প্রথম প্রকাশ । মে, ১৯৬০

প্রকাশক :
রমানাথ ঘোষ
স্ট্যাণ্ডার্ড পাবলিশার্স
২৫-২৬ কলেজ-স্ট্রীট:মার্কেট
কলিকাতা-৭

মুদ্রক :
শ্রীশুভেন্দু রায়
রামকৃষ্ণ-সারদা: প্রিণ্টার্স
৯এ, রামধন মিত্র লেন
কলিকাতা-৪

প্রাক্‌কথা

আফ্রিকার সাহিত্য বইটি প্রকাশিত হল। বছর তিনেক আগে 'বৈশাখী' সাহিত্যপত্রের যে আফ্রিকার সাহিত্যবিষয়ক সংখ্যা বেরিয়েছে—এ বই তারই পরিবর্ধন।

আফ্রিকা এক বিশাল মহাদেশ। প্রচুর রাষ্ট্র, জাতি, ভাষা, সংস্কৃতিতে সমৃদ্ধ এ মহাদেশ। এশিয়ার মতো এ মহাদেশও শতাব্দীর পব শতাব্দী জুড়ে ইউবোপীয় উপনিবেশবাদের শিকার হয়েছে। প্রচণ্ড অত্যাচার ও নিপীড়নের ফলে এখানকার বিভিন্ন জাতির জীবন ও সংস্কৃতি বারে বারে বিপন্ন হয়েছে। বিভিন্ন জাতির মানুষদেব ক্রীতদাস হিসেবে চালান দেওয়া হয়েছে অন্যান্য দেশে। প্রায় সব দেশে চাপিয়ে দেওযা হযেছে অসম ও অন্যায় যুদ্ধ, মরেছে লক্ষ লক্ষ মানুষ। উনিশ শতকের উপান্তে এমনই এক যুদ্ধ নিয়ে প্রতিবাদমুখর হয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ।

শুধুমাত্র অত্যাচার লুণ্ঠন হত্যার মধ্যেই সীমিত থাকেনি ঔপনিবেশবাদ। এক গভীরতর অন্যায তাবা সংগঠিত করে বেখেছিল কালো ও সাদাদের মধ্যে বর্ণবিবোধ ও বিদ্বেষের হিংসা প্রোথিত কবে। গান্ধিজির যে আন্দোলন একটি পর্যায়ে শুরু হয়েছিল উনিশ শতকের শেষের দিকে, তারই সফলতা এসে মিলেছিল নেলসন ম্যাণ্ডেলার নিববিচ্ছিন্ন সংগ্রাম ও বিজয়ে। তবুও সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রাম ও তার অভিঘাতই হল আধুনিক আফ্রিকার সংস্কৃতির নিবিড় পরিচয়।

আফ্রিকায় শতাব্দীর পর শতাব্দী জুড়ে সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিল মূলত ইংরেজ, ফবাসি ও পর্তুগিজ ঔপনিবেশবাদীরা। দীর্ঘকালের বিদেশি শাসনের ফলে স্থানীয় সংস্কৃতিব সঙ্গে বিদেশি সংস্কৃতির একটি সুতীব্র টানাপোড়েনের সৃষ্টি হয়েছিল। তারই স্বাক্ষর বয়ে গেছে আফ্রিকাব নানা দেশের আধুনিক সাহিত্যে। এখানে এ বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হল।

আফ্রিকার সাংস্কৃতিক ভূগোলকে মূলত দুটি ভাগে বিভক্ত করা যায়—সাহারা উত্তর ও সাহারা দক্ষিণ। সাহাবা উত্তরের সংস্কৃতি আরব ঐতিহ্যকে ধারণ করেছে। অবশ্য তার মধ্যে ব্যতিক্রম আছে। আলজিরিয়া সাহারার উত্তবে অবস্থান করলেও তাব উপর প্রভাব পড়েছে ফ্রান্সেব। দীর্ঘকাল ফ্রান্সের উপনিবেশ ছিল বলেই সেদেশে ব্যাপৃত হয়েছে ফরাসি সংস্কৃতি। সাহারার উত্তরে আরবি সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য অত্যন্ত সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী। সাহাবা উত্তবের মৌখিক (Oral) সংস্কৃতিব ঐতিহ্যও বেশ সমৃদ্ধ।

সাহারা দক্ষিণের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যেবও আবাব দুটি ভাগ—মৌখিক ও লিখিত। এই লৌকিক ঐতিহ্যেব সাহিত্যিক উপাদানসমূহ বিগত দুশো বছর ধরে সংগৃহীত হযে একটি বলিষ্ঠ ভাণ্ডাব গড়ে তোলা হয়েছে। প্রতিটি জাতির লৌকিক উপাদানসমহ তাদেব আধুনিক সাহিত্যের মনন ও সৃজনে বলিষ্ঠ প্রভাব রেখে গেছে।

আধুনিক আফ্রিকান সাহিত্যেব আবাব তিনটি প্রদেশ লক্ষ করা যায়। ফ্রাঙ্কোফোন বলা হয সেসব দেশেবই সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে যারা দীর্ঘকাল ধরে ছিল ফরাসি উপনিবেশ। লুসোফোন বলা হয় তাদেরই যারা পর্তুগিজ অধিকারে ছিল। অ্যাংলিফোন হল ব্রিটিশ উপনিবেশের অন্তর্ভুক্ত দেশসমূহ।

ফ্রাঙ্কোফোন হল সেনেগাল, কঙ্গো প্রভৃতি দেশ, লুসোফোনের অন্তর্গত হল মোজাম্বিক সহ আরো কিছু রাজ্য এবং অ্যাংলিফোন ঐতিহ্যের জন্য পড়ছে ঘানা, নাইজিরিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, কেনিয়া, তানজানিয়া বৎসোয়ানা প্রভৃতি দেশ। তিনটি ঐতিহ্যের সংমিশ্রণে আফ্রিকার প্রতিটি দেশের নিজস্ব সাহিত্য গড়ে উঠেছে। আমাদের বর্তমান সংকলনে এমনসব রচনা গৃহীত হয়েছে যাতে চার ভুবনের সাহিত্য মোটামুটি ভাবে অন্তর্ভুক্ত করা যায়। কাজটা অবশ্য অত্যন্ত কঠিন। কেননা একখানি মাত্র সংকলন গ্রন্থের মধ্যে এত বিচিত্রধর্মী সমৃদ্ধ সাহিত্যের মধ্যে থেকে নির্বাচন করা প্রায় অসাধ্য। তবু করা হল। কেননা আফ্রিকার সাহিত্যের সঙ্গে বাঙালি পাঠক যদি পরিচিত হতে পারেন তাহলে আমাদের পক্ষেও তা মঙ্গলজনক বলে প্রতিভাত হবে। এ বিশ্বায়নের যুগেও কলকাতায় বসে বিদেশি বই ইচ্ছে ও সামর্থ অনুযায়ী সংগ্রহ করা সহজ নয়। তাছাড়া গত কয়েক বছরে বিদেশি বইয়ের দাম যে হারে বেড়েছে তা শঙ্কাজনক। তবু কোনো জায়গা থেকে তো শুরু করতেই হয়।

এ সংকলনে তিনজন নোবেল লরিয়েটের রচনার অনুবাদ পরিবেশিত হল। মিশরীয় ঔপন্যাসিক মাফুজের 'মান্যবরেষু', নাইজিরিয় নাটককার ওলে সোয়িংকার 'ক্যামউড অন দ্য লীভস্' এবং দক্ষিণ আফ্রিকার কথাকার নাদিম গোর্ডিমারের দুটি গল্প এ সংকলনের অন্তর্ভুক্ত হল। তাছাড়া সুদানের লেখক তায়েব সালিহ্-র লেখা একটি উপন্যাসও রয়েছে। বিভিন্ন দেশের গল্প কবিতা ও প্রবন্ধও সন্নিবেশিত হল। সেনেগালের রাষ্ট্রনায়ক সেনঘরের একটি কাব্যনাটকও রইল।

অবশ্যই এ নির্বাচন অসম্পূর্ণ ও শীর্ণ। চিনুয়া আচিবির একটি গল্প দেওয়া হল। কিন্তু তাঁর লেখা একটি উপন্যাসের অনুবাদ থাকলে ভাল হত। মিশরীয় নাটককার অল হাকিসের নাটক সম্পর্কেও একই কথা। দক্ষিণ আফ্রিকার নাটককার অ্যাথেল ফুগার্দয়ের নাটকের একটি অনুবাদও দেবার ইচ্ছা ছিল। যদি কখনো দ্বিতীয় একটি এ-ধরনের সংকলন পাঠকদের কাছে পরিবেশন করা যায় তাহলে এসব প্রত্যাশা পূরণ করা যাবে বলে মনে হয়।

রবীন্দ্রনাথের 'আফ্রিকা' কবিতাটির সঙ্গে বাঙালি পাঠকদের পরিচয় আছে। কিন্তু কালিদাস নাগের 'আফ্রিকা' কবিতা বেশ দুষ্প্রাপ্য। আমরা এ সংকলনে দুটি কবিতাই অন্তর্ভুক্ত করতে পেরে আনন্দিত।

আমাদের এ সংকলনে আফ্রিকার সাহিত্য নিয়ে মাত্র গুটিতিনেক প্রবন্ধ অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এ বিষয়ে আরো কিছু আলোচনা থাকলে ভাল হত বলে কেউ কেউ মনে করতে পারেন। কিন্তু বইটির আয়তন তার ফলে আরো বৃহৎ হত এবং ফলত দামও আরো বেড়ে যেত বলে সংযত হতে হল। বিশেষত আমাদের ইচ্ছে হল আফ্রিকার সৃজনশীল সাহিত্য যথাসম্ভব বেশি করে পাঠকদের কাছে পৌঁছে দেওয়া। তাই আফ্রিকার সাহিত্য নিয়ে আলোচনার পরিমাণ একটু কমই হল।

সম্পাদকের অনুরোধে যারা এ সংকলনের জন্য নানা রচনার অনুবাদ করে দিয়েছেন তাঁদের সকলকে ধন্যবাদ জানাই। সংকলনটি পাঠকদের প্রীতি উৎপাদক করলে শ্রম সার্থক হবে।

সূচি

কবিতা

উপন্যাস

আফ্রিকা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

উদ্‌ভ্রান্ত সেই আদিম যুগে
স্রষ্টা যখন নিজের প্রতি অসন্তোষে
নতুন সৃষ্টিকে বারবার করছিলেন বিধ্বস্ত,
তাঁর সেই অধৈর্যে ঘন-ঘন মাথা নাড়ার দিনে
রুদ্র সমুদ্রের বাহু
প্রাচী ধরিত্রীর বুকের থেকে
ছিনিয়ে নিয়ে গেল তোমাকে, আফ্রিকা—
বাঁধলে তোমাকে বনস্পতির নিবিড় পাহারায়
কৃপণ আলোর অন্তঃপুরে।
সেখানে নিভৃত অবকাশে তুমি
সংগ্রহ করছিলে দুর্গমের রহস্য,
চিনছিলে জলস্থল—আকাশের দুর্বোধ সংকেত,
প্রকৃতির দৃষ্টি-অতীত জাদু
মন্ত্র জাগাচ্ছিল, তোমার চেতনাতীত মনে।
বিদ্রূপ করছিলে ভীষণকে
বিরূপের ছদ্মবেশে,
শঙ্কাকে চাচ্ছিলে হার মানাতে
আপনাকে উগ্র ক'রে বিভীষিকার প্রচণ্ড মহিমায়
তাণ্ডবের দুন্দুভিনিনাদে॥

হায় ছায়াবৃতা,
কালো ঘোমটার নীচে
অপরিচিত ছিল তোমার মানবরূপ
উপেক্ষার আবিল দৃষ্টিতে।
এল ওবা লোহার হাতকড়ি নিয়ে,
নখ যাদের তীক্ষ্ণ তোমার নেকড়ের চেয়ে,
হল মানুষ-ধরার দল
গর্বে যারা অন্ধকার তোমার সূর্যহারা অরণ্যের চেয়ে।

সভ্যের বর্বর লোভ
নগ্ন করল আপন নির্লজ্জ অমানুষতা।
তোমার ভাষাহীন ক্রন্দনে বাষ্পাকুল অরণ্যপথে
পঙ্কিল হল ধূলি তোমার রক্তে অশ্রুতে মিশে,
দস্যু-পায়ের কাঁটা—মারা জুতোর তলায়
বীভৎস কাদার পিণ্ড
চিরচিহ্ন দিয়ে গেল তোমার অপমানিত ইতিহাসে।।

সমুদ্রপারে সেই মুহূর্তেই তাদের পাড়ায় পাড়ায়
মন্দিরে বাজছিল পূজার ঘণ্টা
সকালে সন্ধ্যায় দয়াময় দেবতার নামে;
শিশুরা খেলছিল মায়ের কোলে;
কবির সংগীতে বেজে উঠছিল
সুন্দরের আরাধনা।।

আজ যখন পশ্চিম দিগন্তে
প্রদোষকাল ঝঞ্ঝাবাতাসে রুদ্ধশ্বাসে,
যখন গুপ্তগহ্বর থেকে পশুরা বেরিয়ে এল—
অশুভ ধ্বনিতে ঘোষণা করল দিনের অন্তিমকাল,
এসো যুগান্তরেব কবি,
আসন্ন সন্ধ্যার শেষ রশ্মিপাতে
দাঁড়াও ওই মানহারা মানবীর দ্বারে;
বলো 'ক্ষমা করো'—
হিংস্র প্রলাপের মধ্যে
সেই হোক তোমার সভ্যতার শেষ পুণ্যবাণী।।

শান্তিনিকেতন
২৬ মাঘ১৩৪৩

আফ্রিকা

কালিদাস নাগ

মহাত্মা গান্ধী
ভক্তিভজনেষু

দেখ্‌ছি বিরাট কালো মহাদেশ
দেখ্‌ছি তা'র অগণ্য কালো মানুষ
পুরুষ নারী ঘাড় হেঁট্ ক'রে চলেছে
যুগ হতে যুগান্তরে।
কোন্ সুদূর অতীতে এই কালো মানুষ হাঁট্‌তে সুরু করেছে।
কালের গজ-কাঠিতে যেন মাপাই যায় না।
হয়ত মানব-জাতের মুখ্য কুলীন
হয়ত স্রষ্টার খামখেয়ালে তা'র চেপ্‌টা নাক
কালো রঙ্ কদর্য্য ঠোঁট
আরো কত বিসদৃশ বীভৎস জিনিষ
যেন পুঞ্জীভূত হয়েছে তা'র শরীবে।
পরের যুগে শাদা-মানুষ এসে বলেছে
তা'কে দেখে ভয় করে, ঘৃণা হয়।
তাই কালোর উপরে শাদা করেছে কল্পনাতীত অত্যাচার
অভূতপূর্ব্ব নিষ্ঠুরতা।
কালো মহাদেশের সর্ব্বত্র আজ
শাদা জাতের গর্ব্বোন্মত্ত জয়ধ্বজা;
কালো মানুষ ক্রীতদাস
কালো নারী ভোগের দাসী হতেই যেন জন্মেছে।
শাদা-কালোর কামজ সংমিশ্রণ
গড়ে তুল্‌ছে নতুন জাত, বর্ণসঙ্কর সমস্যা—
ভীষণ ক'রে তুলছে মানুষের ইতিহাস।
অথচ এই ইতিহাসের গোড়ার অধ্যায়গুলো
কালো ঐতিহাসিকের লেখা;
কলম দিয়ে লেখা হয় নি তখনো সুরু—

নানা প্রহরণ দিয়ে হাতিয়ার দিয়ে,
কালো মানুষ লিখে গেছে, মানব-পুরাণ।
কিম্পুরুষ যেন বামনাবতার হয়ে ছেয়েছে দেশ মহাদেশ :
কারো খাদ্য কন্দমূল কারো বা মাছমাংস
কেউ অহিংসাধর্ম্মী, কেউ হিংসাব্রতী
কেউ গড়েছে কৃষিবিজ্ঞান কেউ শিকার-সন্ধান,
কেউ স্থল-পথে কেউ জল-পথে গেছে ধেয়ে
সব মানুষের আগে,
সব জাতির অগ্রদূত,
এই কালো মানুষ ছড়িয়ে পড়েছে
অতলান্তিক, ভূমধ্য-সাগর বেয়ে পাশ্চাত্য মণ্ডলে
ভারত-সমুদ্র বেয়ে সুদূর প্রাচ্যখণ্ডে।

মানবজাতির প্রণম্য পথিকৃৎ!
প্রণাম করি তোমায়।
মানুষের শতাব্দী-সঞ্চিত ঘৃণা অত্যাচার ও দাসত্বের ভারে
তোমার ঘাড় গিয়েছে নুয়ে, পা গিয়েছে বেঁকে;
প্রাণ দিয়ে খেটেও মেলে নি তোমার সুখশান্তি
স্থায়ী আবাস
নামও নেই যেন তোমার
শুধু ঘৃণ্য পরিচয়—তুমি ক্রীতদাস!
অপরিসীম স্পর্দ্ধা মানুষের,
যারা এসেছে সবার পরে, করেছে সব লুট,
তারাই কিনেছে তোমার ভিটে-মাটি, তোমার সব,
তোমার প্রাণ!
কী দাম দিয়ে? কে ছিল সাক্ষী?
কে করেছে যাচাই?
এত অবিচার এত প্রতারণা
সহ্য করবে মানবের ইতিহাস, নীতি, ধর্ম্ম?
ন্যায়ের ক্ষেত্রেও কি আছে জাতিভেদ?
কার গড়া এই নব্য ন্যায়? কত দিন তার স্থিতি?

চিত্রশালা ভরে রয়েছে তোমার বিচিত্র সৃষ্টি—
মানবত্বে দাবীর পাকা দলিল :

অসীম সাহসে দুর্ভেদ্য জঙ্গল করেছ ভেদ
চিনেছ লতাপাতা কাঠপাথর,
রচেছ প্রথম গৃহ্যসূত্র—পর্ণকুটীর,
গেঁথেছ প্রথম মালা গৃহলক্ষ্মীর গলায়
দিয়েছ শোলার গয়না, কাঠের কণ্ঠী, ঝিনুকের কঙ্কণ বলয়,
কাচমণির হার গজদন্তের অলঙ্কার।
পাথর ঘষে উদ্ভিদরসে রসিয়ে
এঁকেছ ছবি, পুরাণ পৃথিবীটা ব্যেপে,
হিস্পানী গুহা থেকে ভারত-সাগরের উপকূল পর্য্যন্ত
সাজিয়ে তুলেছ তুমি তোমার রেখায় রঙে।
আদি শিল্পী তুমি, চিত্রী তুমি,
আদি নট তুমি!
ভাষায় নাটক লেখ নি
পায়ের ছন্দে অদ্ভুত নৃত্যতাণ্ডবে মাতিয়ে তুলেছ সবাইকে
নাচিয়ে তুলেছ তোমার শাদা প্রভুদের
তা'রা প্রথম হেসেছিল বোধহয় ঘৃণার হাসি
যখন তোমার ভাষাতীত বেদনা
মূর্ত্তি ধরে ফুটেছিল তোমার নাচে।
প্রথম দাস-জাহাজের বুকে,
সমুদ্রের তাণ্ডবে মনে পড়েছিল বোধ হয়—
একদিন তুমিই গড়েছিলে প্রথম কাঠের কাটামারান্,
লঙ্ঘন করেছিলে অসীম সাগর।
আজ তোমারই পায়ে বেড়ি, হাতে শিকল,
তবু তার মধ্যেই জাগছে যেন জন্মান্তরের স্মৃতি।
নেচে উঠেছ তুমি
নাচিয়ে তুলেছ তুমি, তাঙ্গো নৃত্যে,
শাদা-কালোর ভেদ ঘুচিয়ে;
জাগছে ঘৃণ-প্রীতির যুগ্ম-নৃত্য!
অর্কেষ্ট্রায় এনেছ নতুন তাল, নতুন প্রাণ,
গানে দিয়েছ নতুন প্রেরণা
শেক্‌সপীয়রের রচেছ নতুন টীকা,
ক্রীতদাসের ভাষ্যে ধন্য হয়েছে
শ্বেত কবি-গুরুর রচনা,—
তোমার পায়ে অর্ঘ্য দিয়েছে।

লক্ষ লক্ষ মুগ্ধ শ্বেত নরনারী,
অবাক হয়ে দেখেছি।

ভেবেছি তোমার ভবিষ্যৎ, কালো ভাইবোন।
শিল্পীর সম্বর্দ্ধনা তুমি সহজেই লুটে নিয়েছ
কবে পাবে ন্যায়ের অধিকার
শাদা মানুষের হাত থেকে?
প্রাচীন মিশরকে জুগিয়েছ সভ্যতার উপাদান
ফিনীসিয়া, সীরিয়া বাবিলনে পশেছে তোমাব কারুকাজ,
মধ্য যুগে আরব তাতার দিয়েছে হানা,
লুটেছে তোমার দেশ ঘর ধনদৌলত,
তোমার গজদন্ত, হীরক স্বর্ণ হয়েছে তোমার কাল।
আধুনিকেরা এসেছে তোমার খোঁজে,
ফলন্ত করতে হবে তাদের নতুন সাম্রাজ্য, নতুন জমি;
হিংস্র জন্তুর সঙ্গে হিংস্রতর রোগের সঙ্গে যুঝে,
কালো ক্রীতদাস।
তুমিই গড়ে তুলেছ বিরাট শ্বেত সভ্যতা সুখ সমৃদ্ধি আবাদ
নামে ঘুচেছে তোমার ক্রীতদাস নাম
কাজে মেলে নি আজও মানুষের অধিকার
শাদা মনিবের হাত থেকে।
মানুষের অধিকার?
অনেক আগে উচিত ছিল তোমার পাওয়া
মানব-সভ্যতার মূল উপাদান জুগিয়ে এসেছ তুমি
কে অস্বীকার করবে তোমার দাবী?
কিন্তু ক'রে আসছে উপেক্ষা, যুগে যুগে দেখছি,
আধুনিক ইতিহাসও বাদ যায় নি
তাই আজ কালোর দেশে শ্বেত-সভ্যতার বর্ব্বরতা।
তবু মনে হয়, আছে ন্যায় কোনও খানে
অলক্ষিতে অতর্কিতে নাম্‌বে একদিন
উদ্যত বজ্রের মত
ভেঙে পড়বে অধর্ম্মের সাম্রাজ্য
ছিন্ন হবে দীর্ণ হবে অন্যায়-বৃত্রের উদ্ধত বুক
যেমন দেখি সব জাতির প্রাচীন পুরাণে
তেম্‌নি হবে এ যুগের জীবন্ত ইতিহাসে।

জয়ী হবে মানুষের দাবী; চিরন্তন ন্যায়
বিধৃত করছে চিরদিন মহামানবের লীলা
নাই সেখানে কোনও ভেদ শাদায় কালোয়,
কোন পক্ষপাত জাতিতে জাতিতে—
এ বিশ্বাস
এই প্রতীক্ষা
ব্যথিয়ে তুলছে আমাদের এই যুগান্তরের সীমা।

দার্ব্বান, দক্ষিণ আফ্রিকা
১৯৩৬।।

প্র ব ন্ধ

শব্দের শক্তি ভাষার ক্ষমতা—
আফ্রিকার সাহিত্যগুলির প্রাথমিক পরিচয়

ঈপ্সিতা চন্দ

> "আকাশ ছিল বিশাল, সাদা, স্বচ্ছ, ছিল শূন্য, তারা ছিল না, চাঁদও না, শুধু ছিল একটা গাছ, আর হাওয়া। এই গাছ খাদ্য যোগাতো বায়ুমণ্ডলকে, আর তার গুঁড়িতে বাস করত পিঁপড়েরা। হাওয়া, গাছ, পিঁপড়ে ও বায়ুমণ্ডল চালিত হোত শব্দের শক্তিতে। কিন্তু শব্দ দৃশ্যমান ছিল না। সে ছিল একটা ক্ষমতা, যে ক্ষমতা ব্যবহার করে একটি বস্তু আর একটি বস্তুকে সৃষ্টি করতে পারত।"

পূর্ব আফ্রিকার তানজেনিয়াতে থাকে ওয়াপাংওয়া জাতি তারা সৃষ্টিতত্ত্ব বিবরণ করে এভাবে। এটা অবশ্য গল্পের আরম্ভমাত্র—এরপর সৃষ্টিরহস্যের ক্ষেত্রে যে ধারা আমরা সর্বত্র পেয়ে থাকি, তা এখানেও আছে, পৃথিবীতে কী ভাবে মানুষ এল, কী ভাবে এই দুচারটি মূল উপাদানের ব্যবহার নিয়ে মানুষে মানুষে বাধলো সংঘাত, কী ভাবে মানুষ আদি শক্তি, অর্থাৎ শব্দকে অবহেলা করল, অপমান করল এবং তারই ফলে, "তোমরা একদিন ছিলে মহান, কিন্তু যা তোমরা করেছো, তার শাস্তি তোমাদের পেতে হবে। তোমরা হয়ে যাবে ক্ষুদ্র, তোমাদের উচ্চতা কমে হবে অর্ধেকেরও কম, আর শেষকালে তোমাদের গোটা পৃথিবীটা গ্রাস করবে আগুন", পাঠক ভাবতেই পারেন, এটা খুব নতুন কিছু হলো কি? আমরা তো এধরনের পুরাণ পড়তে বা শুনতে অভ্যস্ত। আমার বক্তব্যও ঠিক তাই। যে মহাদেশকে শ্বেতাঙ্গ উপনিবেশকারীরা 'আদিম-বর্বর-অসভ্য-পশু' হিসেবে দেখেছে এবং দেখিয়েছে, যাদের রঙ-রূপ 'সাধারণ' মানুষের সঙ্গে মেলেনা বলে উৎপীড়ন ও অবদমনের একটা আস্ত তত্ত্ব, অর্থাৎ বর্ণবিদ্বেষ, বহু যুগ ধরে রাজত্ব করেছে এবং সম্পূর্ণ অবলুপ্ত হয়নি এখনো, সেই আফ্রিকার একটি জাতি অন্তত সৃষ্টি-বিনাশ-শক্তি নিয়ে যা ভাবে, তা আমাদের অচেনা নয়, বরং আমাদের নিজেদের ভাবনার গা ঘেঁষেই তার অবস্থান। তাতে যদি কিছু প্রমাণ হয় ভাল। না হলেও ক্ষতি নেই, কারণ আফ্রিকার সুপ্রাচীন, সমৃদ্ধ সংস্কৃতি ও ইতিহাসের অস্তিত্বের জন্য আমাদের অনুমতি বা স্বীকৃতির প্রয়োজন খুব বেশী নেই। বরং বলা যায়, বহির্বিশ্বের স্বেচ্ছাচার ও অভিসন্ধির ফলে তা অনেকাংশে নষ্ট হয়েছে, ধ্বংস হয়েছে। তাও এই বিশাল মহাদেশের বিবিধতা, ধর্ম থেকে আরম্ভ করে সাহিত্যে তার বৈচিত্র্য, তার মানবসম্পদ ও সমাজসম্ভারকে সম্পূর্ণ নষ্ট করতে পারেনি দাস ব্যবসায়ী

বা উপনিবেশকারীরা। নয়া উপনিবেশবাদ ও তথাকথিত শিল্পোন্নয়নের হাত ধরে ক্ষুধা, দারিদ্র্য, অন্তর্বিরোধ ও এইডসের মত মর্মান্তিক রোগের তাণ্ডবও তা পারবে বলে মনে হয়না। কিন্তু যে গল্প দিয়ে আরম্ভ করেছিলাম, তাতে ধ্বংসের পথনির্দেশও করা ছিল। মনে করে দেখুন, ধ্বংস আসবে শব্দের বিনাশের পথ দিয়ে। শব্দ অপমানিত, অবহেলিত হলে মানবসভ্যতা ছারখার হয়ে যাবে। পাঠক ভাববেন, তা হয় কী করে? আমরা তো জানি, আফ্রিকায় সাহিত্যের অস্তিত্ব ছিলনা—উপনিবেশকারীরা নিয়ে এসেছিলেন ভাষা লিপি তার থেকেই তো জন্ম হলো সাহিত্যের। তাহলে?

তাহলে—লিপি না থাকলে কি সাহিত্য হওয়া সম্ভব নয়? ভাষার সঙ্গে লিপির যোগ তো সম্পর্ক বিন্যাশের দ্বিতীয় স্তরে পড়ে ; শিশুতো প্রথমে শেখে কথা, তারপর আসে লেখা। 'আসে' বললে ভুল বলা হবে, এটা আমরা সকলেই জানি, লেখা সহজে আসেনা, আনতে হয়। এবং আমাদের পক্ষে এটা বলা তো প্রায় পাপ যে লেখা ছাড়া সংস্কৃতি, সভ্যতা, সাহিত্য হয় না। কারণ আমাদের সংস্কৃতির মূলে আছে বেদ-উপনিষদ-মহাভারত-রামায়ণ, যে সব গ্রন্থ 'লেখা' হয়েছে তাদের অনেকটা জীবনকাল অতিক্রান্ত হওয়ার পর, স্মৃতি ও শ্রুতিতে বা আধ্যেয় বেদজ্ঞদের হেফাজতে বেঁচে থেকেছে যে সব 'মূল' গ্রন্থ, সেগুলির সঙ্গে সহজেই তুলনা করতে পারি এক একটি আফ্রিকান জাতির ইতিহাসকথা, পরিবারগাথা বা সৃষ্টি-বিনাশ, পাপ-পুণ্য, প্রকৃতি-নারী-পুরুষ, প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি সংক্রান্ত হাজার হাজার কাহিনী যা দর্শন, সমাজশাস্ত্র, নীতিকথাও বটে, সাহিত্যও বটে। শব্দের গুরুত্ব সব থেকে বেশী হয় কথ্যভাষা ভিত্তিক সমাজে—সেখানে যেহেতু ভাষাকে লিপিবদ্ধ করা প্রযুক্তি আসেনি, সেহেতু শব্দ সাধারণভাবে স্থায়ী নয়, তাকে রক্ষা করতে হয়, আঁকড়ে থাকতে হয়, চেষ্টা করে, মনে রেখে, বাঁচিয়ে রাখতে হয়। সুতরাং তার যোগ সরাসরি জীবনের সঙ্গে সেখানে মধ্যবর্তী স্তরে 'লিখতে-জানা' সাক্ষর ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটে না, ভাষা বা সাহিত্যের সঙ্গে, জ্ঞানের সঙ্গে সাক্ষরতার সমীকরণ হয় না। ক্ষমতার তারতম্য নিশ্চয় থাকে—কিন্তু তা এভাবে নয় যে যারা ইস্কুল কলেজে যেতে পেরেছে, তারাই সাহিত্যসেবক হবে, তা তাদের সাহিত্যবোধ থাক বা না থাক, আর যে নিরক্ষর দিদিমা মুখে মুখে গল্প বলেন, তাঁর গল্পগুলি তাঁর সঙ্গেই পরকালে বিলুপ্ত হবে। ক্ষমতার তারতম্য থাকে দুই শ্রেণীর মানুষের মধ্যে—যারা ভাষা ব্যবহার করতে পারে, যারা গল্প বলে, মনে রাখতে পারে, যাদের স্মৃতিতে রক্ষিত হয় ইতিহাস, আর যাদের এই ক্ষমতা নেই। আফ্রিকার বিভিন্ন ভাষায় প্রবাদ আছে, যখন কোনো বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি মারা যান, তখন ধ্বংস হয়ে যায় একটি গোটা পাঠাগার। তাই আলজিরিয়ার জাতীয়তাবাদী স্বাধীনতা সংগ্রামে শামিল মানসিক স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ ও উপনিবেশ-বিরোধী তত্ত্বের অন্যতম ব্যাখ্যাতা ফ্রান্‌ৎস ফানোঁ জানান, ফরাসী উপনিবেশকারীরা আলজিরিয়ার স্বাধীনতা সংগ্রাম দমন করতে গিয়ে ভবঘুরে কথকদের পাকড়ে জেলে পুরেছিলো। এই ভবঘুরে কথকরা আফ্রিকার অনেকখানি জুড়ে ঘুরে ঘুরে পুরোনো গল্প শোনায়, তাদের ঠোঁটে রক্ষিত হয় ইতিহাস। এরা গ্রিয়ো। স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় গ্রিয়োরা এক জায়গার

লড়াইয়ের খবর অন্য জায়গায় গল্পচ্ছলে পৌঁছে দিত সরকারী যোগাযোগ মাধ্যমের সুবিধে পায়নি স্বাধীনতার যোদ্ধারা, কিন্তু গ্রিয়োদের মাধ্যমে তারা একসূত্রে গেঁথেছে বিচ্ছিন্ন লড়াইগুলি। তাছাড়া গ্রিয়োরা পুরোনো গল্পকে নতুন অবস্থার ছাঁচে ঢেলে উদ্দীপনা যোগাতো উপনিবেশপিষ্ট মানুষের হতাশ মনে। ফলে এ ক্ষেত্রে গ্রিয়ো দমনে উদ্যোগী হয়েছিলেন ফরাসী উপনিবেশকারীরা। এভাবেই আমাদের কাছে স্পষ্ট হতে পারে আফ্রিকার বিভিন্ন জাতির মানুষের কাছে কথা এবং ভাষার গুরুত্ব কতখানি। ভাষা ছাড়া কথা বাদ দিয়ে যে সাহিত্য হয় না, এটা বলার মত বিষয় হয়তো নয়। তাও এখানে উল্লেখ না করে পারা যাবে না এই কারণে যে ইউরোপীয় উপনিবেশকারীরা আফ্রিকাবাসীদের বর্বর প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন এই বলে যে তাদের কোনো সাহিত্য নেই। আসলে তাঁরা লিখিত বয়ানকে সাহিত্যের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলেছিলেন, যেহেতু অনেক ইউরোপীয় ভাষায়ই "সাহিত্য" শব্দটি আসে "লেখা" শব্দের সূত্র ধরে, একই উৎস থেকে। ভারতীয় হিসেবে এরকম ভুল করা আমাদের সাজে না, কারণ প্রথমত কথা সাহিত্যের সঙ্গে আমাদের পরিচয় অতি প্রাচীন, এবং দ্বিতীয়ত, আমরা "সাহিত্য" বলতে বুঝি "সাহিত্য" শব্দ থেকে যার উৎপত্তি, যা সমষ্টি স্থাপন করে, সাহচর্য বা সহিতত্বের মাধ্যম—তা ভাষা নির্ভর অবশ্যই কারণ ভাষা যোগ স্থাপনের মাধ্যম, কিন্তু সে ভাষা লিখিত না হয়ে কথ্য ভাষাও হতে পারে। সুতরাং আমাদের সাহিত্য ধারণা ইউরোপীয় সাহিত্য-ধারণা থেকে আলাদা হওয়াই স্বাভাবিক ছিল—যদি উপনিবেশকালে আমাদের ঘাড়ে ইউরোপীয় ধারণা চাপিয়ে দেওয়া না হোত।

কিন্তু আদতে সেটাই ঘটেছে। আফ্রিকার বিভিন্ন অঞ্চলে উপনিবেশ স্থাপন করে অন্তত তিনটি ইউরোপীয় শক্তি—ইংরেজ, ফরাসী ও পর্তুগীজ। এ ছাড়া দক্ষিণ আফ্রিকায় বসবাস আরম্ভ করে তৎকালীন হল্যাণ্ড থেকে আসা ক্যালভিনিস্ট সম্প্রদায়ের মানুষ, পরবর্তীকালে যারা বোয়ার নামে খ্যাত—এই বোয়াররা দক্ষিণ আফ্রিকায় ঘাটি গাড়া ইংরেজদের যুদ্ধে পরাজিত করে দক্ষিণ আফ্রিকার "আফ্রিকানার" বলে চিহ্নিত করে নিজেদের, এবং পরবর্তীকালে দক্ষিণ আফ্রিকায় বর্ণভেদের ভিত্তিতে সংগঠিত "আপার্থায়েড" রাষ্ট্র স্থাপন করে। এ ছাড়া বেলজিয়ামের রাজা লিওপোল্ড আফ্রিকার কঙ্গো নদীর চরবর্তী কিছু অংশ নিজের ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিসেবে দখল করেন—এই অংশ বেলজিয়াম রাষ্ট্রের অধীনে নয়, একেবারে রাজার নিজস্ব জমি বলে চিহ্নিত ছিল। এ ভাবেই দেখতে পাই. ভিন্ন দেশের ভিন্ন সংস্কৃতির উপনিবেশকারীরা আফ্রিকার বিভিন্ন অংশ শাসন করেছে এবং আফ্রিকার জাতিগুলির উপর চাপিয়ে দিয়েছে নিজেদের ভাষা ও সংস্কৃতি, সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের সাহিত্য ধারণাও। আর একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটেছে আফ্রিকায় উপনিবেশকালে তা হলো লিপির আগমন। আগেই দেখেছি আমরা আফ্রিকার প্রায় সব কটি ভাষায় সাহিত্য ছিল কথ্য প্রায় কোনো ভাষারই লিপি তখনো তৈরি হয়নি। এমন অবস্থায় অন্তত চারটি ইউরোপীয় ভাষা, যেগুলির সাহিত্য লিপিবদ্ধ, আফ্রিকার বিভিন্ন অঞ্চল দখল করল, প্রত্যেকটি আলাদা উপনিবেশিক শাসকের শক্তির

স্বতন্ত্র সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক নীতি তো থাকবেই—এই নীতি অনুসারে আফ্রিকার বিভিন্ন এলাকায় স্থাপিত হলো ইউরোপীয় ধাঁচের শিক্ষা ব্যবস্থা, ইউরোপীয় ভাষা শিক্ষা ও চর্চা আরম্ভ হলো সেখানে। কিনিয়ার লেখক এন্‌গুগি ওয়া থিয়ং-ও শিক্ষার মাধ্যমে উপনিবেশ গঠনের প্রসঙ্গে বলেছেন—বন্দুক আর ছোরার অন্ধকার রাতের পর এল চক আর ব্ল্যাকবোর্ডের সকাল। এন্‌গুগির মতে উপনিবেশকারীদের প্রস্থানের পরও রয়ে গেছে তাদের শেখানো ভাষা, সংস্কৃতি, দর্শন। এটাকে তিনি বলেছেন মনে স্থাপিত উপনিবেশ—তাঁর মতে আফ্রিকার দেশগুলিতে শুধু নয়, সমগ্র তৃতীয় বিশ্বের একদা-উপনিবেশিত দেশগুলির প্রকৃত মুক্তি সম্ভব তখনই যখন মনের উপনিবেশগুলির থেকে মুক্তি পাওয়ার উপায় আমরা খুঁজে পাব। এন্‌গুগি এই উপায়ের কথাও বলেছেন। তিনি তখন নাইরোবী বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরিজি বিভাগের প্রধান। সেই বিভাগের অন্যান্য সহকর্মীর সঙ্গে তিনি একটা প্রস্তাব দিয়েছিলেন—ইংরিজি বিভাগগুলিকে বন্ধ করে দেওয়া হোক। ইংরিজি ভাষা ও সাহিত্যের বদলে আফ্রিকার বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে পড়ানো হোক আফ্রিকার ভাষা ও তাতে রচিত কথা সাহিত্য। কথা সাহিত্য লিপিবদ্ধ করতে, আঞ্চলিক ভাষাগুলিকে বাঁচিয়ে রাখতে অগ্রসর হোক "সাহিত্য" ("ইংরিজি সাহিত্য" নয়) বিভাগগুলি। আফ্রিকার ভাষা ও সাহিত্য ছাড়া সেখানে পড়ানো হোক তৃতীয় বিশ্বের অন্য একদা উপনিবেশিত দেশের বাছাই সাহিত্য। অবশ্যই বিশ্ব সাহিত্য পাঠক্রমে ইউরোপীয় সাহিত্যেরও ভাগ থাকবে এবং ইংরিজি সাহিত্যও এই ভাগের একাংশে স্থান পাবে—কিন্তু শুধুমাত্র ইংরিজি সাহিত্যই যে সাহিত্য অথবা শুধু ফরাসী সাহিত্যই যে পাঠযোগ্য, এই ধারণা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিদায় নিক। এ ভাবেই এন্‌গুগির বিশ্বাস, আমাদের উপনিবেশিত মন মুক্ত হবে, এবং রচিত হবে আমাদের নিজস্ব সাহিত্য।

এখানে ভাষাকে প্রাধান্য দিয়েছেন এন্‌গুগি। আফ্রিকার নিজস্ব ভাষাগুলির যেহেতু লিপি নেই, তাই উপনিবেশিক ভাষার রাজনীতির আক্রমণের মুখে তারা নিঃশেষ হয়ে যেতে পারে। ফরাশীতে লেখেন বের্নার্দ দাদি। তিনি তাঁর আত্মকথনমূলক উপন্যাস "ক্লঁবি"তে দেখিয়েছেন কী ভাবে তৈরী হয় উপনিবেশিত মন। ফরাসীরা চেয়েছিলো আফ্রিকার উপনিবেশিত জনগণকে ফরাসী শিক্ষা-সংস্কৃতির মাধ্যমে প্রায় ফরাসী করে নিতে এই নীতিকে বলা হোত "আসিমিলাসিয়ঁ"। উপনিবেশিত প্রজার দেশজ সংস্কৃতিকে ধ্বংস করে তাদের ফরাসী করার প্রক্রিয়ায় যে মানসিক হিংস্রতা নিহিত ছিল, তাই দেখিয়েছেন কামারা লেয়। ছোটবেলায় যে স্কুলে পড়তে পাঠানো হয় উপন্যাসের নায়ককে সেখানে বাচ্চাদের বলা হয়, সবসময়ে ফরাসীতে কথা বলা বাধ্যতামূলক। যদি কেউ ভুল করে মাতৃভাষা বলে ফেলে? তার ব্যবস্থা আছে সব ছাত্রদের দায়িত্ব দেওয়া হয়, তারা কান খাড়া করে বন্ধুবান্ধবদের উপর গোয়েন্দাগিরি করবে, যেই শুনতে পাবে কেউ ফরাসী ছাড়া অন্য ভাষায় কথা বলছে, অমনি নালিশ করবে মাষ্টারমশাইয়ের কাছে। তিনি তখন এক টুকরো কাঠ ঝুলিয়ে দেবেন সেই ছেলের গলায়, যে কিনা সভ্য ভাষার বদলে নিজের ভাষায় কথা বলার ধৃষ্টতা দেখিয়েছে। এবার এই ছেলেটি তার

অপরাধের বোঝা গলায় ঝুলিয়ে ঘুরবে বন্ধুদের ঠাট্টা সহ্য করবে, আর কান খাড়া করে শুনবে—যদি অন্য কেউ নিজের ভাষায় কথা বলে ফেলে, তক্ষুনি কাঠের টুকরো তার গলা থেকে নেমে উঠে যাবে সেই অন্যের গলায়। এ ভাবেই চলে ভাষা ও সংস্কৃতির উপনিবেশবাদ।

ইংরেজ অধ্যুষিত এলাকায় অবশ্য "আসিমিলাসিয়ঁ" নীতি চালু ছিল না—সেখানে ম্যাকলে সাহেবের অতি পরিচিত উপদেশ অনুযায়ী প্রচলিত ছিল অন্য ধরণের নীতি, যা একদা ইংরেজ-উপনিবেশের বাসিন্দা হিসেবে আমাদের কাছে অভিনব নয়। আফ্রিকার যে সব এলাকায় ছিল ইংরেজ শাসন, সেখানেও ইংরিজি ভাষা সাহিত্যে পারদর্শী একটি বাবু শ্রেণীর লালন করা হয়, পরবর্তীকালে যারা শাসক হয়ে ওঠে। এখানেও এই বিভাজন নীতির প্রভাব শুধু রাজনীতি বা সমাজব্যবস্থার উপর পড়ে তা নয়—অবশ্যই সাহিত্যেও এর প্রভাব লক্ষণীয়।

এই হলো প্রত্যেকটি আফ্রিকী ও ইউরোপীয় ভাষায় লেখা আধুনিক আফ্রিকী সাহিত্যগুলির পটভূমি। বহু ভাষা, বহু সংস্কৃতি, বহু ধর্ম ছিলই এই মহাদেশ জুড়ে—তার উপর চাপিয়ে দেওয়া হলো নানাবিধ ইউরোপীয় ভাষা, রকমারি খ্রীষ্টধর্ম ও বিভিন্ন উপনিবেশকারীর বিভিন্ন সাংস্কৃতিক নীতি। এই সব কিছুর সঙ্গে যোগ হলো উপনিবেশ-বিরোধী জাতীয়তাবাদী সংগ্রামকালের উপলব্ধি ও পাশ্চাত্য মানসিকতার বন্ধনের বিরুদ্ধে জেহাদের অভিজ্ঞতা। ইউরোপীয় ও প্রাক্-উপনিবেশিক সাহিত্যের ধারাগুলি জারিয়ে উঠল উপনিবেশকালের নানা অত্যাচার শোষণ আর সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে—আফ্রিকার প্রথম প্রজন্মের লেখকরা এই দুই ধারা অবলম্বন করে আত্মপ্রকাশ করলেন বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে—যখন তাঁরা হয়ে উঠলেন তাঁদের জাতির মুক্তি যুদ্ধের পথপ্রদর্শক, মুখপাত্র বা কখনো কখনো স্বাধীন দেশের প্রধান কর্ণধার। এরকম অভিজ্ঞতার সঙ্গে আমরা পরিচিত হয়েছি নাইজিরিয়ার লেখক চিনুয়া আচেবের উপন্যাস, গল্প ও প্রবন্ধে। আচেবেই প্রথম আফ্রিকী লেখক যাঁর ইংরিজিতে লেখা উপন্যাস প্রকাশিত হয়। ১৯৫৯ সালে হাইনেম্যান প্রকাশ-সংস্থার আফ্রিকী গ্রন্থমালার এটাই প্রথম বই। এর আগে ফরাসী শাসিত অঞ্চল সেনেগল থেকে লিখে খ্যাতি অর্জন করেন কবি লিওপোল্ড সেদার সংঘোর। ফ্রান্সের আফ্রিকী প্রজাদের মধ্যে তিনিই প্রথম সফল হন ফরাসী ভাষা ও সাহিত্যের সব থেকে কঠিন ও উচ্চস্তরের "আগ্রেগাসিয়ঁ" পরীক্ষায়। সংঘোরের কবিতা ফরাসী সাহিত্য সমাজে হইচই ফেলে দেয়—সার্ত্র ও ব্রেতঁর মত দিকপাল সংঘোরের আফ্রিকী পরিচয় খারিজ করে তাঁকে ফরাসী লেখকদের ঐতিহ্যের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবে গ্রহণ করতে তৎপর হয়ে ওঠেন। পরবর্তীকালে এই আদ্যোপান্ত "ফরাসী" লেখকই হয়ে ওঠেন স্বাধীন সেনেগলের প্রথম রাষ্ট্রপতি। এই একই গল্প আঙ্গোলার প্রথম রাষ্ট্রপতি কবি অগস্তিনো নেতোরও। আঙ্গোলাকে পর্তুগীজ শাসন থেকে মুক্ত করার যুদ্ধে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন যিনি, তিনিই পর্তুগীজ ভাষায় লিখেছেন আফ্রিকার নিজস্বতা, ইউরোপীয় শোষণ আর তার বিরুদ্ধে লড়াই নিয়ে কবিতা।

এই প্রথম প্রজন্মের লেখকদের ভূমিকা অনস্বীকার্য—তাঁরা পৃথিবীর কাছে উদ্‌ঘাটিত করলেন সম্পূর্ণ অজানা সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের সম্ভার। ইউরোপের অপপ্রচারে যে কৃষ্ণাঙ্গ মানুষকে বর্বর অসভ্য হিসেবে দেখেছিলো বিশ্বের মানুষ, যাদের পূর্বজদের অপহরণ করে পশুর মত খাটিয়ে মেরেছিলো সভ্য শ্বেতাঙ্গ মার্কিন মুলুকের দক্ষিণ অংশের খেত খামারে, সেই কৃষ্ণাঙ্গ মানুষের সুপ্রাচীন সভ্যতা শিল্প সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচয় ঘটেছিলো এই লেখকদের সৃষ্টির মাধ্যমে। কিন্তু পরবর্তীকালের লেখকরা এঁদের অবদান স্বীকার করেই সমালোচনা করেছেন এঁদের ভাষা ব্যবহারের। এন্‌গুগির কথা আগেই উল্লেখ করেছি—তিনিই নতুন প্রজন্মের লেখকদের কাছে এক বিকল্প প্রস্তাব পেশ করেন। তাঁর মতে, যতক্ষণ না আফ্রিকী লেখক তাঁর নিজস্ব ভাষায় লিখতে উৎসাহী হচ্ছেন, ততক্ষণে তাঁদের পাঠক পৃথিবীর অন্য যে কোনো প্রান্তে থাকুক, তাঁর নিজের দেশে তিনি কখনোই ততখানি জনপ্রিয় বা প্রভাবশালী হতে পারবেন না। তার কারণও খুবই সহজ—কতজন আফ্রিকাবাসী এই উপনিবেশিক ইউরোপীয় ভাষা জানেন? যাঁরা জানেন, তাঁরা কোন শ্রেণীর মানুষ? তাঁরা কি আফ্রিকার দেশজ সংস্কৃতি, তার ঐতিহ্য, তার ভাষাগুলি রক্ষা করতে উদ্যোগী, নাকি নয়া উপনিবেশবাদের আমলে ইউরোপীয় ভাষা জানার সুযোগ নিয়ে বহুজাতিক কোম্পানিগুলির চাকর হয়ে নিজের দেশের সম্পদ বিদেশে পাচার করার প্রক্রিয়ায় শামিল? ইউরোভাষাভাষী (শব্দটি এন্‌গুগির বানানো "ইউরোফোন" শব্দের তর্জমা) মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত শ্রেণীর পাঠকের কাছে আফ্রিকার লেখকগণ কোন বিপ্লব, কোন মুক্তির কথা বলতে পারবেন? তাঁরা যতই বিপ্লবী গল্প ফেঁদে বসুন, যতক্ষণে ইউরোপীয় ভাষায় লিখছেন, ততক্ষণে এই শ্রেণী ছাড়া অন্য পাঠক আশাই বা করেন কী করে?

স্পষ্ট বোঝা যায়, আফ্রিকী সাহিত্যে ভাষার রাজনীতির ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ লেখক কোন পাঠকের কাছে পৌঁছোতে চাইছেন, কী তাঁর বক্তব্য এবং কী ভাবে তিনি এই বক্তব্য পেশ করছেন, সবই নির্ভর করে তাঁর লেখার ভাষার উপর। সুতরাং তিনি যখন ভাষা বেছে নেন, তখনই স্পষ্ট হয় তাঁর দর্শন, রাজনীতি, মতাদর্শ। এন্‌গুগির নিজের অভিজ্ঞতা তাঁর তাত্ত্বিক মতের পরিপূরক। তিনি যখন নাইরোবী বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াতেন, তখনই তাঁর কাছে হাজির হন এক বৃদ্ধা। এন্‌গুগি তখন নাট্যকার হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেছেন—কিন্তু তাঁর নাটক, উপন্যাস সবই ইংরিজিতে লেখা। বৃদ্ধা এসে দাবী জানালেন, তাঁকে লিখতে হবে সাধারণ মানুষের কথা। এই তাঁর প্রথম মাতৃভাষায় লেখার অভিজ্ঞতা—"এন্‌গাহিকা এনদিন্দা" নামে নাটক লিখলেন তিনি, নিজের ভাষা গিকুয়ুতে এবং এই নাটকের প্রযোজনা, নট-নটি, দর্শকদের আগ্রহ ও উৎসাহ দেশকে উত্তাল করে ছাড়লো। এই জনপ্রিয়তার খেসারৎ দিতে হলো নাট্যকারকে। যতদিন তিনি ইংরিজিতে বিপ্লবের কথা, সাম্যবাদের কথা, নয়া উপনিবেশবাদের কথা বলেছিলেন, তাঁর পাঠক ছিল তাঁর নিজের দেশ কিনিয়ার বাইরে। এবার তিনি মাতৃভাষায় লিখে শুধু দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের কাছেই পৌঁছে গেলেন না, তিনি পাঠক/দর্শক হিসেবে পেলেন সেই সব শোষিত মানুষদের, যাঁরা নয়া উপনিবেশবাদের রথের রশী হিসেবে কাজ করছেন—সেই সব

শ্রমিক, ভূমিহীন কৃষক ও শহর সভ্যতায় ব্রাত্যজনেরা এন্‌গুগির নাটক দেখতে ভীড় জমালেন। তারপর হঠাৎ একদিন গ্রেফ্‌তার হলেন এন্‌গুগি। বিনা বিচারে তিনি কিনিয়ার সব থেকে প্রসিদ্ধ জেলখানাতে আটক রইলেন দেড় বছর, এবং ছাড়া পাওয়ার পর বাধ্য হলেন দেশ ছেড়ে স্বেচ্ছা নির্বাসনে পাড়ি দিতে। মাতৃভাষায় লেখার এ হেন পুরস্কার পেলেন তিনি, স্বাধীন কিনিয়ার লেখক হিসেবে।

কিন্তু তাঁর সব সতীর্থ আফ্রিকী লেখকই যে তাঁর সঙ্গে একমত তা নিশ্চয়ই নয়। এঁদের মধ্যে চিনুয়া আচেবে বা সাহিত্যে নোবেল জয়ী একমাত্র কৃষ্ণাঙ্গ লেখক, নাইজিরিয়ার নাট্যকার ওলো সোয়িঙ্কাও পড়েন। এঁরা মনে করেন উপনিবেশকারীরা ভাষাটা এনে আফ্রিকানদের উপর চাপিয়ে দিয়েছিলেন বটে, কিন্তু এখন কৃষ্ণাঙ্গ লেখকরা সেই ভাষাকে আত্মস্থ করেছেন, তার নিয়মকানুনগুলি নিজেদের ব্যবহার অনুযায়ী ভেঙেচুরে বা খারিজ করে সেই ভাষাকে নিজেদের চিন্তাভাবনার বাহন হবার যোগ্য করে তুলেছেন। নাইজেরিয়ার লেখক এ্যামোস টুটুওলার তিনটি উপন্যাস যে ইংরিজিতে লেখা, সে ইংরিজি রানীমা শুধু নয়, তাঁর শ্বেতাঙ্গ প্রজারাও ব্যবহার করেন না। একদা যে "ভুল" ইংরিজি বললে হাসি-ঠাট্টার সম্মুখীন হতে হোত, সেই "ভুল" ইংরিজি ব্যবহার করেই টুটুওলা জনপ্রিয় হয়েছেন, কারণ তাঁর দেশের অল্পশিক্ষিত বাজারে-বন্দরে-দূরপাল্লার যানবাহনে যে সব শিল্পাঞ্চল ঘেঁষা খেটে খাওয়া মানুষের সঙ্গে সাক্ষাৎ হতে পারে, তাঁরা সবাই ইংরিজি বলেন বটে, কিন্তু রানীর ইংরিজি নয়, টুটুওলাব ব্যবহৃত এই "নাইজিরিয়ান" ইংরিজি। অর্থাৎ "ঠিক", "ভুলের" গণ্ডী পেরিয়েও ভাষা ব্যবহার করা যায় ভাষা যদি মাধ্যম হিসেবে কাজ করতে সক্ষম হয়, যদি একজনের কথা অন্যজনের কাছে পৌঁছে দেয়, তাহলে তা ব্যাকরণগত ভাবে "ঠিক" না "ভুল" সে বিচার অবান্তর।

এই বিতর্ক বিভিন্ন ভাষায় লেখা আফ্রিকী সাহিত্যের নিজস্ব ক্ষেত্রে এখনো সজীব দু পক্ষেই যথেষ্ট জনপ্রিয় শ্রদ্ধেয়, সংগ্রামী লেখক আছেন, যাঁরা পৃথিবীর মানুষের কাছে আফ্রিকী সাহিত্যেরই প্রতিশব্দ। হয়ত এই বিতর্কই এই সাহিত্যগুলিকে চলৎ শক্তি প্রদান করে, মানুষ ও মাটির কাছাকাছি থাকতে সাহায্য করে, জীবন্ত সমস্যা নিয়ে নাড়াচাড়া করার প্রেরণা জাগায়। পাঠক হিসেবে আমাদের কাছে এটা সুখের কথা। কিন্তু ভারতীয় পাঠক হিসেবে, বা বাঙালী পাঠক হিসেবে এই বিতর্ক কি আমাদের কাছে অচেনা? ভারতীয় ভাষার সাহিত্যের সঙ্গে ভারতীয়দের লেখা ইংরিজি সাহিত্যের যে অসমতা, যে সংঘাত, যে দ্বন্দ্ব আমাদের গা সওয়া হয়ে গেছে, তা কি কোন নতুন মাত্রা পেতে পারে বিভিন্ন আফ্রিকী সাহিত্যের সংস্পর্শে এসে, আফ্রিকী লেখকদের মতামত তাঁদের জীবন ও সাহিত্যকর্মের সঙ্গে পরিচিত হয়ে? ইউরোপ-আমেরিকার সাহিত্য তো আমাদের প্রায় মুখস্থ কিন্তু নিজেদের অবস্থা বা চিন্তাভাবনার সঙ্গে মেলে যে সব অ-শ্বেতাঙ্গ সাহিত্য, সেগুলির সঙ্গে আমাদের হৃদ্যতা দূরে থাক, পরিচয় ঘটার সময় কি এখনো হয়নি?

আফ্রিকীয় বাস্তবতা : আফ্রিকীয় সাহিত্যে নারী

সোমা মুখোপাধ্যায়

'আফ্রিকা' যে শব্দটি উচ্চারিত হলেই আমরা কোনো একক দেশের কথা কল্পনা করে নিই। আমরা ভুলে যাই অথবা আমাদের 'সভ্য' সচেতনতার মধ্যে নিহিত ধারণা আমাদের ভুলে যেতে শেখায় যে আফ্রিকা একটি মহাদেশ—বহু দেশের সমষ্টি একটি মহাদেশ। 'আফ্রিকা' শব্দটি শুনলেই আমরা অসভ্য, বর্বর, নরখাদক মানুষে পূর্ণ, শ্বাপদসঙ্কুল, বনজঙ্গলে পরিবেষ্টিত এক ভূখণ্ডের কথা কল্পনা করি। যেখানকার সব মানুষই 'অসভ্য'। তাদের আবলুস কাঠের মতো গায়ের রঙ, পুরু ঠোঁট, কোঁকড়ানো কালো চুল। আসুরিক দৈহিক শক্তির অধিকারী তাঁরা। বনের বাঘ, সিংহের মতোই তারা হিংস্র। এবং সেই 'অন্ধকারাচ্ছন্ন' মহাদেশের নারীদের কথা তো আমরা সাধারণভাবেই আমাদের সরলরৈখিক ধারণার মধ্যে দিয়েই প্রকাশ করি। কালো, উঁচু দাঁতের অধিকারী কুরূপা সেই সব নারীরা আমাদের চিন্তাভাবনায় সে অর্থে কোন ইতিবাচক স্থান অধিকার করে নেই। আফ্রিকা এবং আফ্রিকার বাসিন্দা নারী পুরুষরা আমাদের কাছে সেই 'ছায়াবৃতা, কালো ঘোমটার নীচে অপরিচিত মানবরূপ' নিয়ে চির অপরিচিত, উপেক্ষার পাত্র হিসেবেই রয়ে গেছে।

কিন্তু আমাদের এই অবজ্ঞা, উপেক্ষার মধ্যে দিয়ে নিজেদের প্রতিই কি আমরা সুবিচার করি? তৃতীয় বিশ্বের বহু দেশের মতোই আফ্রিকীয় ভূখণ্ডের প্রতিটি স্থানকে বিভিন্ন ইউরোপীয় দেশ নিজেদের ঔপনিবেশিক শক্তির প্রকাশক্ষেত্র করে তুলেছিল। ইংরেজরা যেভাবে ভারতবর্ষে নিজেদের সাম্রাজ্যবাদকে বিস্তার করেছিল, সেই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটেছিল ব্রিটিশ উপনিবেশগুলিতে এবং ফরাসীরা কেবল উপনিবেশ স্থাপন করে ক্ষান্ত হন নি, তাঁদের ঔপনিবেশিকতার সংশ্লেষণ (assimilation) তত্ত্ব অনুযায়ী তাঁরা তাঁদের উপনিবেশগুলিতে ফরাসী সংস্কৃতির বর্ধমান অংশকে উপস্থাপিত করতে চেয়েছিলেন। অন্যদিকে পর্তুগীজ উপনিবেশগুলিতে ক্রীতদাস প্রথার প্রচলন সেই সব দেশগুলির ইতিহাসকে রক্তাক্ত করে তুলেছে। আফ্রিকার বিভিন্ন দেশের এই রক্তাক্ত ইতিহাসের সঙ্গে আমাদের নিজেদের দুশো বছরের পরাধীনতার বাস্তবতার কি কোথাও কোনো সাদৃশ্য নেই? নাকি তৃতীয় বিশ্বের মানুষ হিসেবে, তথাকথিত উত্তর-ঔপনিবেশিক পর্যায়ে আফ্রিকার বিভিন্ন দেশের নারী পুরুষের সঙ্গে আমাদের অবস্থানের কোনো মিল নেই? নাকি সেই সব মানুষের সঙ্গে সহমর্মিতাবোধের সূত্রে সংবদ্ধ হওয়া আমাদের পক্ষে খুবই অস্বাভাবিক বা অপ্রয়োজনীয়?

এই সহমর্মিতাবোধসহ যদি আমরা আফ্রিকার বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন লেখকের সাহিত্যকে পড়ি সেক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই যে আফ্রিকীয় সমাজে নারীরাও ঔপনিবেশিক সমাজে পুরুষদের (ঔপনিবেশিক শাসক + আফ্রিকীয় পুরুষ) দ্বারা শোষিত হয়েছে। একই সঙ্গে উত্তর-ঔপনিবেশিক সমাজেও তাদের পরিস্থিতির সেভাবে কোনো পরিবর্তন হয়নি।

ঔপনিবেশিক শক্তির আগমনের আগে আফ্রিকীয় সমাজ বিভিন্ন উপজাতিতে এবং তাদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নিজস্ব সংস্কৃতি, আচার-ব্যবহারের মাধ্যমে বিভক্ত ছিল। কিন্তু ঔপনিবেশিক শক্তির আগমনের সঙ্গে সঙ্গে আফ্রিকীয় উপজাতীয় সমাজগুলিতে বিদেশী সংস্কৃতির প্রভাব পড়ে এবং ঔপনিবেশিক শাসকের ভাষায় শিক্ষিত এক মধ্যবিত্ত শ্রেণী গড়ে উঠতে থাকে, যারা নিজের সংস্কৃতিকে ভুলে, বিদেশী সংস্কৃতিকে অন্তঃস্থ করতে সচেষ্ট হয়ে ওঠে। এই তথাকথিত 'শিক্ষিত' সম্প্রদায়ের মানুষরা, বিশেষতঃ পুরুষরা নিজস্ব স্বদেশীয় সংস্কৃতি এবং বিদেশী সংস্কৃতি—এই দুই বিশ্বের বিভিন্ন আচারকে নিজের সুবিধামতো গ্রহণ করে। যে ঘটনার প্রকাশ আমরা সেনেগলের লেখক সেমবেন উসমানের 'হালা' উপন্যাসে অথবা ঘানার লেখিকা ম্যাবেল-ডাভ-জংকুয়ার "জীর্ণ অঙ্গীকার" ছোট গল্পে দেখি।

হালা উপন্যাসের প্রধান চরিত্র এল হাজি আবদো কাদের বে—চিনি প্রথমে ছিলেন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক, ঔপনিবেশিক কালে শ্রমিকসঙ্ঘের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার জন্য তার সে চাকরী যায়। পরে তিনি সম্পত্তি হস্তান্তরের ক্ষেত্রে মধ্যস্থতার কাজ করেন এবং অনেক ব্যবসায়ীর সঙ্গেই নিজের সুসম্পর্কের ফলে স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে বৈদেশিক ব্যবসায়ী ও বিনিয়োগকারীদের প্রতিনিধি হিসেবে নিজের দেশে নিজেকে ব্যবসায়ী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তিনি সে অর্থে ইসলাম ধর্মের আচার নিয়ম পালন করেন না কিন্তু তিনি নিজের প্রথম স্ত্রীকে নিয়ে মক্কায় হজ করতে যান এবং 'হাজি' উপাধি লাভ করেন। এবং মধ্যবয়স্ক এই পুরুষটি নিজের মেয়ের বয়সী একটি মেয়েকে তৃতীয় বার বিয়ে করছেন কারণ তাঁর নিজের মতেই—"আমি এখন তৃতীয়বার বিবাহ করেছি, সেহেতু আমাদের আফ্রিকীয় মতানুযায়ী আমি নিজেকে "কাপ্তন" বলতে পারি।"

ইউরোপীয় পোশাকে সজ্জিত, নববিবাহিতা স্ত্রীকে ফ্রান্স থেকে আনা বহুবিধ প্রসাধনী দ্রব্য দিতে উৎসাহী হাজির মতো এইসব 'কাপ্তানরা' সদ্যস্বাধীন নিজের দেশের উপর রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক প্রাধান্য বিস্তারে উৎসাহী। কিন্তু স্ত্রীর সংখ্যাও এইসব মানুষের কাছে সমাজে ক্ষমতা জাহির করার প্রকাশ ক্ষেত্র। কতগুলি নারী তার অধিকারভুক্ত এ তথ্য হাজির মতো পুরুষের কাছে নিজের পুরুষত্ব প্রমাণের এবং কাপ্তানগিরির বিজ্ঞাপন বিশেষ।

ঘানার লেখিকা ম্যাবেল ডাভ-ড্যাংকুয়ার "জীর্ণ অঙ্গীকার" (ভাষান্তর : দিব্যেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়—আফ্রিকার শ্রেষ্ঠ গল্প) নামক ছোট গল্পের প্রধান চরিত্র কোয়ামে অ্যাসান্তে —বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মান জনক উপাধির অধিকারী, অ্যাকাডেমির সম্মানিত সদস্য,

নামজাদা ক্লাবের পরিচালন সমিতির সদস্য। টাউন কাউন্সিলে ঢোকার আশা পোষণকারী কোয়ামে অ্যাসান্তে দশ বছরের পুরোনো স্ত্রী আকোসুয়াকে পরিত্যাগ করতে উদ্যত হয় —যে আকোসুয়া গত দশ বছর ধরে কোয়ামেকে 'প্রভু ও মনিব' হিসেবে উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঙ্গে সেবা করে এসেছে। কারণ এই 'অশিক্ষিত' স্ত্রীকে কোয়ামে তার সদ্য প্রাপ্ত 'ভদ্র' সমাজে কিভাবে পেশ করবে? তাঁর গরিমাতে কোনোভাবে কলঙ্ক লেপন করবে না আকোসুয়া? আর তাছাড়া,

"বয়েস যখন কম থাকে, লড়াই করে দিন গুজরান করতে হয়—তখন একটা সাধারণ মাপের মেয়েছেলে হলেই দিব্যি চলে যায়। অনেক কাজেও লাগানো যায় তাদের —ঝি চাকরানী থেকে শুরু করে অর্ধাঙ্গিনী অব্দি সমস্ত কিছু।"

[জীর্ণ অঙ্গীকার. ম্যাবেল ডাভ ড্যাংকুয়া। ভাষান্তর : দিব্যেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়— আফ্রিকার শ্রেষ্ঠ গল্প]

কিন্তু আকোসুয়াকে কাজে লাগানো এবং প্রয়োজন শেষ। এখন 'ভদ্র' সমাজের উপযোগী 'ভদ্র' মেয়ের প্রয়োজন। আকোসুয়াকে, কোয়ামে একশো পাউণ্ড দিয়ে হিসেব মেটাতে চায়। এবং কোয়ামে তার এই "দয়া ধর্ম্মের" জন্য একটু "কৃতজ্ঞতা"ও আশা করে আকোসুয়ার কাছে। আকোসুয়া তাঁর মনিবের কথাকে অস্বীকার করে এবং নির্বাক বশ্যতাসহ বিদায় গ্রহণ করতে অরাজী হয়। দুর্বিনীত আকোসুয়ার মধ্যে কৃতজ্ঞতার ছিটেফোঁটা না দেখে স্তম্ভিত কোয়ামে ভাবে তার মতো একজন পণ্ডিত খ্রীষ্টান ভদ্রলোক একজন ভদ্রমহিলাকে গির্জায় বিয়ে করতে চাইলে আকোসুয়ার মতো সামান্য মেয়েছেলে এত রেগে যায় কেন?

কোয়ামের বিনা অনুমতিতে আকোসুয়া ঘর ছাড়লে কোয়ামে ভাবে—

"শত হলেও আকোসুয়া একটা মেয়েমানুষ, আর মেয়েমানুষেরা চিরদিনই একটু দুর্বল। আবার বিয়ে করার অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই আমি ফের ওকে কব্জা করে ফেলতে পারবো। তাহলে মোট দুটো বউ আমার হাতে থাকবে—একটা আকোয়াপিমে আর একটা আক্রায়। আর যাই হোক, একটিমাত্র মেয়েছেলেকে নিয়েই থাকা উচিত—এসব স্রেফ বাতেল্লা। দেশে এখন প্রায় আটজন মেয়েমানুষ প্রতি একটিমাত্র পুরুষ। কাজেই আমি যদি মোটে একজনকে বিয়ে করে শুধু তাকে নিয়েই থাকি, তাহলে বাদবাকি আর সাতজনের কি হবে?"

বাদবাকি সাতজনের ভাবনায় অস্থির কোয়ামে 'স্বভাবদুর্বল', 'সাধারণ' মেয়েছেলে আকোসুয়াকে আবার কব্জা করে ফেলার বিষয়ে স্থিরনিশ্চিত হয়েই থাকে। আর তাছাড়া মেয়েমানুষ স্বভাবত দুর্বল—এ তথ্য তো স্থান, কাল নির্বিশেষে এক সর্বজনবিদিত সত্য। এবং সেই দুর্বলতাকে স্বামী দেবতাটি ছাড়া আর বেশি ভালোভাবে কি কেউ জানবে? আর তাছাড়া স্বামী ছাড়া স্ত্রীর গতি কোথায়? ধর্মের নামে, দেশীয় আচারবিধির নামে অথবা সবশেষে অন্তত আর্থিক নিরাপত্তা বোধের জন্যই সবদেশের

আকোসুয়াদের, কোয়ামেদের কাছে ফিরতে হবেই। অন্তত এটুকু আত্মবিশ্বাস কোয়ামেদের আছে।

কিন্তু যখন এই 'জন্মদুর্বল', 'স্বভাবদুর্বল', 'সাধারণ' মেয়েছেলেরা তাদের সীমারেখার বাইরে অর্থাৎ সংসারের অন্দর থেকে বহির্জগতের কর্মকাণ্ডের মধ্যে অংশগ্রহণ করে, তখন সেইসব মেয়েছেলেরা 'আধুনিকা' হয়ে ওঠে। যাঁরা চুল ছাঁটে, বিদেশী পোশাক পরে। অর্থাৎ মেয়েরা কর্মপটিয়সী সুগৃহিণী হয় অথবা ছাঁটা চুলের আধুনিকা হয়। কিন্তু যখন সমাজসৃষ্ট এইসব খাপে সাধারণ মেয়েদের বদ্ধ করা যায় না, তখনই সমস্যায় পরে পুরুষেরা বুঝে উঠতে পারে না কোন খাপে এঁদের রাখবে। ঠিক যে সমস্যায় সমস্যায়িত হয়ে ওঠেন বামজি। দক্ষিণ আফ্রিকার লেখিকা নার্ডিন গর্ডিমারের ছোট গল্প 'নকল চুনী'র (ভাষান্তর : দিব্যেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়—আফ্রিকার শ্রেষ্ঠ গল্প) প্রধান চরিত্র বামজি।

দক্ষিণ আফ্রিকায় আপার্টহাইড (apartheid) নামক বর্ণবৈষম্য নীতির দরুন দক্ষিণ আফ্রিকার শাসকগোষ্ঠী ছিল সংখ্যালঘু শ্বেতাঙ্গরা এবং তিনস্তরে বিভক্ত অশ্বেতকায় গোষ্ঠীর প্রথম স্তরে থাকতো বর্ণসঙ্কর সম্প্রদায়, এশিয় মানুষরা দ্বিতীয় স্তরে এবং তৃতীয় স্তরে সংখ্যাগুরু আফ্রিকীয় উপজাতির কৃষ্ণাঙ্গরা থাকতো।

এই নীতির প্রেক্ষাপটে রচিত 'নকল চুনী'র প্রধান চরিত্র বামজি। ফল, তরিতরকারির ফেরিওয়ালা বামজি সব রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ থেকেই দূরে থাকতে চায়, যতক্ষণ সে নিজে নিরাপদ। কিন্তু তাঁর স্ত্রী মিসেস বামজি সংসারের খুঁটিনাটি কাজ যে সাবলীলতার সঙ্গে করেন, একইভাবে বর্ণবৈষম্য নীতির দ্বারা বিভক্ত সমাজের মধ্যে উপস্থিত বৈষম্যের বিরুদ্ধে আন্দোলনেও অংশগ্রহণ করেন। সারাদিনের কাজের পর মাঝরাত অবধি জেগে মিসেস বামজি লঙ্কাগুঁড়ো করার মতোই অনায়াসে ইস্তেহার ছেপে যান। মিসেস বামজি ছেলেমেয়েদের জামাকাপড়ে রিফু করেন, আত্মীয় স্বজনের শাদিতে অংশগ্রহণও করেন, আবার একই সঙ্গে আইনজীবী ডক্টর খান বা বিরাট ব্যবসায়ী মুনস্বামী প্যাটেলের সঙ্গে আলোচনাতেও মগ্ন হন। বিখ্যাত ব্যক্তিত্বদের আনাগোনাতে বামজি আত্মপ্রসাদ অনুভব করলেও ভোররাতে পুলিস মিসেস বামজিকে গ্রেপ্তার করতে এলে ক্ষুব্ধ বামজি অসহায় হয়ে পড়েন। মিসেস বামজি কিন্তু যাওয়ার আগে আত্মীয় ইউসুফের শাদিতে যাওয়ার জন্য বামজিকে অনুরোধ করে যান। বামজি হতবাক হয়ে গিয়ে ভাবেন যে সাদাসিধে, ভালোমানুষ মুসলমান বিধবাটিকে তিনি বিয়ে করেছিলেন—সে স্বাভাবিকভাবেই সব গৃহকর্ম করেছে, তাঁর বাচ্চাদের পেটে ধরেছে। তাঁর স্ত্রী 'আধুনিকা'ও নয়, তাহলে 'কিসের জন্যে এ সব'। কারারুদ্ধ মিসেস বামজি তাঁর মেয়ে গার্লিকে মনে করিয়ে দেন যে বামজির জন্মদিনে সে যেন তাঁর বা-জিকে শুভেচ্ছা জানায়। মিসেস বামজির মধ্যে বোঝাই 'মেয়েলিপনা' দেখে অবাক বামজি ভেবে উঠতে পারে না এইসব মেয়েলিপনাপূর্ণ মিসেস বামজি কী করে এসব কাজ করে?

প্রশ্নটা কী কেবল বামজির? না কী আমাদের সকলের? নিজের সংসারে প্রতিটি

মানুষের খেয়াল রাখা তো মেয়েলি কাজ। নিজেদের সুবিধার্থেই সমাজ মেয়েদের স্থান নির্দিষ্ট করেছে। যে নারী সুগৃহিণী, সে কেবল ঘরের কাজ করে, তথাকথিত মেয়েলি কাজকর্মের মধ্যেই তাঁর ক্রিয়াকলাপ সীমাবদ্ধ। মেয়েলি কাজ—মানে সংসারের কাজ। রান্নাবান্না করা, কাপড় কাচা, ছেলেমেয়ে মানুষ করা ইত্যাদি খুঁটিনাটি কিন্তু অন্তহীন কর্মসূচী। এইসব 'সামান্য' কাজ পুরুষালি কাজের মধ্যে তো পড়ে না। আবার রাজনৈতিক কাজকর্মে অংশগ্রহণকারী মেয়েরা তো সাংসারিক কাজকর্ম করেন না। অর্থাৎ হয় নারী ঘরোয়া, শান্ত, সাধারণ, মূক অথবা নারী আধুনিকা, বিপ্লবিনী ইত্যাদি। এবং রাজনৈতিক ক্রিয়াকর্মের সঙ্গে যুক্ত নারী তো সংসার সামলাতে পারেন না। অজস্র আরো সমাজ সৃষ্ট খাপের মতোই এগুলিও নারীর জন্য নির্দিষ্ট খাপ। এই অঙ্কের বাইরে কোন নারী গেলেই পুরুষ তথা সমাজের হিসেবে গরমিল হয়ে যায়।

গার্লির কথানুযায়ী তাঁর এই সৃষ্টিছাড়া মাটি হলো সেই মা যিনি—"মা কক্ষণো কাউকে বাদ দিয়ে রাখতে চায় না। মা সর্বদা সকলের কথা মনে রাখে—মনে রাখে যাদের থাকার জায়গা নেই, যে বাচ্চারা খিদেয় জ্বলছে, যে সমস্ত ছেলেরা পড়াশোনা করতে পারছে না তাদের সকলের কথা। এই হচ্ছে আমাদের মা।"

[নকল চুনী, নাদিন গর্ডিমার, ভাষান্তর : দিব্যেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়—আফ্রিকার শ্রেষ্ঠ গল্প

এই মা অর্থাৎ যিনি নিজের সংসারকে সুদক্ষ হাতে চালান। আবার নিজের আশেপাশের পরিবেশে উপস্থিত শোষণ, অবিচার এবং সামাজিক, রাজনৈতিক বৈষম্য সম্বন্ধে সচেতন এবং সেই সচেতনতা তার ক্রিয়াকর্মের মধ্যেও প্রতিফলিত হয়। বামজির মতো আমরাও অনুভব করে উঠতে পারি যে 'পাঁচ সন্তানের মা'—মিসেস বামজি ঠিক 'কোন্‌দিক দিয়ে অন্য সকলের মতো নয়।' কিন্তু এই ভিন্নতা 'সম্পূর্ণ নারীর' বিমূর্ত সংজ্ঞাকে প্রতিষ্ঠা করতে চায় না। এই ভিন্নতা প্রচণ্ডভাবে বাস্তব—যেমনভাবে বাস্তব গার্লির জঠরে থাকা নতুন প্রাণটি।

মামি আমাও দশ বছরের কোয়েসির মা। ঘানার লেখিকা আমা আটা আইডুর "নো সুইটনেস হিয়ার" নামক ছোট গল্পের প্রধান চরিত্র মামি আমা। স্বামীর দ্বারা পরিত্যক্ত মামি আমার জীবনে তাঁর সন্তান কোয়েসিই, তাঁর স্বামী, ভাই, বাবা, সর্বস্ব। মামি আমার বাবা-মা মৃত। তাঁর কোনো ভাই-বোনও নেই। সেজন্য শিশু কোয়েসিকে পিঠে নিয়ে মামি আমা চাষ করেছে। কারণ তাঁর সন্তানকে দেখাশোনা করার জন্য কোনো বোন নেই। এবং স্বামীও পিতার দায়িত্ব গ্রহণ করে না। একাকিনী মামি আমার জীবনের কেন্দ্রবিন্দু ছিল কোয়েসি। কিন্তু গ্রাম্য বৃদ্ধদের আদেশে স্বামীর সঙ্গে বিবাহ বিচ্ছেদের সময়ে কোয়েসিকে স্বামীর কাছে ফিরিয়ে দিতে রাজী হয়ে যায় মামি আমা। কিন্তু হঠাৎ সাপের কামড়ে মারা যায় কোয়েসি। কোয়েসির শিক্ষিকা বা চিচা (যিনি গল্পের কথক) স্বপ্ন দেখতেন, একদিন কোয়েসি উচ্চশিক্ষিত হয়ে নিজের মাকে বিখ্যাত করে তুলবে। কিন্তু সকলের সব স্বপ্নকে ধ্বংস করে, মামি আমার জীবনের অস্তিত্বকে ধ্বংস করে কোয়েসি

মারা যায়। আর কোয়েসির মৃত্যুর পর তার বই, স্কুলের ইউনিফর্ম জীবন স্রোতে নিমজ্জমান মামি আমার কাছে খড়কুঠোর মতো শেষ আশ্রয়। এই মা—যাঁর কাছে জীবনের সার ছিল তার ছেলে, সেই ছেলে ছাড়া একাকী জীবন তার কাছে কোন মধুরতার সন্ধান এনে দেবে? মামি আমা কোনো বিপ্লবের কথা বলেন না, বলেন না কোনো পরিবর্তনের কথা। তাঁর কাছে একমাত্র সত্য তার ছেলে—যে সত্য যে কোনো মায়ের কাছেই সত্য। জীবনের সেই সত্যকে হারিয়ে, মামি আমার জীবনের সব স্বপ্ন, আশা, অস্তিত্ব ধ্বংস হয়ে গিয়ে, মামি আমা প্রকৃতপক্ষেই একলা হয়ে পড়েছেন।

আবার আমা আটা আইডুর "সামথিঙ টু টক অ্যাবাউট অন দ্য ওয়ে টু দ্য ফিউনেরাল" নামক ছোট গল্পটির মধ্যে দুই মহিলার কথোপকথনের মধ্যে দিয়ে আরাবা মাসির জীবনকাহিনী বিবৃত হয়। সুন্দরী আরাবা। এক বিবাহিত আত্মীয়ের দ্বারা গর্ভবতী হয়ে, এক সন্তানের জন্ম দেন। বিভিন্ন ধরনের কেক তৈরি করে, তিনি নিজের দিন গুজরান করেন এবং পরবর্তীকালে ইগয়া ইয়াকোকে বিবাহ করেন। আরাবার ছেলে অটো যখন বড় হয়, তখন তার জন্মদাতা বাবা তাকে নিজের কাছে নিয়ে যান। অটো মায়ের কাছে ছুটি কাটাতে এসে মানসা নামের এক মেয়েকে গর্ভবতী করে তোলে। আরাবা, মানসাকে নিজের কাছে নিয়ে রাখেন এবং ঠিক হয় যে অটোর পড়াশোনা শেষ হলে, সে মানসাকে বিয়ে করে নিয়ে যাবে। আরাবা ও মানসার সম্পর্ককে কেউ মা-মেয়ের সম্পর্ক, কেউ দুই বোনের সম্পর্ক বা কেউ দুই বন্ধুর সম্পর্ক বলে অভিহিত করতো। কিন্তু নিজের পড়ার শেষে অটো মানসাকে বিয়ে করে না। কারণ সে এখন এক 'বড়মানুষের' মেয়েকে গর্ভবতী করে তুলেছে এবং এই বড়মানুষটি অটোর ক্ষতিও করতে পারে। অটো নিজের সুবিধার্থে সেই মেয়েটিকে বিয়ে করে।

মানসা কোন বড়মানুষের মেয়ে নয়। সেজন্যই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটে। আরাবা মাসির জীবনে যা ঘটেছিল—মানসার জীবনেও তাই ঘটে। আরাবা মাসির জীবনের অপমান এবং যন্ত্রণার মূলে অবস্থান করে কখনো তাঁর সন্তানের পিতা, কখনো তাঁর সন্তান অটো। নিজের মায়ের যন্ত্রণাকে কোনোভাবে উপলব্ধি না করেই অটো নিজের মা এবং মানসার প্রতি অন্যায় করে। কিন্তু সমাজের এই তথাকথিত শিক্ষিত পুরুষদের অসংবেদনশীলতার সঙ্গে সঙ্গে সমাজে আরাবা মাসি, মানসা অথবা এই গল্পের কথোপকথনরত দুই মহিলার মতো অজস্র মহিলা আছেন, যাঁরা নিজেদের মধ্যে রক্তের সম্পর্ক না থাকা সত্ত্বেও মা-মেয়ে, বোন বা বন্ধুর সম্পর্কের নৈকট্যে পরস্পরের বেদনাকে, আশা-আকাঙ্ক্ষাকে উপলব্ধি করতে পারেন। আরাবা মাসির মৃত্যুতে মানসার মতো এই কথোপকথনরত দুই মহিলাও শোক প্রকাশ করতে এসেছেন। সমব্যথী এইসব নারীদের উপস্থিতিও হয়তো আরাবা মাসির জীবনের বেদনাকে এক বৃহত্তর মাত্রায় উপস্থাপিত করে।

কিন্তু এই সমাজে অটো বা অটোর বাবার মতো মানুষ থাকলে ইগয়া ইয়াকোর মতো মানুষরাও থাকেন, যিনি আরাবা মাসিকে বিয়ে করেছিলেন। যাঁকে আমরা

সাধারণভাবে বলতে পারি ব্যতিক্রমী পুরুষ। কিন্তু একই সঙ্গে মনে হয় না যে এই ব্যতিক্রমী শব্দটাকেই বা আমরা এরকম বড়মাত্রা দিয়ে দেখি কেন? একজন পুরুষের ব্যতিক্রমী বৈশিষ্ট্য কি সব সমস্যার ভিত্তিতে আঘাত করে? না কি সব সমস্যার সমাধান করে দেয়? আবার একথাও মনে হয় যে ইগয়া ইয়াকোকে আমরা ব্যতিক্রমীই বা বলছি কেন? যেহেতু এক কুমারী মাকে তিনি বিয়ে করে, 'উদ্ধার' করেছেন বলে—না কী আমরা তাকে ব্যতিক্রমী এই কারণে বলবো যেহেতু তিনি আরাবা মাসিকে একজন মানুষ হিসেবে গণ্য করেছেন এবং মানুষ হিসেবে প্রাপ্য সম্মান তাঁকে দিয়েছেন?

আমা আটা আইডুর "আদার ভার্সন" ছোটগল্পের কথক কোফি নিজের স্কুলের পরীক্ষার পরে ছোট চাকরি করে, চার পাউণ্ড তাঁর মাকে দিতে গেলে, তাঁর মা আনন্দে চোখের জলে ভেসে বলে ওঠেন—"এখন আমারও নিজের লোক আছে, যে আমাকে দেখবে।" কিন্তু প্রাথমিক উচ্ছ্বাসের পর মা সেই টাকা ছেলেকে তাঁর বাবাকে দিয়ে দিতে বলেন। ছেলে অবাক হয়ে ভাবে কেন? কারণ মা নিজের মাথার ঘাম ঝরিয়ে, বহু কষ্টে ছেলেমেয়েদের জামাকাপড়ের, খাবারের খরচ চালিয়েছেন। বাবা পড়ার খরচ দিয়েছেন এবং সাংসারিক খরচ হিসেবে তিন পাউণ্ড দিয়ে ক্ষান্ত হয়েছেন। কোফি ছেলেবেলা থেকেই মায়ের জন্য কিছু করতে চায়। কিন্তু মা আজ ছেলের টাকা ফিরিয়ে দিচ্ছেন কেন?

কোফি হয়তো ভুলে যায় যে নারীকে শৈশব থেকেই শেখানো হয় স্নেহ, মায়া, মমতা, ক্ষমা—এই অনুভূতিগুলি কেবল তার জন্যই সৃষ্টি হয়েছে। এবং নিজের নিরাপত্তার জন্যই তাকে পুরুষের উপর নির্ভরশীল হতে হবে—সে পুরুষ পিতা, স্বামী, পুত্র যে কেউ হতে পারে। নারী জীবনের প্রতিটি পর্যায়ের নিয়ন্ত্রক, রক্ষাকর্তা একজন পুরুষ হবে। এবং সেই পুরুষের শত বঞ্চনাকে নারী শেষপর্যন্ত ক্ষমা করে। কারণ সেই পুরুষ হয় পিতা, স্বামী বা ছেলে। এবং প্রতি ক্ষেত্রেই নারী সেই বন্ধনকে অস্বীকার করে উঠতে পারে না।

এই গল্পের কথক গল্পের শেষে আমেরিকায় উচ্চশিক্ষার জন্য যান। এবং একরাত্রে এক ট্রেনে একজন বয়স্ক কৃষ্ণাঙ্গ ভদ্র মহিলাকে দেখে তাঁর নিজের মায়ের কথা মনে হয় এবং সে এই মহিলাকে বারো ডলার দিতে গেলে, তিনি সেই ডলার ফেরত দিয়ে দেন। কারণ তাঁর মতে তিনি একজন মা এবং তাঁর থেকেও এই ডলারের বেশি প্রয়োজন কোফির আছে। এক অজানা আবেগে বাকরুদ্ধ কোফির নিজের মায়ের কথাই মনে পড়ে।

আমরা এখানে মাতৃত্বের কোন সার্বজনিক সংজ্ঞা দিতে চাই না। পৃথিবীর মায়েরা সন্তানের জন্য ত্যাগ স্বীকার করতে প্রস্তুত। তাত্ত্বিকরা বলবেন পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীদের বঞ্চিত করার জন্যই ত্যাগ স্বীকারের মহিমা নারীর মধ্যে শৈশব থেকেই ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। ঐতিহ্যগত ধারণায় বিশ্বাসী মানুষরা বলবেন মায়ের অনুভূতি মানুষের ভিত্তিগত অনুভূতি বিশেষ। সেখানে তত্ত্বকথা খাটে না।

কিন্তু তর্কের মধ্যে না গিয়েও আমরা বলতে পারি—আফ্রিকীয় সাহিত্যের মধ্যে আমরা দেখি মামি আমার মতো নারীরাও সব ধরণের প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও পিঠে ছেলে নিয়ে, মাঠে কায়িক শ্রম করছেন, ছেলে মানুষ করছেন। আরাবা মাসিরা সমাজে মাথা উঁচু করে থাকতে চাইছেন, মিসেস বামজিরা অনায়াসে অন্দর ও বাহিরকে আপন করে নিজস্বতায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠছেন। শহরে, গ্রামে, অন্দরে-বাহিরে বহু অসংখ্য নারী চরিত্র আফ্রিকীয় সাহিত্যের প্রতিটি ছত্রে ছত্রে উপস্থিত হয়ে, বহুধা বিভক্ত আফ্রিকীয় বাস্তবতাকে উপস্থাপিত করেছেন, করছেন এবং করবেন।

এঁদের সঙ্গে কি আমাদের ভারতবর্ষের নারীদের কোনও সাদৃশ্য নেই? আজও আমাদের দেশের নিম্নবর্গীয়, নিম্নবিত্তের নারীরা মাঠে, কলকারখানায় খেটে খান। তাঁদের কথা, সুখ দুঃখ আমাদের সাহিত্যের মধ্যে উপস্থাপিত হয়। কিন্তু আফ্রিকার বিভিন্ন দেশের নারী বা সার্বিক ভাবে আপামর জনসাধারণের সঙ্গে ভারতীয় জনসাধারণের কি কোন মিল নেই? গাণিতিক সূত্র অনুযায়ী, তুলনামূলক সূক্ষ্ম বিচার করেই কি কেবল সাদৃশ্য প্রমাণিত হয়? যে মানবিক অনুভূতির দোহাই দিয়ে আমরা বিশ্বের অন্যান্য অঞ্চলের সাহিত্যের সঙ্গে বিশেষতঃ প্রথম বিশ্বের সাহিত্যের সঙ্গে নিজের বাস্তবতার সাদৃশ্য সন্ধান করি, সেই সন্ধান প্রক্রিয়া থেকে তৃতীয় বিশ্বের একটি বিশেষ অঞ্চলকে বাদ দিয়ে বা কোণঠাসা করে কোন বাস্তবতাকে আমরা উপলব্ধি করতে চাই?

ঔপনিবেশিক বঞ্চনা, শোষণের একই ইতিহাস আমাদেরও, আফ্রিকারও। কিন্তু সেই ইতিহাসকে ভুলে "অন্ধকার মহাদেশ" বলে আফ্রিকাকে অভিহিত করে আমরা নিজেদের "শিক্ষিত মানসিকতা"কে আরো বেশিভাবে অন্ধকারের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাই না কি?

সন্ধান করলে পৃথিবীর প্রতিটি সমাজের মধ্যেই কিছু সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া হয়তো সম্ভব। কিন্তু নিজের বাস্তবতা উপলব্ধি করে নিকটবর্তী বাস্তবতাকে অন্ততঃ উপলব্ধি করার প্রচেষ্টা আমাদের মানসিকতাকে কিছুটা অন্ততঃ প্রসারিত করতে পারে। এবং এই প্রচেষ্টাই হয়তো ভবিষ্যতে আমাদের সব কিছুকে 'সাদা বা কালো', 'আলো বা অন্ধকার' এই দুইভাবে ভাগ করার প্রবণতা থেকে মুক্ত করে, জীবন, জগত এবং মানবসভ্যতার বহু রঙকে উপলব্ধি করতে সাহায্য করবে।

আফ্রিকার কবিতা : সংক্ষিপ্ত রূপরেখা

উজ্জ্বল সিংহ

আফ্রিকার কবিতা ছিল সে-মহাদেশের নিজস্ব এক মহাকাব্যিক-ধারায় প্রবাহিত, সেগুলির সাহিত্যেরই ভাষা সম্পূর্ণ স্থানীয় এবং তা মৌখিক-সাহিত্যের পর্যায়ে পড়ে। মৌখিক ও লিখিত উভয় পরিচয় মেলে প্রধানত তিনটি ইয়োরোপীয় ভাষায় : ফরাসি, পর্তুগিজ ও ইংরেজি। আফ্রিকার কবিতা বলতে এমনিতে সাধারণভাবে নির্দিষ্ট কিছু বোঝায় না। সেক্ষেত্রে মিশর, ইথিওপিয়া, হাওসা [Hausa : মধ্য-সুদানের এক জনগোষ্ঠী, দক্ষিণ নাইজিরিয়া ও নাইজার-এ তাঁদের বাস ; তাদের ভাষার নামও হাওসা] সোমালিয়া, দক্ষিণ-আফ্রিকা, সোয়াহিলি [আফ্রিকার মধ্য ও দক্ষিণাঞ্চলে কথিত বান্টুভাষী যেসব লোক জানজিবার-অঞ্চলে থাকে, তাদের ভাষা ; বান্টুরই গোষ্ঠীভুক্ত] আফ্রো-অ্যামেরিকান, আরবীয়, পশ্চিম-ভারতীয় প্রভৃতি স্থান ও ভাষার কবিতাও আলোচিত হওয়া উচিত। সে এক দীর্ঘ আলোচনা এবং প্রতিটি পৃথকভাবে আলোচিত হওয়া দরকার।

এক

১৯-শতকের গোড়ার দিক থেকে আফ্রিকার কাহিনী, প্রবাদ-প্রবচন, ধাঁধা ইত্যাদি সংগৃহীত হয়ে আসছে। কিন্তু পরবর্তী ১৫০ বছরেও সেখানকার মহাকাব্যিক-ধারার কবিতা সম্পর্কে কিছু জানা যায়নি। উগাণ্ডার অ্যানকোল-অঞ্চলে প্রচলিত বীরগাথাসমূহে প্রশস্তিমূলক কাব্যের নিদর্শন পাওয়া যায়, লুবা-কাসায়ি (জাইরে) এবং রোয়াণ্ডা-য় প্রচলিত প্রাচীন স্তুতিসূচক কাব্য, ত্‌সোয়ানা, জুলু, সোথো, ঝোসা (দক্ষিণ আফ্রিকা) প্রভৃতি অঞ্চলের রাজবংশ-বর্ণনার কাব্য—এগুলিতে মহাকাব্যের কিছু লক্ষণ বর্তমান। আফ্রিকার মৌখিক মহাকাব্যের ধারাটি বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে বিস্তৃত—গাম্বিয়া, মালি থেকে নাইজিরিয়া (পশ্চিম-আফ্রিকা) এবং ক্যামেরুন ও গেবন-এর বান্টুভাষী লোকজন থেকে জাইরে-র বান্টুভাষী অঞ্চল পর্যন্ত। প্রধান-প্রধান কিছু মহাকাব্যকে চিহ্নিত করা সম্ভব হয়েছে ; গাম্বিয়ার ম্যানডিনকা-গোষ্ঠীর মধ্যে 'কাবু'-কে নিয়ে, ম্যানডে-দের সানদিয়াতা (সানজাতা বা সোনজারা নামেও পরিচিত)-কে নিয়ে, ম্যানিনকা-দের ক্যামবিলি, ফুলানিদের সিলামাকা, নাইজিরিয়ায় আইজ-দের ওজিদি। এসব পশ্চিম-আফ্রিকায়। পশ্চিম-মধ্য এবং মধ্য আফ্রিকায়—ক্যামেরুন ও গেবন-এর ফ্যাং-দের অ্যাকোমামবা এবং জোয়ে নগুয়েমা। জাইরে-তে খুবই বিখ্যাত লিয়ানজা-চরিত্রকেন্দ্রিক মহাকাব্য (মঙ্গোদের

মধ্যে), নিয়াঙ্গাদের মধ্যে মুইনডো, লেগা-দের মুবিলা, ল্যাঙ্গা-মোবোলদের লোফোকফোক। এসব কাব্যগাথাগুলি গাওয়া হয় বা হত যে সব অঞ্চলে, ওগুলি বিখ্যাত সেখানকার আঞ্চলিক ভাষায়, এগুলি পরে অনূদিত হয়েছে ফরাসি, ইংরেজি ও ওলন্দাজ-ভাষায়। এগুলির কোনোটি ২০০০ পঙ্‌ক্তির (যেমন সোনজারা), কোনোটি দশ হাজার বা তারও অধিক পঙ্‌ক্তির (যেমন, লেগাদের মুবিলা)। কিছু-কিছু কাব্য আবার নানাভাবে নানা আঞ্চলিক-ভাষায় রূপান্তরিত হয়ে যুগ-যুগ ধরে চারণ-কবিদের প্রিয় হয়ে থেকেছে, যেমন—লিয়ান্‌জা, মুইনডো, সোনজারা, কাবু। মহাকাব্যের প্রধান-চরিত্রগুলি প্রায়শই অলৌকিক জাদুশক্তির অধিকারী। মহাকাব্যগুলির মধ্যে একেকটির এক-একরকম স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যও রয়েছে, যেমন জাইরের মহাকাব্যগুলিতে শিকার এবং পশুদের একটা প্রধান ভূমিকা রয়েছে। পরবর্তীকালে আলোচকেরা মহাকাব্যগুলির শ্রেণীবিভাগ করেছেন : বীরগাথা, ঐতিহাসিক, ওঝা-গুনিনভিত্তিক, রোমান্টিক ইত্যাদি।

এই মহাকাব্যগুলি বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর প্রাচীন ঐতিহ্যভুক্ত। পণ্ডিতদের অনুমান, আফ্রিকার এইসব প্রাচীন মহাকাব্যগুলির সূচনা ঘটেছে মুসলমান ও ইউরোপীয়দের সংস্পর্শকাল থেকে। তবে, জাইরের ক্ষেত্রে দেখা গেছে, সেখানকার কাব্যগুলিতে মুসলমান-অনুপ্রবেশের কোনও প্রভাব পড়েনি, ইয়োরোপীয় আদর্শেরও ছায়াপাত ঘটেনি। নিয়াঙ্গা এবং লেগা সম্পর্কে আলোচকদের অভিমত, পিগমি ও অন্যান্য শিকারিদের ভিত্তি করেই রচিত হয়েছে ওগুলি। মহাকাব্যগুলি পুরোপুরি পরম্পরাগত, অর্থাৎ রচয়িতারা অজ্ঞাত। কিছু কিছু ক্ষেত্রে প্রকৃত গায়ক ও তাদের পূর্বসূরিদের কথা জানা যায়। দু-শ্রেণীর গায়ক রয়েছেন : একদল পেশাদার, তাঁরা দূর-দূরান্তে গানগুলি পরিবেশন করে বেড়ান, এঁদের পৃষ্ঠপোষক থাকে। বেশিরভাগ পশ্চিম-আফ্রিকা জুড়ে এঁদের পাওয়া যায়। দ্বিতীয় দলটি পেশাদার নন, এঁরা বান্টু-ভাষী। নিয়াঙ্গাদের ক্যানডি রুরেকে বা লেগাদের মুবিলা কাম্বারা খুব বিখ্যাত চারণকবি। অথচ, এঁরা তথাকথিত ভদ্র-সম্ভ্রান্ত ঘরের কেউ নন, সামান্য চাষি-পরিবার বা শিকারি-পরিবারের লোক। কিন্তু এঁদের মধ্যে সাহিত্যিক, সাংগীতিক ও নাটকীয় এক অসাধারণ দক্ষতার সমন্বয় ঘটেছে।

এইসব মহাকাব্যগুলির একটা নির্দিষ্ট ছাঁদ আছে : নায়কের জন্ম একটু অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে, জন্মদাত্রীর একটা বিশেষত্ব থাকবে (হয় দীর্ঘ বা সংক্ষিপ্ত গর্ভধারণ, নয়তো কুমারী ইত্যাদি), জন্মাবার আগেই নায়ক জরায়ুমধ্যে কথা বলবে, নায়কের নানারকম আশ্চর্য গুণ থাকবে ইত্যাদি। কোনও সংঘর্ষে তার মৃত্যু ঘটবে, কিন্তু বেঁচে উঠবে আবার। কোনও-কোনও ক্ষেত্রে তার মৃত্যু ঘটবে (উধাও হয়ে যেতেও পারে), তবে সে রেখে যাবে এক বীর পুত্রকে। গল্পগুলির বিষয়বস্তু সহজ-সরল। কিন্তু এসব মহাকাব্যের জাতিগত প্রামাণ্য অত্যন্ত মূল্যবান। তদ্দেশীয় ও তৎকালীন প্রতিষ্ঠান, রীতিনীতি, প্রথা-আচার, চিন্তাভাবনার পদ্ধতি ও মূল্যবোধ-সবকিছুই ওতে নিহিত। কোনও-কোনও মহাকাব্যে অবশ্য ঐতিহাসিক-উপাদান থাকেই না। আবার, কিছু বান্টু-মহাকাব্যে নায়কের ভূমিকাটি অনায়কোচিত (অ্যান্টি-হিরো)। মনে হতে পারে, খলনায়ক বুঝি। ফলত, সেসব ক্ষেত্রে প্রকৃত তথ্য উদ্ধার করতে গেলে অত্যন্ত গভীর পর্যবেক্ষণ প্রয়োজন।

দুই

ফরাসি-ভাষায় আফ্রিকার কাব্যের বিষয়টি বুঝতে গেলে বা ব্যাখ্যা করতে গেলে ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদ ও সংস্কৃতির আগ্রাসনের পটভূমিটিও উল্লেখ্য। দাস-ব্যবসা, পরবর্তী উপনিবেশ-স্থাপন—এসব ইতিহাস মনে রাখতে হবে। তবে, মোটামুটিভাবে বলা যায়, ফরাসি-ভাষায় আফ্রিকার-কাব্যের সূত্রপাত গত-শতকের তিরিশদশকে 'নিগ্রোবাদ' (Negritude) আন্দোলনের সঙ্গে-সঙ্গে। তার-আগেই এ-ধারার শিকড়টি প্রোথিত হয়েছিল বটে, কিন্তু ১৯৩২ সালে প্যারিসে মার্তিনিক-ছাত্রেরা প্রকাশ করেন লেজিতিম দেফেঁস (Légitime défense) পত্রিকা—তাতে আগের প্রজন্মের ফরাসি-ভাষায় আফ্রিকান-কবিদের এবং পশ্চিমি-সংস্কৃতির প্রতি একটি প্রতিদ্বন্দ্বিতার স্পষ্ট চেহারা ফুটে ওঠে। সূক্ষ্ম বিচারে, তাঁরাও কিন্তু এক পরম্পরারই উত্তরসূরি। যে-প্রতিবাদ ও আত্মানুসন্ধানের ধারাটি তৈরি হয়েছিল হাইতিয়াঁস পিয়ের ফবার (Haitians Pierre Faubert — জন্ম ১৮০৩) এবং অসওয়াল্ড ডুরান্ড (জন্ম ১৮৪০)-এর হাতে, যে-সংস্কৃতি গড়ে ওঠে দাসবাহী-জাহাজগুলোয়, যাঁরা ফরাসির আগে কথা বলতেন আফ্রিকান ও ক্রিওল ভাষায় (creole—ইয়োরোপীয় ও নিগ্রোর মিশ্রণজাত)। আফ্রিকান এবং আফ্রো-অ্যামেরিকান—উভয়কেই সহ্য করতে হয়েছে বর্ণবিদ্বেষের নিপীড়ন। তাই, নানা পার্থক্য সত্ত্বেও কাব্যের বেলায় সর্বত্র একটা প্রায়-সমপর্যায়ের প্রভাব ও মনোভঙ্গি কাজ করেছে। ল্যাংস্টন হিউজ এবং ক্লদ ম্যাকে-এর মতো 'হারলেম-রেনেসাঁ'-র নামি ব্যক্তিত্ব থেকে শুরু করে 'নেগ্রিটিউড'-আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা অবধি তো বটেই, সেই সঙ্গে এ-ব্যাপারে প্রভাব ছিল আরেকটি পত্রিকার—লেতুদিঁয়া নয়া (L'Etudiane Noir)। এটি প্রথমোক্ত 'লেজিতির দেফেঁস'-এর দু-বছর পর (১৯৩২-এ) থেকে প্রকাশিত হতে থাকে। এটির পেছনে ছিলেন তিন কবি : এইমে সেজের (জন্ম ১৯১৩), লেয়ঁ জি দামা (জ. ১৯১২) এবং লেয়োসোল্দ, সেদার সেঁঘর (জ. ১৯০৬)। প্রথম জন মার্তিনিক, দ্বিতীয়জন ফরাসি গায়না, তৃতীয়জনই একমাত্র আদত আফ্রিকার (সেনেগাল) লোক। অন্যান্য কৃষ্ণাঙ্গ-সাহিত্যের সঙ্গে এধরনের সংমিশ্রণে ফরাসিতে আফ্রিকান-কবিতার রূপটি আন্তর্মহাদেশীয় হয়ে উঠল। সেজের, সেঁঘর ও পরবর্তী কবিরা ফরাসি-ভাষায় লেখা কবিতায় অত্যন্ত দক্ষ হয়ে উঠলেও তাঁদের কবিতাকে সাধারণভাবে তৃতীয়-বিশ্বের কাব্যের প্রসঙ্গে তো বটেই, তাঁরা উল্লেখিত হতে থাকলেন আফ্রিকার কবিতার প্রসঙ্গেও। পরম্পরাগত আফ্রিকান-কাব্যের মৌখিক ধারাটিকে এভাবে উজ্জীবিত করবার প্রচেষ্টাটি 'নিগ্রোবাদ'-এর তাত্ত্বিকরা ব্যাখ্যা করলেন তাঁদের মতো করে। তাতে করে আবার সাম্প্রতিক কবিরা ব্যাপারটিকে খুব গুরুত্ব দিলেন, কিন্তু এটাও ঠিক, এ-ধরনের মিশ্রিত কাব্যের আঙ্গিক যে বেশ দুরূহ, তাঁরা সেটিও ভালভাবেই জানতেন।

'নিগ্রোবাদ', ইংরেজিতে যা Negritude নামে বিখ্যাত,—এর এককথায় ব্যাখ্যা সম্ভব নয়। ১৯৩৯ সালে সেজের যা বললেন, তার সার-অংশ : আমি যে কৃষ্ণাঙ্গ, এটি সোজাসাপটা মেনে-নেওয়া, কৃষ্ণাঙ্গ-হিসাবে আমাদের ভাগ্য, ইতিহাস ও সংস্কৃতিকে

স্বীকার করা। কথাটা শুনতে যত সোজা, তত্ত্বগতভাবে মোটেই তা নয়। এক-এক পরিপ্রেক্ষিতে এর এক-একরকম তাৎপর্য। কবিতায় তো এ-তত্ত্বের প্রভাবে নানা চেহারা-লেয়ঁ জি দামা-র 'পিগ্‌মেন্টস্' (১৯৩৭) থেকে শুরু করে সেঁঘরের 'শাঁত দঁম্‌ব্র' (Chants d'ombre-১৯৪৫) পর্যন্ত। শেষোক্ত কবিতায় রয়েছে আফ্রিকান-মূল্যবোধের অসাধারণ সমৃদ্ধি নিয়ে গর্ব। এই প্রসঙ্গ আলোচনাকালে আফ্রিকান কবিতাকে রাজনীতি থেকে বিচ্ছিন্ন করা অসম্ভব, কারণ, উপনিবেশিকতা-বিরোধী আন্দোলন এর সঙ্গে যুক্ত। ফরাসি-ভাষী উপনিবেশিকতা-বিরোধী আন্দোলন যুদ্ধোত্তর প্যারিসে ভালভাবে সংহত হয়। তৃতীয় যে-পত্রিকাটি বের হল (Présence Africaine), তার প্রতিষ্ঠাতা আলিউন দিওপ, ইনি সেনেগালের। এখানে বলে রাখা ভালো, ফরাসি-ভাষায় আফ্রিকান সাহিত্য প্রায় গোটাটাই প্যারিসকেন্দ্রিক।

যুদ্ধোত্তর কালের উল্লেখযোগ্য কবিতা-সংকলন : সেঁঘরের Anthologie de la nouvelle poésie nègre et malgache de langue française-১৯৪৮ ; এটির দুর্দান্ত ভূমিকা লিখে দিয়েছিলেন জাঁ পল সার্ত্র। এ-গ্রন্থেরই দূরপ্রসারী প্রভাবে লিখিত হয় ফ্রানত্জ ফ্যানন-এর 'দ্য রেচেড অভ দি আর্থ'—১৯৬১। ফ্যানন-এর কাব্যের বৈশিষ্ট্য ছিল : (১) পাশ্চাত্য-মডেলের যে দাস-মনোভাব-সমন্বিত ঔপনিবেশিক-যুগ তা আত্মস্থ করা ; (২) 'নেগ্রিট্যুড'-এর দৃষ্টান্তে যে-প্রতিবাদের যুগ, সেটিকেও বুঝে-নেওয়া ; এবং (৩) আফ্রিকানরা যখন স্বীয় সংস্কৃতিকে নিজেরা নিয়ন্ত্রণ করতে শিখল, সেই উপনিবেশোত্তর-যুগটিকেও হৃদয়ঙ্গম করা। সেঁঘরের উপরোক্ত 'Anthologie...' কাব্য-সংকলনটিতে যাঁদের কবিতা অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল, প্রত্যেকেরই বৈশিষ্ট্য ছিল কোনও-না-কোনও। বিরাগো দিওপ (১৯০৬-৮৯) ছিলেন গল্পকার, অথচ এখানে হয়ে উঠেছেন সার্থক কবি। কিংবা, ডেভিড ম্যানডেসি দিওপ (১৯২৭-৬১)—বেঁচেছিলেন মাত্রই ৩৪ বছর, অথচ কবিতায় কী ভয়াবহরকম আত্মীকরণ-বিরোধী। ওই সংকলনে নিগ্রোবাদের উদ্ভবের আগেও যে ফরাসি-ভাষায় আফ্রিকান-কবিতা কত চমৎকার ছিল তারও একটা পরিচয় পাওয়া যায় : জাঁ জোসেফ রাবেয়ারিভেলো (১৯০১-৩৭), জাক রাবেমানানজারা (জ. ১৯১৩), ফ্লাভিয়েন রানাইভো (জ. ১৯১৪) প্রমুখ কবিদের মধ্যে সেখানে প্রথমোক্ত-জন বিশেষ করে ভীষণরকম স্বকীয়তায় বিশিষ্ট। একটু দূরত্ব বজায় রেখে চলতেন, সর্বদিক দিয়েই বেশ বিচ্ছিন্ন জীবনযাপন করতেন। মাত্র ৩৬ বছর বয়সে আত্মহত্যা করেন তিনি। উপরোক্ত, তিনজনই মালাগাসির লোক।

স্বাধীনতার পর পরিবেশ-পরিস্থিতি বদলে গেল অনেকটাই। কবিতার মধ্যেও পরিবর্তন এল। উপনিবেশ-বিরোধিতার আদর্শ থেকে সরে কবিতায় দ্ব্যর্থবোধকতা ইত্যাদি বৈশিষ্ট্য স্থান পেতে লাগল। ১৯৬৬-তে প্রকাশিত একটি গুরুত্বপূর্ণ সংকলনে (Nouvelle somme de poésie du monde noire) তরুণ-কবিরা আবির্ভূত হলেন, বহু অপরিচিত মুখও সেখানে উপস্থিত : শার্ল নোকান (জ. ১৯৩৬), জে. এম. বোগিনি (জ. ১৯৩৬—উভয়ই 'আইভরি কোস্ট'-এর), আনেত এম. বায়ে (সেনেগাল, জ.

১৯২৬), ইয়াম্বো উওলোগুয়েম (মালি, জ. ১৯৪০) প্রমুখ। তবে, প্রতিষ্ঠিতদেরও অনেকে ছিলেন : বি. দাঁদি (আইভরি কোস্ট, জ. ১৯১৬), এদুয়ার মনিক (মরিশাস, জ. ১৯৩১), ফ্রাঁসিস বেবে (জ. ১৯২৯), রেনে ফিলম্ব (জ. ১৯৩০—উভয়ই ক্যামেরুন-এর)। তবে সর্বাগ্রগণ্য নামটি হল চিকায়া উ তামসি (Chicaya U Tam'si ১৯৩১-৮৮)। কঙ্গোর জন্য তাঁর চাপা গনগনে ক্রোধ, যা ঔপনিবেশিকতার প্রতি ঘৃণা থেকে জাত—তার সঙ্গে গভীর কাব্যিক বোধ ও সমসাময়িক কাব্য-প্রকরণ সব মিলিয়ে তিনি ভাস্বর। তাঁরই পথের পথিক হেনরি লোপেজ (জ. ১৯৩৭) এবং জে. বি. তাতি-লুতার (জ. ১৯৩৯—দুজনই কঙ্গোর), সেইসঙ্গে সেনেগালের শিখ আলিউ ন্দাও (জ. ১৯৩৩)।

ফরাসি-ভাষায় আফ্রিকান-কবিতাকে যদিও 'নেগ্রিটিউড থেকে পৃথক করা যায় না, কিন্তু আধুনিক কবিরা অবশ্য সে-সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করে হয়ে উঠেছেন বিশ্বজনীন। এখন ফরাসিতে আফ্রিকান-কাব্য নানাভাবে বিকশিত, এমনকি আলোচনা-সমালোচনা—তত্ত্বগত প্রভৃতি দিক দিয়েও, বেনিন, ক্যামেরুন, কঙ্গো, গেবন, আইভরি কোস্ট, সেনেগাল, টোগো, জাইরে—সর্বত্রই। কঙ্গোতো বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে, আগে এক্ষেত্রে প্যারিস যে-ভূমিকা পালন করেছে, এখন কঙ্গো কতকটা তাই।

তিন

পর্তুগিজ-ভাষায় লিখিত আফ্রিকার কবিতাকে লুসোফোন-আফ্রিকান-কাব্যও বলা হয়। এ-ভাষায় প্রথম আফ্রিকান কাব্য হিসাবে যেটি স্বীকৃত : জোসে দা সিলভা মাইআ ফেরেইরা নামে এক অ্যাঙ্গোলার) কবির লেখা "Esponteneidades da minha alma" —অর্থাৎ কিনা, 'আমার আত্মা থেকে উচ্ছ্বসিত প্রস্রবণ'। এটির প্রকাশকাল ১৮৪৯, স্থান লুয়ান্ডা। এটি উৎসর্গীকৃত 'আফ্রিকার মহিলাদের' উদ্দেশে। শুধু যে লুসোফোন-আফ্রিকান ভাষা তা নয়, উপ-সাহারা অঞ্চলে প্রচলিত ভাষাগুলির মধ্যেও এটিই প্রথম কাব্য। ঐতিহাসিক কারণেই এ-ভাষায় আফ্রিকান-কাব্য কম পরিচিত, কম-আলোচিত। অ্যাংগোলা, মোজাম্বিক, কেপ ভারদে, গিনি-বিসাউ এবং সাও-তোমে-র প্রিন্সিপে—এই পর্তুগিজ-উপনিবেশগুলি ঘিরেই এ কাব্যের বিকাশ। স্বাধীনতালাভের পরই

) বরং আফ্রিকান ছাত্রদের দৃষ্টি এসব দেশগুলির কাব্যের প্রতি আকৃষ্ট হল। পর্তুগিজ-ভাষায় লেখা কবিতা তো বটেই, কেপভার্দে, গিনি-বিসাউ বা সাও-তোমে—এসব দ্বীপে যে স্থানীয় একধরনের পর্তুগিজভিত্তিক ক্রিওল-ভাষা প্রচলিত, সেই ভাষায় লেখা কবিতাও গুরুত্ব পেল। ফেরেইরার মতো আরও কিছু পূর্বসূরি, যেমন কৃষ্ণ অ্যাংগোলান-কবি জোয়াকিম করদেইরো দা মাত্তা (১৮৫৭-৯৪) বা সাও-তোমে দ্বীপের সাইতানো দা কোস্তা আলেগ্রে (১৮৬৪-৯০)-এঁরা লিখতেন মূলত ইউরোপীয় রীতিতে। কেপ ভার্দে দ্বীপপুঞ্জের তিন বিখ্যাত কবি ঝঝে বারবোসা (১৯০২-), অসওয়াল্ডো আলকান্তরা

(১৯০৭- এবং ম্যানুয়েল লোপেজ (জ. ১৯০৭)—'ক্ল্যারিডেড' নামে কাব্য-আন্দোলনের জনক; উক্ত নামের পত্রিকা থেকেই আন্দোলনের নাম। ব্রাজিলের আধুনিকতা ও উত্তর-পূর্বের আঞ্চলিকতাবোধে অনুপ্রাণিত বারবোসাই প্রথম তাঁর দ্বীপের ক্রিওল ভাবসত্তাকে কবিতায় ফুটিয়ে তুললেন। তাঁর কবিতায় নির্জনতা, সমুদ্র, খরা, দেশান্তরী-হওয়া এসব ফুটে ওঠে বড় শিল্পিত ভঙ্গিমায়।

১৯৫৬ সালে প্রতিষ্ঠিত এম. পি. এল. এ. (Movement of the Liberation of Angola)-নামক রাজনৈতিক-সংগঠনকে কেন্দ্র করেও কিছু উল্লেখযোগ্য কবি আবির্ভূত হন। আগোস্তিনহো নেতো (১৯২২- , ভিরিয়াতো দা ক্রুজ (১৯২৮- , অ্যাংগোলার প্রথম রাষ্ট্রপতি), আন্তোনিও জাসিন্তো (জ. ১৯২৪), কোস্তা আঁদ্রাদ (জ. ১৯৩৬) বা এম. আন্তোনিও (১৯৩৪-৮৯)—এঁদের কবিতায় জাতীয়তাবাদের সুর। মোজাম্বিক ও অ্যাংগোলায় বহু জঙ্গি-কবি স্বাধীনতার লড়াইয়ে যুক্ত হয়ে আত্মগোপন করে গেরিলা-যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। বহু কবিকে দেশ ছেড়ে পালিয়ে যেতে হয়েছে, অনেকে জেল খেটেছেন। অর্থাৎ ব্যাপারটি হচ্ছে, গোটা ষাটের দশক তো বটেই, ১৯৭৪-এ লিসবন-সরকারের পতন ঘটা পর্যন্ত পর্তুগিজ-ভাষার আফ্রিকান কবিতা মোটামুটিভাবে গোপনেই প্রচলিত ছিল। কবিরা তখন কবিতা প্রচার করতেন আড়ালে-আবডালে, কিংবা প্রকাশ করতেন দেশের বাইরের কোনও কাগজে। নেতো জেলে বসে কবিতা লিখে গোপনে তা পাঠাতেন বাইরে। স্বাধীনতার পর সেসব কবিতা পাঠকদের সমক্ষে প্রকাশিত হতে থাকে। পর্তুগালের পূর্বেকার পূর্ব-আফ্রিকান উপনিবেশ মোজাম্বিকে স্বাধীনতার আগে বছর কুড়ি যাবৎ বেশ কিছু ইউরোপিয়ান কবি প্রচুর ভাল কবিতা লিখেছেন, তবে, সেগুলিতে মোজাম্বিকের নিজস্ব সাহিত্যিক-অভিব্যক্তির চেয়ে পর্তুগিজ-সাহিত্যের ছোঁয়াই অধিক। ষাটের দশক থেকে ধরলে এরকম কয়েকজন : সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ইউরো-মোজাম্বিক কবি হলেন রুই নপফ্লি (জ. ১৯৩৩), ইনি লুরেনসো মারক (অধুনা মাপুতো)-এর লোক, জোসে ক্রাভেইরিনহা (জ. ১৯২২), নোয়েমিয়া দ' সুজা (জ. ১৯২৬)। রুই নপফ্লি-র কবিতায় যেমন অ্যাফ্রো-ইয়োরোপীয় অভিজ্ঞতার বর্ণনা, বাজি দুজনের কবিতায় তেমনই সাংস্কৃতিক পুনঃ-প্রতিপাদনের প্রচেষ্টা। ক্রাভেইরিনহা তো মোজাম্বিকের সবচেয়ে প্রথিতযশা কবি।

লিসবনেও কিন্তু 'নেগ্রিটিউড'-কবিতা লেখা হয়েছে : সাও-তোমে দ্বীপের ফ্রানসিসকো জোসে তেনরেইরো (১৯২১- —পর্তুগালের 'নিগ্রোবাদী' কবি হিসাবে সবচেয়ে বড়মাপের। হারলেম রেনেসাঁ এবং আফ্রো-ক্যুবান নিগ্রোবাদ তো আছেই, তেনরেইরো-কে প্রভাবিত করেছিল সেঁঘর এবং সেজের-এর মতো 'ফ্রাংকোফোন' কবিরাও। এ-কবির কবিতাগুলি প্রকাশিত হয় তাঁর মৃত্যুর পর 'আফ্রিকায় আমার হৃদয়' (Coraçao em Africa :) কাব্যগ্রন্থে। মাত্রই ৪২ বছর বেঁচেছিলেন তিনি। লিসবনেই কাটিয়েছেন প্রায়। এ-ব্যাপারে একটা কথা স্মরণীয়—কিছু অ্যাংগোলান-কবি আবার 'নেগ্রিটিউড' ধারণাকে ইউরোপীয়-ভিত্তিক বলে মনে করেন। তাঁদের বক্তব্য,

তাঁরা কবিতা লিখেছেন জাতীয়তাবাদী মনোভাবকে সম্বল করে, নেগ্রিটিউড-এর সঙ্গে আফ্রিকার সরাসরি সম্পর্ক সামান্যই। সত্যি-সত্যিই, অ্যাংগোলা, মোজাম্বিক ও গিনি-বিসাউ-এর ঔপনিবেশিকতা-বিরোধী আন্দোলনের দশকটিতে সেসব দেশের কবিতাও হয়ে উঠেছিল হাতিয়ার। 'ফ্রেলিমো' (FRELIMO—মোজাম্বিকের 'লিবারেশন ফ্রন্টে'র সংক্ষিপ্ত নাম) জঙ্গি-কবিদের একটি প্রধান সংগঠন হয়ে উঠেছিল তখন। এ-ফ্রন্টের সবচেয়ে আলোচিত কবি মার্সেলিনো দস সান্তোস (জ. ১৯২৯)। -এ, স্বাধীনতার পর আরেকদল কবি লিখতে শুরু করলেন, নতুন প্রকরণ ও নব্য চিন্তাভাবনায় সমৃদ্ধ সেসব কবিতা। অ্যাংগোলায় ম্যানুয়েল রুই (জ. ১৯৪১), আরলিন্দো বারবেইতোস (জ. ১৯৪১), রুই দুয়ার্ত দ কারভালহো (জ. ১৯৪১), জোফ্রে রোচা (জ. ১৯৪১), ডেভিড মেসত্রে (জ. ১৯৪৮)। মোজাম্বিকে রুই নোগার (জ. ১৯৩৩), লুইস কার্লোস পাতরাকুইম (জ. ১৯৫৩)। কেপ ভার্দে-য় করসিনো ফোবতেস (জ. ১৯৩৩), অসওয়াল্ডো অসোরিয়ো (জ. ১৯৩৭), আরমেনিয়ো ভিয়েইরা (জ. ১৯৪১)। গিনি-বিসাউ-এর হেল্ডার প্রোয়েন্সা (জ. ১৯৫৬)। সাও-তোমে-র ফ্রেদেরিকো অগাস্তো দস আনজোস (জ. ১৯৫৪)। এঁরা প্রত্যেকেই নব্য কবিতা-ধারায় বিশিষ্টতার স্বাক্ষর রেখেছেন। এঁদের অনেকের নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষাও কবিতায় যুক্ত করেছে বৈচিত্র্য। তাতে পর্তুগিজ-আফ্রিকান কাব্য আরও সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে। কারভালহো-র কবিতায় আফ্রিকার মৌখিক ঐতিহ্যকে এবং ব্রাজিলীয় 'কংক্রিট' কবিতার তত্ত্বকে আরোপিত হতে দেখা যায়। আশির দশকে অ্যাংগোলা-মোজাম্বিক প্রভৃতি দেশে গৃহযুদ্ধের অস্থিরতা সত্ত্বেও উৎকৃষ্ট কবিতা রচিত হতে থাকে। কয়েকজন অবশ্যপাঠ্য কবি—অ্যাংগোলা-র রুই অগাস্তো (জ. ১৯৫০), পলা তাভারেস (জ. ১৯৫২), জোসে লুইস মেনদোনসা (জ. ১৯৫৫), আনা দ-সান্তানা (জ. ১৯৬০), মোজাম্বিকের লুইস কার্লোস পাতরাকিম (জ. ১৯৫৩), হেল্ডার মুতেইয়া (জ. ১৯৬০), আরমান্দো আরতুর . - .., এদুয়ার্দো হোয়াইট (জ. ১৯৬৪) এবং কেপ ভার্দে থেকে জোসে এল. হপফার আলমাদা (জ. ১৯৫৮)—ইনি ৬০ জন দ্বীপবাসী-কবির একটি অসাধারণ সংকলনও বের করেছেন (Mirabilis)।

চার

ইংরেজিতে লেখা আফ্রিকান কবিতা সবদিক দিয়েই আন্তর্জাতিক-পরিচিতি অর্জন করেছে। উপনিবেশ যুগের শেষ হতে-হতেই এ-ভাষার কবিতা উল্লেখযোগ্য হয়ে উঠছিল। ক্রমশ শিক্ষার প্রসার, দৃষ্টিভঙ্গির উদারতা এসবই কবিতাকে নানাভাবে বিশিষ্ট করে তুলল। তবে, অন্ত্যমিল, অনুপ্রাস, ছন্দ-রীতি এসবের চেয়ে বেশি প্রাধান্য পেল অন্বয়, অলংকার ইত্যাদি। ইংরেজিতে লেখেন, এমন বহু আফ্রিকান-কবি বর্তমানে সারা বিশ্বে সুপরিচিত। তাঁদের কবিতায় অবশ্য আধুনিক-ইংরেজি কাব্যের এবং আমেরিকান-কাব্যের পরম্পরা লক্ষ করা যায় এবং সে-ব্যাপারে তাঁদের নৈপুণ্যও তর্কাতীত। প্রকরণেও তাঁরা বহু

স্বাধীনতা গ্রহণ করেছেন, যেমন—নাটক, উপন্যাসও কখনো-কখনো আংশিক বা পুরোটাই কাব্যে-লেখা।

পশ্চিম-আফ্রিকার নাইজিরিয়া ও ঘানা-য় বিশেষ করে, ইংরেজিতে আফ্রিকান-কবিতার সবচেয়ে পুরনো এবং মার্জিত উদাহরণ পাওয়া যায়। গীতিকবিতা হিসাবে সেসব কবিতা যেমনই উৎকৃষ্ট, তেমনই তাতে পাওয়া যায় দুঃসাহসী চিন্তাভাবনার প্রকাশ ও সামাজিক দায়বদ্ধতার অভিব্যক্তি। এসব কবিতায় বেশি প্রাধান্য পেয়েছে কবিদের নিজস্ব সমাজ ও পরিমণ্ডলের অধিবাস্তবসম্মত, ধর্মীয় ও সামাজিক ধ্যানধারণাসমূহ। আবার, সামাজিক-বঞ্চনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ যেখানে স্পষ্ট, সেখানেও কিন্তু কবিতার শর্তগুলি শিল্পিতভঙ্গিতেই উপস্থাপিত। নাইজিরীয় কবি ক্রিস্টোফার ওকিগবো (১৯৩২- ., জন পেপার ক্লার্ক (জ. ১৯৩৫), ওলে সোয়েংকা (জ. ১৯৩৪) প্রমুখের লেখা নাটকে কবিতার ব্যবহার লক্ষণীয়। গাব্রিয়েল ওকারা (জ. ১৯২১) এবং গাম্বিয়ার কবি লেনরি পিটার্স (জ. ১৯৩২)-এর কাব্যে নিজস্ব ধরন অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক। ঘানার যেসব কবিরা পারম্পরিক আফ্রিকান কাব্য-আঙ্গিককে অভিযোজনের মাধ্যমে বিশিষ্ট হয়ে উঠেছেন —কোফি আউনর (জ. ১৯৩৫), কোফি অ্যানিইডোহো (জ. ১৯৪১), জন আট্রুকোয়েই ওকাই (জ. ১৯৪১)। সংবেদন ও গঠনের দিক দিয়ে পাশ্চাত্য ঐতিহ্যের অনুসারী কবিরা —কোয়েসি ব্রু (জ. ১৯২৪), অ্যালবার্ট ডব্লু কেপার-মেনসা (১৯২৩-৮০), কোজো লাইং (জ. ১৯৩২), ফ্রাংক কোবিনা পার্কস (জ. ১৯৩২), জো দ-গ্রাফ্‌ট (১৯২৪-৭৮)। সিয়েরা লিওন-এর উল্লেখযোগ্য কবিরা হলেন সিল চিনে-কোকার (জ. ১৯৪৫), লোমুয়েল জনসন (জ. ১৯৪০) প্রমুখ।

পূর্ব-আফ্রিকার কবিতায় দুটি রীতির প্রাধান্য। একটি ওকোট পি'বিটেক (১৯৩১-প্রবর্তিত পরম্পরা, তাঁর 'আকোলি'-কবিতার সাঙ্গীকরণ। এই কবিকে আফ্রিকার সবচেয়ে পঠিত কবি বলা হয়। এঁর কবিতা সাবলীল, এবং লৈখিক চিত্রকল্প, রসবোধ. ব্যঙ্গ-পরিহাস, সাধারণ-বোধের স্ববিরোধিতা ইত্যাদির সঙ্গে সমাজ-চেতনায় সমৃদ্ধ। ওকেল্লো ওকুলি (জ. ১৯৪২)—ও এ-ধারার বিখ্যাত কবি। দ্বিতীয় রীতিটি হল, পশ্চিম-আফ্রিকার কবিতার বিশিষ্টতা। সেখানে ব্যবহৃত অব্যয়হীন বাক্যাংশ, সূক্ষ্ম চিত্রকল্প, আধুনিক জীবনের প্রতি তীব্র এক মনোভাব, তাকে প্রকাশ করতে উল্লিখনের পাণ্ডিত্যপূর্ণ ব্যবহার। এ-ধারাব কবিরা : জারেড অ্যাংগিরা (জ. ১৯৪৭), রিচার্ড-নতিরু (জ. ১৯৪৬), টাবান লো লিইয়ং--প্রমুখ।

দক্ষিণ-আফ্রিকার কবিতায় পাওয়া যায় দমনপীড়ন, সাহস, দারিদ্র্য, জেলখানা, প্রতিবাদ, বিদ্রোহ, অন্যায়-বিচারের জন্য ব্যক্তিগত যন্ত্রণা ইত্যাদির বহিঃপ্রকাশ। সত্তর দশকের আগে অবধি এখানকার কবিতা লিখিত হতো নির্বাসনে। ফলে, ব্রিটিশ ও মার্কিন-অভিজ্ঞতার প্রতিফলন তাতে দৃষ্ট হত। উল্লেখযোগ্য কবিরা : আর্থার নর্তজে (১৯৪২-৭০), কসমো পিয়েটার্স (জ. ১৯৩০), ডেনিস ব্রুটাস (জ. ১৯২৪)। মাজিসি কুনেন

(জ. ১৯৩০)-এর কাব্যে আফ্রিকার আঞ্চলিক আঙ্গিকের ইংরেজি-কবিতায় অভিযোজন উল্লেখযোগ্যভাবে পরীক্ষামূলক।

-এর পর থেকে আফ্রিকার ইংরেজি-কাব্যে যে পরিবর্তন সূচিত হয়, সেক্ষেত্রে অগ্রণী কবিরা হলেন : কেরোয়াপেটসে গসিটসিলে (জ. ১৯৩৮), অসওয়াল্ড মবুইসেনি মৎশালি (জ. ১৯৪৩), মনগান সিরোট (জ. ১৯৪৪), সিফো সেপামলা (জ. ১৯৩২), মাফিকা পাসকাল গোআলা (জ. ১৯৪৬), জেমস ম্যাথুজ (জ. ১৯২৯), ড্যানিয়েল পি. কুনেন, ওপকো পিয়েটার জেনস্মা (উভয়ের জ. ১৯৩৯)। ইংরেজি-ভাষার আফ্রিকান-কবিতায় আফ্রো-মার্কিন কাব্য-আঙ্গিক তো বটেই, গভীরভাবে প্রভাব বিস্তার করেছে সাঙ্গীতিক-রূপ [বিশেষ করে জ্যাজ, ব্লুজ] এবং ষাট-দশকের (১৯৬০) রেনেসাঁও। হারলেম-রেনেসাঁ-র ভূমিকাও কাজ করেছে এক্ষেত্রে। মালাওই-এর কবি ডেভিড রুবাডিরি (জ. ১৯৩০) এবং ফ্রাংক এম. চিপাসুলা (জ. ১৯৪৯)-কে লিখতে হয়েছে নির্বাসিত অবস্থায়। আর, স্বভূমি মালাওই-তে বসেই কবিতা লিখে গেছেন জ্যাক মাপানতে। জাম্বিয়ার কবি রিচার্ড-এ চিমা (জ. ১৯৪৫) এবং পাটু সিমোকো (জ. ১৯৫১)-কে নির্বাসনে যেতে হয়নি অবশ্য। জিম্বাবোয়ের কবি স্যামুয়েল কিমসোরো (জ. ১৯৪৯), চার্লস মুনগোশি (জ. ১৯৪৭), মুসায়েমুরা জিমুনিয়া (জ. ১৯৪৯), শিমার চিনোডিয়া (জ. ১৯৫৭), মুডেরেরি কাধানি—প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।

দক্ষিণ-আফ্রিকার ইংরেজি-কবিতায় কিন্তু এক-ধরনের স্পষ্ট পরিচিতির বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায়। স্বদেশভূমির প্রতি অনুরক্তিও সেখানে আধ্যাত্মিক ও ভৌতিক পৃথিবীর মধ্যে সংযুক্তির মনোভাব কাজ করে। এবং তীব্র সাংস্কৃতিক ও ব্যক্তিক বৈচিত্র্য সত্ত্বেও ইংরেজি-ভাষার আফ্রিকান-কবিতায় একটা পৃথক কণ্ঠস্বর স্পষ্ট ফুটে ওঠে। সেখানে যেমন উপস্থাপিত সম্প্রদায়গত মূল্যবোধ ও অভিজ্ঞতা, সেরকমই উপস্থাপিত ব্যক্তিগত উপলব্ধি।

রচনাটিতে উল্লেখিত কবিদের নামগুলির উচ্চারণ সর্বত্র ঠিকঠাক না-ও হতে পারে ; এক্ষেত্রে পাঠকের সহযোগিতা প্রার্থনীয়। নিম্নলিখিত বইগুলি পাঠকের কাজে লাগবে :

১. I. OKpewho : The Epic in Africa
২. F. Oinus : Folk Epic
৩. D. Biebuyck : The African Heroic Tradition
৪. C. Wake (ed.) : An Anthrology of African and Malagasy Poetry
৫. J. B. Kubayanda : The Poet's Africa
৬. A. S. Gerard (ed.) : European-Language writing in Sub-Saharan Africa.

৭. M. Wolfers (tr.) : Poems from Angola
৮. D. Burnes (tr.) : A Horse of White Clouds.
৯. G. Moser : Essays in Portugese-African Literature
১০. R. Hamilton : Voices from an Empire : A History of Afro-Portugese Literature
১১. H. M. Zell and Others (ed.) : New Reader's Guide to African Literature
১২. Wole Soyinka (ed.) : Poems of Black Africa
১৩. The Penguin Book of Modern African Poetry
১৪. O. R. Dathorne : The Black Mind : A History of African Literature.
১৫. A. S. Gerard (ed.) : European-Language Writing in Sub-Saharan Africa.

নাটককার ওলে সোইঙ্কা

তীর্থঙ্কর চন্দ

ওলে সোইঙ্কা (Wole Soyinka) কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দিতে আসেন। ধরে নেওয়া হয়েছিল, সাহিত্য নয়, তিনি নৃতত্ত্ব বিষয়েই পাঠদান করবেন। এমনকি, ১৯৮৪ সালেও আফ্রিকার সাহিত্যচর্চাকে দেখা হয়েছে, সেখানকার নৃতত্ত্ব কিংবা সেখানকার মানুষজনের বেঁচেবর্তে থাকার প্রাচীন ও বর্তমান রীতিনীতির প্রামাণ্য দলিল হিসাবে। ষাটের দশকে নানারকম প্রগতিবাদি আন্দোলনের ফলে আফ্রিকার সাহিত্যচর্চার প্রতি যে বিশেষ নজর দেওয়া হয়েছিল, তা মূলতঃ আমেরিকাস্থিত আফ্রিকান সাহিত্যিকদের উৎস ধরেই। গত চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ বছরে আফ্রিকার সাহিত্যচর্চা তার দেশিয় মহাদেশিয় গণ্ডী ছাড়িয়ে প্রায় সমগ্র ভূ-গোলককেই ছেয়ে ফেলেছে। কেবলমাত্র সক্ষম ঔপন্যাসিক হিসাবে এমন দশবারোজনের নাম করা যায়, যাদের তিনজন ব্রিটেনের বুকার প্রাইজ জিতেছেন। তিনজন জিতেছেন নোবেল পুরস্কার—যার মধ্যে সোইঙ্কা নিজে একজন। এই সম্মান এবং সংখ্যা—বড় কম কথা নয়।

সাম্প্রতিক কালের বিশ্বায়নকে চিন্তাবিদরা, দেখেছেন পুঁজিবাদ-এর একটি 'বিলম্বিত পর্যায়' হিসাবে। জার্মান চিন্তাবিদ এরনেস্ট মেনডেল (Ernest Mandel)-এর সূত্র ধরে আমেরিকান সমালোচক-চিন্তাবিদ ফ্রেডরিক জেমসন (Fredric Jameson), এই বিলম্বিত পর্যায়টিকে 'সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যবাদ' হিসাবেই নির্দিষ্ট করেছেন। অর্থাৎ কিনা, এই সমগ্র 'গ্লোবাল ভিলেজ'-এ কোন পালা নির্মিত হবে, কে কী লিখবে না লিখবে কিংবা ভাবনাচিন্তার স্রোতগুলি কোন কোন অববাহিকা ধরে ছুটবে—সে সব নির্দিষ্ট করে দেবে ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকার 'মাল্টিন্যাশনাল কালচারাল করপোরেশন'-গুলি। ঐ বিলম্বিত পুঁজিবাদের প্রকাশ্য রূপটি যে 'সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যবাদ'—তাকে যে আগ্রাসনের ভূমিকায় নিয়ে গিয়েছে ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকার বিভিন্ন দেশ—তাও ব্যাখ্যাত হয়েছে বিভিন্ন চিন্তাবিদের ভাষায়-কলমে-বিশেষত বিংশ শতাব্দীর একেবারে শেষের দশকে। সমস্ত বিশ্বজুড়ে পারম্পরিক চিন্তাভাবনার একটিমাত্র ছাঁচ তৈরি করে ফেলাই ঐ কালচারাল করপোরেশনগুলির উদ্দেশ্য। সম্পূর্ণ কিংবা আধা-ঔপনিবেশিক দেশগুলিতে এবং অন্য স্বাধীন (!) ভূখণ্ডে ভিন্নতর প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে এই সাংস্কৃতিক স্রোতকে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। দার্শনিক আপ্পিয়া (Kwame Anthony Appiah) যেমন বলেন, '...We are all

already contaminated by each other...', তখন ধীরে ধীরে এও বোঝা যায় যে, এই সাংস্কৃতিক সম্মেলন কোনো সু-সৃষ্টির দিকে ধাবিত নয়, কলুষিত করার একটি উদ্দেশ্য প্রণোদিত সচেতন প্রয়াস।

বিষয়টিকে একটি অতি পুরোনো চিন্তার মধ্য দিয়ে এভাবেও দেখা যেতে পারে যে, প্রত্যেকটি ভৌগোলিক সীমারেখায় নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের (দেশ নয় অবশ্য করেই—কারণ রাজনৈতিক মাতব্বরদের খেলায় একটি দেশ বহুধা খণ্ডিত হতে পলকমাত্র!!)—সাংস্কৃতিক উপাদান এবং তার প্রকাশ তার উৎস স্রোত দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, নির্দিষ্ট। সরাসরি উপনিবেশ নয়, এমন দেশগুলির সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যকেও আপাতভাবে আঘাত না করে গোপনে অত্যন্ত সুচতুর শক্তিশালী প্রক্রিয়ায় 'contaminate' করার প্রচেষ্টা চলবেই। দেশটির সাংস্কৃতিক গঠন বিন্যাস, তার চিন্তা-চেতনার দেশজ উৎস স্রোতকে কলুষিত করার পদ্ধতিটি আর্থিক আগ্রাসনের মতো ততটা প্রকট না হলেও ক্ষমতার দিক থেকে যথেষ্ট বলবান। সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যবাদীদের এই পথ আবিষ্কার এবং অবলম্বন এখন প্রায় সার্বজনীন হয়ে উঠেছে।

দেশজ সাংস্কৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ কোন একটি দেশকে, এই আগ্রাসনের আওতায় নিয়ে আসার প্রথম অনিবার্য পথটি হচ্ছে, অতীতের সঙ্গে তার সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করা, পেছন ফিরে তাকানোর সমস্ত পথগুলি ধূসর করে দেওয়া। স্মৃতির সরণীতে তখন কেবল ঘোলাজলের স্রোত। এইরকমই এক বিস্তীর্ণ উর্বর সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের জন্মদাত্রী আফ্রিকা হয়ে পড়ে 'সংস্কৃতিহীন'; এমনকী, এটাও ভাবা হতে শুরু করে যে, '. .African aesthetics as a flawed version of European aesthetics—or as no aesthetics at all...' সাম্রাজ্যবাদী শক্তির পদ্ধতি এবং প্রচার এতো প্রবল যে 'উৎসহীন মানুষের' কাছে এই 'সত্য' তখন বাহ্যত গ্রহণীয় হয়ে পড়ে। তখনই দায় পড়ে শিল্পী সাহিত্যিকদের। একজন মানুষ হিসাবে সোইঙ্কা মনে করেন, '...Unlike the Theologian, who takes his voice from the realms of deities, the poet appropriates the voice of the people and the full burden of their memory...' বলা বাহুল্য, প্রত্যেক শিল্পী-সাহিত্যিকের কাছেই এমন প্রত্যাশা থাকে। আফ্রিকার লোককথা, তার মৌখিক মহাকাব্য (oral epics) সভ্যতার গোড়া থেকেই এই ভূমিকে ফলবতী করে রেখেছে। যতই সাম্রাজ্যবাদীদের প্রচার আলোয় দৃষ্টি বিভ্রম ঘটুক, প্রকৃত উৎসসন্ধানকারীরা একসময় নীল-নাইজারের অববাহিকায় এক সুদূর প্রায়ান্ধকার ঐতিহ্য-উৎসের সন্ধান পাবেই। আর তখনই শুরু হয়, সৃষ্টিতে নিজস্ব ঐতিহ্যকে ধারণ করে প্রকাশ করার এক অদম্য তাড়না—ঐতিহাসিক উত্তরাধিকারত্ব বহনের দায় ও যন্ত্রণা। সৃষ্ট হয় গল্প উপন্যাস নাটক চলচ্চিত্র, সংগৃহীত হয় সঙ্গীত, শিল্পকলা। আপাতভাবে মনে হতে পারে, এইসব সৃষ্টি খুবই স্থানিক, খুবই গণ্ডীবদ্ধ—(সোইঙ্কা-র নাটক সম্পর্কে শ্রদ্ধেয় সমালোচক যেমন বলেন, 'খুবই নাইজিরিয়ান'!)—কিন্তু উৎসমুখে যাত্রারত অন্য ভূখণ্ডের অভিযাত্রীরাও সেই অন্তিমের স্ফটিক স্বচ্ছ জলে প্রতিবিম্বিত দেখতে পান নিজভূমিকে।

নাটককার সোইঙ্কা তেমনি একজন পথপ্রদর্শক—নিয়ত যাত্রারত।

আফ্রিকার অতীত থেকে বর্তমানের ইতিহাস যে সামাজিক সাম্রাজ্যবাদীদের সামান্যতম সম্ভ্রম আদায় করে না—সে তো জানা কথাই। 'অন্ধকারাচ্ছন্ন মহাদেশ'-কে হলিউডের টারনান মানসিকতায় প্রদর্শন প্রচেষ্টা স্বাভাবিকভাবেই তার সমস্ত প্রাকৃতিক চলাচলের নিয়মকানুনকে 'অ-সভ্য' বলে বিজ্ঞাপিত করে। এমনকি, সাম্প্রতিককালের জাতি দাঙ্গা, প্রায় 'নরখাদক' কিছু 'সম্রাট'-এর উপস্থিতি আফ্রিকাকে খুব বেশি প্রাগ্রসরমান বলে প্রমাণ করে না। সোইঙ্কার কাছে এই বিকৃত মানুষগুলির ব্যবহারিক ব্যাখ্যা ভিন্নতর —অবশ্য করেই কোনো 'সম্রাট'-ই সেই যুক্তিগত কারণে তাঁর সহানুভূতি পান না— সোইঙ্কা শুধু কারণ-উৎসের দিকে দৃষ্টি দিতে সাহায্য করেন। ঠিক যে ব্যাখ্যা পাওয়া যায় ফ্রানজ ফ্যানন (Frantz Fanon)-এর 'The Wretched of the Earth'-এর আলজিরিয়ার মুক্তি সংগ্রামের পারিপার্শ্বিকতার বর্জনায় কিংবা এডওয়ার্ড বণ্ড (Edward Bond)-এর বিখ্যাত 'লিয়ার'-নাটকের মুখবন্ধে। এখনকার অবস্থাটাই 'একমাত্র বাস্তব' নয়। সোইঙ্কা বলেন, 'But it was not always so. When a people have been continuously butalized, when the language of rulers is recognized only in the snarl of marauding beasts of prey and scavangers, the people begin to question, mistrust and the shed their own humanity and for sheer survival, themselves become predators on their own kind...' শুধু ব্যাখ্যা বা বক্তৃতাতেই নয়, সোইঙ্কা-র সৃষ্টিতে এই সত্যই স্পষ্ট হয়েছে সর্বত্র অন্য মহত্তম স্রষ্টাদের মতো।

সমগ্র বিশ্বজুড়ে যে আগ্রাসন, যে যুদ্ধ তার বিরুদ্ধে সোইঙ্কা-র অবস্থান কেবল একজন সাধারণ বিবৃতিকার হিসাবেই সীমাবদ্ধ থাকে না। 'যুদ্ধের বিরুদ্ধে শান্তির স্বপক্ষে' প্রচার আলোয় শ্বেত কপোত ওড়ানোর সহজ পথটি বর্জিত হয় সযত্নে—বরং যে অভ্যেসে তিনি নিজস্ব ঐতিহ্য-স্রোত আবিষ্কার করেন, সেই শ্রম-প্রচেষ্টাতেই তিনি স্পষ্ট করে তোলেন যুদ্ধ-আগ্রাসনের গভীর গভীরতর অসুখের সমস্ত উপসর্গগুলি। দীর্ঘদিন বেঁচে থাকার রসদ আত্মসাৎ করে তাঁর নাটক খুবই ব্যক্তিগত ও জাতীয় স্তরে যে ঘটনা বিবৃত করে, বৃহত্তর প্রক্ষেপনে তার ভেতরেই ফুটে ওঠে সমস্ত মানুষের স্বাধীনতা ও ন্যায় সংগ্রামের রক্তাক্ত ছবি। তাঁর লেখনী সম্পর্কে যেমন বলা হয়, '...(The Burden of Memory) speaks not only to those concerned specifically with African politics, but also to anyone seeking the path to social justice through some of history's most inherpitable terrain...'

সোইঙ্কা-র নির্দিষ্ট কোনো নাটক সম্পর্কে এতক্ষণ নীরবতা পালন করার পরে এখন একটি বা দু'টি সম্পর্কে খুব সংক্ষিপ্ত মনোভাব প্রকাশ করা যেতে পারে। Madmen and Specialists—নাটকে বিষয়বস্তু, বিন্যাস এবং বাদানুবাদ তাঁর আর পাঁচটা নাটকের মতোই অনেকটা। কিন্তু এই নাটকে বিভিন্ন সময়ে অতীত আর বর্তমানকে এক পাত্রে এনে মিশিয়ে যে নতুন বর্ণসুষমা ফুটিয়ে তোলার প্রয়াস তা অনবদ্য। এ এক এমন

চলন যাকে বলা হয়েছে 'far more third'। এবং এইখানে সোইঙ্কা 'খুব নাইজিরিয়ান' নন। কাহিনী যে কেবল অভিনব বিন্যাসেই বিবৃত, কেবল যে 'form' এর পরীক্ষা-নিরীক্ষা তা নয়। কাহিনীগত নিটোল একটি কাঠামোকে সযত্নে সরিয়ে রেখেও বিচ্ছুরিত হয় নিহিত যুক্তির নিবিড় দ্যুতি। তখন আর সোইঙ্কা বিন্দুমাত্র স্থানিক নন, নাটক পাঠের কিছু অভ্যেস সামান্য সরিয়ে রাখলেই তাঁকে গ্রহণ করা যায় খুব কাছের জন হিসাবে। নাটকে যখন উচ্চারিত হয়, '...Sooner or later, we all eat sand' কিংবা কেউ যখন 'I like to keep close to earth' বলে মনোবাসনা ব্যক্ত করে, তখন পাঠকেরই ইচ্ছা যেন ধ্বনিত হয় চরিত্রটির ভাষ্যে। নাটকে এই 'Mother Earth' এর কাছে থাকা অসম্ভব করে তোলে তথাকথিত 'সভ্য মানুষ'। এই মাটির কাছাকাছি থাকা মানুষগুলোকে ভূমি থেকে উৎখাত করে দেবার, জান্তব প্রবণতা নিয়ে আসে এমন একজন যে 'আধুনিকতা'-য় শিক্ষিত (!)- -ঠিক যেভাবে 'দ্য লায়ন এণ্ড দ্য জুয়েল'-এ সভ্যতার বার্তা আসে। Madmen-এর সেই বৃদ্ধ পিতাকে অভিযুক্ত করা হয় এইভাবে যে তাঁর (সেই পিতার) তো অনেক কিছু করণীয় ছিল '...Instead he began to teach to think, think THINK ! Can you picture a more trecherous thing than to place a working mind in a mangled body?' মুহূর্তে সেই সাংস্কৃতিক আগ্রাসনে নিয়োজিত 'multinational Company'-গুলির গর্জনই যে প্রতিধ্বনিত হয়—আমরা যা বলাবো, তা-ই বলবে, আমাদের কাছে যা বর্জনীয়, তোমার কাছে তা অস্পৃশ্য—চিন্তার অধিকার কে দিয়েছে? চিন্তা করলেই 'ধুলোয় লুটোবে মাথা, জিভের খণ্ডে ভোজ'। সমালোচকেরা ঐ বৃদ্ধ পিতার মধ্যে দেখেন গ্রিস দেশের সেই প্রাজ্ঞ দার্শনিককে—যাঁর পরিণতিও হয়েছিল ঐ বৃদ্ধের মতোই—মানুষকে তেমন একটি 'তিমিরবিনাসী' অস্ত্র হাতে তুলে দেওয়ার জন্য—মৃত্যুদণ্ড।

'দ্য লায়ন এণ্ড দ্য জুয়েল'-এও সভ্যতার বার্তা আসে সেই এক বাইরের জগৎ থেকে 'Madmen'-এ যাকে নির্দিষ্ট করা হয়েছিল 'out there' বলে। 'সভ্যতার আলোকপ্রাপ্ত' যুবকটি গভীর অরণ্যের নিয়মগুলি বদলাতে চায়। তার সেই 'সভ্য' করার প্রক্রিয়াগুলি যে প্রকৃতির উল্টোমুখে হাঁটতে শুরু করে, তা সে বুঝতেই পারে না। আসলে সে-ও ঐ 'out there' থেকে এক মানসিক দাসত্বের ভার বহন করে আনে। এই সাম্রাজ্যবাদী শক্তির দাসত্ব সে নিজে (এবং অনেকেই) আত্মস্থ করতে পারে না। তাদের অবস্থা হয় সেই 'সচ্ছল' দাসেদের মতো যারা নিজেরাও কিছু দাসের প্রভু হতে পারে কিন্তু '...they have never been masters of their own existence, nor have they plotted their own distiny...' সাংস্কৃতিক এই আগ্রাসনের জগতে প্রত্যেকেই যেন নিজের অবস্থানটা সঠিক করে নিতে চোখ ফেরান এই নাটকটির মাঝখানে—যে অবস্থান প্রায়শই অবোধ্য কিংবা উটপাখিব প্রক্রিয়ায় অদৃষ্ট।

'দ্য লায়ন এণ্ড দ্য জুয়েল' নাটকটিকে প্রাথমিকভাবে কিছুটা 'কনসারভেটিভ' মনে হতে পারে, মনে হতে পারে, নাইজেরিয়ার (আফ্রিকার) প্রাচীনত্বের প্রতি অহেতুক

সংস্কারগ্রস্ত কিন্তু নাট্যঘটনার সঙ্গে সঙ্গে এটা ক্রমশঃ প্রকাশ্য হতে থাকে যে কোন 'সভ্যতা' একে 'কলুষিত' করতে আসে। এই সভ্যতা সবই দেয়, এমনকী নতুন পর্যুদস্ত অধিবাসীদের ট্রেড ইউনিয়ান-এর অধিকারও কিন্তু ধীরে ধীরে এই স্থানটি হয়ে ওঠে মূল শোষণ স্থলের প্রকৃত যথাযথ প্রতিচ্ছবি। এই নাট্যশেষে এই সভ্যতার আহ্বান প্রকারান্তরে প্রত্যাখ্যাতই হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে দ্রুত পরিবর্তনের জগদ্দল পাথর যখন বিভিন্ন সমাজ দেশের উপর চেপে বসে—প্রথমে সেই সরল প্রাকৃতিক মানুষেরা আশ্চর্যান্বিত হয়, দ্রুত অবিশ্বাসের জগতে চলে যেতে তাদের কোথায় বাধে, কিন্তু নানা পর্যায়ের শোষণে তারা ক্রমাগত সঙ্কুচিত ক্লিষ্ট হতে থাকে, ছটফট করে এবং একসময় এই বাঁধন থেকে বেরিয়ে আসার যে প্রক্রিয়া অনুসরণ করে, তাতে পাহাড় নদীর ঢাল বেয়ে গড়িয়ে আসে রক্তস্রোত—শান্ত বনানী কেঁপে উঠতে থাকে আগ্নেয়াস্ত্রের ধাতব গর্জনে। এই ছবি—অন্তত এখন এই সময়ে সর্বত্রই অতি বাস্তব!

সোইঙ্কা-র 'অপেরা ভনিয়সি' (Opera Wonyosi) গে (Gay)-র 'বেগারস্ অপেরা' এবং ব্রেখটের 'থ্রি পেনি অপেরা'-র নব চিত্রণ। যে নৃশংসতা দুর্নীতি ক্ষমতাকে চিরস্থায়ী করে ধরে রাখার প্রভুদের অনিবার্য পথ, গে এবং ব্রেখটের নাটকে তা বিন্যস্ত হয়েছে বিদ্রূপাত্মক ভঙ্গিতে। সোইঙ্কা ঐ ছবিই এঁকেছেন অনেক বেশি ক্রূর প্রক্রিয়ায়, বিদ্রূপের কশাঘাতের কেবল ধ্বনিই, সজোরে আঘাত করে ভেতরে আঁৎকে উঠতে হয় পাঠক হিসাবে। হয়তো প্রতিটি দেশে এখনই প্রভুরা ততটা প্রকাশ্য চাবুক হাতে তুলে নেয়নি, কিন্তু পরিক্রমা পথের প্রান্তে ঐ পদ্ধতিই অনুসৃত হবে—এ ধ্রুব সত্য। সমাজের, আনাচে কানাচে সমস্ত মতলববাজ ফড়ে দালালদের প্রশ্রয়, তাদের শীর্ষস্থিত কারিগরদের নৃশংসতম স্বরূপ—এ সবই আইডেন্টিফায়েড হয় নাটক-বস্তুতে। এইসব প্রভুদের পরিণতি বড় ভয়ঙ্কর অথচ অধস্তনেরা অন্ধ—The unsavory ends of such rulers should serve as a lesson for their emulators but somehow they never do...' অবশ্য এই অন্ধত্বই যে তাদের পতনের কারণ হয়ে ওঠে এ-ও সত্য। কখনও এই শাস্তিদান পর্ব চলে সাধারণ মানুষের সক্রিয়তায়, কখনও আরও বড় কোনো 'হাঙ্গরের দাঁত'-ই মৃত্যুর কারণ। বাস্তবের একটি ঘটনা এই সম্রাট জেন বেডেল বোকাসা—যিনি 'চিরজীবী সম্রাট'—নিজ পরিবারের বস্ত্র ব্যবসাকে আর দৃঢ়ভিত্তি দিতে অনায়াসে হত্যা করে বিদ্যালয়ে পাঠরত বহু ছাত্রছাত্রীকে—'As a good school master should, he (Bokassa) rounded up the wayward pupils, looked them in prison for instruction, and, assisted by his goons, administered corporal punishment...' আরও বহু নৃশংসতার ছবি নিয়ে এই শাসক নাটকে উপস্থিত হন Folksy Boksy হিসাবে। শাসনের রাজদণ্ড চিরস্থায়ী করে ধরে রাখার বাসনায় নিজ মূর্তি প্রতিষ্ঠা থেকে দেশবাসী-র নির্বোধ নিষ্ঠুর নিয়ন্ত্রণ—সবই অনুসৃত হয় নির্বিবাদে!

সোইঙ্কা-র বহু নাটকের মধ্যে মাত্র তিনটির অতি সংক্ষিপ্ত উল্লেখের কারণ স্থান এবং জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা। তবে এই তিনটিকে আলোচনায় নিয়ে আসার এক অন্য উদ্দেশ্য

আছে। '...bare necessity and aesthetical urge...' নাট্য (শিল্প) সৃষ্টিতে এই দুই পক্ষের সম্মিলন ঘটানোই উদ্দেশ্য। ঐ তিনটি (যার নির্বাচন—বিতর্কিত হতে পারে জেনেও—আলোচকের) প্রতিনিধিত্বকারি নাটকে ঐ প্রয়োজন আর নন্দনতত্ত্বের দু'টি ধারাই সম্পৃক্ত কিন্তু তিনটি সম্পূর্ণ ভিন্নতর মেজাজে। 'অপেরা ভনিয়সি'-তে নাটকের বাস্তব জীবন-বাস্তবেরই প্রত্যক্ষ প্রতিফলন, ম্যাডমেন এণ্ড স্পেশিয়ালিস্ট-এ নাট্যবস্তু অনেক গোপন সংরক্ষিত ঐশ্বর্যের মতো, বিধৃত ঘটনার ভেতর থেকে অভিজ্ঞতার সমর্থন জোগাড় করে নিতে হয় আর 'দ্য লায়ন এণ্ড দ্য জুয়েল'-এ তথাকথিত সভ্যতা-র প্রকট রূপ স্থানীয় সীমাবদ্ধতায় থেকেও কীভাবে সর্বত্রের কথা বলে। কোন নাটকের বিষয়বস্তুকে এভাবে সংক্ষেপিত করে ফেলা সমুদ্রকে গণ্ডীবদ্ধ করার প্রয়াস কিন্তু আলোচকের দিক থেকে উদ্দেশ্য কেবল সোইঙ্কা-র নাট্য রচনার বহু বিচিত্র বিষয় এবং পদ্ধতির একটি ক্ষুদ্র আলোকবিন্দু নির্দিষ্ট করা। তবে সব নাটকের অন্তর্নিহিত সুরটি হয় নিজভূমি থেকে উৎখাত কোনো আত্মগর্বী মানুষের পতনগাথা কিংবা মাটির দিকে নিজ উৎসের প্রতি চলমানতার আহ্বান এবং এই দুইয়ের মাঝেই চলে নানা রং-এর বহু বিচিত্র খেলা।

সোইঙ্কা-র বক্তব্য, নির্দিষ্ট কোনো বাদের প্রতি আনুগত্য নেই তাঁর, তিনি একজন 'নন কমিটেড' লেখক। এইখানে একটু ধন্দে পড়ে যেতে হয়। কারণ তিনি যখন এ-ও বলেন, '...In living together in society, we agree to lose some of our freedom. To detract from the manimum freedom socially possible, to me, is treacherous. I donot believe in dictatorship benevolent or malevolent.' তখন মনে হয়, কমিটমেণ্ট শব্দটাকে নানাভাবে দলিত বিকৃত হতে দেখেই কি তাঁর এই অনীহা! সোইঙ্কা-র নাট্যসমালোচকেরাও যখন বলেন, তাঁর দায়বদ্ধতা "both (for) literary and social flow. Soyinka is a unified personality ; the artist and the man are one." তখনও তাঁর নিজে উচ্চারণের উৎসের প্রতি কেমন সন্দেহ জাগে।

এই সময়ে যখন শিল্পী আর ব্যক্তিমানুষকে সম্পূর্ণ পৃথক করার সামাজিক ব্যাখ্যা প্রায় দৃঢ়ভিত্তি পেয়ে যায়, তখন মানুষ সোইঙ্কা আর রচনাকার সোইঙ্কা এক অন্যভূমির হদিশ দেন। আফ্রিকার মিথ ইত্যাদির অপরিচিত পোশাক গায়ে চাপিয়েও তাঁর নাটকের ঔজ্জ্বল্য ব্যাহত হয় না অপরিচিত নবীন কোন পাঠকের কাছে। এমনকি, তিনি যখন বলেন যে, 'The truth shall set you free? May be. But first the truth must be set free...' তখন এই দ্বিধাদীর্ণ সময়ে এ প্রায় এক শ্লোগানে পরিণত হয়। স্রষ্টা সোইঙ্কা তাঁর উচ্চারিত ঝাণ্ডা নিয়ে পথে নেমে আসেন প্রদর্শকের দৃঢ়তায়। সক্ষমতা সেইখানে।

স্বীকার করে নেওয়া প্রয়োজন, সোইঙ্কা-র সমস্ত রচনা—তাঁর সব কবিতা উপন্যাস প্রবন্ধ চিঠি ইত্যাদি—পড়া সম্ভব হয়ে ওঠে নি। যেহেতু কেবল বাইরের বিভিন্ন নিজ সৃষ্টির ভেতরেও অবিরাম পারস্পরিক ইশারা চলে, ফলে এই সোইঙ্কা পাঠ অসম্পূর্ণ। ব্রিটিশ কাউন্সিল লাইব্রেরীতে এবং দু'একজন প্রাজ্ঞ শিক্ষকসম মানুষের ব্যক্তিগত সংগ্রহে থাকা

সোইঙ্কা-র নাটকগুলি, তাঁর অন্য দু'একটি লেখা বক্তৃতা এবং তাঁর সম্পর্কে সমালোচকদের লেখা দু'টি বই-ই সম্বল। ফলে, অনুগ্রহ করে এই রচনাকে একজন নবীন পাঠকের আংশিক পাঠ হিসাবেই গ্রহণ করা সমীচীন হবে।

দ্বিতীয়ত, রচনাটি প্রস্তুতির সময়েই সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পান Naipaul. বিস্মিত হতে হয়, তাঁর মানসিক গঠনের এক অদ্ভুত প্রকাশ লক্ষ্য করে। এমনকি, বাবরি মসজিদ ধ্বংস-ও যে অবদমিত ভারত আত্মার এক সংহত প্রকাশ এমন লেখাও লেখেন তিনি। অবশ্য কারই মনে হয়, তাঁর অন্য সব লেখাতেও প্রচ্ছন্ন বা প্রকটভাবে একই মানসিকতা ব্যক্ত হয়েছে। গণ্ডীবদ্ধতার বাইরে নিয়ে যাওয়ার প্রচেষ্টায় ব্রতী সোইঙ্কাও নোবেল পেলেন, নাইপাওল-ও পেলেন। রবীন্দ্রনাথ না হয় পুরস্কারদাতাদের পূর্বপুরুষদের অতীত কর্ম! এই বিস্ময়—নিজের জ্ঞানসীমার গণ্ডীবদ্ধতার জন্যই—মাঝে মাঝে স্পষ্ট দেখার পথকে আচ্ছন্ন করে। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোকপাতে উপকৃত হওয়ার অপেক্ষায় রইলাম।

এই সংক্ষিপ্ত লেখাটি লিখতে যে সব বই-এর সাহায্য নিতে হয়েছে :
1. The Burden of Memory The Muse of Forgiveness : Wole Soyinka.
2. The Writing of Wole Soyinka : Eldred Durosimi Jones.
3. The African Novel in English : An Introduction, : M. Keith Booker. এবং সোইঙ্কা-র নাটকগুলি।

আফ্রিকায় ইউরোপিয় ভাষার ভবিষ্যত

আর ফিলোঁর

মানুষকে মিলিত কিংবা বিচ্ছিন্ন করার জন্য ভাষার থেকে কার্যকরী আর কিছুই নেই। সত্যি কথা বলতে, একই ভাষাভাষী লোকের পাশে আমরা স্বচ্ছন্দ বোধ করি। যে কৃষ্ণাঙ্গ ও শ্বেতাঙ্গ একই ভাষায় কথা বলে তাদের মধ্যের যোগসূত্র তাদের অন্য ভাষাগোষ্ঠীর ভাইদের মধ্যের যোগাযোগের চাইতে জোরালো। এই সিদ্ধান্তে আসা চলে যে বর্ণ ভিত্তিক জাতিবৈশিষ্ট্যবাদকে খুঁজে পেয়েছে। এই ধরণের জাতিবৈশিষ্ট্যবাদ স্পষ্টতই পশুদের মধ্যেও দেখা যায়। যেমন ধরুন যে কুকুর ডেকে চলে অথচ তার ডাকের মর্ম বোঝা যায় না, তার সঙ্গে থাকতে শুকরের অস্বস্তি হয়...

তাই, একটি জনগোষ্ঠীর প্রাতিস্বিকতাকে ধ্বংস করতে হলে অবশ্যই তার মাতৃভাষার ব্যবহারকে ব্যাহত করাই শ্রেষ্ঠ উপায়। আর এর ব্যাপ্তি আরো সুদূরপ্রসারী! এই ভাবেই নানা দেশে মানবতাকে বিচ্ছিন্নকারী ভাষাগত যুদ্ধের কারণ নির্দেশ করা যায়। কানাডার কেবেকরা ইংরাজিভাষী স্বদেশবাসীদের বিপুল তরঙ্গে নিমজ্জিত হয়ে তাদের গোড়াকার ফরাসি ভাষার স্বীকৃতি ও সম্মান দাবি করে। তাদের মধ্যে কেউ কেউ আলাদা হয়ে সম্পূর্ণ ফরাসিভাষী কেবেক জাতি সৃষ্টির স্বপ্ন দেখে। বেলজিয়ামে ওয়ালুনদের মধ্যেও একই সমস্যা বাস্তবিক, অতীতে তারা তাদের ফরাসিভাষী দেশবাসীর বিরুদ্ধে লড়াইও করেছে। অল্প কথায় বলতে গেলে, তারা বিদ্রোহ করেছিল এই ক্ষোভের জন্যেই, কারণ তারা পবিত্র এমন কিছু একটা হারিয়েছিল যা তাদের ব্যক্তিত্বের আত্মিক প্রকৃতিটিকে নির্ধারণ করে।

ক্যামেরুন আফ্রিকার এক মাত্র দেশ যেখানে রাজনৈতিক স্বাধীনতার পরেও দ্বিভাষিকতা রয়ে গেছে। কেন এই নবীন দেশে এই ব্যাপারে কোনো গণ্ডগোল বাধেনি...সেটা বোঝানো সহজ...ফরাসি বা ইংরাজি আমাদের সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারের অংশীভূত নয়। তাই সেগুলির কোনোটিকে ব্যবহার করতে গেলে কোনো ক্যামেরুনীয়রই ক্ষুব্ধ হওয়ার কথা নয়। যাই হোক না কেন, আমাদের দেশে এই দ্বিভাষিকতার অন্যান্য তথাকথিত উচ্চ সভ্য দেশে যেমন হয়েছে তেমন অভিজ্ঞতা অন্যান্য তথাকথিত বিতণ্ডার বিষয় না হয়ে বরং সমৃদ্ধির উৎস হয়ে দেখা দিয়েছে।...

মানুষের মধ্যে না বোঝার বিরুদ্ধে লড়াইটা মানবহিতৈষীদের সবসময়েই ভাবিয়েছে। কিন্তু এই লড়াই কার্যকররূপে জেতা হবে না যদি এই পৃথিবীতে ভাষা উপভাষা ও আঞ্চলিক ভাষার দ্বারা সৃষ্ট বাধাগুলিকে ভেঙে ফেলা না হয়...অর্থাৎ মানুষের

ভাষা কেবল মাত্র ভাব প্রকাশের উপায় নয়। প্রতিবেশীকে নিজের কথা বোঝাতে সাহায্য করে এই ভাষা। শক্তিশালী সুগঠিত গোষ্ঠী নির্মাণেও তারই অবদান। সত্যিই এ কথা কত সঠিক যে ভাষার বাধা ভেঙে পড়লে হৃদয় ও আত্মার মিলন—অঙ্কুরিত হয়।

আগেকার ঔপনিবেশিক শক্তিগুলি এ সব কথাভালোই বুঝেছিল। তারা উপনিবেশের লোকেদের হৃদয় মনের মিলন ঘটাতে চায়নি। তারা যে শুধু তাদের আইন, ধর্ম ও শিল্পকে (তাদের সংস্কৃতির বনিয়াদ) চাপিয়ে দিয়েছে তাই নয়, নিজেদের ভাষাগুলির শিক্ষাদান চালু করতেও তারা ভোলেনি। এ কথা সুবিদিত যে সব সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ বাহক হল ভাষা। কিন্তু এই ইউরোপিয় ভাষাগুলি তো আমাদের কাছে ভিনদেশী। আর অন্যান্য ভিন্‌দেশী সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের মতই তারা আফ্রিকার অনিবার্য পরিবর্তনে ইন্ধন জুগিয়ে চলে, আর আমার মতে হয়ে ওঠে এক ক্রিওলিয়করণ। সত্যি কথা বলতে আমাদের তাবা পুরোনো ঔপনিবেশিক দেশগুলিতে তারা তাদের প্রাণবত্তা, তাদের প্রাঞ্জলতা আর তাদের বিশেষ অন্তর্নিহিত কবিতাকে হারিয়ে ফেলে। তারা শুধু যে নতুন উপভাষার জন্ম দেয় তাই নয়, জন্ম দেয় এমন প্রান্তিক সাহিত্যের যা তাদের মাতৃভূমিতে বহু শতক ধরে বর্তমান সাহিত্যের থেকে মূলগতভাবেই আলাদা।

অস্বীকার করা যাবে না যে পৃথিবীতে একটি নয়, একাধিক ইংরাজি ভাষা আছে। লণ্ডন ও আয়ারল্যাণ্ডের ইংরাজি!...মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ভারতের ইংরাজি!.. স্বাধীন কৃষ্ণাঙ্গদের আফ্রিকা ও জাতিবৈশিষ্ট্যবাদী দক্ষিণ আফ্রিকার ইংরাজি!... এই সমস্ত ইংরাজিই আলাদা আলাদা, এর সঙ্গে যোগ করা প্রয়োজন 'বুশ' বা 'পিজিন' ইংরাজিকে। যদিও এই খিচুড়ি ইংরাজিকে আফ্রিকার অনেক ইংরাজিভাষী দেশেই স্থানীয় উপভাষা বলে মনে করা হয় লাইবেরিয়া সিয়েরা-লিওন, নাইজেরিয়া ও ক্যামেরুনে তা কিন্তু এক ভাবে বলা হয় না।

ধ্রুপদী ইংরাজি ভাষা souvenir, bonheur, coup d'Elat-র মত ফরাসি শব্দকে স্বাঙ্গীভূত করতে ইতস্তত করে না। শেক্সপিয়রিয় ভাষায় যার যথেষ্ট প্রতিশব্দ আছে তেমন অজস্র বিদেশী শব্দকে আলিঙ্গন করে সে স্বেচ্ছায় নিজের অশুদ্ধিকরণকে ত্বরান্বিত করে।

আমার এক কানাডিয় বন্ধু সম্প্রতি ক্যামেরুনে এসেছেন, তিনি একদিন আমায় বললেন যে ক্যামেরুনে কথিত ফরাসি বুঝতে তাঁর অসুবিধা হচ্ছে। উদাহরণ স্বরূপ তিনি কিছু কিছু ক্ষেত্রে এমন কি সরকারী ক্ষেত্রেও ব্যবহৃত "J'en ai termine" বাক্যটি উদ্ধৃত করলেন। উত্তরে আমি সেই সব শব্দের উল্লেখ করলাম যেগুলি ফ্রান্সে অচল হয়ে গেছে, কিন্তু কানাডিয় ফরাসি সাহিত্যে এখনো ব্যবহৃত হচ্ছে।

তবে এ কথা আমি বলব না যে ফরাসি ভাষা আমাদের দেশে তার নিজস্ব রূপ হারিয়ে ফেলেনি; হ্যাঁ, অনেক শব্দ পরিবর্তিত হয়েছে, আভিধানিক অর্থ কেনো সরে এসেছে। যথা gater—abiner; payer—acheter; la vic est chire—la vic coûte cher; minauder—mepriser du regard; plantain—banane .। অনেক শব্দের আসলে অস্তিত্ব পর্যন্ত নেই : cadeauter —offair un cadean... পরিবর্তন এসেছে ব্যাকরণগত ভুলের মাধ্যমেও যা এখন আর আমাদের কানে লাগে না যেমন— il s'est marié arve are fille-র জায়গায় il s'est marié d'ure fille, Je l'ai ru-র জায়গায় Je lui ai ru, Je Suis intervenu-র জায়গায় j'ai interveiw।

যাই হোক, এ কথা মনে রাখতে হবে যে মূল ফরাসিভাষীরা অর্থাৎ ফরাসি দেশবাসীরাই কিন্তু আমাদের দেশের এই শব্দগত অশুদ্ধির জন্য প্রাথমিক ভাবে দায়ী। তাঁরা সে কথা জানেনও। তাঁদের মধ্যে থেকে কোনো কোনো কণ্ঠস্বর সেই সব সরকারী সংস্থাগুলিকে উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টাও রয়েছে যারা ভাষার শুদ্ধ ব্যবহারকে সংরক্ষণ করতে প্রচেষ্ট। শুদ্ধ প্রয়োগের সনাতন রক্ষক ফরাসি আকাদেমিও কিন্তু এই গুরুতর বিপদের মোকাবিলা করার জন্য কিছুই করে উঠতে পারেনি। কেন?...প্রথমত, এই ভাষার সর্বাধিক প্রয়োগকারী যে জনসাধারণ তারা প্রতিদিন সংখ্যালঘু শুদ্ধতাবাদীদের ওপর নিজেদের আইনকানুন আরোপ করে। তারপর ফরাসি আকাদেমিও যেন ক্লান্ত হয়ে হাল ছেড়ে দিয়েছে, অবিরত আরো আরো ভিনদেশী শব্দের বৈধীকরণ করে চলেছে। বর্তমানে, বিশেষজ্ঞরা দেখিয়েছেন যে ফরাসি শব্দভাণ্ডারের দুই তৃতীয়াংশ চ্যানেলের ওপরে আর ইয়াংকিদের দেশ থেকে ধার নেওয়া। তাঁদের মতে ফরাসি বলার থেকে অনেক যুক্তিযুক্ত হল "ফংরাজি" বলা!...কারণ, সত্যি কথা বলতে, কোনো ফরাসি দেশবাসীকে উচ্চমানের সংবাদপত্র পড়তে শুনলে মনে হয় যেন ইংরাজিতে আগড়ম বাগড়ম বকাটা তাঁর কাছে পরম গৌরবের বিষয়, যেমন: leader, football, fair play, tansad, sharing, shirting, goal, average, ইত্যাদি... সাবধান! এই শব্দগুলো সমস্তই কিন্তু শ্রেষ্ঠ ফরাসি অভিধান থেকে অপরিবর্তিত অবস্থায় নেওয়া হয়েছে। মনে হতেই পারে যে এর মধ্যে ফরাসিটা কোথায়?

তবে, ফরাসি আকাদেমি এর বদলে এক্কেবারে ফরাসী ধ্বনিযুক্ত নতুন শব্দনির্মাণ করতে পারত। যেমন avion শব্দটি ১৮৭৫ সালে "appareil à vol initant oisean natural (পাখি সদ্দাণ উড়ুক্কু যন্ত্র) শব্দ বন্ধটির প্রতিটি শব্দের প্রথম অক্ষরগুলিকে যুক্ত করে তৈরি করা হয়েছিল। "Weekend"-এর বদলে Sa(medi) (শনিবার) ও din(anche) (রবিবার) কে ছোট করে "sadime" করলে ক্ষতি কী?...

ফরাসিভাষণের উদগ্র প্রবক্তারা কিন্তু এই ব্যাপারটাকেই অবহেলা করেছেন। বরং তাঁদের মধ্যে এক বিশুদ্ধ ফরাসি ব্যক্তি তাঁর জাতীয় ও সরকারি মাতৃভাষার মধ্য ঝাঁকে ঝাঁকে ঢুকে আসা যত গালভরা ভিনদেশী শব্দের বিরুদ্ধে উঠে দাঁড়িয়ে একটি সাহিত্য পত্রিকায় ফরাসিভাষণের "Common Wealth" সৃষ্টির প্রশংসা করেছেন।... অকপটে "our communauté" বললে ক্ষতি কী ছিল? তিনি হয়ত ভয় পেয়েছিলেন যে ওই নামটি আমাদের পুরোনো উপনিবেশিত চিন্তায় অস্বস্তিকর স্মৃতি জাগিয়ে তুলবে...আর যে "ফাংরাজি" তিনি দূর করতে চেয়েছিলেন তার মধ্যেই তিনি গিয়ে পড়লেন...

আমি মাঝে মাঝে ভাবি আফ্রিকানরা হঠকারীর মত উৎপত্তিস্থল থেকে যা আসছে তার ছাঁচেই নিজেদের গড়ে ফেলছে না তো?...

ভাষা তো চিন্তার পদ্ধতিই। তাই যদি হয়, এক লেখক ঠিক করে ভাবতে বা লিখতে পারেন এক মাত্র তাঁর মাতৃভষাতেই। তাই বিদেশী ভাষা ব্যবহারকাবী আফ্রিকান লেখক এক গুরুতর আন্তর দ্বিত্বের সম্মুখীন হন— তিনি যে ইউরোপিয় ভাষা নিয়ে কাজ করছেন। তিনি ভাবেন আফ্রিকানের মত কিন্তু লেখেন ইরোপিয়ের মত। এই নাটকের জন্যই তার চিন্তার থেকে তাঁর কলম বিচ্ছিন্ন হয়।

কখনো সখনো তাঁর লেখায় স্বাদ গল্প সঞ্চার করে নানা অইউরোপিয় শব্দ ও বাক্যাংশ সাংস্কৃতিক জগতের বিশেষ সত্যগুলিকে ব্যক্ত করাটা কল্পনা প্রণোদিত নয়, তা প্রয়োজন নির্দেশিত। ধাঁধাটা আরো জটিল হয়ে উঠেছে মাতৃভাষা ও ইউরোপিয় ভাষার মধ্যে প্রচুর পার্থক্য থাকার কারণে। অন্বয়, শব্দ, চিন্তাধারা ও রীতিতে এই পার্থক্যগুলি সত্যিই চমকপ্রদ...

যেমন আমাদের বান্টু বা আধা-বান্টু ভাষাতে কর্মক্রিয়া বা গুণমানের শব্দানুকৃতি প্রকাশক চিত্রধর্মী ক্রিয়া-বিশেষণ আখ্যায়িকা বর্ণনাকে চিত্রকল্পে ভরিয়ে তোলে। এমনটা ইউরোপিয় ভাষায় হয় না। তাছাড়া অনেক আফ্রিকান শব্দের শেষে সন্তোষজনক সমার্থক শব্দ মেলে না। শুধু "beti" ক্রিয়াটির কথাই ধরা যাক না: "a kogolo"-র অর্থ ফরাসি বা ইংরাজিতে যদি এই ভাবে বলতে যাই "অত্যাসন্ন প্রসবের বেদনা অনুভব" তবুও তা পরিষ্কার হয় না। অবাক হব না যদি আফ্রিকান লেখক তাঁর সাহিত্যিক বৃত্তির অনেক কাব্যিক ঋদ্ধিই এই ভাবে জলাঞ্জলি দিয়ে বসেন। তা হলে সাংস্কৃতিক সর্বনাশের কথা। বলব নাই বা কেন? আমাদের উত্তরাধিকারকে এই ধ্বংস থেকে রক্ষা করতে গেলে মাতৃভাষার বিকাশসাধনই শ্রেষ্ঠ পথ। এই পথের অসুবিধা হল পাঠকের সংখ্যার সংকোচন। কিন্তু এই পথেই আবার অনেক সম্পদ দেখতে মেলে।

সবার আগে, আমাদের সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ তার স্বাভাবিক ভাষাতাত্ত্বিক রূপে সংরক্ষিত হবে। তারপর, বিশেষজ্ঞেরা অনুবাদ করতেই পারেন...তাছাড়া, নিগ্রো-আফ্রিকানকে তার ধ্যানধারণা, তার দার্শনিক ও পৌরাণিক চিন্তাধারার মধ্যে দিয়ে আরো ভালো ভাবে বুঝতে পারা যাবে। অন্য দিকে, ইউরোপিয় ভাষাও আমাদের বৈজ্ঞানিক ভাবে পরিশীলিত ভাষাগুলি থেকে নতুন প্রাণশক্তি আহরণ করে পুনরুজ্জীবিত হবে, সমৃদ্ধ হবে। এই মূল্যে, হ্যাঁ, শুধু মাত্র এই মূল্যেই ইউরোপিয় ভাষাগুলি ভবিষ্যতে তাদের বিশ্বজনীনতাকে জয় করতে পারবে। কারণ, যতই তারা দাবি করুক না কেন, সে বিশ্বজনীনতা তাদের এখনো আয়ত্তে আসেনি।

বিশ্বজনীন ভাষা আমার মতে সেই ভাষা যার মূল উপাদানগুলি মানবজাতির সকলের মধ্যের বাস্তু সংস্থানগত এবং সমাজ-সাংস্কৃতিক বাস্তব অবস্থার সাথে যথেষ্ট খাপ খায়। ইউরোপিয় ভাষাগুলি : ইংরাজি, জার্মান, ফরাসি, পোর্তুগিজ ও স্প্যানিশ সারা বিশ্বে ছড়ানো, কিন্তু তার মূলে আছে ঔপনিবেশিক আগ্রাসন যা অস্বস্তিকর স্মৃতি জাগিয়ে তোলে। বিজিত জাতির ওপর সেগুলিকে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে, তারা আমাদের সাংস্কৃতিক আকাঙ্ক্ষাকে তৃপ্ত করতে পারবে না।

আফ্রিকার দেশজ ভাষার বিকাশসাধন ও ইউরোপিয় ভাষাকে নব প্রাণশক্তিতে সুসমৃদ্ধ করা... এই কঠিন কাজই করতে হবে পারীতে ১৭ই ফেব্রুয়ারি -তে স্থাপিত "La Fédération du Fransais universal" (বিশ্বজনীন ফরাসি ভাষার সংঘ)-এর মত প্রতিষ্ঠানগুলিকে...আমাদের সাংস্কৃতিক আলোচনার অনুষ্ঠানসূচিতে এই বিষয়গুলি রাখা যেতে পারে, ক্যামেরুনের কবি ও লেখক সংঘের পরবর্তী জাতীয় সম্মেলনের সদস্যরা অবশ্যই তাতে অনুরাগী হবেন।

ভাষান্তর : অরূপ মণ্ডল

গল্প

সে আর বেড়ালটা

এজেকাইয়েল মফাহ্‌লেলে

আমার এক বন্ধু পরামর্শ দিয়েছিল, বিষয়টি নিয়ে একজন উকিলের কাছে যাও। তা, আমার তো এতাবৎকাল কোনো কাজেই কোনো উকিলের কাছে যাবার দরকার পড়ে নি। আর উকিলের কথা শুনলেই মনের পর্দায় ভেসে ওঠে আদালতের দৃশ্য, পুলিশের...ভয়ঙ্কর সব ছবি। আমি সত্যিই এক ঝামেলার মধ্যে আছি, তবু বুঝতে পারছিলাম না একজন উকিল আমায় কীভাবে বাঁচাবে! যা হোক আমার বন্ধু তো উকিলের ঠিকানা আমায় দিল।

আর সেই সময় থেকে ঝামেলা আরও পাকিয়ে গেল। আমার মনটা ভারাক্রান্ত হল। উকিলের বাড়ি যাবার আগের রাতে আমি হৃদয়ে তীব্র বেদনা অনুভব করলাম। আমার অন্তরে কে যেন আগুনের ছ্যাঁকা দিল। ঠিক করলাম, আমি উকিলকে সব কথা খুলে বলব। সেই কথা যা আমায় কদিন ধরেই যন্ত্রণা দিচ্ছে।

উঁচু বাড়িটার সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে শুরু করলাম। যখনই কোন মানুষের সঙ্গে দেখা হচ্ছিল তখনই মনে হচ্ছিল—ইনিই সেই উকিলবাবু যিনি আমায় ত্রাণ করবেন। সিঁড়ির বাঁকে একটি ছোকরার সঙ্গে আমার দেখা। ছেলেটির মুখে একজন বয়স্ক মানুষের মুখ বসানো রয়েছে যার চোখ দুটো বড় বড় আর ওষ্ঠ দুটি পুরু। তাকেই বললাম যে আমি উকিল ক বাবুর সঙ্গে দেখা করতে এসেছি। সে খুব ভদ্রভাবে আমায় উকিলবাবুর প্রতীক্ষালয়ে চুপচাপ অপেক্ষা করবার জন্য অনুরোধ করল। আরও জানাল যে আমার পালা এলেই আমি উকিলবাবুর সঙ্গে দেখা করতে পারব। তার কথা শুনে আমি কিঞ্চিৎ হতাশ হলাম। আমার ধৈর্য ছিল না, এখুনি উকিলবাবুকে সব কথা উগ্‌রে দিয়ে আমি যন্ত্রণামুক্ত হতে চাইছিলাম। কিন্তু তা হল না। আমায় তাঁর জন্য অপেক্ষা করতে বলা হল।

উকিলবাবুর প্রতীক্ষালয়ে দেয়াল ঘিরে জনা পাঁচিশেক মক্কেল বসে, ঠিক যেন নাগরদোলায় পর্যুদস্ত হবার জন্যে তৈরি কটি পুতুল। সবকিছু দেখে আমার মনে হল না যে আমার সব কথা উকিলবাবুকে বলার জন্য আমি যথেষ্ট সময় পাব। সমস্যাটি কীভাবে শুরু হল, বেড়ে উঠল, আমাকে গুঁড়িয়ে দেবার জন্য কীভাবে সন্ত্রস্ত করে রাখে—এসব কথা বিশদভাবে উকিলবাবুকে বুঝিয়ে বলার জন্য কি আমি যথেষ্ট সময় পাব—যখন এতগুলো লোক তাঁরই জন্য অপেক্ষা করছে! সেই বয়স্ক মুখের বড় বড় চোখ আর পুরু ওষ্ঠের ছোকরাটি পালাক্রমে অপেক্ষমান লোকদের একের পর এক ডেকে

নিয়ে যাচ্ছিল।·আমি জানতাম, আমায় কী করতে হবে। মনে মনে পুরো বিষয়টি আমি একবার ঝালিয়ে নিলাম, যাতে পুরোটা আমি আনুপূর্বিক গুছিয়ে বলতে পারি। উকিলবাবু নিশ্চয় কোন প্রসঙ্গ বাদ দেবেন না, তা যত তুচ্ছই হোক না কেন।

আর তা করতে গিয়ে ঘরের ভেতর দৃষ্টিপাত করেই আমি চমকে গেলাম। এই লোকজন, ঘরের দেওয়াল, ছাদ, আসবাবপত্র সবই আমার চোখে বিস্ময়কর ঠেকল। একটা আকর্ষণহীন ন্যাড়া ঘর। তাতে কখানা চেয়ার ইতস্তত ছড়ানো। চেয়ারের হাতলগুলো অপেক্ষমান ক্লান্ত কোন মানুষের হাতের পিনের খোঁচায় ক্ষত-বিক্ষত। ঘরের একটি দেওয়াল যেদিকে মক্কেলদের জন্য কোনো চেয়ার রাখা নেই, সেখানে বছব পঞ্চাশ বয়সী এক জন লোক টেবিলের ওপাশে বসে খামের মুখ আঠা দিয়ে বন্ধ করে চলেছে। আর তার পিছনে একটি ছবি ঝুলছে। ঘরে ওই একটিমাত্র ছবি যাতে একটি বেড়াল তার সবুজ দৃষ্টি দিযে ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়ে আছে—যেন তার কাজের নজরদারি করছে। টেবিলের ওপর একটা ভূগোলক স্থাপন করা ছিল কিন্তু কী কারণে তা আমি বুঝতে পারলাম না। মনে হল যে লোকটা আঠা দিয়ে খামের মুখ জুড়ছে সে বুঝি তার ক্লাসের ছাত্রদের ঐ ভূগোলকটা ঘুরিয়ে দেখাবে যে সেটি তার অক্ষের ওপরে ভর রেখে কীভাবে ঘুরতে থাকে।

যখন তুমি কোনো একটি বিষয়ে ভাবনা শুরু কববে, দেখবে তখন হাজারটা ভাবনা তোমার মাথায় জড়ো হয়েছে। হয়ত তুমি গতরাতের অভিজ্ঞতার কথা মনে করতে চেষ্টা করছ ঠিক তখনি তোমার গার্লফ্রেণ্ডের ভাবনাই সবার আগে এসে যাবে। তখন তোমার ভাবনাকে অন্য খাতে বওয়ানোর চেষ্টা করো, কিম্বা ফের ফিরে এসো—এই ঠিক যেমন আমি করছি, তোমার সামনের বেড়ালটাকে দেখছি, কী টেবিলেব ওধারের মানুষটাকে বা একে একে মক্কেলদের দেখছি। কোন এক পলকে মনে হল বেড়ালটা বুঝি নড়ে উঠল, ফের সে আগের জায়গায় ফিরে গেল। বেড়ালের দিকে চেয়ে এবারে দেখি সে যেন ধমক দিয়ে বলছে—তুমি তো দেখছি বড়ই আহাম্মক, কী করে ভাবলে যে ছবির বেড়াল নড়াচড়া করতে পারে?

তুমি দেখেছো একটা মাছি জানালার শার্শির ওপরে কী প্রচণ্ডভাবে আছড়ে পড়ে, যখন নিচের পাল্লা খোলা থাকে তখন সে ওপরের দিক দিয়ে ঢোকার জন্য আঁকুপাক করে। শহরের আকাশ-ছোঁয়া বাড়িগুলো ছাড়িয়ে দৃষ্টিপাত করলে। সেই অপরাহ্নের তাপ এত গুমোট যে তোমার মাথার ভেতরটা যেন তালগোল পাকিয়ে গেল। তাই বয়স্ক মুখের লম্বা কানওলা ছেলেটি যখন—‘পরের জন’ বলে হাঁক দিল তখন তা তোমার কর্ণগোচর হল না। ঘরের ভেতরকার বদ্ধ বাতাসে তুমি যেন ভেসে বেড়াচ্ছ, বোধশক্তিহীন তুমি এই ঘরে অপেক্ষা করছ।

টেবিলের ওদিকের মানুষটা যান্ত্রিকভাবে কাজ করে যাচ্ছিল—সেই একঘেয়েমির ক্লান্তি কাটাতে তার সামনের দু চারজন মক্কেলের সঙ্গে কথা বলা শুরু করলে। তার দন্তহীন প্রসন্ন মুখমণ্ডল মাঝে মাঝেই হাসিতে উদ্ভাসিত হচ্ছিল। চার-পাঁচটি বাক্যের পরই

সে এক একটি প্রবাদ আওড়াচ্ছিল। "আমাদের সাধু পুরুষেরা বলে থাকেন, যে বস্তু তোমাদের নিজের, একান্তভাবে নিজেদের হতে পারে সেগুলো তোমরা এর মধ্যেই হজম করে ফেলেছ। হি-হি-হি। "দূর থেকে শহরটা দেখো, কী চমৎকারই না লাগে, যত কাছে আসবে—যখন শহরে পৌঁছবে তখন ভাল-লাগা সবটুকুই ফুরিয়ে যাবে।" হি-হি-হি।

মক্কেলরা ছোট ছোট দল বেঁধে গল্প করছে, নানাবিধ বিষয়ে তারা আলোচনা করছে। স্যান্টি শহরের কাছে একটি মৃতদেহ পাওয়া গেল, সম্ভবত ট্রেনে কাটা পড়েছে।..."আমার কথাটাই ধরো না—আমার তিন-তিনটে ছেলে আছে, কিন্তু তাদের একজনও কী বাড়িতে একটা পয়সা ঠেকায়? তারা পেট পুরে খায়, ভোঁস ভোঁস করে ঘুমোয়, কোত্থেকে যে খাবাবের জোগান আসে তার খোঁজ কী কেউ রাখে?"

টেবিলের ওপাশের সেই লোকটি বলল, "আমি তো সব সময়ে বলি কী, না, যখনই তুমি নাচের আড্ডায় মেয়েকে পাঠিয়েছ, তখনি তাকে হারিয়েছ।"

"এ তো ঝোড়ো বাতাসকে ধরার চেষ্টা—হাঃ সে বেশি দূরে যেতে পারে নি, ওরা ওকে ধরে ফেলবে—ভেবে দ্যাখো, ছয় মাসও হয় নি ওর বর গোরে গেছে, বেচারি। বউটা এর মধ্যেই বিয়ে করছে। ভাল স্বামী হবার এই পুরস্কার।"

"মহাপুরুষেরা এমন কথাই বলে থাকেন—একপাল জানোয়ারের নেতা যদি একটা গরু হয় তবে পুরোদলটা খাদে পড়বে।...বউ-এর কথাটা শুনবে ততক্ষণই যতক্ষণ জানবে তোমার কথাই শেষ পর্যন্ত শোনা হবে।"

"একবার একজনের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল" "আলু? ওঃ এখনকার দিনে সব জিনিসই মাঙ্গা, এমন কি তুমি যখন বিয়ে করতে যাবে তখন দেখবে মেয়েমানুষেরও কত দাম! একমাত্র ঈশ্বরই জানেন কখন আর কোথায় আমাদের যাওয়া উচিত।..."আমরা কি টাকার জন্যেই এখানে আসি নি? এই যে আমাদের ঘোরাফেরা—এটাও কি টাকার জন্য নয়?"

"মরণ আমাদের পায়ে পায়ে জড়ানো—তবু আমরা কি হাঁটছি না? হি-হি-হি।"

"তুমি বলছ যে তুমি কখনো মাগাবায় যাও নি, তাহলে তো দেখছি তোমার কিচ্ছুই জানা হয় নি। ওখানে মেয়েরা ফল বিক্রি করে। যে মাটিতে ওঁরা দাঁড়িয়ে সেই মাটির মতই রাঙা ওদের রঙ। ছেলে-মেয়ে রাঙা মাটির মত একরকম। নুন মাখানো মাংস শিকে গেঁথে ঝলসানো হচ্ছে। রাঙা ধুলো চক্কর কাটছে। দানবকে আগুনে পোড়ানো হলে সে যেভাবে দাপাদাপি করে লোকেরা সেভাবে পাগলের মত এদিক-ওদিক ছুটছে—সবই যেন স্বপ্নের মত বোধ হচ্ছে।" টেবিলের ওধারে মানুষটি ফের হাসল, তারপর বলল, "তোমার মাথায় যে শিং লাগানো তা মোটেই পাকা নয়—তাই এসব গালগল্পে মোটেই ভয় পেয়ো না।"

"আমরা এখন বড় দুঃসময়ে এসে পৌঁছেছি—এখন বউরা তাদের শাশুড়িদের ধরে পিটোতে পাবে।..." "বহুবছরের মধ্যে এবারই প্রথম এমন কাণ্ড দেখলাম। এমন কাণ্ড যদি ঘটতে থাকে তো আমাদের কালেই গরু এবার গাধা পয়দা করবে।"..."ওঃ আজকের

দিনে সব্বাই সবাইকে পেটায়। আমরা হারালাম...এবারে আমরা সবই হারালাম।" "আমরা আর সে যুগে ফিরতে পারব না।"

টেবিলের ওদিক থেকে মন্তব্য এল—"যখনি লম্বা ডোরা দেখেছি তখনি বুঝেছি যে এটা একটা জেব্রা।"

"লোকটা বড় বেশি পড়ে। সাদা ডাক্তারেরা বলে যে ওর মগজ গেঁজে গেছে।"

"পৃথিবীতে বাজও নেমে এল।" আরেকটি প্রবাদ।

"তোমার বা আমার তো আর ইস্কুলে যাবার সুযোগ নেই। আমাদের বাচ্চাদের নিশ্চয় ইস্কুলে পাঠাব, আমাদের জন্যে ওরাই লিখবে-পড়বে।"..."তুমি কি শুনতে পাও না? ওরা বলে হতভাগ্য লোকেরা মরার আগে চিৎকার করে পালাতে চেষ্টা করে। লোকটা কাঁদে আর বলে—দেখো, একটা পাপের পাহাড় আমার পথ জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে—" "হ্যাঁ, বউ ওর বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে ছিল, আর ও বউকে বলছিল সিলোপ, আমার ছেলে রইল, তুমি তাকে দেখো। আর আমায় একটু জল দাও, হ্যাঁ, এই শেষবার, বলতে পার এই একবারই—জীবনে নিজের জন্যে তোমার কাছে কিছু চাইলাম।"

বয়স্ক মানুষের মুখ আর লম্বা কান-ওলা ছেলেটা আমাদের জানাল যে উকিলবাবুর ঘরে দুজন সাদা সাহেব গেছে। শুনেই চারিদিকে স্তব্ধতা নেমে এল। টেবিলের ওপাশের লোকটি বেশ কয়েকবার অভিবাদন করে ফেলল। বেড়ালটা সবুজ দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে গোঁফ নেড়ে ধমকে দিল। মাছিটা নিশ্চয় তার বেরুবার পথ খুঁজে পেয়েছে। তাপমাত্রা যেন ক্রমেই অসহ্য হয়ে উঠল।

"বলুন কতবার আমি এখানে এলাম"—না, নির্দিষ্ট কাউকে নয় সাধারণভাবে কথাটি বলল বুড়ি মানুষটি।" এখন তো আমার নাতিরা না খেয়ে মরতে বসেছে। আদালতের নির্দেশে আমার দেহের থেকে বিচ্ছিন্ন হবার পর ওদের অপদার্থ বাপ একটি আধলাও দেয় নি।" সে চুপ করতে স্তব্ধতা আরও বাড়ল। কজন লোক বুড়ির দিকে এগিয়ে গেল, ঠিক যেমন পাখিরা কোন প্যাঁচার দিকে ধেয়ে যায়। অল্প কজন নিজেদের মধ্যে বলাবলি করছিল যে সেকথাগুলি তারা শুনছিল তা যেন কেউ শুনতে পায়নি এমনি ভাব করছিল। "এ বুড়িমা কোত্থেকে এল?" বুড়ির পাশে বসা লোকটি শুধোলো। সে একবার প্রশ্ন করা শুরু করলে প্রশ্নের ঝাঁক আসতে থাকবে যতক্ষণ না বুড়ি হাল ছেড়ে দেয়।

এভাবেই লোকেরা ঝামেলা মেটানোর কাজে লেগে গেল। আর আমি ততক্ষণে আমার বিষয়গুলি মাথার মধ্যে ঠিকঠাকভাবে সাজিয়ে ফেললাম। কল্পনায় বহুবার দেখতে পেলাম যে উকিলবাবুটির সামনে আমি বসে আছি। উকিলবাবুটিব ছোটখাট চেহারা, তাঁর চোখ দুটি ক্লান্তিতে জড়ানো (কেন জানিনা উকিলবাবুদের ছোটখাট চেহারাটাই আমার কল্পনায় ধরা পড়ে)। আমার সব কথা তাকে বলে ফেললাম। এখন, আমি যে এই প্রতীক্ষালয়ে বসে আছি, আমি জেনে গেছি যে আমার আর চিন্তা নেই, আমার সব বোঝা

নামিয়ে ফেলেছি। উকিলবাবুর দেখা পেয়েছি, তার সঙ্গে কথা হয়েছে, ব্যস। আমি নিশ্চিত। আর অন্য কিছু ঘটতে পারে না।

এখনও কিছু কিছু কথা হচ্ছে। বোকচন্দর! আমি ভাবলাম। তাদের অন্তরে পুরনো ক্ষতে হুল ফোটানোর তীব্র যন্ত্রণা জমাট বাঁধছিল (আমার মতই)। উকিলবাবুর সঙ্গে দেখা করে তাদের বিপত্তির কথা তাকে জানাতে তারা উৎসুক ছিল। অথচ ওরা এখানে এমন ভান করছে যেন ওদের কোনও উদ্বেগ নেই। তারা এই তাপপ্রবাহকে ভেঙে ফেলার চেষ্টায় ফালতু কথার বান ডাকাচ্ছিল। যে সব বিষয় তাদের আদৌ নয়, সে বিষয়ে তারা বকবক করছিল শুধুমাত্র তাদের নিজেদের সমস্যার ঘূর্ণিস্রোত এড়াতে। এই তাপ প্রবাহে যে ঘূর্ণি বা বদ্বুদগুলো নাচছে কি ফাটছে তাদের নিচে কী আছে? অন্য কারো অধিকার? আইনের অস্বীকার, অবিশ্বাস নাকি নিষিদ্ধ বৃক্ষ? আর টেবিলের ওধারের লোকটি, ওর কী অধিকার আছে এই প্রবাদবাক্য আওড়াবার? লোকটা মানুষের ভাষার মত প্রাচীন এবং রঙ-চটা বাদামি যা এখন নোংরা সাদার মত দেখাচ্ছে এমনি একটি সার্ট পরা। ওর কী অধিকার আছে অমন মিটিমিটি হাসবার? দোকানদার যেভাবে খদ্দেরদের দেখে সেভাবে আমাদের দেখছে ও। ডাক হচ্ছে...পরের জন...পরের জন... তারপরের জন...

এখন পড়ে রইলাম আমি আর ওই লোকটি, আর সেই বিড়ালটি। আমার হৃদপিণ্ডে বিশাল ঘা লাগল যখন আমার মনে পড়ল কি কারণে আমায় উকিলবাবুর কাছে আসতে হয়েছে। আমার বন্ধু গভীর বিশ্বাস নিয়ে বলেছিল, একজন উকিলকে ব্যাপারটা দিয়ে দাও। বিদ্যুতের স্যুইচ টেপার কাজটুকু আমায় করতে হবে। আমার সব পাঁক মুছে বেরিয়ে আসতে উকিলবাবু সাহায্য করবেন। চাই শুধু একজন ভাল উকিলবাবু। যত কঠিন বিষয় হোক না কেন, তাঁকে দিলে তিনি তোমায় মুক্ত করবেন।...হ্যাঁ আমি তাকে আমার সব কথাই বলব যা আমায় নিদ্রায় জাগরণে যন্ত্রণা দিচ্ছে। তা হলেই ফের সব ঠিক হয়ে যাবে। আমি মনে করছি সব ঠিক হয়ে যাবে।

"উকিলবাবু আজ বড়ই ব্যস্ত, কী বলেন?" টেবিলের ওধার থেকে লোকটি বলল।

"হ্যাঁ," আমার জবাব অনেকটা যান্ত্রিক হল।

ঘরের পুরনো ছবিতে ফের আমার মন ফিরে এল। সাদামাঠা ঘর, পুরনো চেয়ার, ইস্কুলে ব্যবহারের ভূগোলক। চিঠি-খামের স্তূপ, লোকটা আর ছবির বেড়ালটা।

মেঝেতে একটা খাম পড়েছিল। সেই খাম তোলবার জন্য লোকটা একটু ঝুঁকল। আমি লক্ষ করলাম লোকটা তার লম্বা হাত দুটো নামাল। এলোমেলোভাবে হাতড়ালো। তারপরে হাতখানা খামটার ওপবে ঠিক রাখল। কিন্তু যতখানি জোরে রাখা দরকার তার চেয়ে অনেক বেশি জোরে বাখতে হল। এমনকি চেয়ারে সে পূর্বাবস্থায় ফিরে আসা পর্যন্ত, আমি সবটাই স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলাম। টেবিলের ওপারে বসা লোকটা অন্ধ, নিরেট অন্ধ। এমন এক গোলমেলে অবস্থার মধ্যে আমার মনটা ঢুকে পড়ায় সব খুঁটিনাটি জিনিসও আমার নজরে পড়ছিল। একজন লোক বসে বসে খামে আঠা জুড়ছে তাকে একটা পাতলা

কাগজের ছবির মত মনে হচ্ছিল—এর কোনো গভীরতা নেই, ঠিক যেন গ্রামোফোন ডিস্ক। এত পাতলা যে এই তীব্র তাপও তাকে বাধা দিতে পারবে না। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে একই কাজ করা একঘেয়েমি—তা অনেক লোক এল কি সামান্য কজন এল, কিছুতেই তার কিছু হয় না। তবে ঐ অপরাজেয় জুটি সে আর তার দিকে একদৃষ্টিতে চেয়ে থাকা বেড়াল, যে আমাদের লজ্জা-আমার হৃদয়বেগ উপেক্ষা করে মনে হচ্ছে আশু অতীন্দ্রিয় ও দূর যন্ত্রণায় না দেখা চাবিকাঠিটি ধরে ফেলেছে।

আমি উকিলবাবুর কাছে গেলাম। আমি যেমন ভেবেছিলাম, দেখলাম তিনি ঠিক তেমনি ছোটখাট লোক, যার ক্লান্ত দুটি চোখ কিন্তু নির্ভীক মুখশ্রী। আমি তাঁকে আনুপূর্বিক সব কথা বলে ফেললাম।

ভাষান্তর : অশোককুমার মিত্র

এক গ্লাস মদ

অ্যালেক্স লা গুমা

সেই সন্ধ্যেতে আমরা মা স্রাইক্কারের ওখানে সামনের ঘরে বসে আছি এমন সময় দরজা খুলে ঐ ছেলেটা ঢুকলো। লম্বা তরুণ, বিলিয়ার্ড স্টিকের মত ছিপছিপে, মাথায় লালচে সোনালী চুলের চুড়ো, গায়ের রঙ গোলাপী ফর্সা। দেখে মনে হচ্ছিলো সিনেমায় যে সব ছোকরাদের দেখায় তাদের মত দারুণ দেখতে ছেলেটাকে।

আর্থার ছেলেটিকে হেসে ডাকলো। আমিও হাসলাম ওকে দেখে আর ও ও আমাদের দিকে তাকিয়ে হাসলো।

আমরা মা স্রাইক্কারের ওখানে কিছুক্ষণ সময় নিয়ে বসে ওয়াইন খেলাম কারণ ঐ সন্ধ্যেয় কোথাও যাবার ছিল না, তাছাড়া গাঁটের থেকে ছয় পেন্স খরচা করে বোতলের দাম দিতে হয়েছিল। মা স্রাইক্কার ঠিকঠাক পয়সা পেলে খদ্দেরদের মদ খেতে সময় লাগলেও খিচখিচ্ করত না।

ও ছিল কালো, মোটাসোটা, হাসিখুশি আব সবাইকেও হাসি দিয়ে আপ্যায়ন করত, খদ্দের হলে তো কোন কথাই নেই। যদিও আমি ভাবতাম যে ওর এই হাসিখুশি ভাবটা বিক্রিবাটা বাড়াবার জন্য রাখা, কারণ কোনো কোনো সময় ও এত হীন হয়ে যেত।

আর্থার ছেলেটিকে জিজ্ঞাসা করলো—কেমন চলছে রে। ও মদ খেয়ে সামান্য মাতাল আর আরও খোলামেলা হয়ে গেছিলো।

ছেলেটি লাজুকভাবে উত্তর দিল—আমি ভালোই আছি।

আর্থার হাসতে হাসতে বললো—বোস্, বোস না। ছেলেটা বসে চাবদিকে তাকিয়ে দেখলো। অনেকবারই এখানে এসেছে, তাও ছোকরা এমনভাবে চারদিকে তাকিয়ে দেখছিল যেন ওর কিছু হাবিয়ে গেছে।

দেওয়ালে কিছু পুরনো ছবি ছিল, একটা পুরনো জাহাজের আর আরেকটা খবরের কাগজ থেকে কাটা উইণ্ডসরের ডিউক ও ডাচেসের ছবি, কালো ফ্রেমে সাঁটা আরেকটা এমব্রয়ডারী করা পাহাড়ী কুটির, প্রজাপতি, বাগান ভর্তি ফুলের ছবি নীচে লেখা—সুখী গৃহকোণ। একটা ডিমালো ছবি ছিলো একজন সাদা কোট পাদ্রীদের মত কলার পবা বৃদ্ধের যাকে মা স্রাইক্কাব আব অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহের ছবি বলে দাবী করে থাকে।

কিন্তু আমরা বুঝতেই পারছিলাম ছেলেটার ছবিতে মন নেই। ও এসেছিলো মা স্রাইক্কারের কোনো একটা মেয়েকে দেখতে, যেভাবে চারদিকে তাকাচ্ছিল তাতেই ওর অপ্রস্তুতভাব আরও ফুটে উঠেছিল।

আর্থার বললো—ভায়া। এক গ্লাস ওয়াইন খা। বোতলটা আলোর দিকে তুলে বললো —এখনও একফোঁটা আছে এখানে।

ছেলেটা বললো—ছেড়ে দাও, অত ভাবতে হবে না।

আর্থার বললো—ধ্যুৎ, আমাদের কাছে পয়সা আছে। আরেক বোতল কিনবো আমরা।

আমাকে জিজ্ঞেস করলো—তাই না ভায়া?

'তাই-ই তো'

'সেক্ষেত্রে আমি বোতল থেকে শেষ ফোঁটাটাও খাব।

ও লাল ওয়াইনটা গ্লাসে ঢাললো, টুপ করে পড়লো ফোঁটাটা, ইলেকট্রিকের আলোয় স্বচ্ছ আর ঘন লাল দেকাচ্ছিলো ওটা।

লালের কোন জবাব নেই—আর্থার বলে চলে—জেরিপিকো। সাদাটাও ভালো, কিন্তু লালটা লা-জবাব। ছেলেটার দিকে তাকিয়ে হেসে আমাকে চোখ মটকায়। 'ও এসেছে মেয়েটাকে দেখতে, ঐ যে কোঁকড়াচুলো ছোট্টটা।' ছেলেটা লাল হয়ে যায় লজ্জায়, মুখটা গোলাপী, অপ্রস্তুত হয়ে চোখটা নামিয়ে ফেলে।

আমি আর্থারকে বললাম—ওকে ছেড়ে দাও।

আর্থার জড়িয়ে জড়িয়ে বললো—ছেলেটা মেয়েটাকে বড্ডো পছন্দ করে।

আমি ছেলেটিকে চোখ মটকিয়ে আর্থারকে বললাম—ছেড়ে দাও তো ওকে, আরেকটা বোতল বল।

আর্থার হাসতে হাসতে দরজার দিকে ফিরে বাড়ির পিছনদিকে হেঁকে বললো—মা, আরেক বোতল লাল, তাড়াতাড়ি আরেক বোতল লাল ওয়াইন।

শুনেছি শুনেছি—পিছন থেকে মহিলা বললো—আমি কি কালা নাকি? না না—আর্থার বললো—কে বলেছে তুমি কালা? কিন্তু আরেক বোতল মদ পাঠাও তো ঐ মেয়েটাকে দিয়ে। এই ছোকরা ওকে দেখার জন্য অস্থির হয়ে গেছে। ও বেশ চালাকচতুর ছেলে, আমার ভালো লাগে ওকে, মা স্রাইক্কার চেঁচালো—হায় ভগবান! সেক্ষেত্রে ওর সঙ্গে সোহাগ করগে, আমি বাধা দিচ্ছি না।

আর্থার মনমরা হয়ে মাথা নেড়ে আমাকে বললো—'দেখলে? দেখ কাণ্ডটা একবার।' ছেলেটার দিকে তাকিয়ে হেসে বললো—'ভয় পেয়ো না, তোমার সঙ্গে সোহাগ করতে যাচ্ছি না।'

আমার কাঁধে এক চাপড় মারলো, একটু পরেই মা স্রাইক্কার এসে ঢুকলো। আমি দেখলাম ছেলেটা মুখ তুলে তাকিয়ে হতাশ হলো।

শার্লেট কোথায়—আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

ও ভাঁড়ার থেকে মদ আনতে গেছে—মা জিজ্ঞাসা করল—কেন, তুমিও কি ওব সঙ্গে আশনাই শুরু করলে নাকি?

ওর মেয়েছেলে ভালো লাগে না—আর্থার মাকে বললো হেসে—ভায়া আমার মেয়ে

পছন্দ করেন না। বছর বিয়াল্লিশের এক বিধবা ওকে বিয়ের জন্য ঝুলোঝুলি করেছিল, কিন্তু ও তাকে বোকার মত ফিরিয়ে দিয়েছে। হাঁদা এমন।

হাসতে হাসতে ও আমার কাঁধে থাপ্পড় মারতে লাগলো ও হেঁচকি তুলতে তুলতে বললো, 'আমাকে মাপ কর, প্লিজ, মাপ কর আমাকে।' উঠে একবার অভিবাদন করার চেষ্টা করে আবার ধপাস করে বসে পড়লো সে।

মা স্রাইক্কার বললো—আজব এক মজার মানুষ বটে।

আর্থার হেসে বললো—চার্লস চ্যাপলিন।

ঠিক তক্ষুনি মেয়েটা এল ট্রেতে লাল মদের বোতল সাজিয়ে আর আর্থার বললো —এই তো সে, এসে পড়েছে। তোমার নাগর বসে আছে তোমার পথ চেয়ে।

মেয়েটার দিকে তাকিয়ে দেখলাম ওর নরম গাল লজ্জায় লাল হয়ে গেল। ওর গায়ের রং মদের মত, গাঢ় বাদামী চোখ, উজ্জ্বল নরম, ডিমালো মুখখানা কুচকুচে কালো কোঁকড়া চুলে ঘেরা। ও লজ্জা পাবার সঙ্গে সঙ্গে নরম ভরাট ঠোঁটজোড়াও মৃদু মৃদু হেসে উঠলো। ও না তাকালেও বুঝলো ছেলেটি আছে সেখানে আর ছেলেটার দিকে তাকিয়ে আমি দেখলাম ওর মুখে প্রবল রক্তোচ্ছ্বাস, মেয়েটিকে দেখে ও চোখ নামিয়ে নিল। মেয়েটা ট্রেটা টেবিলে রেখে ঘুরে দাঁড়ালো। আর্থার হেসে বললো—না না কোথায় যাচ্ছ? ছোকরা এখানে আছে আর তুমি কিনা—বস এখানে। মেয়েটা লজ্জায় ফের লাল হয়ে উঠলো, ঘরের এদিক ওদিক চাইতে লাগলো, কিন্তু ভুলেও ঐ ছেলেটার দিকে তাকালো না।

আমি বললাম—কি শার্লেট?

ও আমার দিকে তাকিয়ে লাজুকভাবে অভিবাদন করলো। দেখ দেখ। আর্থার ত্যাঁদড়ের মত বললো—কিরকম লজ্জা পাচ্ছে দেখ দুজন?

ও কিছুটা মদ গ্লাসে ঢাললো, একটু একটু হাত কাঁপছিলো, তারপর বোতলটা আমার দিকে চালান করে বললো—ওরা খুব সুন্দর লজ্জা পেয়ে যায়—তাই না?

মা স্রাইক্কার হেসে বললো—'এটাই প্রেম'। হাসির দমকে গোটা শরীর কেঁপে উঠলো। তার—প্রেম! ঠিক যেন বাইস্কোপ!

আর্থার গ্লাস তুলে ছেলেটা আর মেয়েটার উদ্দেশ্যে বললো—বর ও কনের জন্য। তোমাদের যেন কম ঝামেলা পোয়াতে হয়।

আবার হেসে সে ছেলেটার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখল ও আহত হয়েছে আর মেয়েটা অন্যদিকে তাকিয়ে আছে। আমি কিছু বলতে যাচ্ছিলাম কিন্তু আর্থার বাধা দিয়ে বললো—এই রকম প্রেম, লজ্জায় লাল হয়ে যাওয়া, এইসব যখন চলছে এদের দুজনের নিশ্চয়ই বিয়ে করা উচিত। আবার খানিকটা মদ খেল সে, খাবিও খেল একটু তারপর চেটোর উল্টোদিক দিয়ে মুখ মুছে নিল।

মেয়েটা বললো—'চুপ কর'। ছেলেটা কঠোরভাবে তাকালো আর্থারের দিকে।

কি চুপপ্ ক-র-বো?—আর্থার বললো ফাঁকা আওয়াজে—বিয়ে বন্ধ করব? বিয়েটা হতেই হবে। সে উঠে দাঁড়ালো এমনভাবে যেন বিয়ের প্রস্তাব উপলক্ষে মদ্যপান করতে যাচ্ছে, কিন্তু পা টলমল করে ফের বসে পড়লো।

আমি বললাম—ছাড়ো ছাড়ো, তাড়াতাড়ি শেষ করে হাওয়া হয়ে যাই।

ও ভড়কিয়ে গিয়ে বললো—কেন বাবা? কি হলো আবার?

মেয়েটা বললো—ও ঠিকই আছে।

আর্থার বললো—হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি ঠিকই আছি। একপায়ে দাঁড়িয়েও থাকতে পারব। দেখতে চাও তোমরা?

পড়ে যাবে এক্ষুনি আর আসবাবপত্রগুলো ভাঙবে, মায়ের সুন্দর সুন্দর ফুলদানিগুলো সব।

মা বললো—হ্যাঁ, খবরদার। আমার ভানগুলোর কথা মনে রাখবে। সবগুলো দামী দামী উপহার আমার।

আর্থার মনমরা হয়ে বললো—ঠিক আছে! চল আরেক গ্লাস করে খাওয়া যাক।

আমি আবার দু-পাত্তর ঢাললাম। ছেলেটার দিকে তাকিয়ে হেসে বললাম—ওকে নিয়ে চিন্তা করো না। একটু বেশি চড়িয়েছে।

ছেলেটা বললো—ঠিক আছে। ও মেয়েটার দিকে তাকিয়ে ওর বাহুতে হাত রাখলো আস্তে, মেয়েটা চকিতে ওর দিকে তাকিয়ে ছোট্ট একটা বাঁকাহাসি হাসলো। কিন্তু কিছু একটা গণ্ডগোল হচ্ছিলো, সব কিছু ঠিক্ঠাক আগের মত যেন ছিলো না।

আর্থার ওর গ্লাসটা শেষ করে ফের হেঁচকি তুলে বিষাদগ্রস্ত ভাবে বললো—মরুক গে। আমি চাইছিলাম ওরা যেন বিয়ে করে নেয়। এরপরেই মেয়েটা আবার উঁচু পেট নিয়ে ঘুরবে।

ছেলেটার মুখে ফের সেই আহত দৃষ্টি দেখা গেলো। আর শার্লেট, সেই মেয়েটা উঠে ঝাঁঝিয়ে বললো—'বন্ধ কর, এসব। কেন বক্বক্ করছো সমানে, থামতে চাইছো না। এমনভাবে তাকাল সে যেন এক্ষুনি কেঁদে ফেলবে। আর্থার কোনোমতে ঠিকঠাক উঠে দাঁড়িয়ে অবাক হয়ে তাকিয়ে বললো—আমি কি করলাম? কিই বা এমন বললাম?

আমি ওর কাঁধের তলায় হাত রেখে বললাম—আমার মনে হয় এবার কাটা উচিত।

মা স্রাইক্কার বললো—হ্যাঁ হ্যাঁ যথেষ্ট হয়েছে। ওকে এবার বাড়ি পৌঁছে দাও। আর্থার বললো—মোটেই আমি এমন কিছু মাতাল হইনি। আরেকটু চালাব এখন।

মা স্রাইক্কার বললো—না হে, এখন যাও তুমি।

আর্থার ওকে বললো, তুমি আমাকে তাড়িয়ে দিচ্ছ। ঠিক্ আছে।

মা আর আমার দিকে তাকিয়ে কাঁধ ঝাঁকিয়ে যথেষ্ট মর্যাদাপূর্ণভাবে বললো—আমি আর কখনো আসছি না এখানে। তুমি একজন খদ্দের-একজন ভালো খদ্দের হারালে। ওকে যদিও ভাঁড়ের মত লাগছিলো, তবুও আমি হাসিনি।

আমি মায়ের কথামতো ওকে দরজার কাছে নিয়ে গেলাম। বেরোনোর আগে আমি ছেলেটি আর মেয়েটিকে বললাম—'ওর কথায় কিছু মনো করো না তোমরা। একটু বেশি খেয়ে নিয়েছে আজ।'

মেয়েটা আমার দিকে না তাকিয়ে বললো—ঠিক আছে, ঠিক আছে। আমরা বাইরে বেরিয়ে টেনে টেনে হাঁটতে লাগলাম, আর আর্থার আমার উপর ভর দিয়ে এলিয়ে রইলো। মা দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে রইলো, মোটা ঢ্যাপস শরীর নিয়ে—ওকে সোজা বাড়ি নিয়ে যাও। আর যেন ঝামেলা না করে।

· আমি ওকে বাড়ি নিয়েই যাচ্ছি। ওর এত কিছু নেশা হয়নি।

আর্থার বললো—ছাড় দেখি আমাকে, তুমি আমাকে বইতে পারবে নাকি? আমি হাঁটতে পারব।

আমি মাকে শুভরাত্রি জানালাম, সে একটু এগিয়ে এসে তারপর দরজা বন্ধ করে দিলো।

আর্থারকে জিজ্ঞাসা করলাম—ঠিক আছে তো সব?

হ্যাঁ হ্যাঁ, কি আবার হবে?

চল তাহলে।

ও ঘ্যান ঘ্যান করলো—কি, ব্যাপারটা কি? ওরা এত ফাজলামি করার মত কি পেল?

তুমি আর তোমার বিয়ে—আমি রাস্তায় পৌঁছে বললাম—তুমি জানই তো সাদা ছেলেটা ঐ মেয়েটাকে যতই ভালোবাসুক, ওকে বিয়ে করতে পারে না। এটা কেউই মেনে নেবে না।

হায় ভগবান—আর্থার বললো অন্ধকারে—কি জঘন্য নরক।

ভাষান্তর : অর্পিতা বন্দ্যোপাধ্যায়

ছাড়পত্র

রোনাণ্ড উইলিয়ামস

বিছানায় পাশ ফিরতেই মাসিজা কাঁধে ব্যথা অনুভব করল। সারা সপ্তাহের হাড়-ভাঙা খাটুনির পর প্রতি রোববার সকালেই এরকম হয়ে থাকে। এর কোন মানে খুঁজে পায় না সে। গোটাকতক টাকার জন্য একটা মানুষ সপ্তাহের ছ-ছটা দিন ক্রীতদাসের মত খাটবে, তারপর একদিনের বিশ্রাম এবং তারপর আবার ঘানিটানা—দিনের পর দিন, বছরের পর বছর।

এই ভাবনাগুলো তার মনকে ভারি করে রাখে হামেশাই, কিন্তু আজকের সকালে এইসঙ্গে একটু প্রত্যাশার খুশির উত্তেজনা মিশে ছিল। ভাগ্যটা ভালোর দিকে গড়াতে চলেছে, কেননা, গত বিষুৎবার মাসিজার আলাপ হয়েছে রেবেকার সঙ্গে।

এতদিন মাসিজা মেয়েদের নিয়ে মাথা ঘামাত না মোটেই বিশেষ করে এ শহরে আসার পর থেকে। কিন্তু রেবেকা একেবারেই আলাদা। সে শহুরে মেয়ে নয় মোটেই। সে এসেছে দূরের গ্রাম থেকে, তার গ্রাম মাসিজাদের কাছেই। শহুরে হালচাল মেয়েটি এখনো রপ্ত করে উঠতে পারে নি। মাসিজা এটা খেয়াল করেছে তার পোষাকের সরলতায় তার সোজাসুজি সহজ কথাবার্তার ধরনে তার স্পষ্ট চাউনি অথচ স্বাভাবিক লাজুক ভাব থেকে। তার সঙ্গে দেখা হলে মাসিজা নিজেকে বেশ ঘরোয়া বোধ করে। দেখা হওয়াটাই অবশ্য ছিল আশ্চর্যের এবং মেয়েটি 'দেশের ছেলের' সঙ্গে আলাপের আনন্দে তাকে এ রোববার নেমন্তন্নই করে ফেলেছে নিজের কাজের বাড়িতে কেননা তার মালিক নাকি বাড়ি থাকবেন না সারা দিনটাই।

খুব খুশির সঙ্গে এ নেমন্তন্নটা গ্রহণ করেছে মাসিজা। নিজের গ্রাম থেকে এত দূরে বাস করেও কোন মানুষের ভাগ্য এমন ভালো হয়। তিন তিনটি বছর তার কেপ টাউনে কেটেছে কোন মেয়ের সঙ্গ ছাড়া, আর আজ তার আলাপ হয়েছে নিজের এলাকার একটা মেয়ের সঙ্গে যে কিনা নিপাট খাঁটি।

সে মাথা তুলল, তাকাল ঘরের চারদিকে। ফণ্ডির বিছানাটা এখনো ভালো করে শুরু হয় নি সকাল, কাজেই রুম মেটের একসময় বিছানা ছাড়ার কারণই নেই কোন, শুধু যদি না সে ম্যাসিকে পৌঁছে দিতে গিয়ে থাকে বাসস্টপে কারণ মেয়েটিকে নিজেব কর্মস্থলে পৌঁছতে হয় সকাল আটটার মধ্যে। ফণ্ডিদের মত মানুষগুলো বেচারা, ভাবল মাসিজা। ব্যাচেলারদের ডেরায় মেয়েগুলিকে আনতে হয় চোবাই চালানের মত করে বেশ গভীব রাতে, আবার তাদের বার করে দেয় কাকডাকা ভোরে, কেয়ার টেকাররা

এখন অচেতন গাঢ় ঘুমে নতুবা তাদের ভালই গুণাগার দিতে হয় এজন্য। ফণ্ডি অবশ্য হলফ করে বলে এসব গুণাগারের মধ্যে নেই সে, অপর কেউ তার রক্ত চুষে খাবে এটা মানা সম্ভব নয় তার কিছুতেই।

ফণ্ডি যখন ঘরে ঢুকল মাসিজা তখন তার সবচাইতে চকচকে ও চওড়া টাইতাতে গিঁট বাঁধছিল। মাসিজার সাজগোজ দেখে অবাক হয়ে গেল ফণ্ডি।

'কি ব্যাপার আজ?' জিজ্ঞাসা করল সে, 'নিশ্চয়ই বলবি না, গির্জায় যাচ্ছিস তুই অবিশ্যি তুই খ্রিস্টান আদৌ হয়েছিস কি?'

মাসিজা নিজের পালিশ করা জুতোর দিকে তাকাল একবার। কোন জবাব দেবার আগে তাঁর থেকে টোকা মেরে একটু নোংরা সরাল সে, তারপর বলল্ 'আমি সী পয়েন্ট যাচ্ছি।'

বিস্মিত হয়ে তাকাল ফণ্ডি, তারপর তার সারা মুখ ভরে গেল হাসিতে, 'কোন্ আত্মীয়ের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছিস। নাকি কোন চাকরি খুঁজতে বাড়ির চাকর না মালি?' সে ফেটে পড়ল অট্টহাস্যে :

'আরে যা যা, যতই ঠাট্টা করিস তোদের মত ছোকরারা ব্যোমকে যাবি শুনলে', উত্তর দিল মাসিজা, 'আমি দেখা করতে যাচ্ছি একটা মেয়ের সঙ্গে, তোদের ওই হরদম ধোঁয়া-ফোঁকা মদটানা মেয়েগুলোর মত নয়। খাঁটি এক গাঁয়ের মেয়ের কথা বলছি আমি। আরো শুনে রাখ, আলাদা একটা চাকরানি ঘর আছে তার! আর হয়ত ঘরভাড়া গুণতে হবে না আমাকে অথবা খাবার কিনতে হবে না যদ্দিন চাকরি আছে তার...।

'বদলে ত বাগানের কাজ করতে হবে তোকে, কিংবা ধুতে হবে মালিকের গাড়ি, আরো সব হাবিজাবি কাজ,' মাথা নেড়ে বলল ফণ্ডি, 'আমি হলে কিন্তু এমনটা করতাম না।'

'আরে তুই যা করিস, তার চাইতে এটা অনেক ভালো। তুই আর তোর ম্যাসি একদিন ধরা পড়লি বলে, বলল মাসিজা।

এভাবে কথা বলতে বলতে মাসিজা পরে ফেলল তার সেরা স্যুট এবং ফণ্ডি তার সাদামাটা পোষাক, কেননা ফণ্ডি অনেক হুঁশিয়ার। প্রচুর মদ টনতে হবে জানলে কখনো ভালো পোষাক পরে না সে। জলদি চলেও গেল ফণ্ডি।

মাসিজার বিশ্বাসই হচ্ছিল না মেঝের উপর পড়ে থাকা নোংরা পোষাকগুলো পরে ছিল সে। উজ্জ্বল নীল যে স্যুটটা সে পরে আছে এখন সেটা তার নিজের মধ্যে এনে দিচ্ছে এত আশ্চর্য সৌষ্ঠব। মনে মনে সিধান্ত করল ওই পড়ে থাকা পোষাকের নোংরা পকেট থেকে কোন কিছু বার করে এ স্যুটটাকে দূষিত করবে না সে। এমনকী থার্ড ক্লাসের মান্থলি টিকিটটাও ব্যবহার করবে না আজ। এ দিনটা সেকেণ্ড ক্লাসের জন্য বরাদ্দ।

চনমনে ভাবে মাসিজা চলল স্টেশনের দিকে, মাথা উঁচু করে। সারাটা পথ পিচ্ বাঁধানো রাস্তায় হেঁটে গেল সে, বালি-ভরা পাশের হাঁটাপথ এড়িয়ে। সকলকে সম্ভাষণ জানাতে জানাতে চলল, এমনকী যাদের চেনে না তাদেরও। মাসিজা আজ সুখী। যাই

হোক না কেন জীবনটা খুব খারাপ কিছু নয়। কষ্টের ক্ষতিপূরণ পাওয়া যায় তাহলে। মানুষকে শুধু প্রতীক্ষা করতে হয় কখন আসবে তার পালা। অবশ্য ভালো ভালো খাবারের কথাও ভাবছিল সে, কেননা সকালে না খেয়েই বেরিয়ে পড়তে হয়েছে তাকে। তাই, শুধু ভাবছিল কখন খেতে পারবে সেই সাদা মানুষটার খাবারগুলো।

তর তর করে সে হেঁটে গেল কেপ টাউন স্টেশন থেকে বাস-স্টপে। কয়েক মিনিটের মধ্যেই তাকে দেখা গেল সী-পয়েন্ট যাবার বাসের দোতলায়। পথের নিশানাটাও ছিল সহজ। বিশ নম্বব বাস স্টপে নামতে হবে তাকে, মাউন্ট স্ট্রীট দিয়ে এগোতে হবে, ডানদিকের তৃতীয় দরজা এবং তার পরেই সে পেয়ে যাবে প্রতীক্ষারত তার গাঁয়ের মেয়েটিকে। নিজের সিটে বসে ছটফট করছিল মাসিজা অধীর হয়ে। বাসটা এত আস্তে চলছে কেন? থামছে হামেশাই! তার মনে হচ্ছিল অতি সহজেই সে এক ছুটে ছাড়িয়ে যেতে পারে বাসটাকে।

কণ্ডাক্টর যেই চেঁচাল 'বিশ নম্বর বাস স্টপ' মাসিজা তার আগেই যেন লাফিয়ে পড়ল বাস থেকে।

বাস থেকে নেমেই সে দেখতে পেল দুজন আফ্রিকান বিপরীত দিকে হেঁটে যাচ্ছে খুব দ্রুতগতিতে। বেশ উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছিল তাদের। পিছু ফিরে তাকাচ্ছিল তারা দেখছিল নানাদিকে, যেন স্থির করতে পারছে না কোন্ পথটা ধরবে। মাসিজা দাঁড়াল, কৌতূহল নিয়ে তাদের দেখতে দেখতে টাইটা ঠিক করল। পাশ দিয়ে যাবার সময় তাদের একজন বলল তাকে 'ভুল দিনটা বাছলে দোস্ত, এখানকার হাওয়া আজ খারাপ।' কী বলতে চাইছে তারা একথা জিজ্ঞাসা করবার আগেই মোড় ঘুরে অদৃশ্য হল দুজন।

যাই বলতে চাক না তারা, কিছুই নষ্ট করতে পারবে না দিনটা। প্রেমের ব্যাপারে তার বন্ধুরা হরবকর ঠাট্টা করে তাকে, আজ তাদের মুখ বন্ধ দেবার সুযোগ এসেছে একটা।

একপা এগোতেই পুলিশের গাড়ি দেখা দিল। ছুটতে চাইল সে, তারপর সংবরণ করল নিজেকে। কিছুইত করিনি আমি, ভাবল সে। নিজেকে আশ্বস্ত করতে চাইল. যদিও তার জানা ছিল কোন আফ্রিকান কিছু করবে, তারপর তাকে থামিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য পুলিশ কখনো অপেক্ষা করে না।

'এই যে তুই, আয় এদিকে' গাড়িটা থামতেই পুলিশের একজন ডাকল তাকে। খুবই সরলভাবে মাসিজা ঘাড় ফিরিয়ে পেছনে তাকাল যেন পুলিশ ডাকছে সেখানকার কারুকে।

আরে তুই? অধৈর্য স্বর, জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে নিজের দিকে আঙুলের সংকেত কবল মাসিজা।

হ্যাঁ হ্যাঁ তুই, গর্জন করে উঠল ক্রুদ্ধ পুলিশ, বেরিয়ে এল গাডিব ভেতর থেকে আফ্রিকান ভাষায় কিড়মিড করে বলল কীসব।

'কোথায় যাচ্ছিস তুই?'

'এই ত এখানে সার এই সামনে' মাসিজা তার গন্তব্য নির্দেশ করে দেখাল, যত দ্রুত সম্ভব সেখানে পৌঁছবার উদ্বেগ প্রকাশ করল তাব।

'যত দিশি বেজম্মাগুলা সব জড় হয়েছে সী-পয়েণ্টে! কে তুই?'

'আমি—'

পুলিশ হাত বাড়াল। কী চাইছে সে তা জানার দরকার ছিল না মাসিজার। পাশের জন্য হাত ঢোকাল পকেটে। সেখানে নেই সেটা। সবগুলো পকেট তন্ন তন্ন করে খুঁজল মাসিজা। পরিচয়পত্র সম্বলিত সেই ছোট্ট ছাত্রপত্রটি ছিলনা কোথাও। আতঙ্কিত হল মাসিজা।

'পাশ নেই?' তার হাতের ডানা চেপে ধরল পুলিশ, হুকুম দিল সঙ্গে যেতে।

'দোহাই হুজুর আমি—'

'তোদের ছ্যাঁচড়ামি আর গুণ্ডামি আমরা বহুত দেখেছি। চলে আয়।'

তখন মনে পড়ল মাসিজার। ওই নোংরা পোষাকে যেগুলোকে ঘেন্না করছিল সে। তার মধ্যেই রয়ে গেছে পাশটা, সেই নোংরা পকেটে থার্ড ক্লাশ টিকিটের সঙ্গে সেই নোংরা রোমালটা যা দিয়ে সারা সপ্তাহ ধরে মুছেছে নিজের ঘাম। ঝপ করে বুঝতে পারল মাসিজা কোন ঘোর সংকটের মধ্যে পড়েছে সে। অনির্দিষ্ট কালের জন্য কয়েদ পরিণামে চাকরি থেকে ছাঁটাই তারপর আবার সেই দীর্ঘ অনিশ্চিত এবং হতাশা নিয়ে কাজ খোঁজা হয়ত বা বহিস্কার...

গাঁয়ের মেয়েটির কথা ভেবে আবার চেষ্টা চালাল সে, 'দোহাই হুজুর ওটা আছে আমার ঘরে, হুজুর'...কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই বোঝাই করা পুলিশের গাড়ির মধ্যে অস্বস্তিকর অবস্থায় নিক্ষিপ্ত হল সে। অচিরেই সে জানতে পেল কোন এক চাকরের ঘরে ছোরার আঘাতে একজন খুন হয়েছে বলে এলাকায় পুলিশের তল্লাশি চলছে। গাড়িটা এখন জোরে ছুটছে থানার দিকে গাঁয়ের মেয়েটির সঙ্গে একটি সুন্দর দিন কাটানোর সব আশা এখন মিলিয়ে যাচ্ছে। মাসিজা কল্পনা করল মেয়েটি যেন প্রতীক্ষা করছে তার জন্য তারপর হাল ছেড়ে দিয়ে সিদ্ধান্তে এল যে সত্যিই শহর মানুষকে করে তোলে কলুষিত, বিশ্বাসের অযোগ্য, এমনকী যদিও তাতে থাকে 'নিজেদের গাঁয়ের' ছোঁয়া।

খিদের জ্বালায় হাঁকপাক করছিল মাসিজার পাকস্থলী। তার মনে পড়ছিল নিজের ঘরে ফেলে-আসা অপির্শিত সেই টাটকা তাজা পাউরুটিটার কথা।

ভাষান্তর : বিষ্ণু বসু

বেন খুড়োর বাছাই

চিনুয়া আচিবি

উনিশ শো উনিশ সালে আমি ছিলাম উমুরুতে অবস্থিত নাইজার কোম্পানীর এক তরুণ কেরানী। সেকালের কেরানী এখনকার এক একজন মন্ত্রী। আমার মাইনে ছিল দু' পাউণ্ড দশ।

হাসতে পারো কিন্তু সেকালের দু পাউণ্ড দশ আজকের পঞ্চাশ পাউণ্ডের মতো। চার শিলিংয়ে তখন কিনতে পারতে আস্ত একখানা ছাগল। আমার মনে আছে সবচাইতে সিনিয়র আফ্রিকান ছিলেন একজন সারো মানুষ, মাইনে তার ছিল সামান্য বেশি। তাতেই আমাদের চোখে তিনি যেন ছিলেন গভর্ণর জেনারেল। সব প্রগতিশীল তরুণের মতোই আমি যোগ দিয়েছিলাম আফ্রিকান ক্লাবে। খেলতাম টেনিস আর বিলিয়ার্ড। প্রতি বছর ইরোপীয়ান ক্লাবের সঙ্গে আমাদের খেলা হত একটি টুর্নামেন্ট। অবিশ্যি আমি ওটা নিয়ে বেশি মাথা ঘামাতাম না। আমার পছন্দ ছিল শনিবারের নাচের আসর। মেয়ে ছিল ঢালাও। এখনকার শহরগুলোতে যেমন হেজিপেজি মেয়ে দেখ তেমন নয়, বেশ চমৎকার সব।

আমার ছিল একখানি র‍্যালে সাইকেল আনকোড়া নতুন, আর আমাকে সবাই ডাকত 'আমুদে বেন' বলে আমার চাহিদা ছিল গরম রুটির মতো। কিন্তু আমি বাবা একটা জিনিস খেয়াল রাখতাম—হাসতে পারি, মজা করতে পারি, মাল টানতে পারি, আর যা কিছু করি না কেন হুঁশ বজায় রাখতাম সব সময়ে। আমার বাবা বলতেন আমাদের দেশের সাচ্চা ছেলেকে জানতে হবে ঘুমোনোর সময়েও কেমন করে খোলা করতে হয় একখানা চোখ। একথা আমি কখনো ভুলি নি। তাই আমি খেলতাম হাসতাম সবার সঙ্গেই তারা চ্যাঁচাত 'আমুদে বেন' 'আমুদে বেন' বলে,—কিন্তু আমি জানতাম আমি কী করছি। উমুরুর মেয়েছেলেরা ছিল বেজায় ধারালো, তুমি ক শুনবার আগেই তারা খ শুনে বসে আছে। তাই আমাকে চলতে হত বেজায় রকম সমঝে। ওদের কোনোটাকে আমার বাড়ির রাস্তা দেখাই নি আমি, তাদের রান্না করা খাবার মুখে দিই নি কখনো পাছে প্রেমের ঝোল যায় মিশে। তখনকার দিনে অনেক তরুণদেরই দেখতাম তাদের সঙ্গে। তাই মনে রাখতাম বাবার কথাগুলো : হ্যাণ্ডসেককে কখনো কনুই ছাড়িয়ে যেতে দিয়ো না।

অবিশ্যি একজন ব্যতিক্রম ছিল, একটি সুন্দরী নোনাজল তরুণী, নাম তার মার্গারেট। এমনি একদিন রোববার সকালে নতুন গ্রামাফোনখানা চালাচ্ছিলাম—একখানা নতুন এইচ এম ভি গ্রামোফোন। (কোনো সেকেণ্ডহ্যাণ্ড জিনিসে আস্থা ছিল না আমার। নতুন কেনার মতো টাকা না থাকলে বরং নিজেকে সংযত রাখতাম।) রেকর্ড চালিয়ে দিয়ে জানালার কাছে দাঁড়িয়ে ছিলাম আমি। চমৎকার সব পোষাক পরে লোকজন আনাগোনা করছিল—আমার বাড়ির কাছের গির্জাটিতে। এই মার্গারেটও তাদের সঙ্গেই

যাচ্ছিল যখন সে দেখল আমাকে। এমনই কপাল তার চোখে পড়বার আগেই আমি লুকিয়ে পড়িনি তাই ঠিক সেই দিনই— কাল-পরশুর জন্য আর অপেক্ষা না করেই গির্জে বন্ধ হয়ে যেতে সে ফিরে এল। তার মতলব নাকি ছিল সে আমাকে বানাবে রোমান ক্যাথলিক অবাক কাণ্ডেরও শেষ নেই হায় মার্গারেট। আমি অবিশ্যি মার্গারেটকে নিয়ে কিছু বলতে চাই না, শুধু বলছি কেমন করে থামিয়েছিলাম এমন ধরনের বোকামি।

সেদিন ছিল নওরোজের সন্ধ্যা তোমরা তো জনোই নওরোজের সন্ধ্যাটা রোজগেরে মানুষরা কেমন করে কাটায়। ক্রিশমাসের সময় মাসকাবারের জন্য দম যায় ফুরিয়ে, কিন্তু নওরোজে সবারই পকেট ভারি। তাই সেদিন আমি গেলাম ক্লাবে।

তোমরা আজকালকার ছেলেরা যখন বলো তোমরা মাল টানো শুনে আমি হাসি। স্রেফ এক বোতল বীয়ার বা হুইস্কি গিলে ক্ষ্যাপাটে মানুষের ভঙ্গি করতে থাকো। সে রাতে আমি টানছিলাম 'হোয়াইট হর্স' মার্কা মাল।

একটা ব্যাপার—আমি কিন্তু মালে কিছু মেশাই না। সেদিন আমি হুইস্কি টানছিলাম কেননা সেদিনটা ছিল হুইস্কিরই দিন। কাল যদি আমার আবার বীয়ার টানার ইচ্ছে হয় তাহলে তখন কিন্তু অন্য কিছু ছুঁয়েও দেখব-না তা সে রাতে টানছিলাম 'হোয়াইট হর্স'। সামনে ছিল আস্তো একখানা রোষ্টচিকেন আর এক টিন গিনি গোল্ড। হ্যাঁ তখন আমি ফুঁকতামও। ফোঁকা বন্ধ করেছি একজন জর্মান ডাক্তার যখন বলল আমার হার্টটা নাকি রান্নার বাসনের মতো কালো হয়ে গেছে। ওই জর্মান ডাক্তারগুলো ভূতের মতো। তারা ইনজেকশন ফুড়ে দিত মাথায় পেটে বা যে কোনো জায়গায়। তোমার শুধু দেখাবার ওয়াস্তা ব্যথাটা কোন জায়গায় বসে তারা ঠিক ফুঁড়ে দেখে সেখানটা, সময় মোটে নষ্ট করত না তারা।

কী যেন বলছিলাম?...হ্যাঁ, হোয়াইট হর্স টানছিলাম, সামনে একখানি, চিকেন রোষ্ট...মাতাল? এ শব্দটা নেই আমার ডিকশনারীতে। জীবনে কখনো মাতাল হই নি আমি। বাবা বলতেন, মাতলামি, সারবেই যদি ডেঁটে বলতে পারো—না। টানতে যখন ইচ্ছে হত টানতাম, খতম বললেই খতম। তাই সেদিন রাত তিনটে নাগাদ নতুন র‍্যালে সাইকেলটাতে লাফিয়ে উঠলাম আমি, শান্তভাবে সোজা সাইকেলটাতে চলে গেলাম বাড়িতে ঘুমোবার জন্য। সেসময়ে আমাদের বড়বাবু ক্যালিকোর গাঁট চুরি করার দায়ে জেল খাটছিলেন, আমি বহাল ছিলাম তার জায়গায়। তাই তখন আমি থাকি কোম্পানীর দেওয়া একটি ছোট বাড়িতে। ওই যে এখন যেখানটাতে অলিভেন্ট কোম্পানী—হ্যাঁ, নাইজার নদীর ধারে। ওইখানটাতেই ছিল বাড়িখানা। এক ধারে দুখানা ছিল আমার ঘর, অন্যধারের ঘর দুখানা ছিল স্টোর কীপারের। কিন্তু কপাল জোরে সেদিন লোকটা ছিল ছুটিতে, তাই তার দিকটাও ছিল ফাঁকা।

সামনের দরজা খুলে ভেতরে গেলাম আমি। তারপর সেটা তালা লাগালাম। প্রথম ঘরে সাইকেল রেখে গেলাম শোবার ঘরে। ক্লান্ত ছিলাম এমনই যে আলোর খোঁজ করলাম না আর। পোষাক খুলে রাখলাম চেয়ারের হাতলে, তারপর বিশাল লোহার খাটটাতে একখণ্ড কাঠের মতো পড়লাম ঝাঁপিয়ে। এবং পড়লাম একজন কারুর ওপরে। সঙ্গে

সঙ্গে আমার মন বলল—এটা মার্গারেট। তাই আমি হাসতে লাগলাম আর তাকে ছুঁতে লাগলাম এখানে-সেখানে। সে ছিল পুরোপুরি ন্যাংটো। আমি হেসেই চললাম, জিজ্ঞাসা করলাম—কখন এসেছে সে। কিছুই বলল না। সন্দেহ হল সে বুঝি বিরক্ত হয়েছে, আমার উপর। কেননা সেদিন তাকে ক্লাবে নিয়ে যাবার জন্য বলেছিল আমাকে, আমি তাকে সোজা বলে দিয়েছিলাম না। বলেছিলাম যদি ক্লাবে যাও দেখা হবে, এভাবে কারুকে ক্লাবে নিয়ে যাই না আমি। সন্দেহ হল; এজন্যই সে বিরক্ত হয়ে আছে।

বিরক্ত না হবার জন্য বললাম তাকে, তবু কোনো কথাই বলল না সে। জিজ্ঞাসা করলাম, ঘুমোচ্ছিল নাকি সে শুধু বলার জন্যই বলা। সে কিছুই বলল না। তোমাদের অবিশ্যি বলেছি—মেয়েরা কেউ বাড়িতে আসুক চাইতাম না আমি, কিন্তু সব নিয়মেরই তো ছাড় আছে। তাই যদি বলি তবে সে রাতে মার্গারেটকে পেয়ে রেগে গিয়েছিলাম আমি—তাহলে, মিথ্যাই বলব। তখনো হেসেই যাচ্ছিলাম, আর তখনই খেয়াল করলাম তার স্তন দুটো কোনো ষোল বছর বয়সী মেয়ের, খুব বেশি হলে—সতেরো। ভাবলাম সে চিৎ হয়ে শুয়ে আছে বলেই এমন বেভুল হচ্ছে। কিন্তু যখন হাত দিলাম তার চুলে এবং সে চুল মেমসায়েবের মতো কোমল। আমার হাসি গেল শুকিয়ে। তার মাথার চুলে হাত দিলাম। একই রকম। তক্ষুণি লাফিয়ে নামলাম বিছানা থেকে, চেঁচিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—'কে তুমি?' মাথা ঘুরছিল কাঁপছিলাম আমি। মেয়েটি উঠে বসল, হাত বাড়িয়ে ডাকল আমাকে, এমন যখন করছিল তার আঙুল ছুঁলো আমাকে। সঙ্গে সঙ্গে তড়াক করে পিছু হটলাম, চেঁচিয়ে বললাম তার নাম জানাতে। তখন আবার বললাম নিজেকেই : একজন মেয়ে ছেলেকে এত ভয় পাচ্ছো কেন হে? সাদা চামড়া কিংবা কালো চামড়া, সবই তো সমান। তাই বললাম : ঠিক আছে, শিগগিরই তোমার মুখ খোলাব আমি। সেই সঙ্গে টেবিলের উপর দেশালাই খুঁজতে লাগলাম। মেয়েটি বোধহয় বুঝতে পেরেছিল আমি কি খুঁজছি। বলল সে, 'বিকো, আকপাকেয়ানা ওকু।'

বললাম, 'তাহলে তুমি মেমসাহেব নও। কে তুমি? যদি না বল তাহলে এক্ষুণি আলো জ্বালিয়ে দেখব আমি।' দেশলাই নেড়ে বোঝালাম যা বলছি তা আমি করবই। আমার সাহস ফিরে এসেছে। আমি তার গলার স্বর স্মরণ করতে চেষ্টা করছিলাম কেননা আমার সেটা খুউব চেনা মনে হয়েছিল।

বিছানায় ফিরে এসো, বলছি তোমাকে , একথাই তখন শুনলাম। যে-ই বলুক- বুঝলাম, কণ্ঠস্বর আমাক মিছে কথা বলছে। চিনির মতো মিষ্টি সে-স্বর কিন্তু ভারি রহস্যময়। তাই আমি দেশলাই ঠুকলাম।

'দয়া করো,' শেষ কথাটি বলল সে।

যদি বলি তার পরেই কী করেছিলাম, অথবা ঘরের বাইরে বেরিয়ে এসেছিলাম কেমন করে পুরোটাই একটা ধারণার ব্যাপার। পরবর্তী যে ব্যাপারটা মনে করতে পারি তা হল এই যে—আমি খ্যাপার মতো ম্যাথিউয়ের বাড়ির দিকে ছুটে চলেছি। তারপর আমার দু হাত দিয়েই ধাক্কা মারছি তার দরজায়।

'কে ওখানে?' ভেতর থেকে বলল সে।

খোলো শিগগির, আমি চেঁচিয়ে উঠলাম', ভগবানের দোহাই, শিগগির খোলো। নাম বললাম আমি, অবিশ্যি তখন আমার ঘর আমার মতো ছিল না। একেবারেই। খুলে গেল দরজা এবং দেখলাম আমার বন্ধু ডানহাতে দেশলাই নিয়ে দাঁড়িয়ে।

মেঝেতে লুটিয়ে পড়লাম আমি এবং সে বলল, 'ঈশ্বর রাজি হবেন না।'

ঈশ্বর নিজেই সে রাতে আমাকে চালিত করেছিলেন ম্যাথিউ ওবির বাড়ির দিকে কেননা আমি দেখিনি কোথায় যাচ্ছি আমি। বলতেই পারিনি তখন আমি ইহলোকে না পরলোকে ম্যাথিউ আমার উপরে ঠাণ্ডা জল ঢেলে দিল এবং খানিক পরে সামলে নিয়ে তাকে বললাম কী ঘটেছে। মনে হয় তাকে সব উল্টোপালটাই বলেছিলাম আমি, নইলে সে বারবার জিজ্ঞাসা করত না মেয়েটিকে দেখতে কেমন।

'বললাম তো আমি দেখিনি তাকে, বললাম আমি।

'ও। তা তুমি তো তার স্বর শুনেছ?'

'আমি তার স্বর শুনেছি ঠিকঠাক। আমি তাকে ছুঁয়েছি, সেও ছুঁয়েছে আমাকে।'

'বুঝতে পারছি না তাকে ছেড়ে দিয়ে তুমি ভালো করেছ কি মন্দ করেছ এ কথাই বলল ম্যাথিউ।

বুঝতে পারছি না কীভাবে বোঝাব ব্যাপারটা কিন্তু কথাগুলো আমার চোখ খুলে দিল। তখনই বুঝতে পারলাম, মামি উয়োতা এসেছিল আমার কাছে নাইজার নদীর দেবী। ম্যাথিউ আবার বলল, 'এটা নির্ভর করে জীবনে তুমি কী চাও তার উপরে। তুমি যদি চাও ধনরত্ন তাহলে আজ তুমি বিরাট ভুল করলে, কিন্তু যদি তুমি বাপের সাচ্চা ব্যাটা হও তাহলে ধরো আমার হাত।'

আমরা হাত ধরলাম এবং সে বলল, 'আমাদের বাপ-দাদারা কখনো বলেন নি একজন মানুষ স্ত্রীপুত্রের তুলনায় বেশি পছন্দ করবে ধনদৌলতকে।'

এখন বউয়েরা যখন আমাকে বিরক্ত করে—তাদের বলি : তোমাদের দোষ দিই না। যদি বুদ্ধিমান হতাম তাহলে তো বরণ করতাম মামি উয়োতাকে। তারা হাসে, আমাকে জিজ্ঞাসা করে কেন তাকে আমি নিই নি। সবচে কচি বউটা বলে, 'ওগো, দুঃখ পেয়ো না, সে আবার ফিরে আসবে, আগামীকালই আসবে সে।' আর তারা হাসে সবাই মিলে।

কিন্তু আমরা সব্বাই জানি ওটা ঠাট্টা ছাড়া কিছুই না। কিন্তু কোথায় সেই মানুষ যে সন্তানের বদলে চাইবে ধনদৌলত কেবল সেই খ্যাপা সাদা আদমি ডক্টর স্টুয়ার্ট হিল ছাড়া। ওহ্ তোমাদের বুঝি বলিনি। মামি উয়োতাকে আমি তাড়িয়ে দিতেই সে রাতে সে যায় ডক্টর স্টুয়ার্টহিলের কাছে, একটা সাদা ব্যবসায়ী, বনে যায় তার প্রেমিকা। শুনেছ তার কথা?...ও হ্যাঁ, সে হয়ে পড়েছে সারা দেশের মধ্যে সব চাইতে বড়লোক। সে কিন্তু লোকটাকে বিয়ে করতে দেয়নি সে যখন মারা গেল, কি হল? তার ধনদৌলত লুটেপুটে খেল বারোভূতে। সে ধনদৌলত কি ভালো? জিজ্ঞাসা করছি তোমাদের। ঈশ্বর না করুন।

ভাষান্তর : বিষ্ণু বসু

প্রকাশনার জন্য নয়

নাদিম গোর্ডিমার

এটা সাধারণত জানা যায় না—এবং সরকারী জীবনপঞ্জীতে এটা কখনো উল্লেখিত হয় নি—সে প্রধানমন্ত্রীমশাই তাঁর জীবনের প্রথম এগারো বছর কাটিয়েছিলেন, ঠিক যখনই তাঁর ওপর ভরসা গেছিল যে তিনি গাড়ীর তলায় পড়বেন না, তখন থেকে, তাঁর খুড়োকে রাস্তায় রাস্তায় পথ দেখিয়ে। খুড়ো সত্যি সত্যি অন্ধ ছিলেন না, কিন্তু কাছাকাছি, এবং অবশ্যই তিনি উম্মাদ ছিলেন। তিনি তাঁর ডান হাতটি ছেলেটির বাঁ কাঁধে দিয়ে হাঁটতেন ; দিনের বেলাটা তাঁরা ঘুরে ঘুরে বেড়াতেন, কিন্তু রাস্তার ঠাণ্ডা দিকের এক টুকরো জায়গাও তাদের ছিল, পোস্ট অফিসের কাছের পা কাটা লোকটা যে জুতোর ফিতে আর তামার বাজু বেচে আর এক করজির নীচ থেকে পুতুলের হাত লাগানো লোক যার জায়গা ওয়াই এম সি-এর বাইরে তাদের দুইয়ের মধ্যে। ঐ জায়গাতেই আভেলাইদ গ্রাহাম গ্রিগ ছেলেটাকে খুঁজে পান, এবং পরে সে তাঁকে বুঝিয়ে বলেছিল, 'রোদ্দুরে বসলে ওরা তোমায় কিছু দেবে না।'

শ্রীমতি গ্রাহাম গ্রিগ প্রেইজ বাসেটসের খোঁজ করছিলেন না। তিনি এক বৃটিশ আশ্রিত রাজ্য থেকে জোহানসবার্গে একটা সফরে এসেছিলেন বন্ধুদের দেখতে, কলকাঠি নাড়তে এবং তার পাশে, সীমানা পার হয়ে যে সব উপজাতির লোকেরা নিজেদের হারিয়ে ফেলেছে, কখনো কখনো কয়েক পুরুষ ধরে, শহরে, তাদের ভাগ্যে কি ঘটে চলেছে সে বিষয়ে নিজের ব্যক্তিগত পড়াশুনোর কাজটাও তদারক করতে। তিনি যখন বুড়োমানুষটার টুপিতে ফেলার জন্য নিজের ব্যাগের কাগজপত্র, চিঠিচাপাটি হাৎড়ে একটা ছয় পেন্স খুঁজছিলেন শুনলেন সে উপজাতির ভাষায় ছেলেটার কানে কানে কিছু বলছে--এটা এই শহরে যেখানে অনেক আফ্রিকীয় ভাষা শোনা যায় সেখানে এমন কিছু তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা নয়। কিন্তু আওয়াজটা তাঁর কানে শব্দের মত শোনাল : এটা সেই ভাষাটা যেটা তিনি একটু বুঝতে শিখেছেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, ইংরেজীতে, শুধুমাত্র উপজাতীয় ভাষায় প্রথানুযায়ী সম্বোধন করে, বৃদ্ধটি উপজাতির মানুষ কিনা। কিন্তু সে বিড়বিড় করে আশীর্বচন আউড়ে চলেছে পয়সার ঠুন ঠুন আওয়াজ যেটা চালু করে দিয়েছে, যেন একটা জরাজীর্ণ, ব্যবহারের অযোগ্য যন্ত্রব্যবস্থায় লাথি পড়েছে। ছেলেটা ওর সাথে কথা বলল, কনুই দিয়ে গুঁতোল ; ইতিমধ্যে মোটামুটিভাবে সে ব্যবসাদার হ'তে শিখে গেছে। বুড়ো আপত্তি করল, না, না, ঐ উপজাতি থেকে সে অনেকদিন আগে চলে এসেছে। অনেক, অনেকদিন আগে। সে জোহানসবুর্গ-এর লোক। তিনি

দেখলেন যে সে ছাড়পত্র দেওয়ার অফিস, সেখানে অন্য অঞ্চলের লোকজন সবসময় ভুলে যাওয়া কোনো 'স্বভূমি'-র মার্কা পাওয়ার বিপদে পড়ে সেখানকার নিয়মমাফিক জিজ্ঞাসাবাদের সাথে তাঁর প্রশ্নকে গুলিয়ে ফেলেছে। তিনি ছেলেটির সাথে কথা বললেন, জিজ্ঞেস করলেন যদি সে প্রোটেকটরেট থেকে এসে থাকে। সে আতঙ্কিত হয়ে মাথা নাড়ল, এর আগে এক কল্যাণ প্রতিষ্ঠান তাদের রাস্তা ছাড়াব আদেশ দিয়েছিল। 'কিন্তু তোমার বাবা?' 'তোমার মা?' কুমারী গ্রাহাম গ্রিগ বললেন, হাসিমুখে। তিনি আবিষ্কার করলেন সে বুড়ো প্রোটেকটরেট থেকে এসেছে, সে গ্রামটাকে তিনি তাঁর নিজের ক'রে নিয়েছেন সেটা থেকেই, এবং তার ছেলেমেয়েরা তাদের ছেলেমেয়েদের যথেষ্ট ভাষা দিয়ে গেছে যাতে তারা সবাই তা দিয়ে নিজেদের মধ্যে কথা বলতে পারে, দ্বিতীয় যারা এক অচিন শহরে জন্মেছে তারা পর্যন্ত।

এখন এই জুটি আর একটা পয়সা দিয়ে বিবেক থেকে দূর করে দেওয়ার মত ভিখিরিমাত্র রইল না : তারা উপজাতির সদস্য। সারা দিনের ভিক্ষের পর তারা কোন শহরে গিয়ে ঠেক নেয় জেনে নিলেন, তাদের জন্য বৃদ্ধের ভাতার অধিকার প্রতিষ্ঠা করলেন, এবং সর্বোপরি, ছেলেটির জন্য কিছু করলেন। সে যে ছেলেটার ঠিক কে হয় সেটা তিনি কখনো খুঁজে বের করতে পারেন নি—তিনি যা বুঝলেন ছেলেটা বাড়ীর মেয়েদের কারোর অবৈধ সন্তান হবে, যাতে সে তাঁর স্কুলে ভর্তি হ'তে পারে সেজন্য তার বাবা-মার পরিচয় গোপন ক'রে যাওয়া হ'ল। আর যতই হোক সে উপজাতির বংশধর, নিজের জায়গা হারানো উপজাতীয় মানুষ, তাকে রাস্তায় রাস্তায় ভিক্ষা করতে ছেড়ে দেওয়া যায় না। তার জন্য শুরুতে কুমারী গ্রাহাম গ্রিগের ভাবনা, এই অবধি পৌঁছেছিল। তাকে কেউ আলাদা ক'রে চাইত না, এবং যখন তিনি তাকে প্রোটেকটরেটে নিয়ে স্কুলে ভর্তি করতে চাইলেন কোনো বাধার মুখে পড়তে হ'ল না। সে তাঁর সাথে চলল ঠিক যেমনভাবে বৃদ্ধের হাতের ভর নিয়ে প্রতিদিন জোহানসবুর্গের রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াত সেভাবেই।

ছেলেটি এর আগে কখনো স্কুলে যায় নি। সে লিখতে পারত না, কিন্তু কুমারী গ্রাহাম গ্রিগ এটা আবিষ্কার করে চমকে গেছিলেন যে সে রীতিমতো স্বচ্ছন্দভাবে পড়তে পারে। তাঁর ছোটোখাট গাড়ীতে তাঁর পাশে খাকী শর্ট আর শার্ট যেগুলো তিনি তাঁকে কিনে দিয়েছিলেন নিজের নেতাকানির দুর্গন্ধের সুরক্ষা ছেড়ে সেগুলো পরে বসে, সরাসরি তাঁর প্রশ্নের মুখে পড়ে, সে তাঁকে বলল যে সে খবরের কাগজঅলা কোণে যার গলার চড়া আওয়াজ শোনা যেত তার থেকে শিখেছে যে পোস্টারগুলো দিনের মধ্যে কয়েকবার বদল করা হত সেগুলো থেকে আর তারপর খবরের কাগজ এবং পত্রিকা যেগুলো সেখানে চড়ানো থাকত সেগুলো থেকে। হায় ভগবান, পথ থেকে কি না শিখেছে! গায়ের চামড়া ছাড়া সবই তার কাছে অচেনা, এমনকি তাও অচেনা, অন্যরকম গন্ধ ছড়াচ্ছে—এই বিচ্ছিন্নতা, তিনি বুঝলেন, বাচ্চাটাকে দিয়ে কথা বলাচ্ছে যেটা সে আত্মস্থ থাকলে কখনো বলতে পারত না। কোনো বাছবিচার না করে সে জীবনের তুচ্ছ

ঘটনাগুলোর বর্ণনা দিল, পা কাটা তামার বালার লোকটার থেকে কেমন ক'রে দাগা সিগারেট বানাতে আর চমৎকার একটা অনুভূতির জন্য কেমন করে তা টানতে হয় সেটা সে শিখেছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন বড় হয়ে কি করবে বলে সে ভেবেছে, যদি তাকে কাকার সাথেই হেঁটে বেড়াতে হয়, সে বলল যে, সে ছেলেদের দলে ঢুকতে চায়, তারা তার থেকে সামান্য কিছু বড়, টাকা করার ওস্তাদ। ওরা সাদা লোকদের পকেট আর হাতব্যাগ থেকে টাকা নিয়ে নেয়, তারা তা জানতেও পারে না, এবং যদি পুলিশ আসে তারা পেনি হুইসল বাজাতে আর গান গাইতে শুরু করে। তিনি মৃদু হেসে বললেন, 'ঠিক আছে. এখন তুমি রাস্তার কথা সব ভুলে যেতে পার। তোমাকে আর কখনো এসব নিয়ে ভাবতে হবে না। এবং সে বলল 'হ্যাঁ, দিদ্-ইমণি, এবং তিনি জানতেন সে কি ভাবছে সে সম্পর্কে তাঁর কোনো ধারণাই নেই—কেমন ক'রে থাকবে? তিনি যা দিতে পারেন তাহল আরও অপরিচিতি, সাধারণভাবে যে উৎসাহ দেওয়া যায় তার অপরিচিতি,-—এই বলে, 'এবং শিগ্গীরই তুমি লিখতে শিখবে।'

তিনি লক্ষ্য করেছিলেন যে লিখতে না পারার ব্যাপারটায় সে জঘন্যভাবে লজ্জিত। যখন তাকে স্বীকার করতেই হ'ল, প্রতিবার তিনি কথা বললে তাঁর কবলে পড়ে সে যখন মুখ খুলেছে তাতে তেরচা একটা ভ্যাঙচানি থেকে গেছে—দাঁত বের করা আর বড় হওয়া একটা ভাঁজ শিশুসুলভ হালকা ভুরুর মাঝে—গভীর হীনমন্যতার। হীনমন্যতা আডেলাইড গ্রাহাম গ্রিগকে আতঙ্কিত করত—যেমন বন্য রাগের দৃশ্য আতঙ্কিত করে অন্যান্যদের। যে যে ব্যাপারে তিনি মিশনারীদের বিরুদ্ধে ছিলেন তার মধ্যে এটা একটা কিভাবে ওরা খ্রীষ্টের হীনতার বোধের কাছে সমর্পণটাকে জোর দেয় এবং একইভাবে আফ্রিকার মানুষজনেরা সাদা মানুষদের গড়ে দেওয়া হীনমন্যতার কাছে সমর্পণের মত ক'রে তৈরী করে।

প্রেইজ ধর্মনিরপেক্ষ স্কুল, সেটা মিশনারী স্কুলের পাল্টা স্কুল হিসেবে গ্রামে চালু করার খরচায় কুমারী গ্রাহাম গ্রিগের লণ্ডনের বন্ধুদের সমিতি সাহায্য করেছিল। তাতে ভর্তি হল। একমাত্র শিক্ষিত শিক্ষক হচ্ছে একটি অল্পবয়সী ছেলে যে দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রশিক্ষণ পেয়েছে এবং এখন তাকে নিজের মানুষদের সেবা করার জন্য ফেরত আনা হয়েছে, কিন্তু এটা একটা শুরু। যেমনটি অ্যাডেলাইড গ্রাহাম গ্রিগ প্রধানকে বলেন, যে কোনো গর্বিত কন্যার মত ঝকঝকে চোখে, 'যখন স্বাধীনতা আসবে ততদিনে আমরা শুধু ব্রিটিশ সরকার নয়, চার্চের হাত থেকেও মুক্তি পেয়ে গেছি।' এবং প্রধান সবসময় একটু অপ্রস্তুতের মত হাসতেন, যদি তিনি ওঁকে এত ভালোভাবে জানেন এবং ওঁর বাবা হওয়ার মত বয়স হয়ে গেছে তাঁর, কারণ ওঁর বাবা মন্ত্রীসভার একজন প্রাক্তন সদস্য এবং একজন বিশপের পুত্র।

এটা সত্যি যে সবকিছুই শুরুর পর্যায়ে ; সেটাই এর সৌন্দর্য—কাদা দিয়ে তৈরী মসৃণ বাড়ীগুলোর, লাল মাটির, মাছির আর নরমের যেগুলো মাসের পর মাস কিভাবে তিনি সহ্য করছেন ভেবে ইংলণ্ড থেকে যারা আসত তারা অবাক হয়ে যেত।

এমনকি প্রেইজও একটা শুরু একদিন উপজাতি তার নির্বাসিতদের ঘরে ফিরিয়ে নেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট অর্থনৈতিক সামর্থ্য লাভ করবে, এবং তার ছেলেদের আর ঐ সীমান্তের পারে শ্রম বেচতে যেতে হবে না। কিন্তু শিগ্‌গীরই এটা পরিষ্কার হয়ে গেল যে প্রেইজ ব্যতিক্রম বটে। খবরের কাগজের শিরোনাম থেকে পড়তে শেখাটা বস্তীজীবনের রসবোধের নমুনামাত্র নয়, প্রমাণিত হ'ল এটা ছিল প্রকৃত, বুদ্ধিবেত্তার অদম্য আগ্রহ। ছ সপ্তাহের মধ্যে ছেলেটি লিখতে শিখে গেল, এমনকি শুরু থেকেই সে নির্ভুল বানান করত, যখন ষোল-আঠারো বছরের ছেলেরাও ইংরেজী বানানের শুদ্ধতার ওপর পুরোপুরি দখল আনতে পারে না। তার পাটিগণিত এত ভালো ছিল যে তাকে থ্রী ক্লাসের সঙ্গে পড়ানো হতে লাগল, শুরুর বদলে মানচিত্র কি সেটা সে সঙ্গে সঙ্গে ধরতে পারল ; অবসর সময়ে বিভিন্ন যন্ত্রব্যবস্থা কিভাবে কাজ করে সেটা বোঝার ব্যাপারে লক্ষণীয় দক্ষতা দেখাল, জল তোলার পাম্প থেকে মোটর সাইকেলের এঞ্জিন পর্যন্ত। আঠারো মাসের মধ্যে সে স্ট্যাণ্ডার্ড ফাইভের পাতাগুলো শেষ করে ফেলল, শহরের সাদা বাচ্চারা যাদের পেছনে লেখাপড়া জানা বাড়ীর সব সুবিধে আছে বয়সে তাদের থেকে একবছর মাত্র পিছিয়ে।

তখনো পর্যন্ত উপজাতির স্কুলে পড়ার মত একটাও বাচ্চা তৈরী হয় নি। এখন কি করা যায় ঠিক করা মুশকিল হ'ল, প্রেইজকে সীমান্তের ওপারের স্কুলে ফেরৎ পাঠানো বাদে। একমাত্র বিকল্প হল মিশন স্কুল, ঐ হতচ্ছাড়া জেসুইটরা যারা সাদা সাম্রাজ্যবাদীরা দখলদারীতে আসার দিন থেকে প্রোটেকটরেটে বসে আছে উপজাতিগুলোকে তাদের 'সুরক্ষা'র আওতায় আনছে—এবং যে বাচ্চাদের সাথে ছেলেটিকে পড়তে হবে তারা তাকে উৎসাহ-উদ্দীপনা কিছুই দেবে না। সুতরাং চাই ফাদার অড্রি এবং দক্ষিণ আফ্রিকা। তিনিও যাজক, অ্যাংলিশন, কিন্তু তাঁর স্কুল একটা জায়গা, যেখানে অন্ততঃ ধর্মপ্রাণ ছানাপোনাদের সাথে, একটা কালো বাচ্চা সাদা শিশুর মতই ভালোভাবে পড়াশুনো শিখতে পারবে।

প্রেইজ যখন আর সব ছেলেদের সাথে ভেল্ড-এ বেরিয়ে এল বিস্তৃতি দেখে তার চোখ বড় বড় হয়ে গেল : জমিটা সবদিকে চলে গেছে, কোথাও কোনো ওপার দেখা যাচ্ছে না ; শুধু হঠাৎ হঠাৎ আকাশ এসে পড়ছে, সে আবার আরও বড়। বাতাস তাকে দিয়ে কুকুরের মত শোঁকাল। সে অসহায়ভাবে দাঁড়িয়ে রইল যেমনভাবে সে দেশগাঁয়ের লোককে ট্রাফিক আলোর পাল্টানো দেখে মাঝপথে ধাঁদিয়ে যেতে দেখেছে। বাড়ীগুলোর মাঝখানের ফাঁকটুকু একসাথে এসে দাঁড়ান, সেটাকে অবাধে ফুলিয়ে তার ওপর মেলে দেওয়া হয়েছে, সে হারিয়ে গেল ; কিন্তু অট্টালিকার মত বড় বড় মেঘ আছে, আর সে কোনো শহরের থেকে জায়গাটা বড় হলেও তাতে পাখপাখালির বসতি আছে। তুমি যদি ভেল্ড দিয়ে দশ মিনিট দৌড়ে যাও, গ্রাম হারিয়ে যাবে, কিন্তু নীচের দিকে মাটিতে হাজার হাজার পিঁপড়ে তাদের ঢিবিগুলোর মধ্যে মধ্যে যে অন্তহীন জমি পড়ে থাকে তার মধ্যে দিয়ে ঠিক পথ চিনে নেয়।

ভোরবেলা আর স্কুলের পরে সে অন্য ছেলেদের সাথে গরু চরাতে যেত। সে তাদের একধরনের জুয়োখেলা শেখাল যার কথা ছেলেরা আগে শোনেই নি। সে তাদের শহরের কথা বলত যা তারা আগে দেখে নি। বুড়োর টুপীর টাকা তাদের কাছে অনেক মনে হ'ত, মেল ট্রেনগুলো পাঁচ মাইল দূরের হল্টে জল নিতে দাঁড়ালে পরে সে কয়েকটা পেনীর বেশী পেত না ; অর্থাৎ টাকার অঙ্কটা তাদের নিজস্ব হিসেবেও বেড়ে যেত, তা ছাড়া সে নিজে একটুখানি বাড়িয়েও বলত। যাই হোক, শহরকে সে ভুলেই যাচ্ছিল ; কুমারী গ্রাহাম গ্রিগের মত ক'রে নয়, একজন শিশুর মত করে, যে নাকি, নিজের লালা দিয়ে বানানো বোলতার চাকের মত করে, নিজের চারপাশের পরিস্থিতির মধ্যেই তার ব্যক্তিগত প্রসঙ্গটুকু বুনে নেয়, সুতরাং তার চারপাশের জায়গা এসে সঙ্কুচিত হ'ল তার গ্রামে, গরুকে যে খর্তটায় জল খেতে নিয়ে যাওয়া হ'ত, তাতে যে হল্ট দিয়ে ট্রেন চলে তাতে ; যে যে বিশেষ বালুজমির বালির ফালি অথবা পিঁপড়েদের নাড়া খাওয়া খসখসে ঘাস ছেলেরা পেরিয়ে যেত, মাথাগুলো একসাথে ছেলেগুলো এগিয়ে যেত, সাদা সারস আর গরু ছাগলের দলের মধ্যে দিয়ে। সে অন্য ছেলেদের শিখল কোন পাতা আর শিকড় চিবোতে ভাল, কেমন ক'রে তারের ফাঁদ পেতে বসন্তের হরিণ ধরতে হয়। যদিও কুমারী গ্রাহাম গ্রিগ বলেছিলেন যে দরকার নেই, প্রতি রোববার সে বাচ্চাদের সাথে গীর্জায় প্রার্থনা করতে যেত।

তিনি সেখানে বাস করতেন, প্রধানদের একজনের বাড়ীতে, সেখানে সে থাকত না ; সে থাকত অন্য ছেলেদের একজনের পরিবারে ; কিন্তু তাঁর বাড়ীতে সে প্রায়ই যেত। তিনি ওকে তাঁর জন্য চিঠি টুকে দিতে বলতেন। তিনি খবরের কাগজ থেকে পাওয়া খবরের টুকরো কেটে রাখতেন এবং ওকে পড়তে দিতেন ; সেগুলো হ'ত উড়োজাহাজের, যেসব বাঁধ তৈরী হচ্ছে তার আর অন্যান্য দেশে মানুষ যেভাবে থাকে সেসব বিষয়ে। 'এখন তুমি ভোল্টা বাঁধের ব্যাপারে, ছেলেদের সব বলতে পারবে সেটা আফ্রিকায়, এখান থেকে দূরে কিন্তু তবু, আফ্রিকাতেই।' তিনি বলতেন, সেই হঠাৎ হাসি যা তাঁর মুখকে রক্তিম করে তুলত তা মিশিয়ে। তাঁর একটা গ্রামাফোন ছিল, সেটা বাজিয়ে গান শোনাতেন তাকে। শুধু গানবাজনা নয়, মানুষজনের কবিতা পাঠ, যাতে সে জানতে পাবে যে স্কুলের বইয়ের কবিতাগুলো শুধু ছোটোছোটো শব্দের সারিমাত্র নয়, বরং গানেরই মত। তিনি ওকে প্রচুর চিনিমেশানো চা দিতেন আর উপজাতির ভাষা শেখার ব্যাপারে সাহায্য করতে বলতেন, তাতে তাঁর সাথে কথা বলতে বলতেন। তাকে দিদিমণি বা শ্রীমতী ডাকতে দিতেন না, যেমনটি সে সাদা মহিলাদের যারা তার টুপিতে টাকা ফেলত তাদের ডাকত, বরং কুমারী গ্রাহাম গ্রিগ বলতে শিখতে হ'ল।

যদিও সে দ্রুত রাস্তা পেরিয়ে যাওয়া উঁচু গোড়ালীর জুতো হিসেবে ছাড়া সাদা মহিলাদের একেবারেই জানত না, তবু তাঁর মনে হ'ত না যে সব সাদা মহিলারা তাঁর মতই হবে ; যেমনটি সে সাদা লোকদের দেখেছে সেই আলোয়, তাদের গাড়ীতে, তাদের সম্পদে, তাদের দূরত্বে, ঘটনা হ'ল, তিনি যা করতেন তার কিছুই সে বুঝত না। তাঁকে

দেখতে তাদের মত, নীল চোখ, সোনালী চুল, আর গায়ের রঙ একটা নয় বরং অনেক : সেখানে সূর্য পুড়িয়ে দিয়েছে বাদামী, কোনো কারণে রাঙা হয়ে উঠলে লাল—কিন্তু তিনি প্রধানের বাড়ীতে থাকেন, তাঁকে তাঁর গাড়ীতে করে পৌঁছে দেন, যখন মেয়েরা গ্রাম থেকে দূরে গিয়ে কাফ্রিকা বোনে তখন তাদের সাথে মাঠে ঘুমোন। সে জানত না কেন তিনি তাকে ওখানে এনেছেন, অথবা তার ওপর সদয় হওয়ারই বা ওঁর কি দরকার। কিন্তু তাঁকে সে জিজ্ঞেস করতে পারত না, নিজের ঘরে একটা গ্রামাফোন আর একটা চমৎকার গ্যাসবাতি (ওটা সে তাঁর জন্য সরিয়ে দিতে পেরেছিল) থাকার পরেও তিনি কেন বাইরে গিয়ে মেয়েদের সাথে মাঠে ঘুমোন সেটা জিজ্ঞাসা করার চেয়ে বেশী কিছু। যদি, যখন তারা কথা বলছে, কথাবার্তাটা যদি পোস্টঅফিসের বাইরের খুঁটির ধারেকাছে এসে পৌঁছলে, তিনি ধীরে ধীরে ঘন লাল হয়ে উঠতেন, তারা চুপচাপ পেরিয়ে যেত অথবা (তাঁর দিক থেকে) আরও জোরে জোরে কথা বলতে বলতে বা হাসতে হাসতে।

সেজন্য যেদিন তিনি তাকে বললেন যে সে জোহানস্‌বার্গে ফিরে যাচ্ছে বিস্ময়ে সে বিহ্বল হয়ে গেল। একথা বলার সাথে সাথে তাঁর মুখ টুকটুকে লাল হয়ে উঠল, চোখে দ্বিধা খেলা করতে লাগল, তাঁর মধ্যে পোস্টঅফিসের বাইরের খুঁটির দৃশ্য আবার ফুটে উঠল। কিন্তু তিনি ইতিমধ্যে বলে চলেছেন '...স্কুলে, একটা সত্যিকারের ভালো বোর্ডিং স্কুলে, ফাদার অড্রির স্কুলে, শহর ন'মাইল মত দূরে। তোমাকে একটা ভালো স্কুলে অবশ্যই ঢুকতে হবে, প্রেইজ। আমরা সত্যিই তোমাকে আর ঠিকমতো পড়াতে পারছি না। হতে পারে একদিন তুমি নিজেই এখানকার শিক্ষক হবে। একটা হাইস্কুল হবে এখানে, আর তুমি হবে তার প্রধান শিক্ষক।

তিনি ওর মুখে হাসি ফোটাতে পারলেন; কিন্তু তাঁকে বিমর্ষ আর অনিশ্চিত দেখাচ্ছিল। সে হাসিটা ধরে রাখল কারণ সমবয়সী অন্য ছেলেদের নিয়ে সে যে প্রারম্ভিক স্কুল শুরু করতে যাচ্ছে সেটাব কথা তাঁকে বলতে পারল না। হয়ত কেউ তাঁকে বলবে। অন্য মেয়েরা। এমনকি প্রধান। কিন্তু হাসি দিয়ে তাকে ভোলানো যায় না।

'তেবেদি আব জোসেফকে আর অন্যদের ছেড়ে যেতে তোমার মনখারাপ হবে।'

সে সেখানে দাঁড়িয়ে রইল, হাসিমুখে।

'প্রেইজ, আমার মনে হয় না তুমি তোমাকে বোঝ—তোমার মাথার ব্যাপারে'। তিনি একটা ছোট্ট ফোঁপানী তোলা হাসি হাসলেন, নিজের মাথায় টোকা দিলেন। তুমি একটা অদ্ভুত ভালো মাথা পেয়েছ। অন্য ছেলেদের থেকে বেশী কিছু আছে তাতে—জানো তুমি? এটা একটা আলাদা কিছু— একটা বিশাল অপব্যয় হয়ে যাবে। অনেক, অনেক মানুষ তোমার মত বুদ্ধিমান হতে চায়, কিন্তু হওয়া সোজা নয়, যখন তুমিই সেই বুদ্ধিমান।

সে হাসিটা ধরে রাখল। সে চাইছিল না যে তাঁর মুখ তার মুখের দিকে আরও চেয়ে থাকুক তাই তাঁর পায়েব দিকে নিজের দৃষ্টি স্থির করল সে, চপ্পলের মধ্যে সাদা

পা, গোড়ালীতে শিরাগুলো ঠেলে বেরিয়ে আসছে চার্চে তার মাথার ওপর যে খ্রীষ্ট ছেলে তার পায়ের মত।

ফাদার অড্রির সাথে আডেলাইড গ্রাহাম গ্রিগের এর আগে দেখা হয়েছিল। আফ্রিকার দক্ষিণের সমস্ত সাদা লোক যারা গায়ের রঙকে বাধা হিসেবে গ্রাহ্য করে না তাদের প্রায় সবাই একে অপরকে চিনত, গ্রাহ্য না করার ভিতটা যতই আলাদা হোক। তিনি কয়েক বছর আগে ওঁর সাথে কোনো কমিটিতে বসেছিলেন, সঙ্গে কয়েকজন সাদা দক্ষিণ আফ্রিকীয় বামপন্থী এবং কালো জাতীয়তাবাদী নেতা। যাইহোক, সবাই ওঁকে চিনত—খবরের কাগজ থেকে, যদি আর কোথাও থেকে না হয় : দক্ষিণ আফ্রিকা প্রজাতন্ত্রের প্রধানমন্ত্রী ডঃ ভেরওর্ড এর দেওয়া প্রকাশ্য বক্তৃতায় ওঁকে সাবধান করে দেওয়া হয়েছিল যে একজন পাদরির রাজনৈতিক ব্যাপারে হস্তক্ষেপ সহ্য করা হবে না। উনি ওঁর বক্তব্য বলে চলেছেন, এবং (খবরের কাগজের উদ্ধৃতি অনুযায়ী) 'রাষ্ট্রের অনুশাসনের আগে ঈশ্বরের আদেশ মেনে চলেছেন। আফ্রিকীয় এবং ভারতীয় নেতাদের মধ্যে ওঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু আছে, এবং বলা হয় যে, ওলন্দাজ পোপবিরোধী গীর্জার কয়েকজন মন্ত্রীর সাথে ওঁর দোস্তি আছে যে, সত্যি বলতে, কিছু বিরোধী মতের লোক যারা যখন তখন বর্ণ বিদ্বেষের পেছনের ঐশ্বরিক অনুমোদন নিয়ে প্রশ্ন তোলে তাদের কারো কারো পেছনে উনি আছেন—এরকমই ওঁর অস্থির, কালো আলখাল্লায় মোড়া অবয়ব, তোত্‌লে বলা বাকপটুতা, রুক্ষ সুন্দর মুখের উপস্থিতি।

তিনি শেষ যেবার ওঁকে দেখেছেন তখন উনি বুড়ো হয়ে গেছেন, সৌন্দর্য কমে গেছে। কিন্তু উনি যতদিন বাঁচবেন ততদিন যা ওঁর থেকে যাবে তা তখনও ওঁর মধ্যে ছিল : অসচেতনভাবে মানুষের নিজের মধ্যে বয়ে চলা এক সহজাত রাজকুমার যে মানুষকে খ্যাতনামা অভিনেতা, রাজনৈতিক নেতা আর সার্থক প্রেমিক করে তোলে : আকর্ষণ আর ঈর্ষার বস্তু, সে তার আত্মার সমস্ত উদারতা সত্ত্বেও, এক নিষ্ঠুরতার কথা খেয়াল করে না সে কারণে মানুষ কোনোদিন তাকে ক্ষমা করবে না—যে স্বাতন্ত্র্য, যে সৌভাগ্য নিয়ে সে জন্মেছে।

উনি ক্লান্ত ছিলেন, এবং তাঁর সাথে যখন কথা বলছিলেন তাঁর প্রতি মনোযোগের চাপে চোখ বুঁজে, মুখ বিকৃত করে ছিলেন, তবু তা সত্ত্বেও, ওঁর প্রভার মধ্যে তাঁর ভিতরের বাতিটির ক্ষীণতা অনুভব করতে পারলেন তিনি। ওঁর সবকিছু ঠিক ; তাঁর কোনোকিছুই পুরোপুরি ঠিক নয়। তিনি সবে ছত্রিশ কিন্তু কখনো তাঁকে এর চেয়ে কম বয়সের বলে মনে হয় নি। তাঁর চোখগুলো তরুণীর উজ্জ্বল, লাজুক চোখ কিন্তু সূঁচালো নখ সহ হাত আর পায়ে চূড়ান্ততার যন্ত্রণা আর টানাপোড়েন যা কখনো সোহাগ দেবে না তার ছাপ : তিনি দেখতে পেলেন, ওঁর উপস্থিতিতে তিনি জেনে গেলেন যে তারা চিরকালের মত বঞ্চিত।

তাঁর হীনতা তাঁকে শক্তি দিল। তিনি বললেন, 'আপনাকে অবশ্যই বলব যে ওকে আমরা উপজাতির মধ্যে ফিরে পেতে চাই। আমি বলতে চাইছি যে, এমনকি সরকার

চালানোর মত পড়াশুনো জানা লোকের সংখ্যাও ভয়ঙ্কর কম সেখানে। আগামী কয়েক বছরের মধ্যে আরও শিক্ষিত মানুষের চূড়ান্ত দরকার আমাদের। আমাদের ওকে পুরোহিত হবার কথা ভাবতে দেওয়া উচিত নয়।

ওঁর কাছ থেকে কি উত্তর প্রত্যাশিত জেনে ফাদার অড্রি মৃদু হাসলেন যে যদি ছেলেটি ঈশ্বরের পথ বেছে নেয় ইত্যাদি।

উনি বললেন, 'তুমি যা চাইছ তা হ'ল উপজাতিদেব কাঠামোটার সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে না এমন একজন দক্ষ রাজনীতিবিদ।

ওঁরা দুজনে হেসে উঠলেন, কিন্তু, আবার অসচেতনভাবে উনি দুজনের গভীর মতবিরোধ স্বীকার ক'রে নেওয়ার সুযোগটা কাজে লাগালেন ; উনি বিশ্বাস করতেন প্রধানদের যেতেই হবে ; যেখানে তিনি পশ্চিমী ধাঁচকে গ্রহণ করার বদলে আফ্রিকীয় তাদের নিজস্ব উপজাতিক গণতন্ত্র গঠন না করার কোনো কারণই দেখতে পেতেন না।

ভালো, এই মুহূর্তে বিষয়টা চিন্তা করার পক্ষে ও একটু ছোট-ই, তোমার মনে হয় না?' উনি হাসলেন। ওঁর ডেস্কের ওপর একগাদা কাগজ, এবং ওঁর ওপর অন্যান্য ব্যাপার নিয়ে ভাবনাচিন্তা করার যে চাপ আছে সে সম্পর্কে তাঁর বোধ ছিল। 'লেমেরাইব মিশনের খবর কি? আজকাল কিভাবে পড়ানো হচ্ছে—ফাদার শ্যামলন যখন ওখানে ছিলেন আমি তাঁকে চিনতাম—'

'আমি ওকে ঐসব লোকজনের কাছে পাঠাব না,' উনি যুগ্মভাবে বললেন, মিশনারীদের এবং আফ্রিকায় তাদের ভূমিকা নিয়ে তাঁর মনোভাবটা যে উনি জানেন সেদিকে ইঙ্গিত করে। এইরকম একটা খোলামেলা আবহাওয়ায়, তাঁরা প্রেইজের পেছনটা নিয়ে আলোচনা করলেন। ফাদার অড্রি পরামর্শ দিলেন যে তার পরিবারের সাথে সম্পর্কটা আবার জিইয়ে তোলা উচিত, জোহানসবার্গের হাতার মধ্যে একবার ফিরে এলে।

'ওরা চমৎকার আতঙ্কজনক।'

'সে যা ছিল, সেটা স্বীকার করে নেওয়াই তার পক্ষে সবচেয়ে ভালো হবে, যদি যা তাকে হ'তে হবে সেটাকে তার মেনে নিতে হয়।' উনি ওঁর কালো আলখাল্লায় খসখস শব্দ তুলে উঠে দাঁড়িয়ে লম্বা পায়ে এগিয়ে গেলেন, খোলা দরজা দিয়ে ঝুঁকে পড়ে ডাকলেন, 'সাইমন ছেলেটিকে নিয়ে এসো।' প্রবেশপথের দিকে তাকিয়ে কুমারী গ্রাহাম গ্রিম উত্তেজিতভাবে হাসছিলেন, তাঁর দৃষ্টির সীমারেখার বাইরে যে হাঁটছে তাকে ভালোবাসবার সবটুকু ইচ্ছে নিয়ে।

প্রেইজ তার নতুন স্কুলের পোশাক নেভি ব্লু হাফপ্যান্ট আর সাদা শার্ট পরে ভেতরে এল। মহিলাটির সহৃদয়তা আর পুরুষটির মনোযোগ তার চোখ গরুর জল খাওয়ার পাত্র থেকে ঠিকরে আসা সূর্যের মত করে তুলল। ফাদার অড্রি ইংলণ্ড থেকে এসেছেন, কুমারী গ্রাহাম গ্রিগ তাকে বললেন। অনেক দূর থেকে, এখান থেকে ছ' হাজার মাইল, যেমনটি সে তার ভূগোলের বই থেকে জেনেছে।

নতুন স্কুলে প্রেইজ খুব ভাল করল। সে রবিবার বড় গীর্জায় গানের দলের সাথে

গান গাইত ; তার শরীর, যা বাইরের ঝোপ জঙ্গলের মানুষের শরীর হিসেবে গড়ে ওঠার কথা, সাদা আলখাল্লার তলায় লুকানো থাকত। ছেলেরা পায়খানায় গিয়ে সিগারেট খেত এবং একবার একটা মেয়ে এসে কর্মশালা ঘরের পেছনে বর্ষার জল জমার নালায় তাদের জন্য শুয়েছিল। সে আগে থেকেই এ সমস্ত ব্যাপারের সব জানত, পথে আর মহল্লায় সেখানে সে পুরো একটা পরিবারের সাথে এক ঘরে ঘুমোত। কিন্তু সে ছেলেদের প্রারম্ভিক স্কুলের বিষয়ে কিছু বলল না। মেয়েরা কুমারী গ্রাহাম গ্রিগকে কিছু বলে নি। প্রধানও না। শিগ্‌গীরই প্রেইজ যখন ব্যাপারটা নিয়ে ভাবল বুঝল যে ওটা নিশ্চয়ই চুকে গেছে। ছেলেরা নিশ্চয়ই জঙ্গল থেকে ফিরে এসেছে। কুমারী গ্রাহাম গ্রিগ বলেছেন যে একবছর পরে, খ্রীষ্টমাস এলে, তিনি তাকে গরমের ছুটীতে নিয়ে আসবেন। প্রথম বছরে, জোহানস্‌বার্গে আসার পথে তিনি তাকে দুবার দেখতে এলেন, কিন্তু খ্রীষ্টমাসে সে তাঁর সাথে ফিরতে পারল না কারণ ফাদার অড্রি তাকে বড়দিন নাটকে রেখেছিলেন এবং ব্যক্তিগতভাবে তাকে লাতিন আর বীজগণিতের তালিম দিচ্ছিলেন। ফাদার অড্রি আসলে স্কুলে একেবারেই পড়াতেন না—এটা ওঁর স্কুল শুধুমাত্র উনি স্কুলটা শুরু করেছিলেন বলে, এবং যে অনুমতিক্রমে তিনি ফাদার প্রভিন্সিয়াল তারই বলে এটা চলত—কিন্তু ছেলেটার উন্নতির বিবরণ (report)টা এমন চমকে দেওয়ার মত যে, যেমনটি উনি কুমারী গ্রাহাম গ্রিগকে বলেছিলেন, মানুষের মনে হবে অতদূর অবধি সম্ভব ওকে মানসিক দিক থেকে উৎসাহ উদ্দীপনা দিয়ে যাই।

'আমি বিশ্বাস করতে শুরু করেছি যে মাত্র ষোল বছর বয়সে আমরা তাকে ম্যাট্রিক পরীক্ষায় বসাতে পারব। ফাদার অড্রি ঘোষণা করলেন হাস্যকর শোনাবার ঝুঁকি নিয়ে বলছি এমন একটা বাতাস নিয়ে। কুমারী গ্রাহাম গ্রিগ জোহানসবার্গে এলে সবসময় চুলের কাটছাঁট করতেন, তাঁকে সুন্দরী আর খুশী দেখাচ্ছিল। 'আপনার কি মনে হয় যে ও কেমব্রিজে ঢুকতে পারবে? আমার কমিটি লণ্ডনে একটা ছাত্রবৃত্তি চালু করবে, আমি নিশ্চিত—প্রোটেকটরেট-এর একজন হবু প্রধানমন্ত্রী এই বিনিয়োগ।

প্রেইজকে পাঠানো হলে, তিনি বললেন ওকে তিনি প্রায় চেনেনই না, সে খুব একটা বড় হয় নি, কিন্তু এত বড় দেখাচ্ছে, লম্বা টাউজার আর চশমায়। যখন কাজ করছ না তখন আসলে ওটা পরার কোনো দরকার নেই'। ফাদার অড্রি বললেন। 'হ্যাঁ, আমার মনে হয় ওটা খোলাপরা করতে থাকলে তুমি ওটা ফেলে চলে যাও, অ্যাঁ?' ওঁরা দুজন দাঁড়িয়ে রইলেন হাসিমুখে, এই ছেলেটির মধ্যে মিশে যেতে দিয়ে।

প্রেইজ দেখল তাঁকে কেউ প্রারম্ভিক স্কুলের ব্যাপারে মনে কবায় নি। তিনি ওকে ওর বন্ধুদের খবর দিতে শুরু করলেন, তেবেদি, জোসেফ আর অন্যাদের, কি ও যখন নামগুলো শুনল মনে হল নামগুলো এমন কারোর যাদের সে মনের ভেতর দেখতে পায় না।

ফাদাব অড্রি কখনো কখনো যাকে ফাদার ওর 'পরিবাব' বলেন সে সম্পর্কে কথা বলতেন, এবং যখন সে প্রথম স্কুলে এল তাকে তাদের কাছে লিখতে বলা হয়েছিল।

একটা সুলিখিত, সুন্দর বানানের ইংরেজীতে লেখা চিঠি হল, ঠিক যেমন চিঠি সে ক্লাসে দরকার হলে স্কুলের কাজ হিসেবে দেখায়। তারা উত্তর দিল না। তারপর ফাদার অড্রি নিশ্চয়ই তাদের সাথে যোগাযোগ করার জন্য ব্যক্তিগতভাবে চেষ্টা করেছিলেন, কারণ বৃদ্ধাটি, দুটো ছেলেমেয়ে যারা সে ছেড়ে আমার সময় একেবারে বাচ্চা ছিল, এবং তার বড় হয়ে যাওয়া 'বোনদের' মধ্যে একজন এক দেখার দিনে স্কুলে এল। তাদের অন্য ছেলেদের সাথে যারা দেখা করতে এসেছে তাদের মধ্যে থেকে দেখিয়ে দিতে হল; সে তাদের চিনতে পারত না, তারাও তাকে না। সে বলল, 'আমার কাকু কোথায়?' কারণ একমুহূর্তে সে তাকে চিনে নিত, বাঁদিকে সামান্য সে কখনো বাঁদিকে হেলে পড়া কাটিয়ে উঠে বড় হতে পারে নি যেখানে বৃদ্ধের হাতের চাপ তার তরুণ হাড়ের ওপর ছাপ ফেলেছিল। কিন্তু বৃদ্ধ মারা গেছে। ফাদার এসে একটা লম্বা হাত বাঁকা কাঁধ জড়িয়ে রাখলেন এবং অন্য লম্বা হাতে ছোটো ছেলেমেয়েদের একজনকে জড়িয়ে একের পর এক জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কি শক্ত পরিশ্রম ক'রে তোমার ভাইয়ের মত অনেক কিছু শিখবে?' এবং ছোট্ট কালো বাচ্চাটা ঘন লোমে ভরা নাকের ফুটোর দিকে, ঝোপড়া ভুরুর দিকে, চামরার তলাব দাড়িতে কালো হয়ে যাওয়া লোমকূপঅলা পাণ্ডুর চোয়াল দিয়ে ঘেরা লাল মুখের দিকে তাকাল এবং তারপর নীচের দিকে মুগ্ধতায় ছিঁড়েখুঁড়ে যেতে যেতে, জপমালাটার দিকে যেটা চামড়ার কোমরবন্ধনী থেকে ঝুলছিল।

তারা আর আসে নি কিন্তু প্রেইজও খুব একটা দেখা করতে আসার লোকের অভাব বোধ করে নি কারণ সে আরও আরও বেশী করে ফাদার অড্রির সাথে সময় কাটাচ্ছিল। যখন আসলে তাকে পড়ানো হ'ত না, ফাদার অড্রির পড়ার ঘরে তাকে পড়া তৈরীর জন্য অথবা নিজস্ব পড়াশুনো করতে বসিয়ে দেওয়া হ'ত, যেখানে সে এত মন দিয়ে কাজ করতে পাবে সেটা মানুষ স্কুলে করার আশা করতে পারে না। ফাদার অড্রি তাকে মস্তিষ্কের ব্যায়ামের একটা ধরন হিসেবে দাবাখেলা শেখালেন, এবং প্রথমবার প্রেইজ ওঁকে হারালে উনি আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিলেন। প্রেইজ প্রায় প্রতি সন্ধ্যায় খাওয়াদাওয়ার পর একহাত খেলার জন্য বাসায় যেত। সে অন্য ছেলেদের শেখানোর চেষ্টা করল কিন্তু প্রথম দশ মিনিট চাল বোঝানোর পরে কেউ একজন তাস বা ঘুঁটি নিয়ে আসত এবং সবাই মিলে কোনো একটা পুরোনো খেলা যা রাস্তায় এবং উঠোনে এবং মহল্লায় খেলা হয়ে থাকে সেটা খেলত।

কুমারী গ্রাহাম গ্রিগ যা খুঁজে পেয়েছিলেন ফাদার অড্রি সেটা নতুন করে আবিষ্কার করলেন : প্রেইজ মন দিয়ে গান শোনে, গভীরতা আছে যে গানে। একদিন ফাদার অড্রি ছেলেটার হাতে বাঁশী তুলে দিলেন যেটা বছরের পর বছর ধরে মখমলের ঢাকা দেওয়া বাক্সে পড়ে ছিল, যা তখনও ছোট্ট রূপালী নামের পাত বয়ে চলেছিল : রোলাণ্ড অড্রি। ফাদার অড্রি মনোযোগ দিয়ে দেখতে লাগলেন যখন প্রেইজ তার প্রাথমিক দোলায়িত মোচড় দিল এবং সব শিশু শিল্পীর মত তার হাঁটু মুড়ে বসার দশায় হ'ল এবং তারপর পেনি হুইসলের বাজানোর মত ক'রে লাজুক, প্রচণ্ড আক্রমণে ফুঁ দিয়ে

সেটাকে বাজানোর চেষ্টা করল। ফাদার অড্রি ওটা ওর হাত থেকে নিলেন। 'এটা হচ্ছে যা তুমি এইমাত্র ওখানে শুনেছ' বাখের অতুলনীয় বাঁশী শোনাটা রেকর্ড প্লেয়ার দেওয়া ছিল। প্রেইজ হাসল এবং ভুরু কোঁচকাল, নাকের সাথে চশমাটা খানিক ওপরে তুলে, এই একটা অভ্যেস তৈরী করেছে সে। কিন্তু শিগগীরই তুমি এটা বাজাতে শিখে যাবে ফাদার অড্রি বললেন এবং আত্মসচেতনতার অভাব, সুযোগ পাওয়ার অভ্যেস থেকে তৈরী হয় তা নিয়ে বাঁশীটা মুখে নিলেন এবং দশ বছর পরে যা স্মৃতিতে আছে বাজাতে লাগলেন।

তিনি প্রেইজকে শুধু বাঁশী বাজাতে শেখালেন না, স্বরলিপির প্রাথমিক উপাদানগুলোও শেখাতে থাকলেন, যাতে কেবল কানে শুনেই না বাজায়, অথবা কেবল ভালো লাগা দিয়ে না শোনে, যাতে যা শুনছে সেটাকে বুঝতেও পারে। বাঁশী বাজানোটা দাবার তুলনায় ছেলেদের কাছে অনেক বেশী সাফল্য পেল এবং শনিবারের রাত্রিগুলোয়, যখন তারা কনসার্ট বসাত, সে বাঁশীটা হোস্টেলে নিয়ে গিয়ে ছেলেদের জন্য বাজানোর অনুমতি পেত। একবার সে সাদাদের জন্য একটা অনুষ্ঠানে বাজানোর সুযোগ পেল, জোহানস্‌বার্গে, কিন্তু ছেলেরা সেটায় আসতে পেল না ; সে তাদের শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরাট হলঘরের কথা, জ্যাজ এর দলের কথা, আফ্রিকীয় গায়ক-গায়িকার কথা আর সাদা মেয়েদের মত লাল ঠোঁট আর সোজা চুলের নর্তকীদের কথা বলতে পারল।

একটা জিনিষ ফাদার অড্রিকে অসন্তুষ্ট করছিল, ছেলেটা কতটা আশা করা যায় ততটা ভরভরন্ত হয়ে বেড়ে উঠছে না। উনি নিয়ম করে দিলেন প্রেইজকে শরীরচর্চার জন্য আরও বেশী সময় দিতে হবে—স্কুল একটা ঠিকঠাক জিমনেশিয়ামের খরচ যোগাতে পারত না কিন্তু বাইরে কিছু যন্ত্র (equipment) ছিল। সমস্যা হচ্ছে, ছেলেটার সময় এত কম, এবং তার ব্যতিক্রমী ক্ষমতা নিয়েও, কোনো পশ্চাৎপট ছাড়া ষোল বছর বয়সে ম্যাট্রিক পাশ করা সোজা নয়। ব্রাদার জর্জ তার ওঠানামা লক্ষ্য রাখায় বিশেষভাবে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি নিশ্চিত যে তাকে উতরে যাবার মত করে তৈরী করে দেওয়া যাবে ; সে এটা পারুক তা প্রত্যেকের চাওয়ার একটা বিশেষ কারণ ছিল ফাদার অড্রি এটা প্রতিষ্ঠা ক'রে দিয়েছিলেন যে সে সর্বসাধারণের জন্য সুযোগ আছে এমন একটা ছাত্রবৃত্তি পেতে পারে যা এর আগে কোনো কালো ছেলে জিততে পারে নি কি মায়াই না হবে, ছেলেটার জন্য, স্কুলের জন্য, সব আফ্রিকীয় ছেলের জন্য যাদের শুধুমাত্র নিকৃষ্ট 'পন্টু শিক্ষা'র যোগ্য মনে করা হয়। হয়ত কোনোদিন জোহানস্‌বার্গের রাস্তার এই ভিখারী বাচ্চা প্রথম কালো আফ্রিকীয় রোড্‌স স্কলার (Scholar) ও হতে পারে। একেই ফাদার অড্রি মজা ক'রে ব্রাদাব জর্জের অহমিকার পাপ বলে উল্লেখ করেন। কিন্তু কে জানে? এটা অসম্ভব নয়। ছেলেটার শরীরের ধাত সম্পর্কে—ব্রাদার জর্জ যা বলেন সম্ভবতঃ সেটাই সত্যি : 'তুমি পলের সেই বছরগুলোর জন্য খাবার খাওয়াতে পার না।'

পনেরোয় যে বছর পড়ল সে বছরের প্রথমভাগের শুরু থেকেই প্রেইজকে তালিম নিতে হ'ল, চাপ নিতে হ'ল, এবং খাটতে হ'ল যা এমনকি সে-ও আগে করে নি। তার

শিক্ষকরা তাকে প্রচণ্ড সহায়তা করলেন ; মনে হ'ল এমনভাবে সেও দুই হাতে এটার স্রোতে তাল রেখে এগিয়ে চলেছে যে বই থেকে চোখ তুলে তাকাচ্ছেই না। উৎসাহ দেওয়ার জন্য, ফাদার অড্রি তাকে পড়াশুনা সংক্রান্ত বেশ কিছু আন্তঃস্কুল প্রতিযোগিতায় প্রতিদ্বন্দ্বীতা করার সুযোগ করে দিলেন সেগুলো আসলে সাদা অ্যাংলিকান স্কুলগুলোকে মাথায় রেখে করা হয় বানানের শব্দজব্দ, বিতর্ক, সাধারণ জ্ঞানের প্রতিযোগীতা। সে বিশাল সাদা স্কুলের পালিশ করা হলঘরের মঞ্চে বসে তার ঠিক উত্তরগুলো দিয়ে যেত আফ্রিকীয় উচ্চারণের ইংরেজীতে যা তাকে ঘিরে থাকা ছেলেরা চাকরবাকর আর জিনিষ দিতে আসা ছেলেদের উচ্চারণ বলেই জানত।

ব্রাদার জর্জ মাঝেমাঝে তাকে জিজ্ঞেস করতেন সে ক্লান্ত কিনা। কিন্তু সে ক্লান্ত হ'ত না। সে শুধু চাইত তাকে যেন তার বই নিয়ে থাকতে দেওয়া হয়। হোস্টেলের ছেলেরা সেটা জানত ব'লে মনে হয় ; তারা আর কখনো তাকে তাস খেলতে বলত না, এমনকি পায়খানায় যখন তারা সিগারেট খেত, তার টানের সিগারেটটা বাড়িয়ে দিত চুপ করে। ফাদার অড্রির দুধের গ্লাস হাতে ঢোকাটা সে বিশেষভাবে চাইত না। সেই বইয়ের পাতায় মুখ দিয়ে বসে থাকত, যখন তখন, পড়ার ঘরে একা ; এবং সেটাই সব। বইয়ের স্যাঁতস্যাঁতে পাথুরে গন্ধটাই তার একমাত্র প্রয়োজন। যেখানে একসময় জিনিষগুলো ধরতে পারত না বলে বার বার নিজেকে জোর পাতায় ফিরিয়ে আনতে হ'ত? শূন্যতার মধ্যে ছাপাগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকতে হ'ত যতক্ষণ না মানেগুলো নিজেদের জড়ো করে তুলত, এখন ঝাঁক বাঁধা তথ্যগুলো ছেড়ে ওঠার দরকার হ'লে নিজেকে জোর করতে হয় যার বাইরে সে কিছুই বোঝে না ব'লে মনে হ'ত। কখনো কখনো ফাদার অড্রি দুধ নিয়ে আসবেন এই চিন্তায় কয়েক মিনিট একটানা কাজ করতে পারত না। উনি এলে অবশ্য ব্যাপারটা কখনো সত্যি সত্যি তত বাজে হ'ত না। কিন্তু প্রেইজ ওঁর মুখের দিকে চাইতে পারত না। দু'একবার যখন উনি আবার বাইরে গেলেন, প্রেইজ খানিকটা চোখের জল ফেলল। সে দেখল সে নিজে প্রার্থনা কবছে চোখে জল নিয়ে হাসছে, কাঁপছে, জ্বালা ধরানো যে জল নাকের ভিতর দিয়ে নেমে বইয়ে ছাপ ফেলে সেটা ঘষছে।

এক শনিবার বিকেলে ফাদার অড্রি অতিথিদের মধ্যাহ্নভোজে আপ্যায়িত করতে করতে পড়ার ঘরে এসে পরামর্শ দিলেন যে ছেলেটির খানিক খোলা বাতাসে যাওয়া দরকার—বাইরে গিয়ে ঘণ্টা খানেক ফুটবল খেল। কিন্তু প্রেইজ গত বছরের ম্যাট্রিকুলেশন প্রশ্নের জ্যামিতি নিয়ে লড়ছিল সেটা, সে সেদিন সকালে, ব্রাদার জর্জকে হতাশ সবটা ভুল ক'রে ফেলেছিল।

ফাদার অড্রি জানতেন ব্রাদার জর্জ কি ভাবছেন : এটা কি সেই গুণ (phenomenon)-এরই একটা উদাহরণ সেটা তিনি কম মেধার আফ্রিকীয় ছেলেদের মধ্যে প্রায়শঃ দেখেন—অক্ষমতা, সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটের অধিকারের অভাবের কারণে একটা খুব ভালো করে জানা কাজ করার, একবার যদি সেটা নিজের পাঠ্যপুস্তকে যেভাবে

দেওয়া আছে তার বাইরে সামান্য অন্যরকমভাবে দেওয়া হয়, এক্ষেত্রে, অবশ্য কোনো মানে হয়-না ; প্রত্যেকে ছেলেটাকে নিয়ে অতিরিক্ত দুশ্চিন্তা করে। একেবারে শুরুর থেকেই সে দেখিয়েছে তার চিন্তন প্রণালীর মধ্যে কোনো যান্ত্রিকতা নেই, তার একটা মস্তিষ্ক আছে, প্রতিবর্ত ক্রিয়ার এক সংকলনমাত্র নয়।

'ছেড়ে বেরোও। মাঠে নেমে কয়েকটা ধাক্কা খেয়ে এলে আরও ভালোভাবে সামলাতে পারবে।' কিন্তু মরিয়াভাব ছেলেটির মুখে একগুঁয়েমির মত হয়ে এঁটে বসেছে। 'আমি করবই, করবই, সে বলল, হাতের পাতা বইয়ের ওপর নামিয়ে রেখে।

'ভালো, তাহলে দেখা যাক দুজনে একসাথে মিলে এটার সাথে লরা যায় কিনা।'

চকচকে জুতো পেরোনো কালো আলখাল্লার খসখস শব্দ সিগারেটের একটা গন্ধ নিয়ে আসে। প্রেইজ উপাসনার কালো মালার দিকে চোখ রাখল ; যে চামড়ার কটিবন্ধনী থেকে সেটা ঝুলছিল বিশাল চেহারাটা বসার সাথে তাতে ক্যাঁচকোঁচ আওয়াজ উঠল। ফাদার অড্রি টেবিলের উল্টোদিকে বসে বইটা নিজের দিকে ঘুরিয়ে নিলেন। চোখের পাতাগুলো পাকিয়ে না ওঠা পর্যন্ত সেগুলো ঘষতে থাকলেন, নিজের বিশাল নাকের ওপর হাতটা টেনে আনলেন, এবং তারপর একমুহূর্ত চোখ বন্ধ ক'রে ঘষলেন, মুখটা অদ্ভুতভাবে খোলা এবং ঠোঁটগুলো পরিচিত বিকৃতির ভঙ্গীতে টেনে রাখা। একটা ঝটকা, যন্ত্রণায় তোলা হেঁচকির মত প্রেইজের শরীরে খেলে গেল। ফাদার আস্তে আস্তে সম্পাদ্যটা বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন, তাঁর স্বচ্ছন্দ, সাবলীল ইংরেজ স্বরে।

তিনি বললেন, 'প্রেইজ তুমি কি শুনছ?'—তাকে কিরকম অলস মনে হল, যেন শুনতে পায় না, যেন গলার আওয়াজটা তার কাছে এসে পৌঁছচ্ছে দূরের তারার আলোর পৃথিবীতে এসে পৌঁছনোর মত করে, যে তারা আগে থাকতেই মরে গেছে।

ফাদার অড্রি ওঁর মসৃণ হাতটা বাড়িয়ে দিলেন, প্রশ্ন করতে অথবা সমবেদনায়। কিন্তু ছেলেটা লাফিয়ে উঠল, একটা আঘাতে ছিটকে গেল। 'প্রভু—না।' 'প্রভু—না।'

এটা পরিষ্কার হিস্টিরিয়া ; সে কখনো ফাদার অড্রিকে 'ফাদার' ছাড়া অন্য কোনো সম্বোধনে ডাকে নি।

এটা একটা ভীতিকর পশ্চাদ্গমন, অবচেতনের দিকে পিছু হাঁটা, যেখানে প্রতীক আর সমষ্টির স্মৃতি ধরা থাকে। সে অন্য কোনো সময় থেকে আর কারো হয়ে কথা বলছে। ফাদার অড্রি উঠে দাঁড়ালেন কিন্তু তার পিছিয়ে আসা দিয়ে বিপদের আভাসের সাথে দেখলেন যে তিনিই ছেলেটির অনুসরণকারীতে পরিণত হয়েছেন, এবং তাকে ছেয়ে থাকা (clumsy) আতঙ্কের মধ্যে পথ হাতড়াতে হাতড়াতে তাকে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে দিলেন।

ছেলেটিকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য ব্রাদার জর্জকে পাঠানো হল। আধঘণ্টার মধ্যে প্রেইজ ফুটবল মাঠে হাজির হল, হাসছে আর ছুটছে। কিন্তু ফাদার অড্রি ঘটনাটা কাটিয়ে উঠতে কিছুদিন সময় নিলেন। তিনি চিন্তা করতে লাগলেন যখন তিনি ছেলেটাকে প্রায়

পেড়ে ফেলেছেন কিভাবে কেন সে পিছিয়ে গেল। প্রবৃত্তিটার কুশ্রীতায় তাঁর বিতৃষ্ণা জাগল, তিনি ভাবতে থাকলেন কেমন ক'রে এই শিকার ধরার প্রবৃত্তির বশবর্তী হয়ে শিয়াল, বুনো কুকুর নরম সরম খরগোশ আর ভেড়ার সারল্যের অপেক্ষা করে। এর আগে জীবনে কেউ তাঁকে ভয় দেখায় নি। যাঁরা তাঁর মত নয় তাদের জন্য এর আগে তিনি বিন্দুমাত্র চিন্তিত হন নি, তাদের জন্য যাদের থেকে অন্যরা মুখ ঘুরিয়ে নেয়। বিমুখতা আর অসন্তোষে ভরা করুণা অনুভব করলেন তাদের জন্য, মুখ থেকে লাল ঝরা শিকারীগুলোর জন্য। এমনকি তিনি ভাবলেন সে ধ্যানের জন্য কিছুদিন নিভৃতিতে গেলে তাঁর ভালো লাগবে, কিন্তু তাতে সেটা অসুবিধের—এত বেশী বাধ্যবাধকতা আছে তাঁর। শেষ পর্যন্ত ছেলেটার বাস্তব অবস্থা স্বাভাবিকতা ফিরিয়ে আনল। যতদূর ছেলেটার ব্যাপার, কেউ ভাববে যে কিছুই হয় নি। পরের দিন

পরের দিন মনে হ'ল সে এ ব্যাপারে সব ভুলে গেছে ; ভালো লক্ষণ। এবং সুতরাং ফাদার অড্রির নিজের ভেতরের ভাঙন, ছেলেটার শান্তভাবের কাছে প্রত্যাখ্যাত হয়ে, মিলিয়ে গেল। উনি পুরো ব্যাপারটার একটাই স্বীকারোক্তি ঘটতে দিলেন—কুমারী গ্রাহাম গ্রিগকে লেখা একটা চিঠিতে—অবশ্যই তাতে এটা নিয়ে কোনো বাড়াবাড়ি করা হয় নি-—বলা হ'ল যে ছেলেটা তার (final great) চেষ্টা নিয়ে উদ্বেগ অনুভব করছে, এবং তিনি যদি একবার দেখা করে যান ইত্যাদি ; কিন্তু তিনি তখনো ইংলণ্ডে রয়ে গেছেন—কিছু পারিবারিক সমস্যা তাঁকে সেখানে মাসাধিককাল আটকে রেখেছে, এবং সত্যি বলতে তিনি এক বছরের ওপর তাঁর পোষ্যকে দেখতে আসেন নি।

শেষ খেপে প্রেইজ একভাবে খেটে গেল। ফাদার অড্রি আর ব্রাদার জর্জ সমানে তার ওপর নজর রেখে চললেন। সে দারুণ ভাল করছিল ; এবং মনে হ'ল সে গর্ব আর আনন্দে আপ্লুত হয়ে গেছে যখন ফাদার অড্রি তাকে একটা নতুন কালোরঙের কালিপেন উপহার দিলেন। এই পেন দিয়েই সে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় লিখবে। এক সোমবার বিকেলে ফাদার অড্রি, যিনি সারা সকাল বিশপের সাথে এক অধিবেশনে ছিলেন, তাঁর পড়ার ঘরে খোঁজ নিতে এলেন, যেখানে প্রতিদিন বিকেলে ছেলেটা টেবিলে, যেটা তার জন্য ঢোকানো হয়েছে সেখানে থাকে। কিন্তু সেখানে কেউ নেই। বইগুলো টেবিলে পড়ে আছে। সূর্যরশ্মির একটা ধারা চেয়ারের বসার জায়গা বেয়ে নেমেছে। প্রেইজকে আর পাওয়া গেল না। স্কুলে খোঁজা হল ; পুলিশে খবর দেওয়া হল, ছেলেদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হ'ল ; সকালে এবং সন্ধ্যায় বিশেষ প্রার্থনা করা হল। সে কিছুই নিয়ে যায় নি বাদে তার কালির কলম।

সব করা হয়ে যাবার পর স্তব্ধতা ছাড়া আর কিছুই রইল না ; কেউ আর ছেলেটির নাম উচ্চারণ করল না। কিন্তু ফাদার অড্রি নিজের দায়িত্বে ছেলেটির তল্লাসী চালিয়ে যেতে লাগলেন। মধ্যে মধ্যে তাঁর মাথায় একটা করে ভাবনা আসত যা একধরনের আশাদায়ক স্বস্তি আনত। তিনি আডেলাইড গ্রাহাম গ্রিগকে লিখলেন।...যেটা আমার চিন্তা হয় যে আমার বিশ্বাস ছেলেটা স্নায়বিক চাপে ভেঙে পড়ার মুখে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল।

আমি তন্ন তন্ন করে খুঁজছি।' হতে পারে যে ও প্রোটেকটরেটের দিকে রওনা দিয়েছে। তিনি প্রধানের ব্যক্তিগত সচিব হিসেবে কাজ করছিলেন, এখন, কিন্তু লিখলেন যদি ছেলেটার হদিশ মেলে তাহলে তিনি পরিস্থিতিটা সামলানোর সময় করার চেষ্টা করবেন। ফাদার অড্রি এমনকি খুঁজে বের করার চেষ্টা করলেন 'পরিবার'টাকে—সেই লোকজন যাদের সাথে ভিখিরি হয়ে থাকার সময় কুমারী গ্রাহাম গ্রিগ প্রেইজকে আবিষ্কার করেছিলেন। তারা নতুন একটা শহরতলিতে চলে গেছিল, তাদের হদিশ পেতে কিছুটা সময় লাগল। উনি ২৮বি, ব্লক ই উপযুক্ত উপজাতি দলের মধ্যে খুঁজে পেলেন।

উনি আফ্রিকীয়দের ঘরদোরে ঢোকা বেরোনোয় অভ্যস্ত ছিলেন এবং বৃদ্ধা মহিলাটিকে তক্ষুনি ওঁর আসার ব্যাপারটা সাদা ভাষায় বুঝিয়ে বললেন, যেহেতু জিজ্ঞাসাবাদ করলে লোকজন কেমন সন্দিগ্ধ হয়ে ওঠে ওঁর জানা ছিল। এইসব বাড়ীগুলোয় কোনো অন্দরের দরজা থাকে না এবং একটা মেয়ে যে জামাকাপড় পরছিল উনি বসা মাত্র ওঁর দৃষ্টিপথ থেকে সরে গেল। সে ফাদার অড্রি আর বুড়ীর কথাবার্তা শুনতে পেয়ে মৃদু আগ্রহ নিয়ে ভেতরে এল। চুপচাপ থাকতে থাকতে বুড়ী হঠাৎ হঠাৎ বলে উঠছিল 'ইস—ইস্—ইস—ইস' মাথা বুকের কাছে ঝুঁকিয়ে কেতাদোরস্ত সমবেদনার ভঙ্গীতে সে নাড়াতে লাগল ; তারা ছেলেটাকে দেখে নি। 'আর ও এত ভাল কথা বলত, স্কুলের সবকিছু এত ভাল ছিল। কিন্তু তারা ছেলেটার সম্পর্কে কিছু জানত না, একেবারে কিচ্ছুটি না। অল্পবয়সী মেয়েটা মন্তব্য করল, হতে পারে পুরোনো গাড়ীতে যে ছেলেগুলো ঘুমোয় শহরে তাদের দলে আছে—জানেন?—বিয়ারের দোকানের ধারে।'

ভাষান্তর : পায়েল ভট্টাচার্য

আঃ আমারই কপাল

নাদিম গোর্ডিমার

পায়ের অবস্থা খুব খারাপ হবার আগে সারা আমাদের বাড়ীতে কাজ করত। সে খুব মোটা, গায়ের রঙ হালকা হলদে বাদামী। বেলুনকে ফোলানো রঙটা যেমন ফিকে হয়ে যায়, গায়ের রঙের দানার পাতলা স্তরের তলায় ফেঁপে ওঠা চর্বি স্তরটাকে ফুলিয়ে ক্রমাগত রঙের দানাগুলোর একটাকে আরেকটার থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে। তার চোখে গিলটি করা ফ্রেমের হালকা ছোট চশমা, সে ভাল রাঁধুনী, যদিও মাখনের ব্যাপারে তার হাত বেশ চড়া।

কিন্তু সেইসঙ্গে, সারার একটাইমাত্র বর সে চার্চে গিয়ে, নিয়মমাফিকভাবে সারাকে বিয়ে করেছে, তিন ছেলেমেয়ে রবার্ট, জেনেট আর ফেলিসিয়া যাদের বড় ক'রে তোলা নিয়ে সারার চিন্তার অন্ত নেই। ঝুঁকে পড়ে পরিষ্কার করতে করতে সে মাঝেমাঝে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ত, বেশী ওজনের মানুষরা যেমনটা করে, আসলে সে তখন ছেলেমেয়েদের কথা ভাবত। আঃ, মাংসের দোকানের লোক মেটের ভাগটুকু না পাঠালে অথবা হপ্তার কাচাকুচির মধ্যিখানে বৃষ্টি নামলে সে বলত। যেন নিজের জীবনের সব ঝামেলা থেকে সে বুঝতে পেরে গেছিল বোজকার ব্যাপার স্যাপার এর চেয়ে ভালোভাবে সে আশাই করতে পারে না। প্রথমদিকে তার এই মন্তব্য যেটা সে বাইবেলের বাণীর ধাঁচে বলত, আপাতভাবে যেটা এত বেখাপ্পা শোনায়, সেটা নিয়ে আমরা হাসাহাসি করতাম। কিন্তু পরে আমরা বুঝলাম। ও বলত, আঃ আমারই কপাল ; এবং এটাই জীবন সম্পর্কে ওর মন্তব্য।

ছেলেমেয়েরা তাদের জায়গায় গিয়ে পৌঁছুক এটা চাইত বলেই তিন ছেলেমেয়ে নিয়ে ওর এত দুশ্চিন্তা ; ও তাদের পড়াশুনো করাতে চাইত, ও চাইত ছেলে যেন একটা ভদ্রস্থ কাজ পায়, ও চাইত মেয়েরা তাদের কুমারীত্ব নিয়ে বড় হয়ে উঠুক আর তাদের বিয়ে হোক গীর্জেয় গিয়ে। ব্যাস এটুকুই। নিজের মিশন স্কুলের শিক্ষা যেটা সুকৌশলে এই জীবনের থেকে বরং পরলোকের ওপর বেশী জোর দেয়, তা তাকে যথেষ্ট বিপজ্জনক কিংবা যথেষ্ট সাহসী কিংবা যথেষ্ট স্বাধীন কিংবা এমনকি যথেষ্ট শিক্ষিতও করে নি যাতে সে ভাবতে পারে যে কোন জায়গাই তার ছেলেমেয়েদের জায়গা হয়ে উঠতে পারে ; কিন্তু তাকে ঠিক ততটুকু উন্নত করেছিল যাতে সে বিশ্বাস করতে পারে জায়গা কোথাও একটা আছে ; সাদাদের জায়গায় ভাগ বসানো নয়, কিন্তু কোনো জায়গা থাকবে না এমনটাও নয় : নিজেদের নিজস্ব একটা জায়গা। তারা যাতে সে জায়গাটুকু পায় এবং

সেখানে থাকে এটাই সে চাইত। এটা হওয়া যে সোজা নয় সেটা জেনে যাওয়ার মত যথেষ্ট অভিস্পাশূন্য-বাস্তববাদী ছিল সে। আবার এটা হওয়া কেন এত কঠিন তা জিজ্ঞেস করার পক্ষেও সে যথেষ্ট রক্ষণশীল ছিল। পৃথিবীটা যেমন সেভাবেই সেটাকে নিয়ে চলতে হবে, ও বলত।

বাচ্চাদের জন্য সে যা চাইত শুনলে মনে হবে সেটা খুব সাধারণ, কিন্তু তা নয়। যে জায়গায় দাঁড়িয়ে চাইত সেখানে নয়।

প্রথমে সে মহল্লায় এক আত্মীয়র বাড়ীতে ছেলেমেয়েদের জন্য একটা ঘর ভাড়া নিল। তাদের খাবারের টাকা দিয়ে দিত আর প্রতি রোববার তাদের দেখতে যেত সেই তুতো ভাইয়ের কাজ ছিল বাচ্চারা যাতে ঠিকমতো স্কুলে যায় আর অন্ধকারের পর মহল্লায় ঘুরে ঘুরে না বেড়ায় সেটা দেখা ; সারা যতটা ঐকান্তিকভাবে শিক্ষায় বিশ্বাস করত ঠিক ততটাই অন্ধকারের কলুষকে ভয় পেত। কিন্তু শিগ্‌গীরই এটা পরিষ্কার হয়ে গেল যে রবার্ট বেশীর ভাগ স্কুলের দিনে গল্‌ফের মাঝে খেলোয়াড়দের সাজসরঞ্জাম বয়ে বেড়ায়--(কেন। কেন। কেন! অপমানে সারা ডুকরে উঠল—এবং রবার্ট ওর হাত খুলে দেখাল, চালাকচতুর হনুমানের অপ্রত্যাশিত ছোট্ট থাবার মত হাতের পাতা, তাতে হাতের ভাপে ভিজে থাকা ছয় পেন্স আর একটা টিকি পড়ে রয়েছে) আর ফেলিমিয়া আর সব ছেলেমেয়েদের মত রাত্তিরবেলা অন্ধকার, ধোঁয়াভরা পথে চেঁচামেচি করে দৌড়ে বেড়ায়। আর সব ছেলেমেয়েরা যারা বার্তাবহ ভৃত্য বা নার্স হবে তাদের জন্য এসব ঠিক আছে ; কিন্তু সারার ছেলেমেয়ের জন্য নয়।

সে তাদের বোর্ডিং স্কুলে পাঠিয়ে দিল।

সঙ্গে সঙ্গে কি কি জিনিষ তাদের অবশ্যই লাগবে তার তালিকা তৈরী হল, শুরু হল খিড়কির দোরে বরের সাথে অন্তহীন আলাপ আলোচনা, ধীরে ধীরে গোলাপী রঙের টাকা চালাচালি করা আর সুতির তামাক রাখা থলেয় আধুলি গোনা। সে তাদের জন্য খরচ করল, শুধুই টাকাপয়সা নয়—টাকাপয়সা আসে আবার যায়—কিন্তু তার যা ছিল সব, ডাকঘরের ন' পাউণ্ড, তার মজুরি, প্রত্যেক মাসে। এমনকি তাতেও কুলোল না, কেননা স্কুলটা নাতালে, এবং সে তাদের জন্য বছরে একবারের ট্রেনভাড়া খরচ করতে পারত যার জন্য বড়দিনের ছুটী ছাড়া আর সব ছুটীতে বাড়ী থেকে তিনশো মাইল দূরের স্কুলে ওদের থেকে যেতে হত। কিণ্তু ওরা শিক্ষিত হচ্ছিল। সে আমায় ওদের চিঠি দেখাত--প্রতিশ্রুতিহীন, আবেগেবর্জিত সাধারণতঃ কিছু চেয়ে পাঠিয়ে লেখা চিঠি। মাঝেমধ্যে আমি ওকে ওদের পাঠানোর জন্য মিষ্টি দিতাম। উত্তরে জেনেটের কাছ থেকে একটা চিঠি পেলাম, ধন্যবাদ দিয়েছে সে, মার্জিত কিন্তু উপহারের জন্য খুশী হয়েছে এমন কোনো ইঙ্গিতের ছিটেফোঁটাও সে চিঠিতে নেই। সারা সবসময় চিঠি পড়তে দিত, দেখার জন্য, আমি জানি, চিঠিতে শ্রদ্ধা প্রকাশ পাচ্ছে কিনা ব্যাপারটা গুরুত্বপূর্ণ। যখন চিঠিটা আবার ভাঁজ করে রাখতাম তখন তার মুখে শান্ত স্বস্তির ভাব ফুটে উঠত। হ্যাঁ, সে বলত, আমি জানি ওখানে ওদের দেখাশুনো হচ্ছে।

যখন বড়দিন এল, তাকে বাচ্চাদের বছরের ছুটী কাটানোর জন্য মহল্লায় ঘর ভাড়া নিতে দিতে আমার লজ্জা করল, আমি বললাম চাইলে উঠোনে তাদের নিয়ে থাকতে পারে সে। গায়ে কালো পোশাক আর ঝালর দেওয়া চাদর চড়াল সে—পুরোনো ভিক্টরীয় কিছু আদবকায়দা আঁকড়ে চলত ও সেগুলো খুব সুবিধের নয়, কিন্তু অবশ্যই কালো মেয়েরা যেমন হাল আমলের ইউরোপীয় অশোভনতার কিছু ধারা শিখে নেয় তেমন কুৎসিতও নয়—তারপর ছেলেমেয়ের সাথে দেখা করার জন্য স্টেশনে রওনা দিল, পায়ের অবস্থা আবার খারাপ হয়েছে, তাই জোরে হাঁটতে পারবে না ব'লে অনেক আগেই রওনা দিল সে। সারাদিন তার বাইরে কাটল, আমি বরং রেগেই গেছিলাম, কিন্তু যখন তাকে তিন ছেলেমেয়ে নিয়ে ফিরে আসতে দেখলাম তার ভেতরের উৎসবের আমেজটুকু সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠলাম এবং কিছু বললাম না।

ওরা নজরে পড়ার মত ভালো ছেলেমেয়ে। আমি কখনো এত ভালো বাচ্চা দেখি নি। এত রুদ্ধবাক, এমন ছায়ার মত চলাফেরা, খেলাধুলোর সময়ও এত অবদমিত। বড্ড বেশী ভাল : সারার ঘরের দেওয়ালে ঠেস দিয়ে রোদ্দুরে চুপচাপ বসতে আসা মেয়েরা, নিজের লাঠির টুকরো আর পাথর নিয়ে বেড়ার ধারের আগাছায় বসে থাকা ছেলে। মেয়েরা কাপড় কাচত আর লাল পশমের টুপি বুনত ; তাদের হাসি থাকত গোপন, কখনই খোলামেলা নয়, যেমনভাবে মাটির নীচ দিয়ে মৃদু কলধ্বনিতে বয়ে যাওয়া জলপ্রবাহকে শোনা যায়। তাদের হাসি বিষণ্ন আর সুন্দর ; কিন্তু কেতামাফিক, প্রফুল্লতা নয় ছেলেটা একেবারেই হাসত না। যখন বেড়াতে আসা কোনো ছেলের ফেলে যাওয়া একটা জলবন্দুক তাকে দিলাম, সে এমন মুখ ক'রে নিল যেন সেটা একটা শাস্তি। সে সেটা বাক্সে তুলে রাখল, ম্যাডাম, সারা গর্বিতভাবে হাসল। ওঃ, হ্যাঁ, ওর কাছে ঐ বন্দুক পাওয়াটা একটা বিশাল ব্যাপার, ম্যাডাম। ও বোধ করছে ও এখন একজন বড়সড় মানুষ হয়ে উঠেছে।

ওদেরকে উঠোনের বাইরে বেরোতে দেওয়া হত না, যদি না তাদের মা তাদের সঙ্গ দিত, অথবা তার তরফ থেকে কোনো তল্পিবওয়া ছেলের দায়িত্বে তাদের পাঠানো হত। একদিন সকালবেলায় রবার্ট উধাও হল এবং দুপুরবেলা খাবার সময় ধুলাধূসর পা আর ঘাসের ফুটকিতে ছাওয়া জামাকাপড় নিয়ে ফিরে এল। সারা সারাসকাল জুড়ে নালিশ করছিল : আমি জানি ও কোথায় গেছে। আমি জানি, গলফ মাঠে। গলফ্ মাঠেই। তার পা তাকে ঝামেলায় ফেলেছিল, তা নইলে সে ওকে ধরতে ওখানে চলে যেত। ক্লান্ত শহীদের ধরণ নিয়ে সে অনেকক্ষণ ধরে আচ্ছা ক'রে ওকে পিটুনি দিল, কিন্তু কোনো রাগ নিয়ে নয়। ও কেঁদেই চলল কেঁদেই চলল, ব্যাথার বদলে বরং যেন কোনো এক বিষণ্নতা থেকে।

প্রচণ্ড রাগের পরে শুধু কান্নাই নয়। দিনকতক ধরে সারা বাচ্চার পালানো নিয়ে বকবক ক'রে চলল ; তিনজোড়া চোখের সামনে ফ্যাকাশে, ফেরানো, রান্নাঘরের দরজা দিয়ে সে উঠোনে আসার সময় তাকে দেখার জন্য ; বকুনি রোদ্দুরের সাথে মিলে

ছেলেটার নীচু করে রাখা মাথায় গিয়ে ঠেকত সে তখন খেলে চলেছে।

সারা বাচ্চাদের প্রতি দুঃখজনকভাবে কঠোর ছিল, অবিরাম তাদের বকাবকি করত আর উপদেশ দিয়ে চলত সে। সামান্যতম বিচ্যুতিও তার দুঃখ আর অননুমোদনের স্থায়ী, ক্ষুরধার বর্ষণের বিস্ফোরণ ঘটাত যা শিশুর উজ্জ্বল স্ফুলিঙ্গটুকু ওপর, চারপাশ সবদিক দিয়ে চুঁইয়ে পড়ত। এই একাগ্রতার কাছে, তার যুক্তির মৃদু, নাছোড়বান্দা, শুষে নেওয়া উপস্থিতির কাছে স্ফুলিঙ্গটুকু সেঁতিয়ে যেত। ওকে বললাম সম্ভবতঃ ও বাচ্চাদের প্রতি বড্ড বেশী কঠোর—ঠিক এরকমটা নয়, কিন্তু তারপর আমি নিজের মনেই পরিষ্কার হতে পারলাম না যে ওদের কি হতে পারে বলে আমি মনে করি—এবং সে এক মুহূর্ত হাতড়াল, তারপর আবেদন জানাল, বাস্তবের সোজাসাপটা দিকটা দিয়ে, কিন্তু ওদের কখনো না কখনো এর মুখোমুখি হতেই হবে, দিদিমণি। যদি এখন শেষে সে যা চায় তা-ই ওরা করতে পারে না, পরে এটা ওদের রাগাতে পারবে না। ওদের শিখতেই হবে, সে বলল--এবার কঠোর—ওদের শিখতেই হবে।

আমার মনে হয় ও একঘেয়েমী দিয়ে ওদের দারুণ ক্লান্ত করত।

ওরা স্কুলে ফিরে গেল, ট্রেনে চড়ে আরেক বছরের নামে। কে জানে ওরা কি অনুভব করছিল? বলা অসম্ভব। শুধু জেনেট, মাঝের জন একটু কাঁদছিল। ও চালাকজন, সারা হাসল, ও শিক্ষিকা হতে চলেছে। এখনই ও স্ট্যাণ্ডার্ড ফাইভে পড়ছে। যদিও দু'বছরের বড়, শরীরের গঠনে চমৎকার বড়সড় মহিলা, ফেলিসিয়াও একই ক্লাসে পড়ে। তার জন্য নির্দিষ্ট কোনো পরিকল্পনা নেই, কিন্তু জেনেটের জন্য—জেনেটের নিশ্চয়তার জোরে সারা হাসি ঠেকিয়ে রাখতে পারত না—জায়গা একটা আছে।

ওরা আর কখনো আমাদের উঠোনে ফিরে আসে নি। বছর ধরে, সারার পায়ের খারাপ হওয়া বেড়েই চলল, এবং সে কাজ ছেড়ে দিল। সে মহল্লায় থাকতে পেল আর বাড়ী বসে করা যায় এমন সামান্য কাচাকুচির কাজ যোগাড় করে নিল। কিন্তু, অবশ্যই, বোর্ডিং স্কুলের এখানেই ইতি ; বরের একার রোজগারে, খাবার খরচের সাথে মহল্লার বাড়ীভাড়া দিয়ে, সোজাকথায় এটা কুলোন গেল না। সুতরাং ছেলেমেয়েরা বাড়ী এল এবং তাদের মায়ের সাথে থাকতে লাগল এবং মহল্লার স্কুলে যেতে লাগল। সে আমায় দেখতে এল, সমস্যাগ্রস্ত দেখতে পেলাম, পায়ের তলা থেকে শক্ত মাটি হারিয়ে যাওয়ার জোরালো অনুভূতি থেকে, কিন্তু পা হড়কানোটা ঠেকানোর পথ খুঁজছে এবং যদিও পড়াশুনোটা সেরকম ভালো হবে না, সে নিজে তাদের কিরকম চলা উচিত শেখাতে পারবে এই সান্ত্বনার মধ্যে স্বস্তি খুঁজছে। কথা বলতে বলতে রান্নাঘরের চেয়ারে বসল সে, আস্তে আস্তে পা দুটো ঠিক করে রাখতে লাগল, ক্রেপ ব্যাণ্ডেজের বাঁধনে সেগুলো থামের মত ফোলা।

সে নিজে আর কখনো আসে নি। তার পায়ের অবস্থা খুব খারাপ হয়ে পড়েছিল। সে ছেলেমেয়েদের—মাঝে মাঝে জেনেটকে একা—আমাব সাথে দেখা করতে পাঠাত। তারা কখনো কিছু চাইত না, এসে আমি লক্ষ্য না করা পর্যন্ত ধৈর্য্য ধরে পিছনের উঠোনে

দাঁড়িয়ে থাকত, এবং তারপর খুব নরমভাবে আমার প্রশ্নের উত্তর দিত, আমার দিকে বাদে অন্য যে কোনো দিকে তাকিয়ে থাকা বিরাট চোখ নিয়ে। হ্যাঁ, তাদের মায়ের পায়ের অবস্থা খারাপ। না, ঠিক যেমনটি তারা আগে ছিল। না, তিনি আর কাচাকুচির কাজ নিতে পারেন না। হ্যাঁ, তারা এখনো স্কুলে যাচ্ছে। আমার সবসময় একটা অদ্ভুত অনুভূতি হত যে তারা অপ্রস্তুত বোধ করছে, আমার দ্বারা নয়, আমার জন্য ; যেন তাদের মুখগুলো জানত আমার এই একই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা না করে উপায় নেই, কারণ তাদের জীবনের আসল অবস্থা আমার অজানা এবং কল্পনাতেও নেই, এবং সেজন্য আমার জিজ্ঞাসাবাদের উর্ধ্বে। সাধারণতঃ ওদের প্রত্যেকের জন্য একটা ক'রে কমলা থাকত, এবং কোনো পুরোনো জামা বা পুলওভার যা দেখে ওঠার আগেই সংসারের অসংজ্ঞায়িত কিন্তু খামখেয়ালী তলা দিয়ে গলে যেত। প্রতিবার তারা আসত—তারা—ঠিক অপরিচ্ছন্ন নয়, কিন্তু আরও ঢিলেঢালা ; ফেলিসিয়ার জার্সিতে একটা বড় সেফটিপিন, রিপু না করা ছোট একটা ফুটো রবার্টসের প্যান্টে উঁকি মারছে। এমনকি জেনেট, একটা ছেঁড়াখোঁড়া শর্টস্কার্ট পরে, যেটা একটা ছেঁড়াখোঁড়া শর্টস্কার্টই ; ইস্ত্রি করা, রিপু করা, শক্ত-শক্ত সম্মানজনক, পরিচ্ছন্ন নেকড়া নয়। হ্যাঁ খাবারদাবার জামাকাপড়ের দাম বাড়ছিল বোধ করি ওরা আরও গরীব হয়ে পড়ছিল।

ওদের দিক থেকে কোনো আসা-যাওয়া ছাড়া অনেকদিন কাটল। আমি অন্য কালো মেয়েদের জিজ্ঞেস করতাম : সারা কোথায়? সারাকে দেখেছ? ওরা ওকে খুব একটা পছন্দ করত না। জানি না, ওরা বলত, কাঠকাঠভাবে। আমি শুনতে পাই সে অসুস্থ, তার পায়ের অবস্থা খারাপ।

সারার বর কাজ করছে না, আমার মেয়েটা একদিন মন্তব্য করল, রান্নাঘরের টেবিলটা ঘষতে ঘষতে। কি? কাজ করছে না? আমি বললাম। তাহলে ওরা চালাচ্ছে কেমন করে? ওর পায়ের অবস্থা খারাপ, ও কাজ করছে না, ক্যারোলিন বলল, কাঁধ ঝাঁকিয়ে। আমি জানি, আমি বললাম, কিন্তু ওদের খেতে হবে। ছোট ছেলেটা কাজ করছে, ক্যারোলিন মন্তব্য করল। ও ডেয়ারীর পেছন দিকে কাজ করছে। তার কথার অর্থ ও মাল তৈরীর ঘরের মেঝে পরিষ্কার করছে, ধোয়ামোছা করছে।

আমি তাকে বললাম পরেরবার মহল্লায় গেলে ও যেন সারার খোঁজ নেয় আর সাহায্য করার জন্য আমি কি করতে পারি সেটা দেখে। সে ফিরে এসে বলল : সারার বর আরেকটা কাজ পেয়েছে। আগের কাজটার পক্ষে ও বেশী বুড়ো হয়ে পড়েছিল। এখন একটু ছোট একটা কাজ পেয়েছে। কিছু করতে পারি? আমি জিজ্ঞেস করলাম—তুমি তাকে বলেছ? ক্যারোলিন আমার দিকে চোখ তুলে তাকাল। তার বর অন্য কাজ পেয়েছে, সে ধৈর্য্যের সাথে বলল, যেন আমি কোনো কথা একবার বললে বুঝি না।

এক মঙ্গলবার সকালবেলা ক্যারোলিন পেছনের বারান্দায় ইস্ত্রি করা ছেড়ে ভেতরে এসে বলল : সারার মেয়ে উঠোনে আছে এবং বলেই ইস্ত্রিতে ফিরে গেল।

গোলমরিচ গাছের তলায় দাঁড়িয়ে জেনেট পাথরের ওপর তার খালি পা মোচড়াচ্ছিল, তার ভঙ্গী থেকে আমার মনে হ'ল সে নিশ্চয়ই লম্বা সময় ধরে ওখানে অপেক্ষা করছে। যতক্ষণ না ক্যারোলিন তাকে নজর করেছে। এখন সে বলল, সুপ্রভাত, দিদিমণি এবং অনিচ্ছুক ভঙ্গীতে সিঁড়ির ধাপের দিকে এগিয়ে এল, নিজের পায়ের পাতা লক্ষ্য করতে করতে। সে আর ছোট্ট মেয়েটি নেই। শিশুসুলভ গোলাচে পেট সমান হয়ে নিতম্বের বাঁকে মিশেছে এবং অতি ছোট, টানটান জার্সি কম্পমান নবীন স্তনের সাথে উঁচু হয়ে আছে।

জার্সিটা নোংরা, একেবারে যাচ্ছেতাই অবস্থায়। তার ছোট্ট কানে গোল, গোলাপী, চকচকে কাঁচের টুকরো বসানো পেতলের দুল। শুনলাম তোমরা অসুবিধায় পড়েছ, জেনেট, আমি বললাম, আমাকে এখন আর একটা বাচ্চার সাথে কথা বলতে হবে না ভেবে।

হ্যাঁ, দিদিমণি, ও বলল, খুব আস্তে, তার স্বর এখনও শিশুরই।

বাবার কাজ চলে গেছে? আমি বললাম।

হ্যাঁ, দিদিমণি, ও বলল, ধীরে ধীরে মাথা নেড়ে, সারার মত। সমস্যা হচ্ছে।

এবং রবার্ট কাজ করছে? আমি জিজ্ঞেস করলাম।

দুগ্ধপ্রকল্পে, সে বলল। এবং নিজের পায়ের পাতার দিকে তাকাল।

আর ফেলিসিয়া কোথাও একটা কাজ পেল না? আমি জোর দিয়ে বললাম, সারার তার মেয়ে নার্স হবার ব্যাপারে আতঙ্কের কথা ভেবে।

ও চলে গেছে, দিদিমণি, মেয়েটি বলল, ক্ষীণভাবে।

সে, কি করেছে? ভালো ক'রে শোনার জন্য ভুরু কোঁচকালাম। ও ব্লোয়েমফনটেইন-এ চলে গেছে। দিদিমণি, সে বলল, এত ক্ষীণভাবে যে কোনোমতে ধরতে পারলাম। ও বিয়ে করেছে, দিদিমণি।

ভাল, চমৎকার! খুব ভাল হয়েছে, তাই না? তোমার মা নিশ্চয়ই খুব খুশী হয়েছেন।

ও কিছু বলল না।

তাহলে বাড়ীতে এখন শুধু তুমি, জেনেট? এবং এখনও স্কুলে যাচ্ছ তো? এখনও একজন হবু শিক্ষিকা, অ্যাঁ?—আমি নিশ্চিত ছিলাম এবার ও হাসবে, ওর গলার আওয়াজ সেটা ওকে মুছে দিয়ে, আমার কাছ থেকে হারিয়ে গিয়ে মিলিয়ে যাচ্ছিল সেটা এবার তুলবে।

আমি বাড়ীতে আছি, দিদিমণি, সে বলল, লাজুকভাবে।

বাড়ীতে?

হ্যাঁ আমি বাড়ীতে মায়ের সাথে আছি—স্বরটা পালিয়ে যাচ্ছিল, নীরবতায় মিলিয়ে যাওয়ার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছিল।

বলতে চাইছ যে সারাটা সময় তুমি বাড়ীতেই কাটাও, জেনেট? আমি জোরে জোরে বলে উঠলাম।

আমি মায়ের সাথে বাড়ীতে থাকছি। তাঁর পায়ের অবস্থা খুব খারাপ। তিনি আর হাঁটতে পারেন না।

তার মানে তুমি একেবারেই স্কুলে যাও না? শুধু মায়ের দেখাশুনো কর?

হ্যাঁ, দিদিমণি, সে বলল, বড় করে চোখ মেলে শক্তভাবে নিজের পায়ের দিকে তাকিয়ে। তারপর সে মাথা তুলে আমার দিকে তাকাল, কোনো আগ্রহ ছাড়া, কোনোরকম ভান ছাড়া, যেন সূর্যের দিকে সরাসরি চেয়ে চোখ ধাঁদিয়ে গেছে।

আমি বললাম, তখনও গলার আওয়াজ উঁচুতে এক মিনিট দাঁড়াও, জেনেট। তোমার জন্য একটা জিনিষ আছে। মনে হয় আছে—এবং বাড়ীর মধ্যে পালিয়ে গেলাম। ছুটে গেলাম ওয়ার্ড্রোব অবধি, একটা জামা আর একটা পুরোনো কর্ডের স্কার্ট টেনে বের করলাম, সে দুটো একসাথে করে পুঁটুলি পাকালাম। হলঘরের মাঝামাঝি এসে আবার হলঘরে ফিরে গেলাম এবং টাকার ব্যাগ থেকে পাঁচ শিলিং বের করলাম।

বাইরে উঠোনে সে তখনো একইভাবে দাঁড়িয়ে আছে। কোথায় আছে তা যেন জানে-ই না বলে মনে হল।

আমি তাকে পুঁটলিটা দিলাম, বললাম, এই যে, আমার এগুলো তোমার হবে, জেনেট—এবং তারপর আমি টাকাটুকু বাড়িয়ে ধরলাম—যেন ওগুলো তপ্ত, বললাম, এটা তোমার মাকে দিও।

ধন্যবাদ, দিদিমণি, ধরা গলায় সে বলল, এবং মনে হল তার গলায় কোনো আওয়াজই নেই। সে জামাকাপড়ের খুঁটে টাকাটা বেঁধে নিল, তারপর জামাকাপড়গুলোকে আবার পোঁটলা পাকাল। আমি উঠোনেই রয়ে গেলাম, ঠিক কি করতে হবে না জেনে। ক্যারোলিন গাড়ীবারান্দাটার জানলা দিয়ে আমায় দেখছিল। আমি হঠাৎ ডেকে উঠলাম, ক্যারোলিন, জেনেটকে একটু চা দেবে?

ক্যারোলিন কখনো এগারোটার আগে সকালের খাবার খায় না ; ঠিক এই সময়। কয়েক মিনিট বাদে আমি যখন রান্নাঘরে গেলাম, জেনেট টেবিলে বসে, তার মুখ বড় চায়ের মগে, তিন টুকরো রুটি আর জ্যাম তার পাশে। মগ থেকে মুখ সরিয়ে সে হাসল খুব ক্ষীণভাবে, খুব লাজুকভাবে, চোখ দিয়ে।

আমি শুনলাম ক্যারোলিন তার সাথে কথা বলছে, এবং অনতিবিলম্বে ক্যারোলিন এসে বলল ও চলে যাচ্ছে।

সে আবার উঠোনে দাঁড়িয়ে, তার হাতে তার পুঁটুলিটা। আমি হাসিমুখে বেরিয়ে এলাম, ওর জন্য একটু ভালো লাগছিল। বিদায় জেনেট, আমি বললাম আর মাকে বলো আশা করছি উনি একটু ভালো হয়ে উঠবেন। এবং তুমি অবশ্যই এসে জানাবে উনি কেমন আছেন, অ্যাঁ?

কোনো উত্তর এল না, এবং একেবারে হঠাৎই দেখলাম যে সে নিজেকে সংযত করার প্রচণ্ড চেষ্টা করছে, যে সে একেবারে মরিয়া হয়ে কেঁদে উঠতে চাইছে। মনে হল চোখে যে জল ঠেলে আসছে তাতে তার সারা শরীর ফুলে ফুলে উঠছে। তার

চোখ বড়, আরও বড় হয়ে উঠল, আরও আরও স্বচ্ছ কাঁচের মত ; এবং তারপর সে কাঁদতে শুরু করল, চোখ আর নাক দিয়ে জল পড়তে থাকল, ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে হিক্কা তুলে তুলে সে কেঁদে চলল।

কি হয়েছে জেনেট, আমি বললাম। কি হয়েছে?

কিন্তু সে শুধু কেঁদে চলল, চোখের জলে মাখামাখি হওয়া হাত দিয়ে সিক্ততাকে আটকানোর চেষ্টা করতে করতে।

কিন্তু কি হয়েছে, মা, কি হয়েছে? কক্ষনো কাঁদে না। কি হয়েছে? আমায় বল?

সে কথা বলার চেষ্টা করছিল কিন্তু চোখের জলে কেঁপে ওঠা দীর্ঘশ্বাসে আটকে যাচ্ছিল : আমার মা—তিনি বড় আসুস্থ..., শেষ অবধি সে বলল।

এবং সে আবার কাঁদতে শুরু করল, কুঁকড়ে যাওয়া মুখে, ফোঁপাতে ফোঁপাতে, হাঁপাতে হাঁপাতে। মরিয়া হয়ে, সে তার ভেজা হাত দিয়ে নাক ঘষতে শুরু করল।

ওর জন্য আমি কি করতে পারি? কি করি?

এই যে..., আমি বললাম, এই যে—এই নাও, এবং ওকে আমার হাতের রুমালটা দিলাম।

ভাষান্তর : পায়েল ভট্টাচায

না ট ক

ক্যামউড অন দ্য লীভস্

ওলে সোয়িংকা

ক্যামউড অন দ্য লীভস্ Camwood on the Leves) নাটকটি প্রকাশিত হয় ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দে। এটি একটি বেতার নাটক। ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বরে লাইজোরয়া ব্রডকাস্টিং করপোরেশন নাটকটি প্রচার করে। ১৯৬০ তে প্রচারিত হয় বি. বি. সি. থেকে। এটি একটি বেতার নাটক হলেও মঞ্চনাটকেও রূপান্তরিত হতে পারে বলে মনে করা হয়। পশ্চিম আফ্রিকার য়ুরুবা সভ্যতার সঙ্গে পাশ্চাত্য সভ্যতার টানাপোড়েন নিয়ে গড়ে উঠেছে এ নাটক। যুক্ত হয়েছে প্যাগান ও খ্রিস্টানদের দ্বন্দ্ব। ঐতিহ্যের উৎসকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন নাট্যকার। এ সমস্যাকে অবশ্য আড়ালে রেখে তিনি দুটি প্রজন্মের সংঘাতকে তুলে ধরেছেন। সে হিসেবে এ নাটক যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ।

Camwood শব্দটি বেশ অপ্রচলিত। সাধারণ ইংরেজি অভিধানে নেই এ শব্দ। যাইহোক, অভিধানে এর অর্থ পাওয়া যাচ্ছে The red wood of Basita Milida imported the Gaboon used chiefly for dyeing purpose, also for violtin bowls. রঙ করার উপযোগী একধরনের গাছের রস যা বেহালার ছড় ঘষতেও লাগে। এটি একেবারেই আফ্রিকার স্থানীয় কোনো গাছের রস। আমাদের দেশেও অবশ্য এ ধরনের গাছের রস আছে। নাটকের প্রথম গানটির মধ্যে (যা আবার শেষ গানও বটে) শব্দটি রয়েছে।

এ নাটকের লেখক ওলে সোয়িংকা আধুনিক আফ্রিকার উল্লেখযোগ্য লেখক। নাইজিরিয়ায় তাঁর জন্ম ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দে। গোড়ায় গল্পকার হিসেবে আত্মপ্রকাশ করলেও তিনি খাতিমান নাট্যকার বলেই। তাঁর প্রথম নাটক মঞ্চস্থ হয় ১৯৫৯ খ্রিষ্টাব্দে। তারপর 'এ ড্যান্স অব দ্য ফরেস্টস', 'দা লায়ন অ্যাণ্ড দ্য জুয়েল', 'বিফোর দ্য ব্ল্যাকআউট', 'কংগোস হারভেস্ট', 'ডেথ অ্যাণ্ড দ্য কিংস হর্সম্যান', প্রভৃতি নাটক তার খ্যাতিকে পৃথিবী ব্যাপী করে তুলেছে। তাঁর এ খ্যাতি তাঁকে দিয়েছে নানাধরনের পুরস্কার। অবশেষে তিনি পেয়েছেন নোবেল পুরস্কার ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দে।

চরিত্রলিপি

মোযি : রেভারেণ্ড এরিনযোবি : ইসোলা : মোরুনকে।। মিঃ ওলুমোরিন।
মিসেস ওলুমোরিন। শিশুর দল, মানুষ, জনতা প্রভৃতি
।। ঘটনাস্থল পশ্চিম আফ্রিকার একটি য়ুরোবা শহর।।

(১) গান

অগ্রে ত্‌' ওর' ওমো রে দ্‌' অরো ও...ওলেন্‌লে
অলুকো ত্‌' ওর্‌' ওমো রে গ্‌ ওসুনো...ওলেন্‌লে
বাবা ইয়োকু ত' ওর্‌' ওমো রে প্‌'অ গো গো ইদে ও
অওয়া ও লে তরো ইউয়োন ইয়েন
ক্‌' অ মো আ ব্‌ 'ও লু স' এ রে ইমোরন্‌...
ওলেন্‌লে

প্রচণ্ড ধাক্কার শব্দে শুরু।

মোযি।। দরজা খোল। ইসোলা দরজা খোল। (দরজায় আবার ধাক্কা দেয় সে) ইসোলা, তোর মায়ের দোহাই, মিনতি করছি বাপ আমার, দরজা খুলে দে আমাকে...আমাকে কথা বলতে দে তোর সঙ্গে, দোহাই...বাপ আমার...দরজা খোল। (আরো মরিয়া হয়ে) ইসোলা, তোকে আমি কি করেছি? আমাকে বন্ধ দরজার বাইরে রেখেছিস কেন? বাবা আমার, ঈশ্বরের ক্রোধ আমাদের বাড়ির ওপর নেমে আসবার আগেই খুলে দে দরজাটা।

তাঁর ধাক্কা আরো মরিয়া হতে থাকে, একটি শিশু কাঁদতে শুরু করে, বাচ্চাদের ক্ষীণ পায়ের আওয়াজ বেশ কাছেই, তাদের একজন শিশুটিকে থামাবার চেষ্টা করছে।

ইসোলা, আমাকে কি শুনতে পাচ্ছিস না? আজকের দিনটিতে আমাকে লজ্জা দিতে চাইছিস? শোন বাপ তোর ভাই বোনগুলোর কথা ভাব...ইসোলা, আমাকে দেখতে পাচ্ছিস না? আমি হাঁটু গেড়ে বসে আছি। তোর ভাই বোন সব্বাই মিলে তোকে মিনতি করছে। আমার জন্যে একটু মায়া থাকলে দরজাটা খোল। দরজা খোল, বাপ আমার...ইসোলা, আমাকে কি লজ্জা দিতে চাস? কাল ফুরোবার আগেই আমাকে কবরে পাঠাতে চাইছিস? ইসোলা, বাচ্চাটা পর্যন্ত কাঁদছে...দোহাই তোর, একটু করুণা কর আমাদের। বেরিয়ে আয়, দোহাই তোর, তোর বাবার সঙ্গে কথা বলব আমি...শপথ করছি, তোকে কথা দিচ্ছি আমি, তোর বাবাকে বুঝিয়ে বলব। (শুধু শিশুটির কান্নার শব্দ। সহসা চীৎকার করে) ইসোলা।

দূরে কোথাও হঠাৎ দরজা খোলার আওয়াজ। মোযির যেন দম আটকে আসে।

ঈশ্বর আমাকে দয়া করুন, উনি এসে গেছেন। (ফোঁপাতে ফোঁপাতে আন্তরিক মিনতি জানাতে থাকে, শুধু চেষ্টা তাঁর স্বর যেন কেউ শুনতে না পায়) ইসোলা, বাবা আমার, উনি এখানে আসবার আগেই, সোনা আমার, ঠাকুর আমার, আমার আদরের মনি, বাইরে বেরিয়ে আয়, বেরিয়ে আয়

দোহাই তোর। আমি কথা বলব ওনার সঙ্গে। তুই দরজা খোল। তোর অনুতাপ হয়নি এমন কথা ভাবতে দিস না ওনাকে। দোহাই তোর দোহাই...দরজা খোল...

এরিনযোবি॥ (নিচ থেকে) কোথায় সে? মোযি? কোথায় ওটা?

মোযি॥ স্‌ স্‌...বাচ্চাটাকে সরিয়ে নিয়ে যা। জলদি...পাশের ঘরে নিয়ে যা, দরজায় তালা লাগিয়ে দে...জলদি...হা ঈশ্বর, এখন আমি করি কি...আমি এখন কি করব?

ভারি পায়ের শব্দ সিঁড়ি বেয়ে উঠে আসে।

(মরিয়া হয়ে ফিস্‌ফিসে স্বরে) ইসোলা, এখনো উনি এসে পৌঁছোননি, এখনো পৌঁছোননি। এখনো আসেননি এখানে, বাবা আমার... এখনো বেরিয়ে আসতে পারিস...কিছু জিজ্ঞেস করতে পারিস...যা তোর মন চায়...আমি তোর কেনা হয়ে থাকব, শুধু দরজাটা খোল বাপ আমার...

এরিনযোবি॥ (উঠতে উঠতে) মোযি!

মোযি॥ হায় আমি শেষ হয়ে গেলাম...হে ভগবান আমার শেষ।

এরিনযোবি॥ মোযি নিচে যাও।

মোযি॥ রেভারেণ্ড...

এরিনযোবি॥ নিচে যাও, মোযি।

মোযি॥ রেভারেণ্ড, ও তোমারই ছেলে...যাই করে থাক না কেন ও তোমারই ছেলে...

এরিনযোবি॥ নিচে, নিচে, নিচে যাও! বাচ্চাগুলোকেও সঙ্গে নিয়ে যাও।

মোযি॥ ও ত একগুঁয়ে নয়, রেভারেণ্ড। তুমি ভেবো না ওর অনুতাপ হয়নি। ও নিজের ঘরে বসে প্রার্থনা করছে। প্রার্থনা করছে মার্জনার জন্য।

এরিনযোবি নড়ে, পাশের ঘরটি খোলে, শিশুটির কষ্টের কান্না সহসা যেন ঝাঁপিয়ে পড়ে।

এরিনযোবি॥ নিচে যাও, তোমরা সবাই। সব্বাই মায়ের ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে থাক। কারুর কোনো আওয়াজ শুনতে চাই না আমি, শুনতে পাচ্ছ ত সাফ কথা? একটু আওয়াজও নয়।

ছোটদের পায়ের শব্দ সিঁড়ি দিয়ে নেমে যায় দ্রুত। মোযি ফুঁপিয়ে যেতেই থাকে, বিড়বিড় করে বলে।

মোযি॥ এ দিনটা দেখার জন্যই আমি বেঁচে আছি...এ আমারই পাপের শাস্তি কিন্তু হে মহান প্রভু, আমাকে কি শাস্তি দিতে পারতে না অন্য কোনো ভাবে? আমার ছেলেমেয়েদের মধ্য দিয়ে নয়, হে প্রভু, আমার ছেলেমেয়েদের মধ্য দিয়ে নয়...

নিচে দরজা বন্ধ হবার শব্দ।

এরিনযোবি।। মোযি!

মোযি।। এ এক কঠিন বিচার প্রভু...আমার শক্তি নেই...সইবার শক্তি আমার নেই...আমার পাপের শাস্তি আমাকে দাও...কিন্তু এভাবে নয়, প্রভু, এভাবে নয়...

এরিনযোবি।। মোযি, এমন ব্যবহার করতে তোমাকে বারণ করছি আমি...

মোযি।। রেভারেণ্ড, আমি দুর্বল মেয়েমানুষ, তোমার মত শক্তি আমার নেই।

এরিনযোবি।। তাহলে শক্তির জন্য প্রার্থনা করো। কিন্তু আমার কানের কাছে গোঙাবে না।

মোযি।। সে তোমার ছেলে, রেভারেণ্ড..

এরিনযোবি।। আমার ছেলে? আমি ওকে ত্যাজ্য করেছি। সে আমার ছেলে নয়...তোমাবও নয়।

মোযি।। না না, আমাকে দাবী জানাতে দাও। আমাকে কথা বলতে দাও ওর সঙ্গে। আমি ওর মা।

এরিনযোবি।। ঈশ্বরের অসন্তোষকে তুমি ভয় পাও না? আমি বলছি, এ প্রাণীটিকে নিয়তির হাতে সমর্পণ করো।

মোযি।। কেমন করে করি? না, আমি পারব না রেভারেণ্ড, পারব না। ঈশ্বর দয়ালু। ও আমার ছেলে—।

এরিনযোবি।। বলছি তো, ও তোমার ছেলে নয়। ওলুমোরিনের মেয়ের অসম্মান করেছে ও...আমাকে ফেলেছে লজ্জায়...ও তোমার ছেলে নয়...

মোযি।। না, ও আমারই ছেলে। আমি ত্যাগ করতে পারিনা ওকে। ও তোমার ছেলেও রেভারেণ্ড, তুমি ত্যাজ্য করতে পার না ওকে।

এরিনযোবি।। মোযি! শয়তানের ঐ সৃষ্টিটাকে যতবার নিজের ছেলে বলে ঘোষণা করছ ততবার তুমি পাপ করছ ঈশ্বরের বিরুদ্ধে।

মোযি।। রেভারেণ্ড।

এরিনযোবি।। আমার বিচারে ন্যায্যতা প্রমাণ করবার জন্য আমি সাক্ষী মানব ঈশ্বরকে। (স্তব্ধতা) নিচে যাও, মোযি। তোমার হৃদয় যদি চায় তাহলে প্রার্থনা করো ওর জন্য। কিন্তু ভয় হচ্ছে ওর উদ্ধারের আশা আর নেই।

মোযি।। (আবেগমুক্ত থাকার চেষ্টা চালিয়ে) তোমার হাতেই ওকে সমর্পণ করে যাচ্ছি রেভারেণ্ড, ছেড়ে যাচ্ছি ঈশ্বরেরও হাতে। রেভারেণ্ড যদি দেখতে চাইতে তাহলে দেখতে ও প্রার্থনা করছে নতজানু হয়ে। ও জানে ও পাপ করেছে, ও জানে তা। তাই ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করছে নিজের হৃদয় নরম করবার জন্য। সামান্য একটু সময় দাও ওকে, রেভারেণ্ড, অল্প একটু সময়।

এরিনযোবি।। আমি অপেক্ষা করছি। ঈশ্বরের বিচার দ্রুত নেমে আসে না।

মোযি।। দয়ালু হও।

এরিনযোবি।। ঈশ্বর দয়ালু। নিচে বাচ্চাদের কাছে যাও, তুমি। দরজায় তালা দিয়ে দাও।

মোযির ক্লান্ত পদধ্বনি সিঁড়িতে ধীরে মিলিয়ে যায়। একটি দরজা খোলে এবং বন্ধ হয় ধীরে, তালায় চাবি পড়ে। এরিনযোবি একটি চেয়ার টানে, বসে।

এরিনযোবি।। আমি অপেক্ষা করছি।

(২) স্তব্ধতা। তারপর গান।
মো লে য'ইয়ান ইয়ো বি আরো ওকো
মো লে য'আমালা বি ওনিসাংগো
মো লে গ্‌বো' ওমো পোন্ বি অব্ এযিরে
ওমো ইইন-ইন ও আরো ইন্ ও
তাইইয়ো ইইন-ইন ও, আরা ইন্ ও
কোহিন্‌দে ইইন-ইন ও, আরা ইন-ও'

গোধূলির শব্দের সঙ্গে গান মিলিয়ে যায়। দৃশ্যান্তর। রাত-পেঁচা, ব্যাঙ, ঝিঁঝির আওয়াজ। দুটি মানুষ ঝোপের মধ্যে শব্দ করে চলছে।

মোর‍্যনকে।। এর চাইতে মশাল ভাল ছিল না কি? হেই? ইসোলা?

ইসোলা।। অ্যাঁ, কি বলছ?

মোর‍্যনকে।। আমার কথা শুনছ না। আমার কথা তুমি শুনছ না।

ইসোলা।। শুনছি ত!

মোর‍্যনকে।। না, শুনছ না। এখনো কি তোমার বাবার কথাই ভেবে যাচ্ছ? আজ যা ঘটল সেই সব?

ইসোলা।। না না। সেসব মন থেকে আমি ঝেড়ে ফেলেছি। হ্যাঁ কি বলছিলে বলো।

মোর‍্যনকে।। বলছিলাম একটা মশাল থাকলে ভালো হত।

ইসোলা।। আমি ত বরাবর লণ্ঠন দিয়েই কাজ সারি।

মোর‍্যনকে।। কিন্তু এখন কি তুমি খুশি হওনি মশালটা আমি চুরি করে এনেছি বলে? আমার উপর রেগে গিয়েছিলে তুমি, কিন্তু এখন কি তোমার মনে হচ্ছে না ওটাই দরকারি ছিল বেশি?

ইসোলা।। আমি লণ্ঠনই পছন্দ করে এসেছি কেননা কাজে লাগানো যায় সহজে। যাকগে, বল তোমার কেমন লাগছে? কিছু যে বদলে গেছে লক্ষ্য করছ না?

মোর‍্যনকে।। কিসের বদল?

ইসোলা।। মাটির দিকে তাকাও। আজ রাতে কোনো ছায়া পড়েনি আমাদের। গাছেদের ছায়া পড়েনি একটুও।

মোর‍্যনকে।। আহ, ছায়া আমার ভাল্লাগে না। এতে বরং ভয় করছে কম।

ইসোলা।। সত্যি কথা বল। বল ভয় পেতে তুমি ভালবাসো। ভালবাসো যখন ছায়া থাকে আমাদের।

ইসোলা।। সত্যি কথা বল। বল ভয় পেতে তুমি ভালবাসো। ভালবাসো যখন ছায়া থাকে আমাদের। সবসময়েই তুমি ছুটে বেড়াও তার তল্লাসে।

মোরুানকে।। (হাসছে) পা-গুলো বেশ মজার। পথ চেয়ে অর্ধেক ওঠে তারা, তারপর কাঁপতে থাকে ঝোপে এসে...লাঙ্গা-লাঙ্গা...লাঙ্গা...লাঙ্গা...আগেরের মত।

ইসোলা।। জোলির পা-ওয়ালা আগেরে। (মোরুানকে হাসে) দেখছ, তুমি নিজেই পছন্দ করছ লণ্ঠন।

মোরুানকে।। না না। একটা মশাল অনেক কাণ্ডজ্ঞানের।

ইসোলা।। ঠিক আছে, এই নাও একটা, বেশ বড়সড়ো। এনেছি সঙ্গে করে। ঝোলার মধ্য থেকে বার করে নাও। (শামুকদের ঘষাঘষির আওয়াজ) আর কটা আছে আমাদের?

মোরুানকে।। না না, গুনবে না। বিমপে বলেছে শামুক গুনলে ভাগ্য খারাপ হয়।

ইসোলা।। হুম, তোমার সেই আয়া। কত কথাই না বলে তোমাকে।

মোরুানকে।। খুব জ্ঞানী মহিলা—তা জানো। তার কথা মেনে চলা ভাল।

ইসোলা।। বেশ ভাল কথা। মহিলাটি যদি না-ই গোনেন তাহলে আমাদের কাছে বিক্রি করেন কেমন করে?

মোরুানকে।। আহ্-হা, তিনি বলেন বাজারে গুনলে দোষ নেই কোনো।

ইসোলা।। কিন্তু শামুক যখন কুড়িয়ে বেড়ায়। এই ত পেলাম আরো দুটো...

মোরুানকে।। আরে, মশাল বার করতেই ত বেরিয়ে এল ওগুলো।

ইসোলা।। ঠিক আছে, ঠিক আছে, মেনে নিচ্ছি আমি। ভাগ্যিস মশালটা এনেছিলে, খুব খুশি হয়েছি। তবে এটা আনা উচিত হয়নি তোমার। এটার মালিক তোমার বাবা। (ঝোপ সরানো ছাড়া অন্য কোন আওয়াজ নেই।) মোরুানকে!

মোরুানকে।। বল।

ইসোলা।। ভাবতেই পারিনি, আজ তুমি বেরিয়ে আসবে।

মোরুানকে।। কেন পারব না?

ইসোলা।। ভেবেছিলাম ভয় পাবে।

মোরুানকে।। কিসের ভয়? ওহ্, বুঝেছি। না, আমি তৈরি হয়েই এসেছি।

ইসোলা।। তৈরি? কিসের জন্য?

মোরুানকে।। এই দেখ। আলোটা এদিকে ঘোরাও।

ইসোলা।। কি এটা? একটা বোনার কাঁটা?

মোরুানকে।। হ্যাঁ। আর একটা ছোট্ট পাথর...এই যে।

ইসোলা।। কি বলতে চাইছ তুমি?

মোরুানকে।। রাতের বদ আত্মাদের হাত থেকে রক্ষা পাবার উপায়।

ইসোলা॥ কি বললে?

মোরুনকে॥ বিমপে বলেছে আমাকে। যখন জানল আমি পোয়াতি, এসে বলল আমি যেন একটা পাথর আর তীক্ষ্ণ কোনো জিনিস নিয়ে বেরোই। বিশেষ করে রাতের বেলা। (ইসোলা হাসিতে বিস্ফোরিত) সত্যি কিন্তু একথা। কাকাকেও জিজ্ঞেস করেছিলাম আমি, তিনিও সায় দিয়েছেন।

ইসোলা॥ ঠিক আছে বাবা। আমিও বরং বিমপের কাছ থেকে শিখে নেব এসব। মনে হচ্ছে পৃথিবীর সব বাড়ির আয়ার মধ্যে উনিই সব চাইতে জ্ঞানী।

মোরুনকে॥ ঠিক তাই।

ইসোলা॥ যাই হোক, শামুকগুলোর জন্য আমার কাছ থেকে দাম নিয়েছে বড্ড বেশি...তবে এ নিয়ে কিছু বলিনি আমি। শুধু ভেবেছিলাম, বিকেলের ঐ মারদাঙ্গার পর, বেরিয়ে আসার আর সাহস পাবে না তুমি।

মোরুনকে॥ কিন্তু সত্যি বলতে এ নিয়ে মাথা ঘামাইনি আমি।

ইসোলা॥ ঘামাওনি। ঘামাতে হয়ওনি। শুধু খবর পেয়েছিলাম তোমার মা বাবা মোড়ল মশায়ের সঙ্গে হাত মিলিয়ে আমাকে খুন করার ধান্দা করছেন। মোটের উপর তোমাকে তাঁরা হিসেবের মধ্যেই আনেননি। ভয় পেয়েছিলে তুমি?

মোরুনকে॥ না, বেশির ভাগ ব্যাপারই ঠিক বুঝতে পারিনি। তোমার বাবা তোমাকে অভিশাপ দিচ্ছিলেন কেন?

ইসোলা॥ জানি না। সম্ভবত নিজেকেই জানেন না তিনি। ব্যাঙের ছাতাও কিছু কুড়িয়ে নেব নাকি?

মোরুনকে॥ না...না. রাতের বেলায় নয়।

ইসোলো॥ কিন্তু দেখ অঢেল জন্মে আছে এখানে। দেখ দেখ, সবগুলোর দিকে তাকাও।

মোরুনকে॥ খুব ভোরে এসে কুড়িয়ে নিয়ে যাব আমরা। বিমপে বলে খুব ভোরই হল এসব কাজ করার সময়। সকাল বেলার প্রথম কাজ। তখনই ওগুলো ডাগর হয় কেননা সারারাত ধরে তারা পান করে শিশির।

ইসোলো॥ আচ্ছা বল ত, তোমার আয়া জানে না এমন কিছু আছে কিনা?

মোরুনকে॥ অল্পই তার অজানা।

ইসোলা॥ আচ্ছা, শামুক শিকার নিয়ে আরো কিছু নিষেধ আছে নাকি তার?

মোরুনকে॥ মধ্যরাত হল শামুক কুড়োনোর সেরা সময়। কেননা তখনই ত বাজারে যাবার সময়।

ইসোলা॥ সামনের বার তাকে নিয়ে এলেই হবে, আমরা তাহলে দোষের কিছু আর করব না।

ঝোপের মধ্যে খোঁজার আওয়াজ।

মোরুনকে॥ আমার মনে হয় ইসোলা, তোমার একটা লাঠি ব্যবহার করা এখানে ভাল।

হাত দিয়ে এভাবে লাঠির কাজ করে ঝোপ ঠ্যাঙানো তোমার উচিত হচ্ছে না। যদি সাপ থাকে ওর মধ্যে?

ইসোলা॥ সাপ ত থাকতেই পারে।

মোরুানকে॥ তবে? তোমাকে যদি কামড়ায়?

ইসোলা॥ কামড়াবে না।

মোরুানকে॥ তাই নাকি? তোমার বন্ধু নাকি তারা?

ইসোলা॥ ঠিক বন্ধু নয়। তবু কামড়াবে না। তারা জানে আমি তাদের কামড়াতে পারি আরো জোরে।

মোরুানকে॥ কিন্তু দাঁতে ত তোমার বিষ নেই। ওদের আছে।

ইসোলা॥ কেমন করে জানলে? আমারও ত থাকতে পারে বিষদাঁত...জানো না আমি একজন পাদ্রীর সন্তান?

মোরুানকে॥ বেশ ত, তুমি না হয় চৌকস। আমি কিন্তু সাপকে কামড়াতে পারি না। আমাকে যদি কামড়ে দেয়?

ইসোলা॥ ঠিক আছে, বিমপেই না হয় তোমার হয়ে কামড়ে দেবে।

মোরুানকে॥ আহা—দেখো, বিমপেকে বলে দেব তুমি পছন্দ কর না তাকে।

ইসোলা॥ তোমার কথা বিশ্বাসই করবে না। (সামান্য বিরতি।)

মোরুানকে॥ ব্যথা পাচ্ছ না ত?

ইসোলা॥ কি বললে?

মোরুানকে॥ আমার হাত তোমার পিঠে। ব্যথা লাগছে না ত?

ইসোলা॥ না, কেন? (মোরুানকে আঘাত করে তাকে)

মোরুানকে॥ এবার? ব্যথা লাগছে না এখনো?

ইসোলা॥ কি হল? (মোরুানকে আবার আঘাত করে তাকে) আমাকে আঘাত করা থামাও।

মোরুানকে॥ দেখছিলাম তোমার পিঠে ব্যথা লাগে কিনা। উনি কি তোমাকে মারেননি? তোমার বাবা?

ইসোলা॥ না।

মোরুানকে॥ সত্যি বলছ ত? তোমাকে মেরেছিলেন উনি? বাড়ি ফেরাব পর কি ঘটেছিল? তোমার মা কি বলেছিলেন? তুমি কিচ্ছু বলনি আমাকে।

ইসোলা॥ বেশি কিছু বলার যে ছিলই না। বাড়ি ফিরলাম, আমার দরজা বন্ধ করে বসে রইলাম। তারপর বাবা যখন বাড়ি ফিললেন, জানালা দিয়ে পালিয়ে এলাম।

মোরুানকে॥ তোমার ঘর থেকে? কিন্তু সে ত দোতলায়।

ইসোলা॥ বাবা যে দরজা চেপে বসে রইলেন। পাহারা দিচ্ছিলেন। বাধ্য হয়ে লাফালাম জানালা ভেদ করে।

মোরুানকে॥ মরেও ত যেতে পারতে?

ইসোলা॥ না, পারতাম না। যাই হোক, লাফিয়ে পালিয়েছি, মরিনি।
মোরুানকে॥ কিন্তু এমনটি আর কক্ষনো কোর না। শপথ কর।
ইসোলা॥ ঘাবড়িও না। এমন করবার দরকার আমার আর হবে না।
মোরুানকে॥ কিন্তু উনি কি বলবেন যখন দেখবেন তুমি পালিয়েছ?
ইসোলা॥ মনে হয় আবার শাপমন্যি করবেন আমাকে। আবার শাপমন্যি করবেন, কেননা তাছাড়া তাঁর যে আর কিছু করবার নেই।
মোরুানকে॥ কেন? কেন করবেন? আমার বাবা মা ত শাপ দেননি আমাকে? দিয়েছেন কি? বুঝতে পারছি না। সব্বাই এমন শোরগোল করছে কেন? আর তোমার বাবা। তিনি তাঁর হাতের লাঠি দিয়ে তোমাকে পিটতে চাইছেন। তোমাকে কি ঘেন্না করেন তিনি?
ইসোলা॥ (ব্যঙ্গ ভরে) কে জানে?...ছেড়ে দাও এসব। অনেক কুড়িয়েছি। তোমার জন্য একটা চমক জমিয়ে রেখেছি।
মোরুানকে॥ কই দেখি।
ইসোলা॥ অনুসরণ কর আমাকে।
মোরুানকে॥ খুব দূরে যেতে হবে?
ইসোলো॥ খানিকটা।
মোরুানকে॥ যদি হারিয়ে যাই আমরা?
ইসোলা॥ হারাব না। ভাল কথা, বিমপেকে বোল এসবের দাম আরেকটু বেশি করে ধরতে। এখন থেকে আমার টাকার দরকার আরো বেশি হবে। কিছু জিনিস জোগাড় করতে হবে আমাকে।
মোরুানকে॥ ইসোলা, তোমার জন্য কিছু নিতে দেবে না আমাকে? কক্ষনো খুঁজে পাবেন না তাঁরা। আমার বাবা টাকাপয়সা ছড়িয়ে রাখেন যেখানে সেখানে।
ইসোলা॥ না। বলেছি ত তোমাকে। তোমার বাপ মা'র টাকা আমি চাই না।
মোরুানকে॥ কিন্তু এ টাকা ত আমারো, তাই না? (সামান্য বিরতি) ইসোলা, তুমি আবার রাগ করলে?
ইসোলা॥ না। তুমি কিন্তু শপথ করেছিলে এসব কথা আর তুলবে না।
মোরুানকে॥ দুঃখিত। দোহাই রাগ কোর না।
ইসোলা॥ রাগ করিনি...চিনতে পারছ এ জায়গাটা?
মোরুানকে॥ না, একেবারেই না।
ইসোলা॥ এখন খুব সাবধান। আমার জামাটা খুব কষে ধরো। পথ এখানে ফুরোল।
মোরুানকে॥ কোথায় যাচ্ছি আমরা?
ইসোলা॥ গির্জায়। মনে পড়ছে না তোমার? গির্জার কথা!
মোরুানকে॥ গির্জা?
ইসোলা॥ অনেকদিন আগে তোমাকে নিয়ে গিয়েছিলাম একবার। বড় পাহাড়ের পাশে জায়গাটা। কতদিন হয়ে গেল...তখন খুব ছোট ছিলাম আমরা। আসলে

তুমিই কিন্তু গির্জা নাম দিয়েছিলে ওটার।

মোরুানকে।। একটা...পাহাড়...ওখানে?

ইসোলা।। হ্যাঁ, বাঁশঝাড়ে ভরা।

মোরুানকে।। ছোট্ট একটা ঝোরা আছে ওখানে—তাই না?

ইসোলা।। ছোট্টটি আর নেই এখন। পরিষ্কার একটা ছোট পুকুর বানিয়েছি আমি নিজে। অবশ্য এখন বলছি না, আগে দেখ।

মোরুানকে।। তুমি ঠিক জান পথ হারাইনি আমরা? কোনো পথের রেখা দেখতে পাচ্ছি না আমি।

ইসোলা।। ভুল যাতে না হয় সেদিকে খেয়াল রেখেছি সাবধান। প্রায় এসে গেছি আমরা।

মোরুানকে।। (উত্তেজিত) ঐ যে পাহাড়টা।

ইসোলা।। হ্যাঁ, কিন্তু যেটা দেখাতে চাই তোমাকে...সেটা ওটার ওদিকে। এবার চোখ বন্ধ কর...ঠিক আছে। সব...আমি তোমাকে ধরছি সাবধানে।

মোরুানকে।। ওহ্...

ইসোলা।। ঠিক আছ তুমি। পাহাড়ের দরিপথ ভেদ করে যাচ্ছ তুমি। মনে পড়ছে তোমার?

মোরুানকে।। মনে পড়ছে। কত ছোট ছিলাম আমরা তখন।

ইসোলা।। (হাসছে) এখনো কিন্তু খুব একটা বড় নও তুমি। ভয় পেয়ো না। এমনকি আমিও উঠে যেতে পারি কিছু না ধরেই। ঠিক আছে...না, এখনো হয়নি। একটু দাঁড়াও, আলোটা জ্বালি। (দেশলাই জ্বালাব আওয়াজ।) ঠিক আছে, এবার চোখ খুলতে পার।

মোরুানকে।। ইসোলা...এটা তৈরি করেছ তুমি!

ইসোলা।। দেখ...এখানে এস...ঐ যে তোমার ছোট্ট ঝোরা। মনে পড়ছে এখন? এই যে সেই বাঁশঝাড়...এই যে এদিকে। ওখানেই আমরা পেয়েছিলাম কচ্ছপের ডিম।

মোরুানকে।। হ্যাঁ, মনে পড়ছে। ফিরে এসে লক্ষ্য করেছিলাম কি করে বাচ্চা বেরোয় ডিম ফুটে।

ইসোলা।। দেখ দেখ...তাকিয়ে দেখ...মোযি...মোযি...

মোরুানকে।। মোযি? তোমার মা এখানে নাকি? ইসোলা, ওখানে কিছু একটা আছে...কিছু একটা নড়াচড়া করছে।

ইসোলা।। হ্যাঁ একটা কিছু আছে নিশ্চয়ই। ভয় দেখিয়োনা ওকে...ঐ আসছে সে...তোমার এখনো মনে আছে ওকে?

মোরুানকে।। (উত্তেজিত) তিনি এখনো এখানে? মা...এখনো এখানে...(ক্রমশ আরো উত্তেজিত) ইসোলা, সেই একই মানুষ তাই না? সেই এক মা। বলতে চাও তিনি চলে যাননি কখনো? এই পুরোটা সময়ে?

ইসোলা॥ তুমি ভয় পাইয়ে দিলে, তাই আবার গর্তে ঢুকে গেলেন উনি।

মোরুানকে॥ দুঃখিত, সত্যি দুঃখিত। আবার কি উনি বাইরে আসবেন না?

ইসোলা॥ হয়ত আসবেন আরো পরে। অচেনাদের ভয় পান উনি, আর এতদিনে ভুলে গেছেন তোমাকে। এখন শুধু চেনেন আমাকে। আমার স্বর শুনলেই বেরিয়ে আসেন।

মোরুানকে॥ চেষ্টা কর তাহলে। ডাক তাঁকে, হয়ত এখন আর ভয় পাচ্ছেন না।

ইসোলা॥ দেখছি চেষ্টা করে। মোযি...মোযি...

মোরুানকে॥ এটাই কি তাঁর নাম?

ইসোলা॥ ভুলে গেছ তুমি? প্রথম যখন তাঁকে পেয়েছিলাম, এ নামই ত দিয়েছিলাম।

মোরুানকে॥ কিন্তু এ ত তোমার মায়ের নাম।

ইসোলা॥ মা কিছু মনে করবে না। এতে দুজনকেই মনে পড়ে আমার, দুজনেই ঝুঁকে পড়েছে ভারে, তাদের বয়স বলতে পারি না আমি।

মোরুানকে॥ মোযি...মোযি...বেরিয়ে এস বাইরে, আমি এসেছি। বেরিয়ে এস, দোহাই তোমার।

ইসোলা॥ কাজ দিচ্ছে না।

মোরুানকে॥ ওহ্ ইসোলা, কেন তুমি আমাকে দেখালে এ জায়গাটা। এখানে আমি বাস করতে চাই। চিরকালের জন্য।

ইসোলা॥ এমন কাজ এখন তুমি করতে যাচ্ছ না। চলে এস, আমাদের বাড়ি ফিরে যাবার সময় হয়েছে। শুধু ভাবছি তোমার মা হয়ত এখন তোমাকে খুঁজে মরছেন।

মোরুানকে॥ মরবেন কেন? আমার জন্য তার ভারি ভাবনা।

ইসোলা॥ কিন্তু এটাও ত ঠিক যে তুমি তাঁর চোখের আড়ালে যাবে না।

মোরুানকে॥ শুতে যাবার আগে আমাকে তালাবন্ধ করে রাখে আমার মা। কাজেই আমাকে নিয়ে মাথা ঘামাবার কারণ তার নেই। (কুটিরের মধ্যে ঢোকে) ওটা কি?

ইসোলা॥ কোথায়?

মোরুানকে॥ ঐ যে। বন্দুক নাকি?

ইসোলা॥ সেই রকমই ত দেখাচ্ছে, নাকি? আমি জানি ওটা পুরোনো আর মরচে ধরা।

মোরুানকে॥ কোথায় পেয়েছ ওটা?

ইসোলা॥ মোড়ল মশাইয়ের বন্দুক। শিকারের জন্য এটা আমার দরকাব।

মোরুানকে॥ (হেসে) শামুক শিকারের জন্য?

ইসোলা॥ হতেও পারে। যাই বল, ঝোপের গভীরে গেলে অনেক...অনেক শিকার মেলে। মোড়লমশাই যখন শিকারে যেতেন সঙ্গে যেতাম আমি। বেশির ভাগ সময়েই পাখিশিকার। তিনি মাটির ওপর দাঁড়িয়ে থাকা কোনো প্রাণী মারা পছন্দ করতেন না।

মোরুনকে॥ কেন?

ইসোলা॥ ভয় পেতেন তিনি; ভাবতেন শিকারটা হয়ত রূপ নেবে মানুষের। তরুণ বয়সে তাঁর এক বন্ধু মারা পড়েছিলেন এভাবে। এ নিয়ে বলায় তাঁর ক্ষান্তি ছিল না।

মোরুনকে॥ কোন পশু তুমি মারবে?

ইসোলা॥ মানে, প্রথমে...ধোর না, ছুঁয়ো না ওটাকে! (বন্দুকের গুলি ছোটে। মোরুনকের আর্তনাদ)। মোরুনকে। মোরুনকে।

চিৎকার গলে মিশে যায় গানের মধ্যে।

গান : (৩)

ই-এ-ইয়া কো সে এ গ্‌বো
ই-এ-ইয়া কো সে এ গ্‌বো
ইবা সে এ গ্‌বে মা গ্‌বে ত'এমি
আসিকো তি ও বা আ সে এ গ্‌বে
এরিন কু ল'ওকো আ ক্'ওকে ওয়া'লে
এরিন কু ল'ওকো আ ক্'ওকে ওয়া'লে
লারিন্‌কা কু ন্'ইলে আ ক'ওকো রো'কো
ওথু এলিকুন ও ন্থো ওয়েরে
একিকান এলেকুন মেথি আবে
বা ও র্'আকো'সু আ ফ্'ইউরা গুন'ইয়ান
বা ও র্'এনি ফে লে আ ফ্'-আনা এনি
বা বা কা'নি আ কুন্‌লে উইযো
বি ও সি কা'নি আ মা সানো লো
আবাযা ও রে কেকে ও ওপো ওনা

গান মিলিয়ে গেলে গির্জার ঘণ্টায় দুটো বাজে। মোযি দোতলায় আসে। যে চেয়ারে এরিনযোবি ঘুমিয়ে পড়েছে তার হাতলে টোকা মারে।

মোযি॥ রেভারেণ্ড, রেভারেণ্ড। বিছানায় আসবে না?

এরিনযোবি॥ (জাগে, চমকে ওঠে) উ-হুম্? কে? মোযি?

মোযি॥ অনেক দেরি হয়েছে। বিছানায় আসবে না?

এরিনযোবি॥ কটা বেজেছে?

মোযি॥ এইমাত্তর দুটো বাজল।

এরিনযোবি॥ দুটো? মাঝবাত পেরিয়ে গেছে? বলতে চাও আমাকে এতটা সময় ঘুমিয়ে থাকতে দিয়েছ?

মোযি॥ তুমি ক্লান্ত ছিলে। ভাবলাম ঘুমোলে তোমার ভালই হবে।

এরিনযোবি॥ ইসোলা? কোথায় সে? (দরজা খুলতে চেষ্টা করে।) ওহ্হো, মনে হচ্ছে এখনো যেন প্রার্থনা করে যাচ্ছে।

মোযি॥ জানি না, রেভারেণ্ড, শুধু বলছি সকাল হোক। রাগ সত্ত্বেও ঘুমিয়ে পড়েছিলে তুমি। মনে হচ্ছে ঘুমিয়ে পড়েছে ইসোলাও।

এরিনযোবি॥ ওকে উঠতে হবে। প্রতিজ্ঞা করেছি আমার ছাদের তলায় আর একটি রাতও থাকতে পারবে না সে।

মোযি॥ দোহাই তোমার রেভারেণ্ড, শুধু সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে বলছি। রাগ সত্ত্বেও ঘুমিয়ে পড়েছিলে তুমি। হয়ত ঈশ্বরের ইচ্ছাই এটা। বিচার যাতে বিলম্বিত হয়।

বিরতি

এরিনযোবি॥ ঠিক আছে। তোমার এ কথা মেনে নিচ্ছি। কিন্তু আর একটা রাতও তার সঙ্গে এক ছাদের তলায় কাটাব না আমি।

মোযি॥ কোথায় যাচ্ছ?

এরিনযোবি॥ গির্জায়। গির্জার ঘরে গিয়ে ঘুমবো। কিন্তু সূর্য ওঠার পরেও যদি বাড়িতে থাকে সে তাহলে তাকে তাড়াব চোরের মতো, ব্যভিচারী বলে।

মোযি॥ সঙ্গে আমিও আসব কি?

এরিনযোবি॥ কিসের জন্য?

মোযি॥ তোমার সঙ্গে কথা বলতে চাই। তোমার সব কথা মেনে চলব। কিন্তু তার আগে তোমার সঙ্গে কথা বলতে পারি আমি?

এরিনযোবি॥ বলার মতো কিছু নেই।

মোযি॥ কিছু সময়ের শান্তি যে আমরা পেয়েছি তার মধ্যে ঈশ্বরের হাত আমি দেখতে পাচ্ছি। যদি আমরা কথা বলতে পারি খানিক...?

এরিনযোবি॥ এখনো ওর হয়ে ওকালতি চালাবে?

মোযি॥ না, না। আমি শুধু চাইছি কিছু বোঝাপড়া। ওরা দুটিতে বড় হয়ে উঠেছে একসঙ্গে। ইসোলা আর মোরুানকে একই মায়ের সন্তানের মতো বেড়ে উঠেছে।

এরিনযোবি॥ এর থেকে কি শিক্ষা নিতে পারি আমি?

মোযি॥ একটু ধৈর্য ধরো রেভারেণ্ড। একটু শুধু বোঝাপড়া চাইছি। ওরা একসঙ্গে খেলেছে, ঝগড়া করেছে, মারামারি করেছে। মোরুানকে কতবার তোমার কোলের উপর বসে থেকেছে, কত জিনিস কিনেছে তার?

এরিনযোবি॥ এক বছর আগে, এই বাড়িতে, ওলুমোরিন এসে নালিশ জানিয়েছে ইসোলা খুশি মত তাঁর মেয়েকে নিয়ে দূরে দূরে টেনে নিয়ে গেছে। বলেছে, দুজনে নাকি সব সময়েই ঘুরে বেড়ায় গভীর বনের মধ্যে। তার ফলে আসতে পারে পাপের প্ররোচনা।

মোযি॥ খাঁটি কথা, খুব খাঁটি কথা, কিন্তু...
এরিনযোবি॥ আমি ওকে ধমকে দিইনি, সাবধান করে দিইনি? বলিনি ওর এই বাউণ্ডুলেপনা অন্যের ঘরে গিয়ে না ঢোকে? আমাকে না লজ্জায় ফেলে?
মোযি॥ হক কথা, কিন্তু বাচ্চাদের বন্ধুত্ব কেউ কি থামাতে পারে শুধু হুকুম করে?
এরিনযোবি॥ বাচ্চা? ওকে বাচ্চা বল তুমি? বাচ্চা, অথচ যৌনপাপের অপরাধী? কতবার ধমক দিয়েছি? কঠেরভাবে? ঠ্যাঙাতে ছাড়িনি কখনো। তারপরেও যখন এসব ভয়ংকর গুজব আমার কানে এসেছে, তাকে ডেকেছি, জিজ্ঞেস করেছি তাকে সতর্ক করার কথা মনে আছে কিনা। তার কাছ থেকে কথা আদায় করেছি যাতে ওলুমোরিনের মেয়ের সঙ্গে কখনো সে দেখা না করে। আমাকে কথা দিয়েছে আর ভেঙেছে। এধরনের অপরাধ...আমারই বাড়িতে, আমার নিজেরই বাড়ির মধ্যে!
মোযি॥ আমরা ওকে উদ্ধার করব, তাড়িয়ে দেব না লজ্জার মধ্যে।
এরিনযোবি॥ আমার বাড়ির মধ্যে আমি এমন কিছু হতে দিতে পারি না যা আমি অন্যকে না করার উপদেশ দিয়ে থাকি। এখন কি তবে আমি পিছিয়ে আসব যখন আমার বাড়ির একজন, তাই বা কেন, আমায় রক্তেরই একজন ঈশ্বরের বিধানকে লঙ্ঘন করেছে? তুমি কি চাও আমার মাথা নত হয়ে পড়ুক দ্বিগুণ ভাবে? (মোযি নীরব) শান্ত হও, নারী। শক্তি যখন কমে আসে, ঈশ্বরই তখন যোগান শক্তি।

তিনি সিঁড়ি বেয়ে নামতে থাকেন। সামনের দরজায় সহসা আঘাত। এরিনাযোবি থামেন।

রাতের এসময়? কি হল? আবার কোন কৌতুক শুরু হল আমার জীবনে?
আবার ধাক্কা, আরো মরিয়া...বিরতি। ॥দৃশ্যান্তর॥
ইসোলা॥ খুব শস্তায় পেলে শিক্ষাটা। জানো না বন্দুক নিয়ে এমনটা কক্ষনো করতে নেই?
মোরুনকে॥ বুঝতে পারিনি ভেতরে গুলি ভরা আছে।
ইসোলা॥ সব সময়েই কিছু বোঝো না। তুমি কি ভাবছ তোমাকে এখানে নিয়ে এসেছি শুধু এভাবে মরবে বলে? খুব বেঁচে গেছ, অবশ্য আমার একটা মাত্র গুলি তাও খরচ করে ফেললে।
মোরুনকে॥ গুলি ভরে রাখা উচিত হয়নি তোমার।
ইসোলা॥ ভরে রাখতেই হয়। ঝোরাটার ওপারেই দানবের মত একটা সাপ বসবাস করে...ঐ ওখানে...ঐ বাঁশঝাড়ের ভেতর। মনে হয় একটা অজগর। সত্যি বিশাল বড়। যাকগে আমাকে মারতেই হবে ওটাকে। ওটাকে না মারলে এখানে বাস করা আমার পক্ষে সম্ভবই হবে না।
মোরুনকে॥ এখানেই বাস করবে নাকি তুমি?
ইসোলা॥ আমি এখানেই বাস করি। এটাই আমার বাড়ি।
মোরুনকে॥ এখানেই ঘুমোবে, একেবারে একা?

ইসোলা॥ এর আগেও এখানে বাস করেছি আমি, মাঝে মাঝেই, বাবা যখন বেরিয়ে গেছেন যজনের কাজে দূরের কোনো গির্জায়। একবার প্রায় এক সপ্তাহের মত বাইরে ছিলেন তিনি, আর আমি পুরো সময়টা কাটিয়েছিলাম এখানে। শুধু একথা ভেবে যে এরিনযোবি অসুখী রাখেন আমাকে।

মোরুানকে॥ তোমার বাবা? তাঁর ভাবনা কি তুমি একবারও থামাতে পার না?

ইসোলা॥ ওহ্, বাবার কথা বলিনি। অজগরটার কথা বলছিলাম। আমি ওটাকে ডাকি এরিনযোবি বলে।

মোরুানকে॥ ইসোলা, তুমি কি একটা দুর্বৃত্ত সন্তান হতে চাও?

ইসোলা॥ না, কিন্তু সাপটা যে দুর্বৃত্ত। কচ্ছপের ডিমগুলোর কথা মনে পড়ে? মোযি ওগুলো ফুটিয়ে সব বাচ্চা বার করত, বাচ্চাগুলো কখনো সখনো সাঁতরে চলে যেত ঝোরার ওপারে। সাপটা গিলতে পারত না ওদের, তাই সে ওগুলোকে মুখে তুলে নিয়ে পাথরে আছড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলত।

মোরুানকে॥ ওটা কি সাঁতরে চলে আসতে পারে এপারে।

ইসোলা॥ ঠিক জানি না। যদ্দুর দেখি বাঁশঝাড় ছেড়ে কক্ষনো বেরোয় না ওটা। তার বন্দুকে গুলি ভরা থাকলে মনে স্বস্তি পাই।

মোরুানকে॥ ঠিক আছে, কাল কিছু বারুদ এনে দেব তোমাকে।

ইসোলা॥ না, বরং বিমপেকে বোল আনতে। বিমপে যে বাজারে শামুক বিক্রি করে সেখানেই পাওয়া যায় বারুদ। ওটাকে মরতেই হবে, সাপটাকে।

মোরুানকে॥ তোমার সঙ্গে আমি এখানেই থাকব, এখানেই বাস করব।

ইসোলা॥ না, তোমার ভালো লাগবে না। তবে যখনই তোমাকে অসুখী করে তুলবে তারা, চলে আসবে এখানে।

মোরুানকে॥ তুমি কি অসুখী?

ইসোলা॥ চল, এখন যাই। এখানে দাঁড়িয়ে কথা বলতে থাকলে ভোর হয়ে যাবে। তাছাড়া আজ রাতে এখানে আমি থাকছিও না—গুলিভরা বন্দুক ছাড়া থাকা যাবেও না। তোমাকে ফিরিয়ে দিয়ে আসব, তারপর চলে যাব। গির্জার চত্বরে গিয়ে ঘুমোব।

মোরুানকে॥ না, তুমি শপথ করেছিলে। শপথ করেছিলে কবরের চাতালের মধ্যিখানে তুমি ঘুমোবে না। ভূতের ভয়ও কি নেই তোমার?

ইসোলা॥ আরে, ভূতেরা খুব ব্যস্ত মানুষ, আমার মত। আমরা কেউ কারুকে বিরক্ত করি না।

মোরুানকে॥ না, তুমি যাবে না ওখানে। যাকগে, আমি এখানেই থাকছি। একটা রাত আমাকে থাকতেই হবে। আসলে আমরা দুজনেই ত আবিষ্কার করেছিলাম জায়গাটা।

ইসোলা॥ না, আমরা দুজনে নয়। আমি তোমাকে নিয়ে এসেছিলাম। যাকগে, সে ত অনেক দিন আগের কথা। আমরা তখন বাচ্চা ছিলাম। এই ত খানিক আগেই জায়গাটা মনেই করতে পারছিলে না তুমি।

বিরতি

মোরুনকে।। বিমপে বলে আমাদের দুজনের বিয়ে করে ফেলা উচিত। তোমার কি মনে হয় ঠিক বলেছে সে?

ইসোলা।। কত বয়স তোমার?

মোরুনকে।। তোমারই সমান। প্রায় পনের।

ইসোলা।। যা, আমার বয়স ষোল বছর দুমাস। তা, তোমার কি মত? বিয়ে করতে চাও আমাকে?

মোরুনকে।। এ নিয়ে ভাবিনি। তোমার কি মনে হয় আমাদের করা উচিত?

ইসোলা।। আমার সন্তানের জন্ম দিতে যাচ্ছ বলে তুমি কি অসুখী?

মোরুনকে।। না। আসলে এটা সকলকেই ঝাঁকিয়ে দিয়ে। আর সেজন্যে তোমার বাবাও তোমাকে অভিশাপ দিচ্ছেন।

ইসোলা।। তুমি কি অসুখী?

মোরুনকে।। না। না, আমি অসুখী নই। কিন্তু আমি ঘাবড়ে গেছি খানিক। আজ বিকেলে মা এ ব্যাপারে কিছু বলার আগে আমার ধারণাই ছিল না কোনো। মা আমাকে এক ঝুড়ি প্রশ্ন করার আগে আমি কিছু বুঝতেই পারিনি। তারপর আজ বিকেলে মা আবার আমাকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন তোমার কথা।

ইসোলা।। তুমি বললে নাকি যে তুমি কোনো অন্যায় করেছ?

মোরুনকে।। না। কিন্তু তিনি তোমাকে গাল পাড়তে লাগলেন। বাবাও ভয় দেখিয়ে বললেন তোমাকে ফাটকে পাঠাবেন তিনি। তারপর ডেকে পাঠালেন তোমার বাবাকে। তিনি বললেন তোমাদের পরিবারকে তিনি আদালতে পাঠাবেন।

ইসোলা।। তোমার বাবা প্রভাবশালী মানুষ। অনেক বন্ধু তাঁর।

মোরুনকে।। ভয় পাচ্ছ নাকি তাঁকে?

ইসোলা।। ভয়? তোমার কি মনে হচ্ছে তাঁকে আমার ভয় পাওয়া উচিত? আসলে মোড়ল মশাই-ই শক্তি জোগাচ্ছেন আমার।

মোরুনকে।। তোমার বাবা বল, ইসোলা, তোমার বাবা।

ইসোলা।। মোড়লমশাই।

মোরুনকে।। তাঁকেই তোমার বাবা বল। যখন তুমি কঠোর হও তোমাকে ভয় লাগে আমার...এত একগুঁয়ে কেন তুমি? ইসোলা...দোহাই তোমার...এমন কোর না...আমাব দিকে তাকিও না ওভাবে।

ইসোলা।। (স্বল্প নীরবতা) এদিকটায় এস, মোরুনকে, এখানে দাঁড়াও...এখানে এ আলোর নিচে।

মোরুনকে।। কেন? আমার দিকে এমন করে তাকিয়ে আছো কেন?

ইসোলা।। তোমাকে ঠিক অন্যরকম লাগছে? তুমি এখন পরিপূর্ণ নারী, এটা অনুভব করতে পারছ কি তুমি?

মোর‍্যানকে।। জানি না।

ইসোলা।। কাছে এস...শুনতে দাও আমাকে। এখানেই ত থাকার কথা বাচ্চাটার। (বিরতি) কোন আওয়াজ নেই।

মোর‍্যানকে।। আমার মা-ও শুনতে চেষ্টা করেছিলেন।

ইসোলা।। (ক্ষিপ্ত) আর কখনো তাঁকে করতে দেবে না এমনটা।

মোর‍্যানকে।। কি হল, ইসোলা, কি ব্যাপার?

ইসোলা।। দুঃখিত কিছু মনে কোর না। কিছু নয় এটা...তুমি বলছ তুমি থাকবে এখানে?

মোর‍্যানকে।। আজ রাতে আমি যাচ্ছি না। এ জায়গা ছাড়ার মত শক্তি আমার নেই। তোমার সঙ্গে থাকতেই হবে আমাকে।

ইসোলা।। এটা আমার বাচ্চা। তুমি নিজেই যে এখনো বাচ্চা, তা জানো তুমি?

বিরতি

মোর‍্যানকে।। ইসোলা!

ইসোলা।। বল।

মোর‍্যানকে।। শহরের সব্বাই তোমার নামে মিথ্যে রটাচ্ছে। বিমপেতো আমাকে বলছিল। তারা বলাবলি করছে—। তুমি নাকি ঠেঙিয়েছ তোমার বাবাকে। সারা শহরের লোক তোমাকে শাপমন্যি করছে।

ইসোলা।। সত্যি কি তাকে আমি ঠেঙিয়েছি?

মোর‍্যানকে।। জানি না।

ইসোলা।। কিন্তু তুমি ত ছিলে ওখানে; ছিলে না?

মোর‍্যানকে।। আমি ত পালিয়ে গিয়েছিলাম। তোমার বাবাকে আমি ভয় পেয়েছিলাম ইসোলা। কী ভয়ংকর তিনি! তিনি যখন তুলে নিলেন লাঠিটা, আমি পালিয়ে গেলাম! ভীষণ ভয় পেয়েছিলাম। পালিয়ে গিয়েছিলাম বিমপের কাছে।

ইসোলা।। পালিয়ে গিয়েছিলাম আমিও। শুধু মনে আছে আমাকে মারবার জন্য লাঠিটা তুলতেই আমি তাঁর কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে ভেঙ্গে ফেললাম সেটা। তিনি কাড়াকাড়ি করছিলেন। তারপর চলে গেলাম বাড়ি। যারা জমা হয়েছিল সেই ভিড়ের কথা মনে আছে আমার। আমি যেন কুষ্ঠ রোগী, সেভাবেই পথ করে দিয়েছিল আমার। কুঁকড়ে পালিয়ে গিয়েছিল তারা। তখনই হঠাৎ বুঝতে পেরেছিলাম একঘরে হলে কেমন লাগে। আমি বাড়ি পৌঁছোনোর আগেই মা কেমন করে যেন জানতে পেরেছিলেন সব। ছান্নর মত চ্যাঁচাছিলেন তিনি, বুক চাপড়াচ্ছিলেন যেন পুরো পরিবারের উপর নেমে এসেছে একটা বিপর্যয়। বাচ্চারা সব জড়াজড়ি করে দাঁড়িয়েছিল এক জায়গায়। পরস্পরকে আঁকড়ে ছিল তারা প্রচণ্ড ভয়ে।

নীরবতা

মোরুনকে ।। রাতে কি ঠাণ্ডা পড়ে এখানে?

ইসোলা ।। পড়ে। তবে চাদর আছে আমার। তুমি ওটা নিতে পার। চলে এস, এবার ঘুমোতে দাও। ক্ষিদে পেয়েছে তোমার? খাবারও আছে।

মোরুনকে ।। খাবারের দরকার নেই। তবে ঘুম পেয়েছে। এস, দুজনে মিলে প্রার্থনা করি আমরা।

ইসোলা ।। তার মানে?

মোরুনকে ।। একসঙ্গে প্রার্থনা করি।

ইসোলা ।। হ্যাঁ, তাই ত বললে শুনলাম।

মোরুনকে ।। ঠিক আছে, আর দাঁড়িয়ে থেক না ওখানে। আমার পাশে এসে নতজানু হয়ে বোস।

ইসোলা ।। না। ইচ্ছে হলে তুমি করতে পার নিজের মত।

মোরুনকে ।। কি হল? বাড়িতে কি তোমরা সবাই মিলে একসঙ্গে প্রার্থনা কর না?

ইসোলা ।। করি বৈকি।

মোরুনকে ।। তাহলে কি প্রার্থনা করতে চাইছ না আমার সঙ্গে?

ইসোলা ।। (দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে শুয়ে পড়ে।) আমার ঘুম পেয়েছে। খুব শিগগিরই, বুঝতে পারবে তুমি।

মোরুনকে ।। কি বুঝতে পারব?

ইসোলা ।। এছাড়া আমি কিছুই করি না। সারা জীবনটাই একটা দীর্ঘ প্রার্থনা, কিন্তু কার কাছে জানি না সঠিক।

মোরুনকে ।। তোমাকে বুঝতে পারি না আমি।

ইসোলা ।। না, তোমাকে বুঝতে হবে না। কিন্তু যদি দীর্ঘ সময় তোমাকে থাকতে বলি তুমি থাকবে?

মোরুনকে ।। যদি থাকতে দাও আমাকে...? কেন? আমাকে কি ফিরিয়ে দেবে?

ইসোলা ।। সেটা নির্ভর করছে তোমার উপর।

মোরুনকে ।। এভাবে যদি বলে চল আমি কিন্তু ভয় পাব তোমাকে।

ইসোলা ।। আমি ভাবলাম তুমি প্রার্থনা শুরু করতে যাচ্ছ।

মোরুনকে ।। না করব না। একা আমি প্রার্থনা করব না...ইসোলা!

ইসোলা ।। আবার কি হল?

মোরুনকে ।। আগেও জিজ্ঞেস করেছিলাম, উত্তর দিতে রাজি হওনি। তুমি অসুখী?

ইসোলা ।। না। অসুখী নই। কিন্তু আমার ইচ্ছে করে আমি যেন বিষণ্ণ না হই। নাও, এবার ঘুমোতে যাও।

এরিনযোবির বাড়ি। প্রচণ্ড ধাক্কার আওয়াজ।

এরিনযোবি ।। আহ থামুন না। আপনি যেই হোন না, পুরো বাড়িটাকে যে ভয় পাইয়ে

দিচ্ছেন। আসছি রে বাপু, আসছি (দরজা খোলেন) মিস্টার ওলুমোরিন! আরে মিসেসকেও দেখছি যে! কি ব্যাপার? আপনারা এখানে?

ওলুমোরিন।। আপনার ছেলে কোথায়? আমার মেয়েকে পাওয়া যাচ্ছে না।

মিসেস ওলুমোরিন।। (আর্তনাদ করে) সামনে আনুন ছেলেকে, এক্ষুনি। সব নষ্টের গোড়া সে-ই। আমার মেয়েকে কি করেছে সে?

এরিনযোবি।। আমার ছেলে? সে ত বাড়ি ছেড়ে বেরোয়নি তারপর—।

মিসেস।। আপন নিজেও জড়িয়ে আছেন তার সঙ্গে, তাই না? আপনি রক্ষা করছেন তাকে। আপনার ছেলের ফাটকে যাওয়া আটকাতে পারবে না আর কেউ এখন।

এরিনযোবি।। আমি ত্যাজ্য করেছি ওকে।

ওলুমোরিন।। সেটা প্রকাশ্যে। গোপনে অন্য ব্যাপার। আমার চোখে ধুলো দিতে পারবেন না আপনি। পাদ্রীসাহেব, বহুবার বলেছি আপনার ছেলে যেন আমার মেয়ের কাছে না ঘেঁষে। তবু মেয়েটাকে আমার ফুঁসলেছে ছোঁড়া, তার পেট বানিয়ে দিয়েছে। এখন তাকে নিয়ে ভেগে পড়েছে আপনার ছেলে আর আপনি বলছেন কিচ্ছু জানেন না আপনি।

এরিনযোবি।। ঈশ্বরের সামনে শপথ করে বলতে পারি এসব কাণ্ডই বাবা হিসেবে সুখকর নয় আমার কাছে। ইসোলা আমার নামের উপর লজ্জা আর অসম্মান ছাড়া কিছুই আনেনি।

মিসেস।। সময় নষ্ট করছি আমরা। হয়ত দুটোতেই এখানে রয়েছে আর আপনি ওদের সময় দিচ্ছেন লুকোবার পাদ্রীসাহেব, আপনার ছেলেকে ডাকুন। তাকে ডেকে পাঠাচ্ছেন না কেন? ডাকুন তাকে। ডেকে বলুন আমার মেয়েকে যেন ফেরত দেয়, আদালতে যাবার আগে।

এরিনযোবি।। আসুন আমার সঙ্গে, নিজেরাই দেখুন খুঁজে। ঈশ্বর আমার সাক্ষী। আমি তাকে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাবার হুকুম দিয়েছি...অস্বীকার করেছি তাকে, আমার ছেলে বলে...শয়তানের এ সন্তানটির জন্য সারাটা জীবন আমার টকে গেল..কিন্তু এ ছাড়া আর কিই বা করতে পারি আমি?

সিঁড়ি বেয়ে ওপরে ওঠে তারা।

মিসেস।। সব কেত্তনই শোনা হয়ে গেছে আমার। এখন শুধু চাই মোরুানকেকে ফেরত। মেয়েটা আমার কি দোষ করল যে আপনার বদমাস ছেলেটার খপ্পরে পড়ল? সারাটা জীবনে মোরুানকে অবাধ্য হয়নি আমার...তার বাপমায়ের কাছে কক্ষনো পাপ করেনি যতক্ষণে না আপনার ছেলে এসে নষ্ট করেছে তাকে। আর এখন মেয়েটাকে আমার ভাগিয়ে নিয়ে গেছে...আপনার ছেলের আমরা কি করেছি যে সে আমাদের মেয়েটাকে ছাড়ল না? তার পছন্দসই মেয়ে ত অনেক ছিল, তার এই কি লুচ্চামির সঙ্গী হবার যোগ্য. কিন্তু আমাদের মেয়েটাকে কেন সে...

দোতলায় চাতালে পা দেন।

এরিনযোবি॥ এই আমার চেয়ার। এ চেয়ারে বসেই অপেক্ষা করছিলাম কখন সে বেরিয়ে আসে তার ঘর থেকে যাতে তাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিতে পারি চিরকালের মতো। কথাটা যে মিথ্যে নয় আমার স্ত্রীও তার সাক্ষী দেবেন। খানিক আগে তিনিই আমাকে জাগিয়ে দিয়েছেন। পাহারায় আমি ঢিলে দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

দরজায় ধাক্কা দেয়।

কথা দিতে পারি আপনাদের মেয়ে এখানে ছিল না কখনো। (আবার ধাক্কা দেয়, আরো জোরে।) দরজা খোল, ইসোলা। দরজা খোল, নইলে লোক ডাকিয়ে দরজা ভাঙাব। (আবার ধাক্কা দেয়।) ধৈর্যের শেষ সীমায় পৌঁছে গেছি আমি। তোর কপালে খারাপ কিছু ঘটার আগে খুলে দে দরজাটা।

নীরবতা

মোযি॥ ইসোলা, আর কতক্ষণ মিনতি করব তোর কাছে? দরজা খুলে দে। (উদ্বিগ্ন স্বরে।) রেভারেণ্ড, একথা বলা আমার ঠিক নয়...কোনো খারাপ চিন্তা মনে ঢুকতে দিতে নেই আমি জানি, কিন্তু রেভারেণ্ড (ক্রমশ আরো উদ্বিগ্ন) ইসোলা একটু বিগড়ে যাওয়া ছেলে, কিন্তু ছ'ঘণ্টারও বেশি হয়ে গেল দরজায় তালা এঁটে বসে আছে। একটু শব্দও শোনা যাচ্ছে না...

এরিনযোবি॥ বাজে কথা। যখন এলাম তখনো তার আওয়াজ শুনেছি। (প্রচণ্ড ধাক্কা দিয়ে) ইসোলা, দরজা খোল। খোল দরজাটা। কারুকে ঠকাতে পারবি না।

মোযি॥ রেভারেণ্ড, আমরা ওকে মেরে ফেলিনি ত? আমরা হয়ত ওকে মরার দিকে ঠেলে দিয়েছি।

এরিনযোবি॥ (ক্ষিপ্ত) চুপ, একদম চুপ। তোমার ছেলে এমন নয় যে নিজের ক্ষতি করবে।

মিসেস॥ ভেঙে ফেলুন দরজা। আমি জানতে চাই কোথায় আমার মেয়ে। ওহ্, মোরুনকে মোরুনকে...

দুহাত দিয়েই ধাক্কা মারতে থাকে দরজায়।

খুনি কোথাকার, শিগগির দরজা খোল। যে অসভ্যতা তুই করেছিস তাতে তোর উপর ঈশ্বরের অভিশাপ নেমে আসার আগেই আমার মোরুনকেকে ফিরিয়ে দে আমার কাছে। খোল দরজা, বলছি তোকে, দরজা খোল। মোরুনকে। মোরুনকে! যদি ভেতরে থেকে থাকিস বেরিয়ে আয় মায়ের কাছে।

ওলুমোরিন।। সোনা আমার...নিজেকে সংযত কর...দোহাই তোমার, শান্ত হও। আমরা তাকে পাবই। আমরা মেয়েটাকে পাবই, তারপর ছেলেটার হাত থেকে এ শহরকে বাঁচাব বরাবরের মত। রেভারেণ্ড, এখানে অপেক্ষা করছেন কেন? দরজাটা আমাদের ভেঙে ফেলতে হবে। আপনার ছেলে যদি বেরিয়ে না আসে ভাঙতেই হবে দরজা। আপনি না ভাঙলে কাজটা করতে হবে আমাকেই।

এরিনযোবি।। না, আমি নিজেই ভাঙব। এবাড়ি এখনো আমার; মিস্টার ওলুমোরিন। মোযি, চেষ্টা করে দেখবে নাকি আরেকবার?

মোযি।। (নিঃশেষে হাল ছেড়ে দিয়ে) আমি আর কিচ্ছু পারছি না। ছেলে আর আমাকে চিনছেই না।

এরিনযোবি।। তাহলে এভাবেই হোক। ওই ডাণ্ডাটা দাও আমাকে।

শাবলের আঘাতের শব্দ। তারপর কাঠ ভাঙ্গার আওয়াজ।

দেখি কোথায়...? একি, কেউ নেই!

ওলুমোরিন।। পালিয়েছে নাকি?

মোযি।। কোথায় পালাবে? নিশ্চয়ই আত্মহত্যা করেছে। ইসোলা! ইসোলা।

এরিনযোবি।। ঐ যে জানালাটা...দেখছি খোলা।

মোযি।। আমরা ওকে মেরে ফেলেছি। ইসোলা, বাপ আমার...

এরিনযোবি।। ঈশ্বরের দোহাই নিজের আত্মাকে যেন এতটা নষ্ট সে না করে। (দ্রুত বেরিয়ে যান ঘর থেকে) না, নিচেও নেই দেখছি।

ওলুমোরিন।। নিচে নেই অবশ্যই। মাটিতে দেখাচ্ছেনা কারুকেই। তার মানে পালিয়ে গেছে। আর পালাতে সাহায্য করেছেন আপনারাই।

মিসেস।। মোরুানকে...আহ্, কি করেছে আমার মেয়েটিকে নিয়ে রেভারেণ্ড, অন্তত এটুকু বলুন আমার মেয়েটাকে নিয়ে কী করেছে সে। কোথায় নিয়ে পালিয়েছে? মোরুানকে...মোরুানকে...(ফোঁপায়)

এরিনযোবি।। কিছুই বুঝতে পারছিনা। নিশ্চয়ই পালিয়েছে যখন ঘুমোচ্ছিলাম।

ওলুমোরিন।। আর কিছু বলার নেই আপনার। আমার লোকজনদের গিয়ে আমি খেপিয়ে তুলছি, শহর ছেড়ে পালিয়ে যাবার আগেই ধরতে হবে তাকে। তারপর ফয়সালা হবে আইনের কাছে—অবশ্য আমার জ্ঞাতিরা তার উপর রাগ ঝাড়বার পর। এ শহরের কেউ পছন্দ করে না তাকে, তারা একবার তাকে ধরতে পারলে তারপর ঈশ্বরের দয়া—।

মোযি।। কি করবেন আপনারা? পশুকে শিকার করবার মতো ছুটে যাবেন আপনারা? আমার ছেলে কখন কি করেছে আপনাদের? বলছেন, আপনাদের মেয়েকে চুরি করেছে সে। আমি বলছি, আপনাদের মেয়েই আমার ছেলেকে ছিনিয়ে নিয়েছে আমাদের কাছ থেকে, গোল্লায় পাঠিয়েছে তাকে!

ওলুমোরিন।। কি বললেন? ঠিক এটাই ভেবেছিলাম যে আপনারা দুজনেই ওকে আড়াল করবেন। অথচ আজ বিকালেই ও ঠেঙিয়েছে নিজের বাবাকে। আপনার হাত থেকেই লাঠি ছিনিয়ে নিয়েই আপনাকে আঘাত করেছে।

এরিনযোবি।। একথা যারা বলছে তারা পাপ করছে ওর বিরুদ্ধে...অবশ্য তার বিদ্রোহ ঈশ্বরের চোখে আমাকে আঘাত করারই সমান।

মোযি।। সে করেনি, রেভারেণ্ড, করেনি সে। সবাই মিলে তার পেছনে লেগেছে কেন?

এরিনযোবি।। শান্ত হও মোযি!

মোযি।। ছেলেটা শুধু ভুল করেছে, সবাই তাকে দানব বানাতে চাইছে কেন?

মিসেস।। ভুল করেছে? কচি খোকা! আমার মেয়েটাকে প্রথমে নষ্ট করেছে, তারপর পালিয়েছে—নাকি?

মোযি।। মিসেস ওলুমোরিন, আপনি ত আছেন এখানে, আপনার জ্ঞাতি গোষ্ঠীদের বলছেন না কেন তারা মিছে কথা বলছে? আপনারা জানেন আমার ছেলে নিজেকে নষ্ট করবে না এভাবে...নিজের আত্মাকে ধ্বংস করবে না কক্ষনো।

এরিনযোবি।। ধ্বংস করেছে। সে কি যৌন পাপ করেনি?

মোযি।। একটা শিশুর ভুল। কিন্তু সে কখনো মারেনি তার বাবাকে। না, তাকে শাপ দেবার দরকার নেই, তার দরকার শোধন।

এরিনযোবি।। অনেক হয়েছে। ঈশ্বরের হাতেই তাকে ছেড়ে দিয়েছি আমি। গির্জায় যাচ্ছি প্রার্থনা করবার জন্য। হায়, অভিশপ্ত সেই দিন যখন এ শিশুকে গ্রহণ করেছিলাম আমার সন্তান বলে।

সিঁড়ি দিয়ে নেমে যাবার পায়ের শব্দ। দরজা বন্ধ হবার আওয়াজ।

ওলুমোরিন।। চলো যাই। গিয়ে আমাদের লোকজনদের খেপিয়ে তুলি।

মোযি।। আমার ছেলেকে যদি মারেন...যদি মারেন আমার ছেলেকে তবে প্রভু আপনাদের বিচার করবেন!

মিসেস।। ও একটা বাচ্চাচোর। ছেলেধরা। আমার মেয়েকে যে কী করেছে!

মোযি।। বলে দিচ্ছি, আমার ছেলেকে যেন আঘাত না করেন। ঈশ্বরের দোহাই, আমার ছেলেকে ছোঁবেন না...আহত করবেন না তাকে। তার কেশস্পর্শ করলেই স্বর্গ বিচার করবে আপনাদের। স্বর্গ বিচার করুন...যদি পাশে দাঁড়িয়েও তাকে মারধোর করতে দেখেন...স্বর্গ বিচার করুন আপনাদের —(কান্নায় ভেঙে পড়ে।)

গান (৪)

মো য'আওয়ি গ্‌বেগ্‌বে
কি ওয়ন মা গবাগ্‌বে নি
মো য'অওয়ি ওনি তেতে

কি ওয়ন মা তে মি মো'লে
ওযো ন্লো কো সে ওয়া রে
ওফু ই মো র্'ওকো র্'ওকো কো গ্বেগ্বে ইলে
ও মা ন্লো ওগেরেরে
ও মা ন্লো ওগেরেরে

দৃশ্যান্তর

মোযি।। (অভিযোগের স্বরে) ইসোলা!
ইসোলা।। (একটু যেন ছোট ইসোলা) মা?
মোযি।। তুই আবার ঐ গানটা গাইছিস?
ইসোলা।। মা?
মোযি।। হ্যাঁ, ঠিক এইরকম। তার ব্যবহারটা এমনই। হঠাৎ যেন নিজেকে কালা হিসেবে দেখিস। আর তখন শুধু 'মা'? বলছিলাম আবার তুই ঐ গানটা গাইছিস?
ইসোলা।। কোন গানটা মা?
মোযি।। কোন গান? কোন গানের কথা বলছি বেশ ভালোই জানিস, তোর বাবা যেটা গাইতে বারণ করে দিয়েছেন। গানটা এভাবে গাইবার জন্য কতবার তিনি শাস্তি দিয়েছেন তোকে?
ইসোলা।। কিন্তু মা, বাবা ত এখন এখানে নেই।
মোযি।। এটা তা আরো খারাপ। তোর বাপ দূরে থাকলে তুই যদি তাঁকে অমান্য করিস তাহলে ত তুই বেশ মন্দ ছেলে। হঠাৎ যদি ফিরে আসেন তাহলে কি হবে? এভাবে কথা বলতে লজ্জা করে না তোর?
ইসোলা।। মাগো, বাবাকে আমি অমান্য করিনি গো। তিনি বলেছেন এ গানটা তিনি আর কখনো শুনতে চান না। তাই তিনি বাড়িতে থাকলে কখনো ত গাই না গানটা।
মোযি।। ইসোলা! এটাই ত মন্দ ছেলের কথা! এভাবে তোকে কথা বলতে যেন আর কখনো না শুনি। কখনো না। শুনতে পাচ্ছিস?
ইসোলা।। ঠিক আছে, মা।
মোযি।। আচ্ছা ইসোলা, তোর বাবাকে কেন সব সময়েই অসন্তুষ্ট করিস? তোর উপর তিনি রেগে থাকলে আমার কত কষ্ট হয়— তুই কি দেখতে পাস না? তোকে শাস্তি দিলে? কিন্তু তাঁরও ত তোর উপর শক্ত হওয়া দরকার —তুই তাঁর প্রথম সন্তান। এ কথাটা মনে রাখিস কখনো? প্রথম সন্তান। তুই পরিবারের বড়। বাবার আদলে যদি গড়ে তুলিস নিজেকে, তাহলে তোকে যারা অনুসরণ করবে তাকিয়ে থাকবে তোর দিকেই।
ইসোলা।। মা—।

মোযি॥ তুই কি তাঁর হতাশার কারণ হতে চাস? তুই, তাঁর প্রথম সন্তান?

ইসোলা॥ আমি শিগগিরই ফিরে আসছি মা, আমাকে এখন একজায়গায় যেতে হবে।

মোযি॥ দাঁড়া। যখনই তোকে কিছু বলতে চাই অমনি পালিয়ে যেতে চেষ্টা করিস।

ইসোলা॥ আমাকে যেতেই হবে। গির্জার ঐকতান গানের রেয়াজে যোগ দিতে অনেকটাই দেরি করে ফেলেছি।

মোযি॥ গির্জার ঐকতান? বলিসনি ত কখনো তুই যোগ দিয়েছিস তাতে।! কবে থেকে? তোর বাবা জানেন তো?

ইসোলা॥ না। বাবাকে বলব কি?

মোযি॥ 'বলব কি' মানে? কী বিদঘুটে ছেলে রে বাবা তুই? কত মাস ধরে তোর বাবা তোকে গির্জার ঐকতানে যোগ দিতে বলছেন—আর এখন তাঁর কথা মানতে রাজি হয়েছিস অথচ কিচ্ছু বলিসনি তাঁকে? তাঁকে খুশি করবার জন্য কাজটা করলি অথচ বললি না!! ওহ্, তুই তাঁকে অবাক করে দিতে চাস?

ইসোলা॥ কিন্তু এটা যে বাবার ঐকতান দল নয়।

মোযি॥ আবার একটা নতুন ছুঁতো খুঁজে বার করছিস। এসব শুনতে চাই না আমি। খালি ছুঁতো, খালি ছুঁতো। যা ভাগ। জলদি যা, নইলে দেরি হয়ে যাবে।

ইসোলা॥ মা, আমি গির্জায় যাচ্ছি না। আমাকে ভুল বুঝো না।

মোযি॥ প্রথমে বললি, যাচ্ছিস—আবার বলছিস, যাচ্ছিস না। এবার সুবোধ ছেলের মত জলদি যা তো। এ রোববারে তোকে হয়ত ঐকতান দলের সঙ্গে তাঁরা গাইতেও দিতে পারেন। এটা তোর বাবাকে কত খুশি করবে। এর ফলে হয়ত তোর ঐ পছন্দসই পৌত্তলিক গান গাওয়া বন্ধও হয়ে যেতে পারে।

ইসোলা॥ মাগো, দুজনের কিন্তু একই ঐকতান গানের কথা ভাবছি না আমরা। আমরা এটাকে ঐকতান গান বলি শুধু মজা করে।

মোযি॥ ছোকরা কিসের কথা বলছে? (ইসোলা 'এগুনগুন' গোল শুরু করে।)

ইসোলা॥ থামা এ গোল। নাচও থামা। এদিকে আয়, বল কি বলতে চাইছিস? (একই ধরণের গোল, গায় 'এগুনগুন' গান।) ইসোলা, আয় এখানে এক্ষুনি। আহ্, ক্ষুদে শয়তান...একবার যদি ধরতে পারি তোকে...ওহ্, তুই কি চাস আমি আছাড় খাই...দাঁড়া না একবার যদি তোকে ধরি...

ইসোলা॥ (হাসছে, একই ধরনের 'এগুনগুন' স্বরে।) আইয়া মোড়লমশাই...মিসেস এরিনযোবি, ও মিসেস এরিনযোবি...ও মি ফ'ওমোলোক্ষে লে...[মিসেস এরিনযোবি, মোড়ল মশাইয়ের বউ, তুমি ছেড়ে দেবে কি এ বেচারী বালকটিকে?]

মোযি॥ (ভীত চকিত ফিসফিসে স্বরে।) তুই দুষ্টু ছেলে, আমি যা ভাবছি তাই যদি হয়...

ইসোলা।। চলি মা। মোড়লমশাইকে বোল আমি চলে গেছি ঐকতান গানের রেয়াজে..

মোযি।। আর শয়তান ছেলে, আরো ভালো কিছু খেলা খুঁজে পাস না তুই?...কি? আয় এদিকে, ইসোলা। তোকে আমি পই পই করে বলিনি যাতে তোর বাবাকে তুই মোড়লমশাই বলে না ডাকিস। আমাকে বিরক্ত করার জন্য সব সময়েই তুই এটা করিস।

ইসোলা।। কিন্তু তিনি মোড়লমশাই ত বটেই।

মোযি।। এটা তুই করিস শুধু আমাকে অসুখী করার জন্য। কেন বাপ বলে ডাকিস না ওনাকে? ইসোলা, এ নতুন অভ্যাস তুই শুরু করলি কবে থেকে? তুই একটা বাচ্চা ছেলে অথচ মনের মধ্যে রাগ পুষে রেখেছিস বুড়োদের মতো। বড় হলে তখন যে কি করবি!

ইসোলা।। কিন্তু তিনি মোড়লমশাই ত বটেই।

মোযি।। কোথাও যাস নে। যদি যাস আমি কিন্তু তোর বাবাকে বলে দেব কোথায় গিয়েছিলি তুই। শপথ করবি কি করবি না বল?

ইসোলা।। কিসের শপথ বলো?

মোযি।। সব সময়ে 'বাবা' বলবি ওঁকে, বিশেষ করে যখন কথা বলবি আমার সঙ্গে।

দরজা খোলার রুক্ষ শব্দ।

এরিনযোবি।। ইসোলা।

ইসোলা।। আজ্ঞে!

এরিনযোবি।। আমার লাঠিটা নিয়ে যায়। জলদি, আমার সময় নষ্ট করিস না।

ইসোলা।। আজ্ঞে?

এরিনযোবি।। এখানে আয় আমার কাছে।

হিঁচড়ে নিজের কাছে এনে, লাঠি দিয়ে পেটাতে থাকে।

তুই দুঃখের সন্তান, শুনতে পাচ্ছিস? দুঃখের সন্তান। তুই নষ্ট হয়ে গেছিস, শোধরানোর অতীত। আমি ভাবি এটা একটা খ্রিস্টান বাড়ি, কিন্তু তুই এটাকে করে তুলতে চাইছিস পৌত্তলিক নিবাস। আমার বাড়িতে লজ্জা বয়ে আনবি না তুই। যদি তোকে মেরেও ফেলি আমি, তবু দেখব আমার বাড়িতে লজ্জা বয়ে আনিসনি তুই।

নামিয়ে রাখে লাঠি, একটু ভারি নিশ্বাস ফেলতে থাকেন।

চোখে জল নেই এক ফোঁটা, অ্যাঁ। তাকিয়ে দেখ ওর দিকে। কোনো ভুল নেই, আত্মাটাকে বিক্রি করে দিয়েছিস শয়তানের কাছে। তাকিয়ে দেখ ওটাকে। চোখদুটো ওর একেবারে শুকনো...এইমাত্র যে শাস্তি পেল তার

কোনোই চিহ্ন নেই। (চেঁচিয়ে) হাত তোল। (চড় মারে তাকে।) এর পরে থেকে যখন বলব হাত তোল সুবোধ ছেলের মতো হাত তুলবি সঠিক ভাবে। এবারে যাতে আরো খারাপ কিছু না ঘটে তোর কপালে—সত্যি কথা বল। মোরুানকেকে কি বলেছিস? কি বলেছিস তাকে?

ইসোলা॥ আজ্ঞে...আমি জানি না আজ্ঞে।

এরিনযোবি॥ মিথ্যে বলতে চাইছিস আমাকে? জিজ্ঞস করছি, ওলুমোরিনের মেয়েকে গোপনে কি বলেছিস তুই?

নীরবতা

একগুঁয়ে হতে চাইছিস? বল কি বলেছিস তাকে? কি বলেছিস তাকে? (আবার মারতে থাকেন।) হাত নামাবি না। তুলে রাখ হাত দুটো যেখানে আছে। এবার বল, কি বলেছিস তাকে? নিজে থেকে বলবি, নাকি ঠেঙিয়ে বার করব তোর থেকে?

ইসোলা॥ বুঝতে পারছি না ঠিক কোন কথাটার কথা বলছেন আপনি—।

এরিনযোবি। মিথ্যেবাদী! তোর এ বাচ্চা বয়সেই পাক্কা উকিলের মতো যুক্তি বার করছিস? বলিসনি গতকাল তুই মুখোশ নাচের দলের সঙ্গে শহরে গিয়েছিলি? গিয়েছিলি, না যাসনি?

ইসোলা॥ (ঘাবড়ে) আজ্ঞে হ্যাঁ, বলেছিলাম ওকে।

এরিনযোবি॥ ঠিক আছে বলে যা। বল শুধু খেলার ছলে তুই বলেছিলি এটা, বানিয়ে বলেছিলি। তুই কখনোই যাসনি মুখোশ নাচের দলের সঙ্গে রাস্তায়।

ইসোলা॥ আমি...আমি ঠিক...অস্বীকার করতে চাইছি না, আজ্ঞে।

এরিনযোবি॥ ঠিক যেন তোরই যোগ্য কাজ! একটু আগে এ গুনগুনির পোশাকে সেজে রাস্তায় নেচেছিস পৌত্তলিকের মত। বল, এটা খ্রিস্টানের বাড়ি, কি বাড়ি নয়? তোকে কি আমি বড় করে তুলিনি খ্রীস্টান হিসেবে...মোযি! মোযি!

মোযি॥ (নেপথ্যে) বলুন, রেভারেণ্ড।

এরিনযোবি॥ এস, এসে শুনে যাও তোমার পুত্রটি তোমার বাড়িতে সাম্প্রতিক কি সম্মান বয়ে এনেছে?

মোযি॥ কি হয়েছে, রেভারেণ্ড?

এরিনযোবি॥ এগুনগুন...তার সাম্প্রতিক চাকরি। মনে হচ্ছে খুব শিগগিরই এক ভোরে জেগে উঠে দেখব আমাদের দরজায় পশুবলি হয়েছে...একটা কুকুরের দু-টুকরো দেহ অথবা আরো কিছু ঘৃণার দৃশ্য। তোর জন্যেই আমাব বাড়ির হাল আজ এই দাঁড়িয়েছে, শয়তানের বাচ্চা। (সংলাপ সহ ঘুষি)

মোযি॥ ইসোলা, তুই কি জানিস না, এটা খারাপ। তুই একজন খ্রিস্টান। এ ধরনের ব্যবহার তোর বাবাকে শুধু অসন্তুষ্টই করবে!

এরিনযোবি॥ জানো কি, কেমন করে একথা শুনলাম আমি? ছেলেটা লজ্জাকরভাবে শুধু পালিয়েই যায়নি, গিয়ে আবার মোরুানকে কাছে বাহাদুরি নিয়েছে। মেয়েটা আবার বলছে ওর বাপ মাকে। আর জানোই তো ওলুমোবিন পরিবারটা কোন ধাঁচের। সকাল হবার আগেই সারা শহর জেনে যাবে কেচ্ছাটা। পাদ্রীর ছেলে পৌত্তলিকদের সঙ্গে ভিড়ে খানাপিনা করছে...(আবার মারেন) অপদার্থ ছেলে, এভাবেই তুই আমার নামের ওপর কলঙ্ক চাপাতে চাস? (মারতে থাকেন বার বার।) তাই না? তাই না?

'তাই না' তাই না' ধ্বনিত হতে থাকে কিল চড়ের আওয়াজের সঙ্গে, পুনরাবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে ঘনতা বাড়তে থাকে তার। ইসোলা অস্থির হতে থাকে যাবো, মারো, গোঙাতে থাকে।

মোরুানকে॥ ইসোলা! কি হয়েছে? ইসোলা, জাগ, জেগে ওঠ ইসোলা...

ইসোলা॥ অ্যাঁ? কি ...কে এটা?

মোরুানকে॥ আমি, আমি মোরুানকে। আমি জেগে উঠেছ কি এখন, ইসোলা?

ইসোলা॥ কি ব্যাপার? ওহ্ আমি কি স্বপ্ন দেখছিলাম?

মোরুানকে॥ হ্যাঁ, কিন্তু কিসের স্বপ্ন? এমন ছটফট করছিলে কেন?

ইসোলা॥ দুঃখিত। ঘুমের ঘোরে কথা বলছিলাম নাকি আমি?

মোরুানকে॥ না। তবে উথাল-পাথাল করছিলে। গোঙাচ্ছিলেও তুমি ব্যথা করছিল নাকি তোমার?

ইসোলা॥ না, না। ঠিক আছি আমি। আমি দুঃখিত তোমার ঘুম ভাঙিয়ে দিলাম।

মোরুানকে॥ ঠিক জান, তুমি অসুস্থ নও?

ইসোলা॥ হ্যাঁ, হ্যাঁ ঠিক জানি। মোরুানকে আমি শুধু স্বপ্ন দেখছিলাম। যাও আবার ঘুমোও গিয়ে।

মোরুানকে॥ ঠিক আছি। শুভরাত্রি, ইসোলা!

ইসোলা॥ শুভরাত্রি!

সামান্য নীরবতা। বনের আওয়াজের দৃশ্যান্তর ঘটে গৃহস্থালীর আওয়াজে।

এরিনযোবি॥ ইসোলা!

ইসোলা॥ (ঘুমের ঘোরে) কি হয়েছে মোরুানকে?

এরিনযোবি॥ মোরুানকে? পাগল হলি নাকি তুই? আমি ডাকলাম তোকে আর তুই উত্তর দিচ্ছিস মোরুানকে কে? এটা কোন ধরনের পাগলামি? ঐ মেয়েকে কি তোর মগজে পুরে রেখেছিস?

ইসোলা॥ (ছোট ইসোলা।) আজ্ঞে? আমি...আমি...

এরিনযোবি॥ ওলুমোরিনের মেয়ের ব্যাপারে তোকে কি আমি সাবধান করে দিইনি? সাবধান করে দিয়ে বলিনি কি ওর সঙ্গে তোকে যেন আর না দেখি?

ইসোলা॥ আজ্ঞে, হ্যাঁ।

এরিনযোবি।। তাহলে তোরা দুজনে মিলে গির্জার চত্বরে আজ বিকেলে কি করছিলি? তার সঙ্গে দেখা গেছে তোকে...না, আমার কাছে মিথ্যে বলবি না তুই। তোকে দেখা গেছে ওর সঙ্গে। কি করছিলি ওকে নিয়ে? সাবধান করে বলিনি তোকে আর দেখা করবি না ওর সঙ্গে।

ইসোলা।। আমরা শুধু দেখছিলাম কবরের ফলকগুলিকে।

এরিনযোবি।। কবরের ফলক দেখবার জন্য গিয়েছিলি তোরা দুজনে? সতর্ক করে দিইনি উপাসনার পর গির্জার চত্বরে আর থাকবি না? ভদ্র বাড়ির ছেলে মেয়েরা উপাসনার পর সোজা ফিরে যায় যার যার বাড়ি, আর তোরা ঘুরে বেড়াস গির্জার চত্বরে। কবরের ফলক দেখে? (তাকে মারেন।) এই কি শিক্ষা তোকে দিয়েছি আমি? (পুনরপি মার) এভাবেই কি তোকে বড় করে তুলছি আমি? আমার প্রত্যেকটি আদর্শ যাতে তুই লঙ্ঘন করিস? কতবার বলেছি মেয়েটার কাছ থেকে তুই দূরে থাক? কতবার? বল, কতবার...কতবার...কতবার! কতবার...! কতবার! কতবার।

ইসোলা।। (অস্বস্তিভরে গোঙায়। একটা আচমকা গোঙানির চিৎকার এবং সে জেগে ওঠে) মোরুনকে...ভাল, ওকে জাগিয়ে দিইনি। (দেশলাই ঠুকে লণ্ঠন জ্বালায়)।

মোরুনকে।। (জেগে ওঠে।) কে? ওহ্, ইসোলা, কি করছ?

ইসোলা।। কিছু না। শুধু একটু আলো চাইছিলাম।

মোরুনকে।। কিসের জন্য?

ইসোলা।। খারাপ খারাপ স্বপ্ন দেখছি খালি। যাও ঘুমিয়ে পড়, আলোটা জ্বালা থাকলে হয়ত আমার ঘুম ভালো হবে।

মোরুনকে।। তোমার মাথার উপর হাত রাখছি আমি— এভাবে। কিংবা তোমার বগলের নিচে একটা টাটকা পাতা। বিমপে বলে...

ইসোলা।। ও হ্যাঁ, বিমপে বলে...এখন আমরা আবার ঘুমোতে যাব কি— না?

মোরুনকে।। এটা সত্য বিমপে বলে তোমার বগলের নিচে যদি একটা টাটকা পাতা রাখতে পার অথবা পার...

সরাসরি দৃশ্যান্তর

এরিনযোবি।। ইসোলা।

ইসোলা।। আজ্ঞে।

এরিনযোবি।। মোযি! তুমি কোথায়? মোযি?

মোযি।। (আসতে আসতে) রেভারেণ্ড, কি হয়েছে? কি ঘটল?

এরিনযোবি।। এ বিচারই মহৎ প্রভু ন্যস্ত করা ভাল ভেবেছেন। (ইসোলাকে মারেন।) ঈশ্বরবিহীন বালক, একটার পর একটা লজ্জা বয়ে আনছিস আমার বাড়িতে। চল দেখি (সহসা ধবে টানতেই ইসোলা পড়ে যায়।) ওঠ! হিঁচড়ে টেনে তোলেন তাকে।) ওঠ...ওঠ বলছি!

মোযি।। (ভীত, আর্তনাদ করে) রেভারেণ্ড, দোহাই তোমায়, দোহাই...লাথি মেরো না ওকে।

এরিনযোবি।। ওঠ। আয়, মেয়েটার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখ কত ক্ষতি করেছিস তার। দেখি, মুখ তুলে তুই তাকাতে পারিস কিনা সরাসরি তার চোখের দিকে...(টানেন, প্রায় হিঁচড়ে নিয়ে যেতে থাকেন দরজার দিকে।)

মোযি।। রেভারেণ্ড, দোহাই তোমার...আস্তে টান। রেভারেণ্ড, দোহাই...ওহ্, তুমি মেরে ফেলবে ওকে। রেভারেণ্ড...আমিও যাব ওদের সঙ্গে...আমার মাথার ওড়না...কোথায় আমার মাথার ওড়না...

দৃশ্যান্তর। এরিনযোবি রাস্তার উপর দিয়ে হিঁচড়ে নিয়ে চলেছে ইসোলাকে। রাস্তায় নানাধরনের আওয়াজ—মানুষ, ছাগল, বাই-সাইকেল এবং মাঝে মাঝে মোটরের হর্নের আওয়াজ। মিশে যায় 'ওমো যোভিয়া'-র প্রস্তাবনার সঙ্গে।

গান : ৫

ওমো কি ও ইয়ে যোউয়ো ও
ওমো যোউয়ো
মো কুন্‌লে সো বে ও ও
ওমো যোউয়ো
মো ফ্'একুরু বে ও ও
ওমো যোউয়ো
মো ফ্'আকারা বে ও ও
ওমো যোউয়ো
কি ও ইয়ে যোউয়ো ও
ওমো যোউয়ো
কি ও ইয়ে যোউয়ো
ওমো যোউয়ো
কি ও ইয়ে যোউয়ো ও
ওমো যোউয়ো

এরিনযোবি।। নষ্ট ছেলের ক্রমোন্নতি দেখছি তোর মধ্যে...তোর জন্মের পর থেকে এটাই তোর ধরন, লক্ষ্যভ্রষ্ট না হয়ে এ পথই অনুসরণ করছিস তুই। মুখোশ নাচে যোগ দেবার মুহূর্ত থেকেই তুই যে ভ্রষ্ট হতে শুরু করেছিস আমি জানি। আমার ছেলে...একটা এগুনগুন। পাদ্রীমহলে আমাকে হাসির খোরাক করে তুলেছিস তুই। যখন আমি পবিত্র প্রার্থনা পরিচালনা করি, প্রত্যেকটি ভালোমানুষ নিশ্চয়ই হাসতে থাকেন, বলতে থাকেন আমি কেন নিজের ছেলেকে এগুনগুন ঝড়ের মন্দ প্রভাব থেকে মুক্ত করে আনতে পারি না। ওহ্, গোড়া থেকেই তুই ভ্রষ্ট...মেলামেশা করিস বস্তির বাচ্চাদের সঙ্গে...গান করিস বুনোদের...রাতের বেলা বেরিয়ে যাস, কেউ জানে না ভোর হবার আগে কত ধরনের নোংরা কাজ করিস। এখন তোর সব খেল

খতম...তোর পাপের হাঁড়ি সূর্য ভেঙে দিয়েছে...কি হল? এটার মানে কি? মোযি, এটার মানে কি?

মোযি।। রেভারেণ্ড, আমি...

এরিনযোবি।। ফিরে যাও, মোযি ফিরে যাও এক্ষুনি।

মোযি।। রেভারেণ্ড আমার ওখানে থাকার দরকার আছে।

এরিনযোবি।। তুমি সেখানেই থাকবে, যেখানে থাকবার নির্দেশ দেব আমি, বুঝলে। এখন তোমাকে মায়ের দাতাগিরি দেখাতে হবে না।

মোযি।। কিন্তু রেভারেণ্ড...

ভিড় জমার আওয়াজ।

এরিনযোবি।। তোমার যদি এখন দয়া দেখাতে হয়, তাহলে তার দাবীদার ঐ বেচারা মেয়েটি। তার জীবনটাই ধ্বংস হয়ে গেছে পুরোপুরি, ধ্বংস হয়েছে তোমার ছেলেকে দিয়ে। যৌনপাপীকে দয়া দেখাবার কি পাপ তা কি দেখতে পাচ্ছ না? বাড়ি যাও, মোযি..ফিরে যাও বাচ্চাগুলোর কাছে...(জনতাকে ক্রোধের স্বরে।) কি ব্যাপার? আপনাদের সকলেরই কারুর কোনো কাজ নেই? এধরনের হল্লা নাচ দেখাবার স্বাধীনতা আপনারা পেয়েছেন বলে ভাবছেন? যান, আগে নিজেদের পাপের দিকে তাকান। চলে যান, সব ভণ্ডের দল, ভেগে পড়ুন, চলে যান—। নিজেদের গোপন পাপগুলো উন্মোচিত হবার আগেই তাদের প্রচণ্ড আঘাত করুন।

তিনি চলে যেতে থাকেন। তাঁর চলে যাবার সময় 'ওমো যেউিয়ো' গানটি শোনা যায়।

মনে হয় আপনারা অহংকারী...অহংকারী হতে ভালোবাসেন আপনারা, তাই না? বলুন ত কেন আপনারা যান মুখোশ নাচের আসরে, শুধু আপনাদের পেছনে ভিড় জোগাড় করবার জন্যই ত। চিৎকার করে গালিগালাজ করেন, ভিক্ষে করেন পয়সা। অভিশাপ দেন, চেঁচান, ঈশ্বরের মুখের উপর করেন তাঁর নিন্দা। কিন্তু সেই ঈশ্বর শেষ পর্যন্ত আপনাদের আঘাত করবেনই, ধন্যবাদ দিন এখনো আঘাত দিয়ে আপনাদের মেরে ফেলেননি তিনি। (সহসা গর্জন করে) মোযি এখনো দাঁড়িয়ে আছ কেন ওখানে? কিসের অপেক্ষা করছ? ফিরে যাও, ফিরে যাও এক্ষুনি। বাড়ি ফিরে অপেক্ষা কর আমার জন্য। (আবার যেতে থাকেন) দুর্বল। কী দুর্বল! আমার বিপদের সময় যার শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকার কথা...আহ্, নিজের হাতে নৈপুণ্য দেখার জন্য প্রস্তুত হও।

তাঁরা কয়েক ধাপ উপরে ওঠেন। দরজায় ধাক্কার শব্দ।

এবারে দেখব কতটা কঠিন তুমি।

মিসেস॥ রেভারেণ্ড...আমার স্বামী অপেক্ষা করছেন। আপনি! আমার মেয়েকে কি করেছেন আপনি? ওকে ধ্বংস করেছেন, জানেন কি সেটা? ওকে ধ্বংস করেছেন।

ওলুমোরিন॥ ইসোলা, আমার পক্ষে দুঃখের দিন এটা। আমার মেয়ে তোর কোন ক্ষতি করেছিল যে শহরের সব মেয়ের মধ্যে তুই তাকেই তুলে নিলি?

মিসেস॥ মোরুনকে...মোরুনকে...

মোরুনকে॥ মা!

মিসেস॥ শুরু কর। বল আবার আজ সকালে কি বলেছিলি আমাকে?

মোরুনকে॥ আমি জানি না...ইসোলা ...

ওলুমোরিন॥ ওর সঙ্গে কথা বলিস না...তোর মায়ের কথার জবাব দে।

মিসেস॥ ইসোলা দায়ী কি দায়ী নয়?

এরিনযোবি॥ অবশ্যই ইসোলা দায়ী। মনে হয় না ছোঁড়া এতটাই বখে গেছে যে সব অস্বীকার করবে।

মিসেস॥ তাছাড়া, আমার মেয়ে কিছু বুঝতেই পারেনি। ওকে ফাঁদে ফেলা হয়েছে। বিমপেকে মেয়ে তাই বলেছে। ছোঁড়া তোর সঙ্গে চালাকি করেছে, তাই না? ঠকিয়েছে তোকে। এসব বোঝার পক্ষে তুই একবারেই সরল।

ইসোলা॥ মিসেস ওলুমোরিন...

এরিনযোবি॥ চুপ! তোকে কিছু বলতে বলা হয়েছে কি?

মিসেস॥ দেখছেন তো রেভারেণ্ড, ব্যাপারটা পরিষ্কার। আমার মেয়ে একেবারেই শিশু। কিছু সে বুঝবে কেমন করে? তার অজ্ঞানতায় পাপী সুযোগ নিয়েছে আপনার ছেলে।

ইসোলা॥ মিসেস ওলুমোরিন, আমার মনে হয়—

এরিনযোবি॥ শুনতে পাচ্ছিস না তোকে চুপ করে থাকতে বলছি আমি?

ওলুমোরিন॥ না না, শুনি কি বলার আছে ওর। ইসোলা, তুই আমাদের সঙ্গে কথা বলতে চাস, তাই না? বেশ, বলতে থাক। শুনি সে কথাই যদি অস্বীকারই করতে চাস।

ইসোলা॥ আমি শুধু...আমি ঠিক...জিজ্ঞেস করতে চাই যদি...খানিক সময়ের জন্য মোরুনকের সঙ্গে কথা—

বেজায় হট্টগোল।

ওলুমোরিন॥ তোর ইচ্ছে কথা বলার?

এরিনযোবি॥ ছোকরা পাগল হয়ে গেল নাকি?

মিসেস॥ ঠিক শুনছি ত আমি? ঈশ্বর সহায় হোন আমার। এরমধ্যেই কি অনেক ক্ষতি করিসনি তুই? মেয়েটার সঙ্গে কথা বলতে চায়!!

এলিনযোবি॥ ইসোলা, বুদ্ধিভ্রংশ হয়নি নিশ্চয়ই?

ইসোলা॥ মোরুন্নকে, আমি জানতে চাই...আমাকে বলনি তুমি...সত্যি কি সন্তান হবে তোমার?

এরিনযোবি॥ ছেলেটার মাথা কি পুরো খারাপ হয়ে গেছে? ইসোলা, তোকে কি বলিনি একেবারে কথা বলবি না বাচ্চাটার সঙ্গে? সরে আয় ওর কাছ থেকে...

মিসেস॥ হে ভগবান, মেয়েটার হাত ধরেছে ও! দেখতে পাচ্ছেন...দেখতে পাচ্ছেন...আমি নিশ্চয়ই পাগল হয়ে যাচ্ছি!

ওলুমোরিন॥ আমার মেয়েকে ছেড়ে দে বলছি।

ইসোলা॥ মোরুন্নকে, তাহলে আমার সন্তান তোমার গর্ভে, আমার নিজের সন্তান?

মিসেস॥ বাঁচাও! বাঁচাও! কি সাহস আমার মেয়েকে ছুঁচ্ছে। ভাগ, ভাগ, বেহায়া ছেলে। মেয়েটার থেকে দূরে দাঁড়া।

এরিনযোবি॥ আমার লাঠিটা নিয়ে আয়। কোথায় আমার লাঠি?

মোরুন্নকে॥ ছেড়ে দিন...ছেড়ে দিন ওকে। ওকে মারবেন না। ইসোলা পালিয়ে যাও।

ওলুমোরিন॥ আমার সামনে, আমার সামনে মেয়ের হাত ধরছে। মেয়েটাকে এতসব করার পরেও? শয়তানের নিজের বাচ্চা...শয়তানের আপন জারজ ফল!

মোরুন্নকে॥ পারছি না...আমি আর পারছি না...

পায়ের আওয়াজ ধাবমান।

মিসেস॥ মোরুন্নকে, ফিরে আয়, ফিরে আয় এখানে। বিমপে! বিমপে! আয়াটা গেল কোথায়? বিমপে...মেয়েটাকে ফিরিয়ে আন। ফিরিয়ে আন বলছি।

ইসোলা॥ বাবা, আমি...

এরিনযোবি॥ বাবা বলে ডাকবি না আমাকে...

লাঠিটা নামিয়ে আনেন তিনি।

ইসোলা॥ না!

মিসেস॥ বাঁচাও! বাঁচাও! ছেলেটা ওর বাপকে মারছে। বাঁচাও! পড়শীব দল! বাঁচাও!

এরিনযোবি॥ (কঠিনভাবে) ইসোলা।

ইসোলা॥ না! না!

কিছু সময়ের ধস্তাধস্তি। বেতের বাড়ির আওয়াজ। জেগে ওঠে ইসোলা, লাফিয়ে ওঠে, শ্বাস ফেলতে থাকে জোরে জোরে।

মোরুন্নকে॥ ইসোলা কি ব্যাপার?

ইসোলা॥ মানুষটা কি আমাকে শান্তিতে থাকতে দেবে না?

মোরুন্নকে॥ আবার তাঁর স্বপ্ন দেখছ? ইসোলা, ওঁকে কি তুমি ভুলতে পার না?

ইসোলা॥ আমাকে একা থাকতে দিচ্ছে না কেন?

মোরুন্নকে॥ ইসোলা! (অকস্মাৎ ভীত) কোথায় যাচ্ছ তুমি?

ইসোলো॥ বাইরে। চাঁদ উঠেছে।

মোরুানকে॥ থাম। আমাকে একা ফেলে যেও না এখানে।

ইসোলো॥ বেশ, চলে এস যদি তোমার ভাল লাগে।

মোরুানকে॥ আহ্, পূর্ণিমার চাঁদ। দেখ, দেখ...ঐ যে মোযি, চাঁদের আলোর উত্তাপ নিচ্ছে।

ইসোলা॥ কী শান্তিময় দেখাচ্ছে ওকে। সাবধান, ওকে চমকে দিও না।

মোরুানকে॥ ইসোলা, দেখ।

ইসোলা॥ কি হল?

মোরুানকে॥ বাঁশঝাড়ের পাশে...ঐ যে আবার...ইসোলা, হে ভগবান, কি বিশাল ওটা...কি বিশাল...

ইসোলা॥ আমার বন্দুকটা নিয়ে এস...জলদি। ঐ ত এরিনযোবি! আজ রাতে পেড়ে ফেলব ওটাকে। আবার পালিয়ে যাবার আগে নিয়ে এস জলদি। চট করে।

নড়া চড়ার দ্রুত আওয়াজ।

মোরুানকে॥ এই নাও, ইসোলা। ধর যদি তোমার ফসকায়, অথবা শুধু আহত কর ওটাকে...খুব বিপদের হবে না?

ইসোলা॥ আমি ফসকাবো না।

মোরুানকে॥ ওহ্, কি ভয়ংকর দেখতে ওটাকে। গুলি করছ না কেন? এক্ষুনি ওটাকে মেরে ফেল ইসোলা।

ইসোলা॥ আমি শুধু অপেক্ষা করছি কখন মাথাটা বেরোয়। এ আলোতে ওকে নিশানা করা খুব কঠিন। চাঁদের আলো পাতার রঙের মতো এক দেখাচ্ছে। আর এভাবে এত চেঁচিও না। শুধু মাথাটার দিকে নজর রাখ, পাতাগুলো মাঝখানে।

মোরুানকে॥ ঐ তো! ঐ তো ওটা ওখানে! কি কুৎসিত দেখতে...ইসোলা। আমার ভয় করছে।

ইসোলা॥ আমাকে ছুঁয়ো না, আমি ফসকাবো...ঐ বেরিয়ে আসছে আবার।

বন্দুকের ঘোড়া টেপে, শুধু খট করে একটা শব্দ হয়।

মোরুানকে॥ কি হল? ছুটল না যে।

ইসোলা॥ (নিজের কপালে আঘাত করে) বোকা! বোকা। কি বোকা আমরা। এটাতে বারুদ ভরা দরকার ছিল। বন্দুকটা যখন হাতে নিয়েছিলে এটা ছুটে গিয়েছিল মনে নেই?

মোরুানকে॥ ওহ্...ওহ ইসোলা, খুবই দুঃখিত আমি...বাস্তবিক আমি খুবই দুঃখিত...কোথায় যাচ্ছ? কোথায় যাচ্ছ তুমি?

ইসোলা॥ বাড়ি।

মোরুানকে।। বাড়ি? মানে, তোমার বাবার বাড়ি?

ইসোলা।। হ্যাঁ, আমাকে কিছু বারুদ আনতেই হবে। আমি জানি তিনি বারুদ রাখেন কোথায়। তারপর গুলি করব।

মোরুানকে।। এখুনি কেন? সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করলে হয় না? ('মেতা মেতা ল্'ওরে' গানটি শুরু হয় এবং দৃশ্যটির শেষ পর্যন্ত প্রবাহিত হতে থাকে)

গান : ৬

মেতা মেতা ল্'ওরে ও ইই
মেতা মেতা ল্'ওরে ও ইই
ইকন নি ন্উয়া সুন ল্'এনি...ইই
ইকন নি নউয়া সুন ল্'এনি...ইই
ইকন নি ন্উয়া সুন ল্'আইইয়া...ইই
মো স্'ওযূ ওয়েরে মো বা ল্'আইইয়া লো
মো তি লো ম্'ওগুন, মো তি লো মো'ওসা
মো তি লো ম্'ওপো বলে ওদো
ওপে উয়েউয়ে সে'ফকু পা'নকো
ইসে ন্কেলে সে'কু প্'ওকুনরিন
ওতে 'বাদান ম্'ওগুন ওয়া যা'লু
ওন্দেরে সে'কো ইয়েইয়ে
ইয়েইয়ে ও লোরে ও...এ

ইসোলা।। না। আজ রাতেই মারতে হবে ওটাকে। আজ রাতে। আর অপেক্ষা করতে পারছি না আমি।

মোরুানকে।। ইসোলা, এটা বোকামি। কাল পর্যন্ত অপেক্ষা করা যাক।

ইসোলা।। না, আজ রাতে। এটার জন্যই যত দুঃস্বপ্ন দেখা দিচ্ছে। দেখতে পাচ্ছ না? মারতেই হবে ওটাকে।

মোরুানকে।। অপেক্ষা কর আমার জন্য...ছেড়ে যেও না আমাকে...ইসোলা, আমাকে একা ফেলে যাও সব সময়। অপেক্ষা কর, দোহাই তোমার...

ইসোলা।। ঠিক আছে, জলদি কর।

মোরুানকে।। চলে গেছে এর মধ্যেই। সাপটা চলে গেছে। তাহলে অপেক্ষা করছ না কেন সকালের জন্য?

ইসোলা।। যদি পালিয়েই থাকে তবু ঢুঁড়ে বার করব ওটাকে। আজ রাতেই ওটাকে শিকার করে ফেলতে চাইছি আমি।

মোরুানকে।। (ব্যাকুল আর্তনাদে) ইসোলা, বড্ড দ্রুত ছুটছ তুমি। দাঁড়াও, দোহাই তোমার---অপেক্ষা কর কাল পর্যন্ত...ইসোলা, ঐ দানোটাকে আজ রাতে শিকার করতে যেতে তুমি পারো না...ইসোলা; পারতেই হবে...পারতেই

হবে আমাকে, নইলে ঘুম হবে না আমার। মোড়ল মশাইয়ের ঘবে লুকিয়ে আমি ঢুকব, তারপর বারুদ হাতাব।

মোরুানকে।। তাহলে এটা সত্যিই। বিমপে আমাকে বলেছিল তুমি বদ্ধ পাগল, একেবারে বদ্ধ পাগল। এখন বুঝতে পারছি সত্যিকথাই বলেছিল সে...তুমি পাগল, ইসোলা...তুমি পাগল হয়ে গেছ।

ইসোলা।। ঐ জিনিসটা আমাকে পাক দিয়ে ঘুরলে আমি ঘুমুতে পারব না। দেখনি তুমি, আর তোমাকে দেখাতেও চাই না আমি...আরেকটা ভাঙা খোলা আমি দেখেছি ঝোরার ওপরে...পাহাড়ে আছড়ে ভেসেছে অন্যগুলির মতো...কি লাভ যদি তারা যেতে আসতে না পারে নিজেদের ইচ্ছেমতো। আজ রাতেই আমি মারব ওটাকে...

গান জোরে হয়। তারপর দৃশ্যান্তর। একটি জানলা ভাঙ্গার শব্দ।

মোযি।। কে ওখানে? কে? কে ওখানে? যেই হও না কেন, বেরিয়ে এস, শুনতে পাচ্ছ? খিড়কির দোর দিয়ে আমায় বাড়িতে লুকিয়ে ঢুকো না...আমার ছেলে এখানে নেই আর তাই তুমি হাতড়ে বেড়াতে পার সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত। সে নেই এখানে, তাই ভাগো এখান থেকে. শান্তিতে থাকতে দাও আমাকে। ভাগো! শুনতে পাচ্ছ?

নীরবতা

আমি জানি ওখানে আছ তুমি। আমি কালা নই। বেরিয়ে এসো, যেই তোমাকে পাঠাক না কেন। অথবা ফিরে যেতে পার, গিয়ে বলতে পার তার মেয়েকে পাইনি আমি, আমার ছেলেকেও পাইনি আমি। যাও, গিয়ে বলো তাকে। ঈশ্বর তাকে অভিশাপ দেবে যদি আমার ছেলেকে সে ছোঁয়...

নীরবতা। ধীর পায়ের আওয়াজ দরজার কাছে, তারপর হঠাৎ দড়াম করে খুলে যায়।

ইসোলা।। মা, দোহাই তোমার...বন্ধ করো দরজাটা।

মোযি।। ইসোলা। বাবা আমার, কোথায় ছিলি তুই? কি করছিলি?

ইসোলা বাক্সগুলো হাতড়ায়, খ্যাপার মতো খুঁজতে থাকে।

ওহ্, ইসোলা, আমাকে এমন ভেঙে টুকরো টুকরো করছিস কেন? তার চাইতে ঘুঁষি মেরে এক্ষুনি আমাকে মেরে ফেলছিস না কেন? আমি কি তোর মা নই? ইসোলা, মোরুানকে কোথায়? কোথায় হারিয়ে যাওয়া মেয়েটা? ইসোলা, জবাব দিচ্ছিস না কেন? তার বাবা মেয়েকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। সারা শহরের লোকদের খেপিয়ে তুলেছে তোর বিরুদ্ধে। সে বলছে তুই নাকি চুরি করেছিস তার মেয়েকে...ইসোলা, তোর মায়ের কথার

জবাব দে...কি করছিস তুই? ইসোলা। ওগুলো তোর বাবার জিনিস...বাপ আমার...তোকে আমরা কি করেছি? তুই যে বিপদের মধ্যে আছিস বাবা...তোকে লুকোতে হবে।

ইসোলো॥ আহ্...এই যে।

মোযি॥ কি ওটা? (ইসোলা বন্দুকটা তুলে নেয়) আরে এটা? নামিয়ে রাখ। এটা তোর বাবার বন্দুক না? (জানলা খোলা হয়) ইসোলা, চোরের মত জানালাটা ব্যবহার করবি এখন? কোথায় যাচ্ছিস তুই? না, তুই যেতে পারিব না। এখানেই থাকবি।

ইসোলা॥ মা, আমাকে যেতে দাও।

খানিক ধস্তাধস্তি।

মোযি॥ তোকে এখানে থাকতেই হবে। তোর কি একেবারেই ভয়ডর নেই? বলছি, সারাটা শহর তোর বিপক্ষে। তারা তোকে বলছে ছেলেধরা...তার মানে জানিস তুই? ছেলেধরা। এ গল্পটাই তোর সম্পর্কে চালু করেছে ওলুমোরিন।

ইসোলা॥ মা, যেতে দাও আমাকে...এখানে থাকা আমার চলবে না।

মোযি॥ তোর মনটাকে কি আমার বিরুদ্ধে একেবারে পাথর করে রেখেছি, তুই? বলছি তোকে, সারা শহরের সম্পত্তি এখন তোর জীবন। ছেলেধরা। তারা সবাই বলছে তুই ওলুমোরিনদের বাড়িতে গিয়ে মেয়েটাকে নষ্ট করেছিস।

ইসোলা॥ আমি করিনি, ব্যস ফুরিয়ে গেল।

মোযি॥ ফুরোল কি? তাহলে মেয়েটা কোথায়? কোথায় মেয়েটা? ইসোলা, আজ রাতে তুই কোথায় ছিলি? এখন কঠিন ব্যবহার বুড়োদেরই মানায়। বাবা আমার, তুই আমার মধ্যে ভয় ভরে দিচ্ছিস। তুই কি সত্যিই আমার ছেলে? আমি যেন তোকে আর চিনতে পারছি না।

ইসোলা॥ (আরে হিংস্রভাবে) মা, কি করছ তুমি? যেতে দাও আমাকে। যেতে দাও বলছি। (নিজেকে ছাড়াতে চেষ্টা করে)

মোযি॥ (ফোঁপায়) আমাকে মেরে ফেল। বন্দুকের আর কি কাজ? তোর বাবার ঘরে কি পাবার জন্য এসেছিস? মোরুানকে কোথায়? আমার বিরুদ্ধে নিজেকে এত কঠোর করে রেখেছিস কেন তুই? তোর মধ্যে কি ঘটেছে। ইসোলা? বাচ্চা বয়স থেকে তোর মধ্যে আমি কি পুষেছি যা আমি জানি না?

ইসোলা॥ কিছু না, কিছু না। আমাকে যেতেই হবে।

মোযি॥ যেতেই হবে? কোথায় যেতে হবে? এটা ছাড়া কি তোর আর কোন বাড়ি আছে? ভাবছিস বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে পারবি আমাকে ভয় আর প্রশ্নের মধ্যে রেখে? মোরুানকে কোথায়?

ইসোলা॥ তুমি যদি জানতে...তার নিজের বাড়িতেই।

মোযি।। আমাকে মিথ্যে বোল না বাবা। এর আগে ত কখনো এমন করিসনি, মিথ্যে বলিসনি আমার কাছে।

ইসোলা।। আমি ওকে নিয়ে গেছি ওখানে...এই মাত্তর। সে যেতে চায়নি কিন্তু আমি তাকে রেখে এসেছি ওখানে।

মোযি।। আর ওলুমোরিন? সে কি বাড়িতে আছে? বাপ মা কি জানেন মেয়েটা তাদের ফিরেছে?

ইসোলা।। তা নিয়ে মাথা ঘামানোর দরকার নেই আমার। বাড়ির দরজাটা ছিল খোলা, জায়গাটা মনে হচ্ছিল ফাঁকা। এবার আমাকে যেতে দেবে কি?

মোযি।। তারা যখন জানতে পারবে তাদের মেয়ে ফিরেছে তখন তুই যেতে পারবি যেখানে খুশি। তার আগে নয়। এখানে তোকে ওরা নিয়ে যেতে পারবে আমার মরা শরীরের উপর দিয়ে।

ইসোলা।। না মা। আমাক যেতেই হবে এখন। আমাকে এখন ছেড়ে দাও মা।

মোযি।। মেয়েটাকে ফিরে পাক, তার আগে নয়।

মোরুানকে।। (বাইরে থেকে) ইসোলা। ইসোলা।

মোযি।। কে? মোরুানকে গলা না?

পদধ্বনি বাড়ির ভেতরে আসে।

মোরুানকে।। ইসোলা...তুমি ফিরে গেলে না?

মোযি।। কি ব্যাপার? কোথায় ফিরে যাবি মেয়েটার জন্য?

ইসোলা।। এটাই একমাত্র উপায় যাতে আমি ওকে নিয়ে ওখানে থাকতে পারি। আমি ওকে কথা দিয়েছিলাম আমি ফিরে যাব।

মোরুানকে।। বাড়িটা একেবারে ফাঁকা...কেউ নেই...এমনকি বিমপেও নেই কোথাও। কেমন করে থাকি আমি? মা, সবাই মিলে কোথায় গেছে?

মোযি।। তোকে খুঁজতে।

মোরুানকে।। কত ভিড় দেখলাম...মশাল হাতে, অস্ত্র হাতে ...কিছু গণ্ডগোল হয়েছে নাকি?

মোযি।। ওরা সবাই তোর বাবার বন্ধু...তারা বলছে আমার ছেলে তোকে ভাগিয়ে নিয়ে গেছে। দেখতে পাচ্ছিস আমার ছেলের উপর কত ঝামেলা তুই এনেছিস?

ইসোলা।। মা, ওকে দেখ—। আমি যাচ্ছি।

মোযি।। না! আমি তোদের দুজনকেই লুকিয়ে রাখব বাড়ির মধ্যে। তারা আসুক, এসে এখানে তোদের খুঁজে পাক। বুঝলে মেয়ে, ওরা কিন্তু এসে তোমাকে জিজ্ঞেস করবে ইসোলা তোমাকে নষ্ট করেছে কিনা। তোমার বাপকে বোল কিছুটি করেনি ও। নাকি করেছে? তুইও কি ওকে দোষী বলবি? নাকি ওকে বাঁচাবি ওদের রক্তপিপাসার হাত থেকে?

মোরুানকে।। আমি ইসোলার সঙ্গে যাবই, আমি যাবই...

জানলা সহজে খুলে যায়। জনতার প্রবল কোলাহল। ইসোলা লাফ দিয়ে বাইরে বেরিয়ে যায়।

মোযি।। ইসোলা! ইসোলা!...ফিরে আয়। ফিরে আয়!

স্বর।। ঐ ত ছোকরা।
...ঐ ওই যে। জানালার ফোকর দিয়ে। তাড়া কর...তাড়া কর। জঙ্গলে পালিয়ে যেতে দিয়ো না ওকে। কেটে ফেল! চিরে ফেল ওকে! ঝোপের মধ্যে যেন যেতে না পারে।

ওলুমোরিন।। (চেঁচিয়ে) যে ওকে ধরতে পারবে আমার বাড়িতে তার অবাধ গতি। সে যা চাইবে দিয়ে দেব।

স্বর।। ওটাকে ঝোপ ঘাসের মধ্যে পালাতে দিয়ো না। কেটে টুকরো করে ফেল ওটাকে। কেটে টুকরো করে ফেল ওর যাবার আগেই লম্বাঘাসের কাছে পৌঁছে যাই।

মোযি।। ওলুমোরিন...ওদের ফিরতে বলুন। ওলুমোরিন, আপনার মেয়ে এখানে নিরাপদ আর সুস্থ।

মিসেস।। কি বলছেন? মোরুানকে?

ওলুমোরিন।। মোরুানকে? কোথায়?

মিসেস।। মোরুানকে...মোরুানকে...

মোযি।। ওলুমোরিন, আপনার মানুষ কুত্তাগুলোকে ফেরত আনুন...আপনার মেয়ে এখানে, এই যে ও! আমার ছেলের ক্ষতি করার আগে আপনার খ্যাঁকশেয়ালগুলোকে ফিরিয়ে আনুন। রেভারেণ্ড! রেভারেণ্ড! ওহ্...উনি ত গির্জায়। আমি নিজে গিয়ে তাঁকে ডেকে আনছি। ওলুমোরিন, আপনার মেয়েকে ফিরে পাচ্ছেন। আমার ছেলের যদি কোনো ক্ষতি হয়, আমার ছেলের যদি ক্ষতি হয়, তাহলে...তাহলে ঈশ্বর তাঁর খুশিমতো বিচার করুন। (তাঁর স্বর দূরে মিলিয়ে যায়)

ওলুমোরিন।। মোরুানকে, মা আমার, ভালো আছিস তো?

মিসেস।। এদিকে আয়, তোকে ধরতে দে। তোর কোনো ক্ষতি করেনি ত ছেলেটা?

মোরুানকে।। আমাকে ছেড়ে দাও। ছেড়ে দাও আমাকে। (প্রচণ্ড হিংস্রভাবে) আমাকে যেতে দাও, ডাইনি ডাইনি কোথাকার।

মিসেস।। কি বললি?

ওলুমোরিন।। কি বললি মেয়ে? এদিকে আয়, এদিকে আয় বলছি!

মিসেস।। শুনলে কি বলে ডাকল আমাকে?

মোরুানকে।। আমি ওর কাছে যাব। আমাকে ছেড়ে দাও। আমি ইসোলাকে চাই।

ওলুমোরিন।। চোপ!

মিসেস।। ছেলেটা ওকে তুক করেছে। নিজের মধ্যে আর নেই মেয়েটা শুনছ কি

বলছে মেয়ে?

ওলুমোরিন।। আমার হাতে ছেড়ে দাও ওকে, তারপর ওকে শুধরে দিচ্ছি বরাবরের মতো। আহ্ আমাকে মারছে মেয়েটা!

দ্রুত পদধ্বনি মিলিয়ে যায়।

মিসেস।। থামাও! থামাও মেয়েটাকে। ওর মায়ের দোহাই হারিয়ে যাবার আগে মেয়েটাকে আটকে দাও।

ওলুমোরিন।। আমাকে মেরেছে! আমাকে মারল মেয়েটা! পুরো পাগল হয়ে গেছে। থামাও...আটকাও ও মেয়েকে!

কিছু মানুষ।। পেয়েছি, পেয়েছি ইসোলাকে। ছোট্টো ঐ ঝোপের মধ্যে...আমরা ঘিরে ফেলেছিলাম, তাই পালাতে পারেনি।

ওলুমোরিন।। আমার মেয়ে...আমার মেয়ের কি হল?

মানুষ।। তার পেছনে ছুটেছে সবাই...বেশিদূর যেতে পারবে না।

ওলুমোরিন।। তোমরা শুধু ঝোপটা ঘিরলে কেন? ঝোপ খেতে চাই না আমি। ছোকরা কোথায়? নিয়ে এসো তাকে।

মানুষ।। সবাই বলছে ওর হাতে নাকি একটা বন্দুক রয়েছে। কেউ কেউ দেখেছে। সেজন্যেই আমরা ধরে আনতে পারিনি।

ওলুমোরিন।। তাহলে আগুন লাগাও ঝোপে। যাও...তোমরা মানুষ নাকি? ঝোপে আগুন লাগাও, বেরিয়ে আসুক তাপের জ্বালায়।

পদধ্বনি মিলিয়ে যায়।

অন্য একজন।। কর্তা...আপনার মেয়ে, আজ্ঞে...

ওলুমোরিন।। ধরতে পারোনি তাকে?

পদধ্বনির কঠিন আওয়াজ।

মানুষ।। না, কর্তা। সেও লুকিয়েছে ঝোপে।

মিসেস।। নিজেদের মানুষ বল তোমরা? তাকিয়ে দেখছ কি? মেয়েটাও যে ঝোপের মধ্যে রয়েছে ওর সঙ্গে। এখন কি করবে তুমি? কি করতে চাইছ?

এরিনযোবি।। (প্রবেশ করে) কিছু না। আপনাদের আর কিছু করার নেই।

পশ্চাদ্‌পটে মোযির কান্না।

ওলুমোরিন।। রেভারেণ্ড এরিনযোবি, আপনি ঠিক সময়ে এসেছেন।

এরিনযোবি।। তাই বোধহয়। ব্যাপার কি? একজন মানুষ কি শান্তি পেতে পারে না ঈশ্বরের আবাসেও। আপনার লোকজনের চিৎকার আমাকে কালা করে দিয়েছে।

তারপর আমার স্ত্রী ছুটে গিয়ে বললেন আপনার মেয়েকে আপনার ফিরে পেয়েছেন। এর পরেও আপনারা ছুটে এসেছেন আমার ছেলের উপর প্রতিশোধ নিতে?

ওলুমোরিন॥ কোন্ মেয়ে? সেও পালিয়েছে ওখানে...ছেলেটার সঙ্গে...ঝোপের মধ্যে।

মোযি॥ মেয়েটা তো এখানেই। এ বাড়িতে। আপনাদের হাতে ওকে তুলে দিয়ে মিনতি করলাম যাতে আপনার লোকজনকে বাড়িতে ফিরিয়ে নেন। কিন্তু ছেলে কোণঠাসা হয়ে রয়েছে ওখানে এখনো। আপনার সবাই জন্তু হয়ে গেছেন।

মিসেস॥ আর আপনার ছেলে? আপনার ছেলে জন্মেছেই জন্তু হয়ে। ওকে কিন্তু অন্য কেউ জন্তু বানায়নি।

মোযি॥ আপনি কি মা নন? আমার ছেলের বিরুদ্ধে কি ঘেন্না আপনি পুষে রেখেছেন?

মিসেস॥ ওটা ছেলেধরা।

মোযি॥ না, তা নয়। মোরুনকে আপনাদের বলবে সত্যি কথাটা। আমার ছেলে ওকে চুরি করেনি।

এরিনযোবি॥ খুব হয়েছে। ইসোলা কোথায়? এখন সে কোথায়?

মোযি॥ ঐ যে ওখানে। ঠিক যেখানে মানুষগুলি ভিড় করেছে।

এরিনযোবি॥ আপনারা থামুন। আমি ওকে বার করে আনছি। আপনাদের মেয়েকেও।

মোযি॥ (তার পেছনে চিৎকার করে) রেভারেণ্ড, ওকে জানতে দিয়ো যে তুমিই গিয়েছ। ওর হাতে তোমাব বন্দুক। জানতে দিয়ো ওর বাবা যাচ্ছেন...

মৃদু গানের মধ্য দিয়ে দৃশ্যান্তর

ওমো কি ও ইয়ে যোউয়ো ও
ও মো যোউয়ো
মো কুন্‌লে মো রে ও ও
ও মো যোউয়ো
মো ফ্' একুরূ বে ও ও
ও মো যেউয়ো
কি ও ইয়ে যো- উয়ো ও
মো ফ্' আকারা বে ও ও
ও মো যোউয়ো
কি ও ইয়ে যোউয়ো ও
ও মো যোউয়ো
কি ও ইয়ে যোউয়ো ও
ও মো যোউয়ো

এরিনযোবি॥ (দূর থেকে) পথ ছাড়ুন। নিজেদের মান সম্মানও খুইযেছেন আপনারা।

পালান সব। যান, চলে যান এখন। নিজেদের বাড়ি ফিরে অপেক্ষা করুন। আপনারা সবাই। আমি বলছি—যান আপনারা। আপনারা কি জানোয়ার যে রক্ত খাবার জন্য জিভ চাটছেন? আপনাদের মাথার উপর আমি ঈশ্বরের অভিশাপ ডেকে আনার আগেই আপনারা পালান। যান সবাই।

সকলে গজগজ করতে করতে সরে যায়।

ইসোলা। ইসোলা। ভোরের প্রার্থনা করার সময় প্রায় হয়ে এসেছে। বাড়ি ফিরে চল, ইসোলা, বাবা আমার। বাড়ি ফিরে চল পরিবারের সকলের সঙ্গে যোগ দে।

গান একটু জোরে হোতে থাকে।

ইসোলা, আমি যখন গির্জায় ছিলাম, তোর মা আমার কাছে গিয়েছিল, সব বলেছে। তুই পাপ করেছিস, আমি জানি...

ইসোলা।। আমি পাপ করিনি।

এরিনযোবি।। অনুতপ্ত হ। আমি তোর কাছে এসেছি কেননা আমিও পাপ করেছি। ঈশ্বরের কাছে হৃদয় খুলে দিয়ে জানলাম একমাত্র তিনিই ছেড়ে দিতে পারেন সন্তানদের, কিন্তু তা করেন না কখনো তিনি। আমার কি অধিকার আছে, তাঁর সামান্য সেবক, এত অহংকারী হবার? কি আমার স্বর আছে যাতে আমি তোকে গালাগাল দিতে পারি ঈশ্বরের সামনে মানুষের সামনে? আমার পাপও তখন তোর মতোই বিশাল হয়ে উঠল। বাড়ি ফিরে চল, তাঁর ক্ষমা পেতে আমায় প্রার্থনায় সাহায্য কর।

ইসোলা।। এরিনযোবি আমাকে শান্তিতে থাকতে দাও।

এরিনযোবি।। এরিনযোবি? বাছা, এ যে তোর বাবার নাম!

ইসোলা।। এরিনযোবি, আমাকে শান্তিতে থাকতে দাও।

এরিনযোবি।। এভাবেই কি আবার আমাকে বাইরে আটকে রাখতে চাস? দীর্ঘ রাত কেটেছে, আমার থেকে তোর কঠিন মুখ আর ফিরিয়ে নিস না। নিজের পাপের জন্য অনুতাপ কর, বাবা আবার...

ইসোলা।। পাপ আমি করিনি।

এরিনযোবি।। হ্যাঁ করেছিস। ঈশ্বরের দৃষ্টিতে আমরা সকলেই পাপী; তাঁর দয়ার উপরেই শুধু আমাদের নির্ভর। তোর মা আমাকে ডেকে এনেছে একথা সত্যি, তিনি তোর জীবন নিয়ে ভয় পেয়েছিলেন। কিন্তু আমি আমার উপাসনা সেজন্যে ভাঙিনি। মঙ্গলময় ঈশ্বর রক্ষা করেন তাঁর সন্তানদের, তাই তোর জীবন নিয়ে কোনো ভয় ছিল না আমার। তোকে আমি তাঁর হাতেই সমর্পণ করেছি...

ইসোলা॥ না, ওলুমোরিনের হাতে।

এরিনযোবি॥ বাবা আমার। আমি তোকে ঈশ্বরের হাতেই সমর্পণ করেছি। গির্জায় গেলাম শুধু প্রার্থনা করতে যেন তোর মধ্যে দিয়েই প্রভু তাঁর ইচ্ছা পূরণ করেন...

ইসোলা॥ আর ওলুমোরিন তার নিজের ইচ্ছা...এটাকে ভুলে যেয়ো না এরিনযোবি।

এরিনযোবি॥ বাবা আমার, এটা কি এগুনগুন ঝোপ যার ভেতর থেকে অন্ধকারের মধ্যে তিনবার চেঁচিয়ে বললি নিজের বাবার নাম। মেয়েটাকে পাঠিয়ে দে। ওর মা-বাবা অপেক্ষা করছেন।

ইসোলা॥ মোরুানকে আমার পাশেই রয়েছে। বেঁধে রাখিনি ওকে। ওকেই বল, ওর যা ইচ্ছা তাই করুক।

এরিনযোবি॥ মোরুানকে বাড়ি ফিরে চলো। তোমার বাবা মা উদ্বিগ্ন। তাঁদের কাছে ফিরে এসো।

নীরবতা। শুধু গান শোনা যাচ্ছে।

কন্যা ফিরে এস মা বাবার কাছে। তুমি নিতান্ত শিশু, তবু বিপথে চলে গিয়েছ। তুমি বেরিয়ে এসো। আমি একা বোঝাপড়া করি আমার ছেলের বিবেকের সঙ্গে।

বিরতি। শুধু গান।

ইসোলা, তুই কি আটকে রেখেছিস ওকে?

ইসোলা॥ এরিনযোবি, তুমিই ওকে আটকে রেখেছ।

এরিনযোবি॥ আবার? বাবা আমার, আমাদের সমাজ বলে ছেলে বাবাকে নাম ধরে ডাকলে সেটা খুবই খারাপ সময়। মেয়েটাকে পাঠিয়ে দে। ওকে বল বাড়ি ফিরে যেতে।

ইসোলা॥ আসা আর যাওয়া তার নিজেরই ইচ্ছের উপর। আমার কাছে চাইবে না কিছু।

এরিনযোবি॥ মোরুানকে। ('ওমো যোউয়া' চলতে থাকে।) তাহলে আমিই আসছি, ওকে নিয়ে আসতে।

ইসোলা॥ (যেন গর্জন করে) আসবে না। (ঝোপের মধ্যে পায়ের শব্দ)

এরিনযোবি॥ মোরুানকে, আমি আসছি, তোমার মা বাবার কাছে ফেরত দেব তোকে।

ইসোলা॥ এরিনযোবি. এস না এখানে। ফিরে যাও তোমার গির্জায়।

ঝোপের মধ্যে দৃঢ় গতি।

তফাতে থাক এরিনযোবি, তফাতে থাক...যদি দেখা দেয় তোমার মাথা, এরিনযোবি। তোমার মাথা যদি একবারও দেখা দেয় পাতাগুলোর মধ্যে। এরিনযোবি!

সে বন্দুক ছোড়ে। মোরুানকে আর্তনাদ করে ওঠে, কাঁদতে শুরু করে। থেয়ে আসা পায়ের আওয়াজ ছুটছে।

ইসোলা।। চুপ মেয়ে, চুপ...কেন, এ ত শুধু এরিনযোবি...ভয় পেয়েছ তুমি?

প্রচণ্ড আলোড়ন ঝোপের মধ্যে

মোযি।। (চিৎকার করে) ইসোলা। ইসোলা! রেভারেণ্ড! ইসোলা। তোমরা কোথায়? কোথায় তোমরা? ইসোলা! (সহসা চুপ) ন্‌গ্‌হ? রেভারেণ্ড। রেভারেণ্ড! রেভারেণ্ড। (কান্নায় ভেঙে পড়েন তিনি) ('আগবে' গান)

ইসোলা।। মোযি...তুমিও? কেন, মোযি, তুমি কাঁদবে না...চুপ, মেয়েমানুষ, চুপ এখন...চুপ...চুপ... (গান জোরে হয়, পূর্ণ দমে)

গান : ১

অগ্‌বে ত'ওর্‌'ওমো রে দারো ও...ওলেন্‌লে
অলুকো ত'ওর্‌'ওমো রে গ্‌'ওসুন ও...ওলেন্‌লে
বাবা ইয়োকু ত'ওর'ওমো রে পারাকো ইদে ও
আওয়া ও লে তরো ইউয়োন ইয়েন
ক্‌'অমো আ ব'ওলু স্‌'এরে ইমোরন...
ওলেনলেও

সমাপ্ত

।। গানের অনুবাদ।।

(১) 'অগবে'
শিশুর জন্য শোকে 'অগ্‌বে' তাকে মুড়ে রেখেছিল নীলে
শিশুর জন্য শোকে 'অলুকে' ক্যামউড রঙ করেছিল মাটি
শোকার্ত বাবা পেতলের ঘন্টা এনেছিল জোর করে
কিন্তু আমরা বাস করতে পারি না বেশি করে এসব নিয়ে
তাহলে আমরা জড়িয়ে পড়ি ঈশ্বরের সঙ্গে নিয়তির খেলায়।

(২) 'মো লে য'ইয়ান ইয়ো'
আমি আনন্দ পাই খামারের মানুষের মতো রাঙা আলুর টুকরোয়
আমার ভোজ ভুট্টা দিয়ে 'সাঙ্গো' উপাসকের মতো
আমার পিঠ শিশুটির আশ্রয় পবিত্রতম মায়ের মতো
এ শিশু তোমাকে—তোমার নিজেরই রক্ত আর মাংস

এ যমজ তোমাকে—তোমার নিজেরই রক্ত আর মাংস
এবং যমজের একটি—তোমার নিজেরই রক্ত আর মাংস

(৩) 'এ-ইয়া কো সে এ গ্‌বে'
বেজায় ভারি, বেজায় ভারি এটি তোলার পক্ষে
বেজায় ভারি, বেজায় ভারি এটি তোলার পক্ষে
যদি হত আর একটু হাল্কা, আমি তাহলে বইতাম নিজেই
আর যখন এটা মনে হবে হাল্কা বলে
হাতিটা মরেছিল ঝোপের মধ্যে, পর্বতকে আমরা এনেছিলাম বাড়িতে
বুনো ষাঁড় মরেছিল ঝোপের মধ্যে, পর্বতকে আমরা এনেছিলাম বাড়িতে
ইঁদুরটা মরেছিল বাড়ির মধ্যে, পর্বতকে আমরা
নিয়েছিলাম ঝোপের মধ্যে
চিতাবাঘের চোখ, অন্ধকারে জ্বলে
চিতাবাঘের লেজ আন্দোলিত পাশে
চিতাবাঘের থাবা, দুদিকে ধারালো ক্ষুর
মন্দা রাঙা আলুর যদি আকাল পড়ে, তাহলে ঝাঁপাতাম নরম ওল
কনে যদি পালায় তাহলে বিয়ে করব আমাদের শালীদের
ব্যাপারটা যদি বিরক্ত কর আমাদের, আমরা নতজানু হয়ে নালিশ জানাব
আর তা যদি না করে, তাহলে চালিয়ে যাব আর্তনাদ...
গালের উপর ক্ষতচিহ্ন যেন জ্বলজ্বল যাত্রাপথ

(৪) 'মো য'আওয়ে গবেগবে'
তুললাম আমি 'গ্‌বেগবে' পাতা
নইলে ভুলে যেতাম আমি
তুললাম আমি 'তেতে' পাতা
নইলে চাপা পড়তাম নিচে
দিন শেষ হয়ে যাচ্ছে, যাক আমাদের ভালোয় রেখে
চোখগুলো হোক আলোময়, তারা ভোলে না ঘর
এভাবেই চলে যায় এটা...এভাবে হোক শুভ বিদায়
এভাবেই চলে যায় এটা...এভাবে হোক শুভ বিদায়

(৫) 'ওমো কি ও ইয়ে যোউয়ো ও'
বাচ্চা আমি মিনতি করছি তোকে
মিনতি করছি তোকে
নতজানু হয়ে মিনতি করছি তোকে

মিনতি করছি তোকে
বরবটির দই নিয়ে মিনতি করছি তোকে
তৃপ্ত হ তোকে মিনতি করছি আমি
মিনতি করছি তোকে
তৃপ্ত হ তোকে মিনতি করছি আমি
মিনতি করছি আমি

(৬) 'মেতা মেতা ল্'ওরে ও'
বন্ধু আসছে তিনজন করে
বন্ধু আসছে তিনজন করে
প্রথমজন দিতে চাইল মাদুর ঘুমোবার জন্য
পরের জন দিতে চাইল মেঝে ঘুমোবার জন্য
তৃতীয়জন দিতে চাইল তার বক্ষ
একবারও পিটপিট করিনি আমি, গ্রহণ করলাম বক্ষ-উপহার
আমি জেনেছি নদীকে, জেনেছি আমি সমুদ্রকে
স্রোতদের পিতার পথ আমি জানি
ছোট পর্ণও বয়ে আনতে পারে মৃত্যু তন্তুদের উপর
একজন সোমত্ত মানুষও মরে যায় অবসাদ-ভরা শ্রমে
ইবাদানের ষড়যন্ত্র যুদ্ধকে বয়ে এনেছিল শহরে
সুন্দর পালক দিয়ে তোতা বানায় আবোল তাবোল
বন্ধুত্ব শুধু ভুলে-ভরা, শুধুই অন্তঃসারহীন।

ভাবান্তর : বিষ্ণু বসু

চাকা

লেওপোল্‌ড সেদার সেন্‌ঘর

চরিত্রলিপি

একটি শ্বেতস্বর / চাকা / একটি স্বর / সংস্তব / সংস্তব চালক

নাট্যকার ও নাটক

লেওপোলড্ সেদার সেন্‌ঘর সেনেগালের নাট্যকার। সেনেগাল আফ্রিকার পশ্চিম-প্রান্তের একটি দেশ। তার রাজধানী ডাকার। এ দেশটা একদিন ভাগাভাগি করে নিয়েছিল ফরাসী আর পর্তুগিজরা। কিন্তু বিশ শতকে নানা দেশের মুক্তি সংগ্রামের সঙ্গে তাল মিলিয়ে সেনেগালও তৎপর হয়ে উঠেছিল স্বাধীনতা লাভের জন্য। ১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে জুন স্বাধীন হয় সেনেগাল। প্রথমে প্রাক্তন এক ফরাসী উপনিবেশ সুদানের সঙ্গে মিলে গড়ে উঠেছিল মালি ফেডারেশন। কিন্তু মাস দুয়েকের মধ্যেই এ ফেডারেশন থেকে বেরিয়ে পৃথক রাষ্ট্র হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে সেনেগাল।

ফরাসী প্রভাবের ফলে সেনেগালে গড়ে উঠেছিল নাট্যকলার প্রতি অনুরাগ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অনেক আগে থেকেই দেখা দিয়েছিলেন বিশিষ্ট কিছু নাট্যকার। অবশ্য এ নাটকগুলো লেখা হত প্রধানত ফরাসী ভাষায়।

'চাকা' নাটকটিও সেন্‌ঘর লিখেছিলেন ফরাসী ভাষায়। সেন্‌ঘবের জন্ম ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে সেনেগালের সমুদ্রতীরবর্তী একটি অঞ্চলে। প্রাথমিক পাঠ সমাপ্ত করে বিশ বছর বয়সে চলে যান পারীতে, উচ্চশিক্ষার জন্য। সোরবন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক হন তিনি। পশ্চিম আফ্রিকার অধিবাসীদের মধ্যে তিনি প্রথম এ কৃতিত্বের অধিকারী। দেশে ফিরে পান বিবিধ সরকারী পদ যার মধ্যে ছিল সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রীর পদ। স্বাধীনতার পর তিনি হলেন প্রথম রাষ্ট্রপতি।

'চাকা' নাটকটি লেখা হয়েছিল ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দে। নাটকটি তাঁর কবিতার মতোই আশ্চর্য দেশীয় রূপকল্পে গ্রথিত। অনুবাদের নানা ঘাট পেরিয়ে তার নিজস্ব আস্বাদ আমাদের, এই পূর্বপ্রান্তবাসীদেরও প্লুত করে।

১. চিতেন

একটি শ্বেতস্বর : চাকা, তাহলে এসেছ,
ক্ষিপ্র চিতা অথবা
বিশ্রীবদন হায়েনার মতো
তিনটি কাঠের বর্শাফলক মাটিতে বিদ্ধ,
বাগ্‌দত্ত তুমি
আর্ত শূন্যতার সঙ্গে—
তুমি এসেছ এখানে, তোমার
কামনার মুহূর্তে।
আজ এই নদী রক্তের, তোমাকে স্নান করায়—
এই তবে হোক তোমার প্রায়শ্চিত্ত।
চাকা : (শান্ত মুখ) হ্যাঁ, আমি এসেছি এখানে, মধ্যবর্তী
দুটি ভাইয়ের : দুজন বিশ্বাসঘাতক,
দুটি তস্কর, দুটি আকাট—
হ্যাঁ, তবে অবশ্যই নয় হায়েনা।
বরং বলতে পারো
ইথিয়োপিয়ার সিংহের মতো, মাথা
স্থাপিত অনেক উচুঁতে।
আমি এসেছি। পৃথিবীতে আনীত।
কী উজ্জ্বল শৈশবের সাম্রাজ্য—
এবং এখানেই অবসিত আমার
কামনা।
শ্বেতস্বর : চাকা, তুমি কাঁপছো
চরম দক্ষিণে এবং
সূর্য বিস্ফোরিত হলো হাসিতে
সর্বোচ্চ শিখরে।
দিনের আলোয় অস্পষ্ট
হে কাঠপায়রার তীক্ষ্ণ বাঁশির সুর।
তুমি কিছুই পাওনা শুনতে, শুধু শোনো
আমার কণ্ঠস্বরের নয় ফলা—
যা তোমার সাতটি হৃদপিণ্ডকে
বিদ্ধ করে।

চাকা : সাগরপারের শ্বেতস্বর, আমার
অন্তঃস্থ চোখ
দ্যুতিময় করে তোলে হীরক রাত্রিকে,
দরকার নেই দিনের মিথ্যা আলো।
বুক আমার দুর্ভেদ্য কবচ
তোমার বিপুল বজ্রকে করে
বিধ্বস্ত।
তেঁতুলগাছে বিচ্ছুরিত ভোরের শিশির
এবং আমার সূর্য
আমাকে প্রতিজ্ঞা জানায়—
সে উঠে আসবে কাঁচের দিগন্ত বেয়ে।
শুনতে পাই মধ্যাহ্ন পাখিদের
কলগুঞ্জন
এবং উদ্বেলিত হয়ে উঠি
প্রতিটি মজ্জার অভ্যন্তরে।
শ্বেতস্বর : হা হা চাকা, বাস্তবিক তোমারই
উপযুক্ত যখন বলো
আমাকে তোমার ভালোবাসার
পাখিদের কথা।
মাখনের মতো তাদের হৃদয়,
চোখ দুটি নেনুফার পল্লবের মতো—
তার কথা যেন উৎসের যাদুমর্মর।
তুমি হত্যা করেছ তাকে,
সেই সুন্দরতমাকে,
উদ্ধার পেতে চেয়েছ নিজের বিবেক থেকে।
চাকা : হায়, আবার তুমি জাগিয়ে তুলছ
আমার বিবেককে।
হ্যাঁ, আমি তাই করেছি, আমি তাকে মেরেছি
যখন সে বলছিল সেইসব গল্প
নীল দূরদেশের।
হ্যাঁ, আমি তাকে মেরেছি, এমন হাত দিয়ে
যা কাঁপে নি কখনো।
অপূর্ব ইস্পাতের বিদ্যুৎ বগলের সুগন্ধি
ঝোপে সংলগ্ন।

শ্বেতস্বর : চাকা, তাহলে স্বীকারোক্তি করছ! তবে কি
শপথ করে সত্যি বলবে কত লক্ষ মানুষ
নিশ্চিহ্ন হয়েছে তোমারই জন্য?
পুরো নারীবাহিনী
গর্ভভারে স্ফীত অথবা স্তন্যপায়ী শিশুসমেত?
তুমি শকুন আর হায়েনার
সেরা সরবরাহক, তুমি মৃত্যু অধিত্যকতার কবি—
অন্বেষণ করছিলে যোদ্ধাদের,
আসলে তুমি একটি কসাই।
গিরিখাতগুলো পবিপূর্ণ
রক্তের স্রোতে। ফোয়ারার শিখরে
রক্তের ঝর্ণা
বন্য কুকুরগুলো গর্জন করছে
মৃত্যুর দিকে সমতলে,
আর তার উপর ঘুরপাক খাচ্ছে
মৃত্যুর ঈগল।
হে চাকা, তুমি জুলু,
তুমি ভয়াবহ প্লেগের চাইতেও, তুমি ক্রোধোন্মত্ত
দাবানল!

চাকা : খিড়কির উঠোন মুখর হয়েছে
হাঁসমুরগীর খামারে, বনমোরগের
মূর্খ খাঁচা, হ্যাঁ, অতি অবশ্যই
জমকালো হাজার কাহিনী। মোলাম ভেলভেট
সিল্কের মতো মসৃণ বক, চর্বি মাখানো
লাল তামার মতো বিচ্ছুরিত।
কাঠুরিয়ার কুঠার আমি এনেছি
এই মৃত অরণ্যে,
এবং প্রজ্জ্বলিত করেছি বন্ধ্যা বুনোঝাড়কে,
নিপুণ স্বত্বাধিকারীর মতো।
আর মজুত রয়েছে ওই ছাইগুলো
শীতে বপনের জন্য।

শ্বেতস্বর : কি বলছ কি? বিন্দুমাত্র নেই শোচনা—

চাকা : একমাত্র অমঙ্গলই পারে অনুশোচনার উৎস হতে।

শ্বেতস্বর : মানুষের নাসারন্ধ্র থেকে

জীবনের যাবতীয় সুগন্ধিকে উৎখাত করার মধ্যেই থাকে বৃহত্তম অমঙ্গল।
চাকা : বৃহত্তম অমঙ্গল তো থাকে
অন্তরেরই দুর্বলতায়।
শ্বেতস্বর : ক্ষমা করা হলো হৃদয়ের দুর্বলতাকে।
চাকা : হৃদয়ের দুর্বলতাই তো পবিত্র
হায়, বিশ্বাস করো না কি
আমি তাকে পারি নি ভালোবাসতে,
আমার নিগ্রোবধূ ছিল লাল
তবে জেনো, একটি মাত্র পালক তার কোমর
তার উরু দুটো যেন উদ্‌বিড়ালেব উরু—
বিস্মিত যে কিলিমাঞ্জারোর তুষারে।
তার স্তন দুটি পরিপক্ক ধান খেত
এবং পূবালি হাওয়ার অধীনস্থ
আকাসিয়া পাহাড়ের মতো।
ময়াল-বাহুর নোলিভে
অনুপুঙ্খ-সাপের ঠোঁট তার।
নোলিভে, যার চোখ দুটো ছিলো নক্ষত্র—
দরকার ছিলো না কোনো
চাঁদের, দরকার ছিলো না মাদলের...
শুধু তার কণ্ঠস্বর আমার মস্তিষ্কে
এবং রাত্রির জ্বরতপ্ত নাড়ি।
হায়, বিশ্বাস করো না কি
আমি পারি নি তাকে ভালোবাসতে,
কিন্তু এই দীর্ঘ বছরগুলো, বছরগুলোর
এই ভ্রাম্যমান চাকা, এই লৌহ-গলাবদ্ধ
সব ক্রিয়াকে মারে গলা টিপে।
এই দীর্ঘ নিদ্রাহীন রাত
আমাকে পরিণত করে কাম্বেসীর
হঠকারী ঘোড়ায়, লাফায়,
লাথি মারে নক্ষত্রদের
বিদ্ধ নেকড়ের যন্ত্রণার মতো
এক নামহীন বেদনায় নিমজ্জিত।
হয়তো করতাম না হত্যা
যদি তাকে ভালোবাসতাম আরো কম করে।

আমি চেয়েছিলাম সন্দেহ ভেঙে
মুক্ত হতে।
তার মুখের দুখের মাতলামি থেকে,
আমার রক্ত
রাতের ছুটে যাওয়া মাদল থেকে।
আমার অস্ত্রের জ্বলন্ত লাভা থেকে,
আমার নিগ্রোত্বের গভীরে
নিমজ্জিত
আমার হৃদয়ের ইউরেনিয়ম খনি থেকে,
নোলিভের প্রতি আমার প্রেম থেকে—
আমার কালো মানুষগুলোর
ভালোবাসার স্বত্বের জন্য।

শ্বেতস্বর : আমার বক্তব্য, চাকা, তুমি আসলে
কবি, কিংবা জিভে মধু—
বলিয়ে এক রাজনীতিবিদ্।

চাকা : দূতেরা আমাকে বলেছিলো
'তারা এসেছিল শাসকদের সঙ্গে,
কম্পাস, কাঁটা-কম্পাস, চাঁদা, টি-স্কোয়ার—
চামড়া সাদা, চোখগুলো হাল্কা নীল,
তাদের বুলি উলঙ্গ এবং
তাদের মুখগুলো সরু
এবং বজ্র নিক্ষিপ্ত হয়েছিলো
তাদের জাহাজ থেকে।'
আমি পরিণত হলাম একটি মাথা ও একটি বাহুতে
একটুও না কেঁপে
যোদ্ধাও না কসাইও না।
'রাজনীতিবিদ্'-তুমি বললে,
আমার অন্তরস্থ কবিকে আমি খুন করেছি
শুধু রয়ে গেছে
একটি ক্রিয়াশীল মানুষ।
একজন মানুষ যে বিচ্ছিন্ন সকলের থেকে,
নির্জন এবং ইতিমধ্যেই মৃত
অন্য অনেকের আগে—
যাদের জন্য তুমি হুতাশ করছো।

কেউ কি জানতে পেরেছে আমার
কামনা?

শ্বেতস্বর : বুদ্ধিমন্ত সে-ই পারে
বিস্মরণের তটে একাকী দাঁড়াতে।
কিন্তু শোনো চাকা, তোমাকে মনে রাখতে হবে,
দৈবজ্ঞ ইসানুসীর কণ্ঠস্বর
অনেক দূর থেকে।
ভালো করে ভাবো, চাকা,
তোমাকে বাধ্য করছি না আমি—
আমি শুধু একজন দৈবজ্ঞ, একজন যন্ত্রবিদ্।
উৎসর্গ ছাড়া ক্ষমতার কোনো উৎস নেই
আর চরম ক্ষমতা আকর্ষণ করে মূল্য—
আমাদের প্রিয়তম মানুষদের রক্ত।

একটি স্বর : (যেন চাকারই তুল্য—অনেক দূর থেকে)
প্রত্যেককেই মরতে হয় উপসংহারে
সব কিছু স্বীকার করে নিতে।
আগামীকাল একজনের রক্ত তোমার ভেষজে
ছড়িয়ে পড়বে ফোঁটায় ফোঁটায়। এমনকী
দুধ যেমন একজন সচেতন দৈবজ্ঞের
শুষ্কতাকে নরম করে।
প্রস্থান করো, আমাকে ছেড়ে দাও শান্তিতে
প্রত্যেক পরিত্যক্ত মানুষকেও দেওয়া হয়
কয়েক ঘণ্টার বিস্মরণ।

চাকা : (এগিয়ে আসতে থাকে)
না, না, শ্বেতস্বর,
তুমি জানো বেশ ভালোভাবেই—

শ্বেতস্বর : সেই ক্ষমতাই তোমার অন্তিম
যা তুমি লক্ষ্যে রেখেছ—

চাকা : একটি উপায় মাত্র—

শ্বেতস্বর : তোমার আনন্দ—

চাকা : আমার ক্রুশবিদ্ধতা।
আমি স্বপ্নে দেখেছি পৃথিবীর চারকোণের
সব দেশ
আত্মসমর্পণ করছে শাসকদের কাছে,

টি-স্কোয়ার, কম্পাস,
জঙ্গলগুলো চলছিল,
পাহাড়ের দল ধ্বংস করছিল উপত্যকা
আর
শৃঙ্খলাবদ্ধ নদীকে।
আমি দেখেছি
জোড়া রেলপথের পাশে বিন্যস্ত
রেলিংয়ের নিচে
পৃথিবীর চারকোণের সবগুলো দেশকে,
আমি দেখেছি কফিনের মানুষদের
কর্মরত
স্তব্ধতার পিঁপড়ে-ঢিবির মতো।
কর্ম তো পবিত্র
কিন্তু কর্মে নেই আর কোনো
মাদলের অঙ্গভঙ্গি,
নেই কোনো স্বর বা ছন্দ
কিংবা ঋতুদলের অভিব্যক্তি।
দক্ষিণের মানুষগুলো
উঠোন, বন্দরে, খনিতে,
কারখানায়।
এবং রাতে বিচ্ছিন্ন থাকে দুঃখের বস্তিতে।
আর অন্য মানুষেরা জমায়
কালোসোনার পাহাড়
অথবা রক্ত
যখন তারা মরে ক্ষুধার্ত।
এক সকালে আমি দেখেছিলাম
প্রত্যুষের কুয়াশা থেকে
বেরিয়ে আসছিল লোমশ মাথার অরণ্য।
বাহুগুলো শুষ্ক বিবর্ণ, চুপসানো পেট
চোখ আর বিশাল ঠোঁটগুলো,
মিনতি করে বোঝাছিল
এক অসম্ভব দেবতাকে।
আমি কি থাকতে পারি অসাড়
এবং অনুভূতিহীন

এসব বিদ্রূপবদ্ধ যন্ত্রণার প্রতি?
শ্বেতস্বর : তোমার কণ্ঠস্বর রক্তিম আজ ঘৃণায়।
চাকা—
চাকা : আমি ঘৃণা করি শুধু অত্যাচারকে
আর কারুকে নয়
শ্বেতস্বর : এই ঘৃণা তোমার হৃদয়কে বিদীর্ণ করছে
হৃদয়ের দুর্বলতা পবিত্র
কিন্তু আগুনের এ ঘূর্ণিঝড়কে
পবিত্র বলা যায় না কোনোমতেই।
চাকা : এ ঘৃণা অতিরিক্ত নয়
আমার মানুষগুলোর ভালোবাসার মতো।
বরং বলি, বাহুর ক্ষমতার অধীনে
শান্তি নেই, থাকতে পারে না
শান্তি থাকতে পারে না অত্যাচারের অধীনে
যেমন নেই সাম্যবিহীন ভ্রাতৃত্ব।
এবং আমি চাই সব মানুষ হোক ভাই।
শ্বেতস্বর : তুমি দক্ষিণীদের তৈরি করেছ যুদ্ধের জন্য
সাদাদের বিরুদ্ধে—
চাকা : এই ত পৌঁছে গিয়েছ ঠিক জায়গায় এতক্ষণে—
শ্বেতস্বর, পক্ষপাতী স্বর,
স্তোকদাতা স্বর।
তুমি শক্তিমানের কণ্ঠস্বর
দুর্বলদের বিরুদ্ধে।
সমুদ্রের ওপার থেকে আগত
মালিকদের বিবেক।
আমি সেই গোলাপী-কানওয়ালাদের
ঘৃণা করিনি।
তাদের বরণ করেছিলাম দেবতাকে বার্তাবহ বলে,
সুন্দর কথা আর স্বাদুতম পানীয় দিয়ে।
তারা চেয়েছিল ব্যবসা করতে—
আমরা তাদের দিয়েছিলাম যাবতীয় :
হাতির দাঁত, মধু এবং লুকোনো রামধনু
মশলা, সোনা, মূল্যবান পাথর
তোতা, বাঁদর এবং কী নয়।

বলব কি তাদের নোংরা উপহার
আর তুচ্ছ পুঁতির মালার কথা?
হ্যাঁ, তাদের কামান শিখতে শিখতে
আমি হলাম মানুষের নেতা
এবং আমার ভাগ্য পরিণত হল
যন্ত্রণায়,
যন্ত্রণা—আমার হৃদয় আর আত্মার।
শ্বেতস্বর : পবিত্র হৃদয়ে যন্ত্রণা আনে মুক্তি।
চাকা : হ্যাঁ, আমার হৃদয়ও গৃহীত।
শ্বেতস্বর : তোমার অনুতপ্ত হৃদয়।
চাকা : আমার কালো মানুষগুলোর জন্য ভালোবাসায়—
শ্বেতস্বর : আর নোলিভের প্রেম আর যারা শায়িত মৃত্যু উপত্যকায়?
চাকা : নোলিভের প্রতি আমার ভালোবাসা।
কেন বার বার বলছ একই কথা?
প্রত্যেকটি মৃত্যু তো আমার নিজেরই।
প্রয়োজন আছে ফসল কাটার জন্য প্রস্তুত থাকা
এবং গমকলে পেষাই করা
কালো আদরের চিরকালীন সাদাকে।
শ্বেতস্বর : যে সহ্য করেছে অনেক যন্ত্রণা

২. পরাচিতেন

[প্রেমের মাদল, জীবন্ত ; চাকা এক লহমার জন্য তার চোখদুটো সে বন্ধ করে তারপর খোলে এবং অনেকক্ষণ ধরে তাকিয়ে থাকে পূর্বদিকে। তার মুখ গম্ভীর ও উজ্জ্বল]

চাকা : আসছে রাত, আমার দয়ালু আর
সুন্দর রাত।
চাঁদ যেন সোনাব মুদ্রা
আমি শুনতে পাচ্ছি
নোলিভের ভোরের কূজন
যেন দারুচিনির ডেলা গড়িয়ে আসছে
সুবাসপূর্ণ ঘাসের মধ্যে।
সংস্তব : তাহলে সে ছেড়ে যাচ্ছে আমাদের,

কী কালো এ ব্যাপার—
এই সেই নির্জনতার মুহূর্ত।
এসো, আমরা গান করি জুলুদের মাহাত্ম্য
যাতে আমাদের স্বর সান্ত্বনা দিতে পারে তাকে-
বায়েতে বাবাকে,
বায়েতে হে জুলু।

সংস্তব-চালক : আর কী চমৎকার সে—
পুনর্জন্মের এই তো মাহেন্দ্রক্ষণ।
শৈশবের বাগানে পেকে উঠেছে
কবিতা,
ভালোবাসার এই তো মাহেন্দ্রক্ষণ।

চাকা : হে আমার বাগ্‌দত্তা,
এ মুহূর্তটির জন্য কত না প্রতীক্ষা করেছি,
এই প্রণয়ের রাতের জন্য, কষ্ট করেছি কত
শেষহীনভাবে,
যন্ত্রণা সয়েছি বহু বহু
সেই শ্রমিকের মতো—
যে অনিচ্ছুক জমিকে সম্বর্ধনা জানায়
বেলা দুপুরে।

সংস্তব-চালক : ভালোবাসার এই তো মাহেন্দ্রক্ষণ।
এই তো চাকা একাকী, তার দোহারা নগ্নচার
কালো সৌন্দর্যে আবৃত।
আনন্দের এই যন্ত্রণা টান টান
যৌনকামনায় এবং তার কণ্ঠস্বর।

সংস্তব : বায়েতে বাবা—বায়েতে ও বায়েতে।

চাকা : কিন্তু আমি তো কবিতা নই
নই মাদল। ছন্দও আমি নই।
সে আমাকে ধরে রাখে
নিঃস্পন্দ,
বাওলের প্রতিমূর্তির আদলে
আমার সমগ্র শরীরে নির্মাণ করে
স্থাপত্য।
না, আমি নই কবিতা।
আমি শুধুমাত্র সঙ্গী

আমি জননী নই, আমি পিতা
তাকে ধরে থাকি বাহুতে
তাকে আদর করি, তার সঙ্গে
কথা বলি মোলাম স্বরে।

সংস্তব-চালক : হে জুলু, হে চাকা, তুমি আর নও
লাল সিংহ যার চোখ
বহুদূর থেকে আগুন জ্বেলেছিল
গ্রামে গ্রামে।

সংস্তব : বায়েতে বাবা—বায়েতে ও বায়েতে।

সংস্তব-চালক : তুমি আর ভয়াল নও,
নও মহিষ বা সিংহ, নও আর প্রচণ্ড হাতি।
সেই মহিষ যে বিধ্বস্ত করে দেয়
সাহসীদের সব ঢাল আর বর্ম।
'হে আমার পিতা', তুমি বলেছ
'হে আমার মাতা'—
এ তো পরাজয়ের অন্য প্রান্ত।
সংস্তব : বায়েতে বাবা—বায়েতে ও বায়েতে।

চাকা : হে আমার বাগ্‌দত্তা, এ মুহূর্তটির জন্য
আমি বহুদিন প্রতীক্ষা করেছি,
আমি ঘুরেছি দূরান্তে যৌবনের স্তেপভূমিতে
অন্যের হাতে রেখে গেছি বাঁশি
আর গুঞ্জরিত মধু,
পরিদর্শন করেছি জ্ঞানী মানুষদের
দূরতম বানপ্রস্থের আশ্রম।

সংস্রব : হে জুলু, তুমি কঠিন প্রেরণা
তোমার সারা দেহে মাখানো হয়েছে
বীর্যবান তেল,
ধৈর্যসম্পন্ন উল্কির তুমি পুত্র।

চাকা : মজলিসের নীরবতায় আমি কথা বলেছি
অনেক
এবং বহুবার সংগ্রাম করেছি
মৃত্যুর একাকীত্বে
আমারই জীবিকার বিরুদ্ধে।
এই আমার বিচার এবং

কবির নরকবাস।
সংস্তব-চালক : তুমিই সেই জুলু যার মাধ্যমে
আমরা বেড়ে উঠেছি জীবন্ত—
যে নাসারন্ধ্র দিয়ে আমরা পান করি
বলবান জীবন।
তুমিই সেই ভাগ্যবান যে প্রশস্ত কাঁধে
তুমি বহন করছ
যাবতীয় কালো চামড়ার মানুষ।
সংস্তব : বায়েতে বাবা—বায়েতে হে জুলু—
সংস্তব-নেতা : তুমি কুশলী ক্রীড়াবিদ্
এবং তোমার ল্যাঙট পড়েছে খসে
আর যোদ্ধারা মরছে তোমার দিকেই তাকিয়ে।
ভারি মিষ্টি সেই স্বর
যা মানুষের শরীরকে কম্পিত করে।
সংস্তব : বেয়েতে বারা—বায়েতে জুলু!
সংস্তব-চালক : তুমি সেই দোহারা নর্তক
যে নির্মাণ করেছে মাদলের ছন্দ
নিজের বাহু আর দেহের ভারসাম্য।
সংস্তব : বায়েতে বাবা—বায়েতে হে জুলু
সংস্তব-চালক : তোমাকে আমি বলি শক্তিমান।
তোমার যৌনচেতনা নিয়ে সর্বোত্তম উদার তুমি।
প্রেমিকা তুমি রাত্রির
যার চুলে রয়েছে পতনশীল নক্ষত্র
জীবনের কথাসমূহের স্রষ্টা তুমি
শৈশব-সাম্রাজ্যের কবি।
সংস্তব : রাজনীতিবিদের মৃত্যু হোক সম্পূর্ণ।
চিরজীবী হোক কবি
চাকা : হে মাদল, অনুচ্চার্য সময়ের ছন্দ,
গান করো রাত্রির
গান করো নোলিভকে নিয়ে,
এবং তুমি হে সংস্তব—
রাখো তীক্ষ্ণ নজর,
হও প্রণয়ের প্রহরী।
সংস্তব-চালক : আমরা দাঁড়িয়ে আছি এখানে

রাত্রির দুয়ারে,
গান করেছি অতি প্রাচীন গল্পমালা
আর চিবোচ্ছি সাদা বাদাম
আমরা ঘুমোবো না, আহা, আমরা
ঘুমোই না, প্রতীক্ষা করি শুধু
শুভ সংবাদের।

সংস্তব : তার মৃত্যু হবে, নোলিভে-র,
নিজেরই সারহীন মেদের অভ্যন্তরে।
এবং প্রত্যূষে জন্ম নেবে
শুভ সংবাদ।

চাকা : হে আমার রাত, হে আমার
কালো সৌন্দর্য, আমার নোলিভে।
এই মহৎ দুর্বলতা আজ মৃত
তোমারই তেলা হাতের নিচে
যা মুছে দিয়েছিল সব বাধা।
এটাই তো হাতের তালুর উত্তাপ
বুকের মধ্যে।
অধুনা, মশলাগুলো, পেশীকে লালন করে।
বাসরঘরের ধূপের ধোঁয়া
হৃদয়কে দেয় দিব্যদৃষ্টি।
হে আমার রাত, হে আমার স্বর্ণকেশী
পাহাড়ের উপত্যকার আমার চোখের তারা
আমার চুনি-বিছানার স্যাঁৎসেতে রমনী
আমার নিগ্রোবধূ
হীরক গোপনীয়তার।
আলো মাখানো কালো মেদ, শরীর তার
প্রথম দিনের প্রভাতের মতো স্বচ্ছ।
কিন্তু সে এখন মৃত, সেই কণ্ঠলগ্ন
যন্ত্রণা।
যখন আমরা নগ্ন একে অপরের বিরুদ্ধে
এবং সহসা ধাঁধানো, সহসা
প্রেমিকার চোখের বিদ্যুতে আহত।
আহ, আর সেই হৃদয় শুয়ে আছে নগ্ন
প্রতিটি শিকড়ে, নির্ধারিত পাহাড়ে লগ্ন।

কিন্তু সে মরেছে, সেই যন্ত্রণা
তোমারই তেলা হাতের গভীরে।
সংস্তব : বায়েতে বাবা—বায়েতে হে জুলু
চাকা : দূরস্থিত মাদল, স্বরবিহীন ছন্দ
যা রাত্রি ও সব গ্রামগুলোকে
পাঠিয়ে দেয় দূরান্তরে
অরণ্য আর পর্বতের ওপারে
তন্দ্রাচ্ছন্ন নদীগুলির ঘুমের ওপারে
এবং আমিই সে, যে সকলকে সঙ্গ দেয়
আমিই মাদলের জঙ্ঘা থেকে উৎপন্ন
হাঁটু।
আমিই খোদাই করা মাদলের লাঠি,
নদীবক্ষ বিদীর্ণ-করা
নৌকোর গলুই,
আকাশে রোপনরত হাত,
পৃথিবীর পেটে স্থাপিত পা।
আমিই সেই মুষল
যে বিবাহ ঘটায় সুরেলা বক্রতার।
আমিই মাদলের কাঠি
মারি। আঘাত করি মাদলকে।
কে বলে একঘেঁয়েমির কথা? আনন্দই তো
একঘেঁয়ে, একঘেঁয়ে উৎসব।
চিরন্তন শুধু আকাশ
মেঘবিহীন,
চিৎকারমুক্ত নীল অরণ্য।
কণ্ঠস্বর নির্জন একাকী
অথচ ঋজু।
এ ঢক্কানিনাদী দ্বৈরথে।
এই সুসঙ্গত দ্বন্দ্বে
শিশিরের মুক্তো যেন ঘাম—
কিন্তু না, আমাকে মরতে হবে
প্রতীক্ষায়—
উঠুক নতুন পৃথিবীর সূর্য,
হে আমার রাত্রি।

হে আমার নিগ্রোবধু, আমার নোলিভে
উত্থিত হোক স্বর্ণকেশী রাত্রি থেকে
মাদলের ধ্বনি থেকে
উত্থিত হোক।

[চাকা ঢলে পড়ে যায়। সে মৃত।]

সংস্তব-চালক : শ্বেত প্রভাত, নতুন প্রভাত
খুলে দিল আমার মানুষদের
যাবতীয় চোখ।
সংস্তব : বায়েতে বাবা—বায়েতে ও বায়েতে
সংস্তব-চালক : শিশির ওগো শিশির
তুমিই জাগিয়ে তুললে আমার মানুষদের
আকস্মিক শেকড়।
সংস্তব : বায়েতে বাবা—বায়েতে ও বায়েতে
সংস্তব-চালক : উদয়-অচলে সূর্য
পৃথিবীর সকল মানুষের উপর
বিরাজ করছে।
সংস্তব : বায়েতে বাবা—বায়েতে ও বায়েতে।

[যবনিকার অন্তরালে যেতে যেতে সংস্তব এই ধুয়াটি বারবার আবৃত্তি করতে থাকে।]

ভাষান্তর : বিষ্ণু বসু

ক বি তা

ছেড়ে যাবার সময়ে বিদায় শুভেচ্ছা

আগুস্তিনিউ নিতু (অ্যাঙ্গোলা)

দিগন্ত ওখানে
আগুনের শিখা আর
জটবাঁধা গাছের ঝাঁকের ঘন ছায়া
তাদের উদ্যত হাত ওপরে ওঠানো
হাওয়ায় সবুজ গন্ধ জ্ব'লে-যাওয়া তাল গাছেদের।

রাস্তায়-রাস্তায়
বাইলেন্দু কুলিদের সার
পিঠের চাপানো বোঝা ভুট্টার গমের ভারে কেবল গোঙায়।

ঘরের ভেতর
মধুর মধুর-আঁখি মুলাটোরমণী
ফের প্রসাধন সারে মুখ ভ'রে লাল রঙে চালের গুঁড়োয়
অনেক জবড়জং কাপড়ে সাজানো মেয়ে নাড়ায় কেবল তার উরু
বিছানায় নির্ঘুম লোকটা শুধু ভাবে
কবে সে টেবিলে ব'সে খাবে
কবে সে কিনটে পাবে ছুরি-কাঁটা চামচ-টামচ।

আকাশে ওখানে
আগুনের শিখা জ্বলে
এবং ঢাকের পাশে কালো-কালো মানুষের ছায়া
তাদের উদ্যত হাত ওপরে ওঠানো
হাওয়ায় উষ্ণ সুর ঢেউ তোলে মারিয়াম্বার

রাস্তায় কুলিরা
ঘরের ভেতরে সাজে মুলাটোরমণী

বিছানায় সেই লোক চোখে যার ঘুম নেই কোনো
জ্বলন্ত কয়লাগুলো শুধু খেয়ে ফ্যালে
আগুনে পোড়ায়
দিগন্তের তপ্ত সেই দেশ।

আমাদের জীবন

এম্বেল সোন দিপোকো (ক্যামেরুন)

একটি পীড়িত পাখি মরুর ওপর দিয়ে চ'লে যায়, যন্ত্রণাকে তার
হাওয়ায় গানের মতো উড়িয়ে-ছড়িয়ে
যে কোনো মরূদ্যানে
জল নিতে এসে সেই ভিস্তিওলা বলে
দ্যাখো সে কেমন ক'রে ওড়ে
    দ্যাখো-দ্যাখো কীভাবে সকল কিছু ছুঁয়ে যায় সুর।

ডানামেলা আশা যাকে স্বপ্ন ব'লে মনে হয়েছিলো
(আমাদের নিয়তিকে মুখোশ পরিয়েছিলো কালো-কালো রক্ত দিয়ে আঁকা)

যেমন শহরে-গঞ্জে আমরা শুধু আউড়ে যাই একই সে প্রার্থনা
যেমন গ্রামে ও হাটে সমস্বরে ছড়াই-ওড়াই
    পূর্বপুরুষের সব গাথা ও পুরাণ
দূর-দূরান্তরে শুধু পাঠিয়ে দিয়েছি বাবে-বারে
    আমাদের হতাশা, জীবন আর মরণশীলতা
পাঠিয়ে দিয়েছি দূরে আগামী দিনের সেই তরুণ দেশেরে
    কাল-পরশুর সেই দেশ
নিজেই তারিফ ক'রে যেভাবে দাতারা দেয় বাহ্‌বা নিজেরে
যখন কাউকে রক্ত দেয়।

পূর্বলক্ষণ

বিরাগো দিওপ (সেনেগল)

অনাবৃত সূর্য এক—এক সূর্য হলুদ রঙের
উষা যেই ফুটে ওঠে তখন যে-সূর্য থাকে পুরো অনাবৃত
সোনালি কত-যে ঢেউ সে ছড়ায় আলোর হিল্লোলে
হলুদ নদীর তীরে-তীরে

অনাবৃত সূর্য এক—এক সূর্য শুভ্র ধবধবে
সারা গা উদোম যার সেই সূর্য এবং যে শুভ্র ঝকঝকে
যে ঢালে রজতশুভ্র ঢেউ
ধবল নদীর জলে-জলে।

অনাবৃত সূর্য এক-এক সূর্য লাল টুকটুকে
যে-সূর্য উদোম ন্যাংটো এবং যে লাল টুকটুকে
রক্তরাঙা ঢেউ ঢালে শুধু
রক্তিম নদীর জলে-জলে।

আফ্রিকা : আমার মাকে

দাভিদ দিওপ (সেনেগল)

আফ্রিকা হে আফ্রিকা আমার
পূর্বপুরুষের সেই সাভানার অহংকারী যোদ্ধাদের আফ্রিকা আমার
আমার দিদিমা যার অফুরান গান গেয়ে যান
সুদূর নদীর ধারে-ধারে
আফ্রিকা তোমাকে আমি কখনও জানিনি
অথচ আমার চোখ ভ'রে যায় তোমার রক্তেই
তোমার সুন্দর সেই কালো রক্ত ঝ'রে পড়েছিলো খেতে-মাঠে
তোমার ঘামের রক্তে
তোমার দাসত্বে শ্রমে

তোমার সন্তান যারা তাদের গোলামি
আফ্রিকা আমায় বলো তুমি বলো আফ্রিকা আমার
এই পিঠ যা কিনা কবেই দুমড়ে নুয়ে বেঁকে গেছে
এই পিঠ যা কিনা বেটাল থুবড়ে পড়ে দীনতার ভারে
এইসব থরো-থরো লাল-লাল ডোরাকাটা পিঠ
সে-পিঠ তোমার নাকি
যে-পিঠ কশার কাছে জো-হুজুর বলে রোজ দুপুরে রাস্তায়
সে-পিঠ তোমার নাকি বলো

এবং তখন এক সুগম্ভীর স্বর বলে আমাকে উত্তরে
ওই দিকে তাকা তুই অবোধ বালক চোখ মেলে দ্যাখ
ওখানে দাঁড়িয়ে আছে সে-এক কিশোর আর উদ্দীপিত তরু
রংজ্বলা শাদা-শাদা ফুলের ভেতর এক সঙ্গীহীন অথচ সুন্দর
আসলে আফ্রিকা সে-ই তোরই সে আফ্রিকা আজ পুনর্জায়মান
আবার সে জন্ম নেয় অসীম-নিঃসীম ধৈর্যে জেদি একগুঁয়ে
সেইসব ফলে-ফলে ধীরে-ধীরে যারা শুষে নেয়
মুক্তির সকল তিক্ত স্বাদ

আমার বাবার স্মৃতিতে

সি. জে. ড্রাইভার (ট্রান্সভাল)

টিলার ওপরে প'ড়ে থাকে যত মৃত
হেঁটে যেতে হবে দূরে

যেখানে গাছের ছায়ারা হাত বাড়ায়
আকাশের মাপ নেয়।

মৃত প'ড়ে থাকে নিথর স্তব্ধ জলে—
ছুঁয়ে দ্যাখে না হাওয়া।

তাদের বয়স পাথরেরই স্তব্ধতা,
চুরমার জল, ধস নেমে আসে নিচে।

আমি সেই গাছ...

ডেনিস ব্রুটাস (জিম্বাবোয়ে)

আমি সেই গাছ
হাওয়ায় মড়মড় ক'রে উঠি
বাইরে বিশাল রাতে,
দোমড়ানো তবু একগুঁয়ে।

আমি সেই পাত
ছাতের তোবড়ানো টিনখানি
হাওয়া এসে থরোথরো কাঁপে,
অস্থির ঝাপট মেরে যায়।

আমি সেই স্বর
ফোঁপাই নিশুত রাত জুড়ে,
যে কাঁদে কেবলই অবিরাম
সান্ত্বনাবিহীন। '

আশ্রয়

ইস্‌মাইল চুনারা (ট্রান্সভাল)

ধবধবে কড়া কাফনে গা মুড়ে
ওই-যে দাঁড়িয়ে তারা
মুখে লেপটানো
স্তব্ধ মুচকি হাসি।
জগতের দিকে ছড়ানো এ জেনো
উর্দি পরানো সাড়া
আমি নির্বাক শুধু চেয়ে দেখি
আমার করুণ হাসি
কী ক'রে অমন সুস্মিত থাকে

এমন অবস্থাতে।
আশ্রয়?—সে তো ভেতর মুখোই থাকে
গর্ভের থেকে বেরিয়ে আসার পরও।

নির্জন কারাবাসেও যারা সঙ্গী ছিলো

জেরোমি ক্রনিন (কেপটাউন)

যেখানে, অরুচি মুখে,
তুমি পাও কিঞ্চিৎ প্রসাদ
তোমারই তুমিত্ব দিয়ে গড়া বাসি কুটির বিস্বাদে।
সারাক্ষণ ওৎ পেতে থাকে
যে-আলাপচারী
যে-কোনো ছুতোয় তাকে এড়াবে ব'লেই
পায়চারি করার ছলেই
এক পা বাড়িয়ে দাও আগে।
একটি চোখেরই তারা তুমি
অথচ একাই তুমি অনেক অনেক পেখও বটে,
সজোরে হিঁচড়ে টেনে তুলেছো তাদের ওই
    উঁচু-উঁচু গবাক্ষগুলোয়
যেহেতু সবাই মিল দেখতে চেয়েছিলো
গরাদে ও জালে আটকানো
কেটে যাবে আরো কত ক্ষণ?
দেখা যায়, দেখা যায়
আকাশ সম্পূর্ণ ফেঁড়ে গেছে কী প্রকাণ্ড প্রশ্নচিহ্ন এক—
আর এক অচেনা সারস শুধু উড়ে যায় দূরের আকাশে।

ভাষান্তর : মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

বাতাসে ওড়া পাতা

বার্নার্ড দাদিয়ে (আইভরি কোস্ট)

আমি সেই মানুষ যার রাতের মতো রং
বাতাসে ওড়া পাতা, আমি স্রোতের টানে স্বপ্নে ভেসে যাই।

বসন্তের নবাঙ্কুরে ভরিয়ে-দেওয়া গাছ
বাওবাবের কোটরে আমি শিশির গুনগুন

বাতাসে ওড়া পাতা, আমি স্রোতের টানে স্বপ্নে ভেসে যাই।

আমিই সেই মানুষ কিছু মানি না রীতিনীতি
আবার তাই নালিশ
বাধাকে শুধু বাধাই দিই, সবারই থেকে তাই
কুড়োই পরিহাস
বাতাসে ওড়া পাতা, আমি স্রোতের টানে স্বপ্নে ভেসে যাই।

আমিই সেই মানুষ ওরা যার বিষয়ে বলে
'ওঃ! সে লোকটা!'
ধরতে তাকে পারো না কোনো মতে
হালকা হাওয়া ছোঁয় তোমায়, ছুঁয়েই যায় সরে

বাতাসে ওড়া পাতা, আমি স্রোতের টানে স্বপ্নে ভেসে যাই।

ছুটতে-থাকা মেঘের দিকে পোতাধ্যক্ষের
লক্ষ্য থাকে যেমন
তীব্র চোখে পৃথিবী চেয়ে থাকে—
পালগোটানো জাহাজ যায়
সাগরজলে ভেসে

বাতাসে ওড়া পাতা, আমি স্রোতের টানে স্বপ্নে ভেসে যাই।
আমি সেই মানুষ যার স্বপ্নে বহুতর
তারার মতো জ্বলে
মৌমাছির ঝাঁকেরও চেয়ে গুঞ্জরণময়

শিশুমুখের হাসিরও চেয়ে হাসিতে আরো ভরা
সঘন আর ঘনবনের প্রতিধ্বনি থেকে

বাতাসে ওড়া পাতা, আমি স্রোতের টানে স্বপ্নে ভেসে যাই।

ভাষান্তর : শঙ্খ ঘোষ
সৌজন্যে : ছায়াচ্ছন্ন হে আফ্রিকা

এক আঁজলা খবর

আতোঁয়ান রোজার বোলাম্বো (জায়ারে)

যে জলা ধুয়ে দেয়
ক্যালাবাম্প শাঁকের মহান আত্মা
পাহাড়গুলো কুঁজো হয়ে
লাফ দিয়ে ওঠে সেই জলার ভিতর থেকে

গুজব রটে রাজদ্রোহের
জ্বলন্ত তলোয়ারের মতো
পৃথিবীর ধমনী
ফুলে ওঠে পালিনী রক্তে
ধরণী কোলে তোলে
নগর গ্রাম কুঁড়ে
অরণ্য আর বনভূমি
যা পূর্ণ হয়ে আছে কীটের শুঁড়-শোভিত শৃঙ্গী দানবে
তাদের দীর্ঘ কেশব হল সূর্যের দর্পণ।

এরা তারা-ই যারা রাত্রি নামলে
চালিত করে বাদুড়ের বাহিনী
আর ভয়ের পাথরে
শানিয়ে নেয় তাদের অস্ত্র

ধ্বংসের পাটাতনের ওপর
বাতাসের গতির সঙ্গে ভাসে
অপরাধীর আত্মা
মর্ত্যবাসীর বিবাদকে পরোয়া না করে
আগুনের ফনায়
ছিঁড়ে আনে বিদ্যুতের হীরক-হৃদয়

নিশ্চয়ই বিদ্রুপ হল ধূমায়িত মাংসের পাত্র
নিশ্চয়ই দুঃসাহস প্রতিহিংসার স্তোত্র পাঠ করে
কালা আদমীর ধূর্ততার মতো
তারা একবর্ণও বোঝেনি
বৃশ্চিকের দুর্জ্ঞেয় ভাষা :
দৃঢ়তা

বোঝেনি ওঝাদের ক্রোধ আর
আর ছুঁড়ে-মারা ছোরার হিংস্রতা
সর্ব-পারঙ্গম।

ভাষান্তর : রাম বসু
সৌজন্যে : ছায়াচ্ছন্ন হে আফ্রিকা

সময়

দাভিদ দিওপ (সেনেগাল)

একটা সময় আছে স্বপ্ন দেখার
রাত্রির স্বস্তির মধ্যে নৈঃশব্দের গভীরে
একটা সময় আছে সন্দেহ করার
শব্দের ভারী আবরণ ছিঁড়ে ফ্যালে কান্নার ফোঁপানি
একটা সময় আছে যন্ত্রণা পাওয়ার সারাটা সময়

যন্ত্রণা পাওয়ার সারাটা যুদ্ধ-পথ মায়ের দৃষ্টির মধ্যে
একটা সময় আছে ভালোবাসার
আলোর কুটিরে যেখানে গান গায় চারাগাছের শরীর
এবং সময়ের উন্মাদনার মধ্যে
সময়ের অধৈর্যের মধ্যে উর্বরতর সময়ের বীজ
যেখান থেকে জন্মাবে ভারসাম্য।

ফরাসী থেকে ভাষান্তর : অরুণ মিত্র
সৌজন্যে : ছায়াচ্ছন্ন হে আফ্রিকা

জ্যাক মাপান্‌জে (মালাউই)

রাজা-রাজড়া আর যোদ্ধারা না থাকলে ফরমায়েসি পদ্য
মুখ থুবড়ে পড়ে।
কাম্পুচিয়ার হাড়সার বাচ্চারা ঠাণ্ডা চোখে তাকিয়ে আছে
রোখা আইরিশ ছোক্‌রারা ছুঁড়ছে গ্রেনেড—
এসব কিছুই কবিতার পক্ষে বড্ড বেশি জরুরি
থ্যাৎলানো সেয়েটো বাচ্চারা খিম্‌চে ধরছে তাদের নাড়িভুঁড়ি
তারপর কবিতাকে আঁচড়াচ্ছে, দুয়ো দিচ্ছে।

এখন আর কোনো কবি বড় করে প্রশ্ন করে না
কেন মরতে বসা বাচ্চাগুলো
হাট-খোলা চোখে তাকায় বা বোমা ছোঁড়ে।
আর আমরা কেনই বা ঝাড়াই-বাছাই করতে যাবো
ঐ যন্ত্রণাশীল সন্দেহগুলোকে
যা চিরকাল ঘিরে রাখবে আমাদের?
আমাদের আট সিলিণ্ডারঅলা গাড়িগুলোর
তেলের সংকটের কথা বলাই তো যথেষ্ট আদিখ্যেতা...
যে সময় ব্যাঙাচিদের ব্যাঙ-হিসেবে বাড়তে দেওয়াই হয় না

তখন তো বাচ্চাদের বয়স নিয়ে কথাবার্তা বলার
কোনো আলাদা মানেই নেই!

ভাষান্তর : অমিতাভ দাশগুপ্ত
সৌজন্যে : ছায়াচ্ছন্ন হে আফ্রিকা

বেকার আমি

নিসে মালাংগে (দক্ষিণ আফ্রিকা)

আমি এখানে
একখণ্ড কালো মেঘের তলায় আমার বাস
এইত, এই ক্ষীয়মান আলোতে কাঁচি
এইখানে
গাছের গায়ে পেরেকবিদ্ধ স্বাধীনতা
মৃত্যুর অপেক্ষায়
এই তো এখানে থাকি, দেশলাই-এর বাক্সের ভেতর।

ক্ষুধার জ্বালায় আমি মরি, দেশও মবে, আমার শিশুরাও
দেখো তাদের দিকে তাকিয়ে :
কী ঘোলাটে চোখ, কোনো মতে চলে, মাথা নাড়ে
পেটে দানা নেই
শুনতে পাচ্ছ? ওঁরা কাঁদছে।

তেজী সূর্যের দিকে আমি থুথু ছিটিয়ে দিই,
রোজই তার তেজ বাড়ে
বর্ষার প্রতীক্ষায় থাকি
এই সুন্দর জমিতে লাঙল দেব কী করে
আমি যে বেকাব
বেকার আমি, এখানেই থাকি তবু অদৃশ্য আমি,
ধর্মপ্রচারক হাঁকে 'ওগো জল দাও'

ওহে অফিসবাবুর দল
হলদে-বাদামী আরাম কেদারায় আসীন,
বাতিটাকে দয়া করে উস্‌কে দাও না একটু।
ওহে নিপীড়ক, পায়ে পড়ি
গাছে লট্‌কানো ঐ স্বাধীনতাকে মুক্ত করো।
রাগে-দুঃখে ঢাকা আমার মুখ
পাকস্থলী ঘৃণা আর যন্ত্রণায় ভরা
পাগল হয়ে ঘুরে ফিরি
অপুষ্টির ব্যামো কোয়াশিয়োকরে
মরে আমার বাচ্চাগুলি
এখানেও কিছুই গজায় না
আর পশুপাখি সব গেছে মরে হেজে

কানে শুধু আসে রাতে
বাতাসের আর্তনাদ
আমারই মরণযন্ত্রণার ঘোষণা

বিদ্রোহ

হিউবার্ট টেম্‌বা (নামিবিয়া)

তুমি ও আমি এই লড়াইয়ের অস্থি এবং রক্ত
শরীরে মাংস গড়তে আমরা উচ্ছিষ্ট খেয়েছি
দিনের আলোর স্বাদ না জেনে
শাস্ত্রাচার পালন করেছি অন্ধকারে
ক্লেশের চাদরে মোড়া আমাদের সকাল
ওই চাদরগুলির আর কোনো অনুভূতি নেই

আর কোনো সূক্ষ্ম কণাও নেই রক্তের
যা দিয়ে মানুষ তৈরি হয়—সেইসব
আমার বন্দিত্বে হারিয়ে গিয়েছে

এখন আর কোনো ভোরের বাজনা বাজে না
পৃথিবীতে আর নৃত্য করে না গায়ক-গায়িকার দল
যখন বোনেদের বিবাহ হয়ে যায়
সেসব হারিয়ে গেছে গৃহে অরণ্যে, লড়াই করছে
দক্ষিণ সাহারায়
আমরা তো সম্পূর্ণ ঘোষণা করেই শুরু করেছি যুদ্ধ
আর শেষ মানুষটির হাড় ভাঙার জন্যে অপেক্ষা করছি

তুমি ও আমি এই যুদ্ধ করবো
কেননা যদি সমর্পণ করি আমরা
তবে আমাদের হয়ে অন্য কেউ লড়বে না
এই আমি দাঁড়িয়ে রয়েছি, নির্বাসনে হারিয়ে যাওয়া
এক পুত্রের মতো
আর ব্যবহার করছি আমার সহজাত অস্ত্রশস্ত্র

একদিন তোমাকে খুঁড়তে হবে আমার হৃদয়
কিউনেন, অ্যামবেসি অথবা লিমপোপো-র
অরণ্যের নিচে
কিন্তু তাতে শেষ হবে না যুদ্ধ

ক্রন্দনরতা বোন
ঘরে ফিরে গিয়ে মাকে ব'লো
এখানে ন্যায়সঙ্গত এই বিদ্রোহ
তিনি যেন শোক না করেন
যদি বুলেটে ঝাঁঝরা হয়ে যায় আমার শরীর

আর সেই সাম্রাজ্যবাদীদের হাতের পুতুল
কীসের জন্যে আর্তনাদ করে
'আমি ক্লান্ত', সে বলে আর সেজন্যেই সে পিছিয়ে পড়ে
নুনবাহী গাধার মতোন

আর ওই ক্লান্ত-অবসন্ন যখন ছিন্নভিন্ন হয়ে পড়ে
তখন আমরা নিশ্চয় এগিয়ে যাবো
চলতে থাকবে লড়াই
আর ওই শত্রুর কেয়ামত পর্যন্ত
আমরা যুদ্ধ করে যাবো।

ভাষান্তর : সৈয়দ হাসমত জালাল

যুদ্ধবাজ

জন এস মবিতি (কিনিয়া)

আমরা আর একটি যুদ্ধের জন্যে
প্রতীক্ষা করতে করতে ক্লান্ত
আমাদের গাছগুলো পাতা ঝরাতে ঝরাতে
ইতিমধ্যে ন্যাড়া হয়ে গ্যাছে
একের পর এক শীত এসেছে এবং চলে গ্যাছে
বসন্ত যথারীতি ফুলের সংসার সাজিয়েছে
এবং সেই ফুলগুলো ঝরে গ্যাছে বহুকাল
তবুও আমরা এই সময়ে
আরেকটি যুদ্ধের জন্য প্রতীক্ষারত
আমাদের আনবিক বোমায় জং ধরে গেল
যারা এইসব বোমা বানিয়েছিল
আজ তাদেরও মাথায় বিস্তীর্ণ টাক

কিন্তু আমরা যারা
বিগত যুদ্ধের শহীদ
তারা যুদ্ধকে ভয় পাই না
আমরা যারা যুদ্ধকে জানি
তারা বুঝি যুদ্ধের মিষ্টি স্বাদ
যুদ্ধের সুগন্ধ
আমরা স্বপ্ন দেখি সেই দিনের

যখন বন্দুকের নল থেকে উঠবে ধোঁয়া
তাই আমরা প্রতীক্ষারত
আরেকটা যুদ্ধের জন্যে
যতক্ষণ বন্দুকের গুলির আওয়াজ
আমাদের শ্রুতিকে না ছোঁয়
অথবা বিজয়ের বর্বর উল্লাস আমাদের আনন্দিত করে
আমরা প্রতীক্ষা করবো
আর একটা যুদ্ধের জন্য।

ভাষান্তর : সোমনাথ মুখোপাধ্যায়

এখন ফসল তোলার সময়

ওয়েসি ক্রু (ঘানা)

যদি এটাই সময়
আমার হৃদয়কে নিয়ন্ত্রণে আনার—
তাই কর,
এখনি সেটাই কর
যেমন ভেসে যাওয়া মেঘমালার কাছে,
পাহাড়গুলোর পিছনে, বৃষ্টিপাত ; গুহাগুলোই
যেন তাদের বাড়ী।

যদি এটাই সময়
নিজেকে বুঝে নেওয়ার, তবে
সহজে আক্রান্ত হতে দাও সেই আনন্দে
যা তুমি তুলে ধর আমার ঠোঁটে।
যখন নানা জাতেব ছোট হরিণীর দল
দীর্ঘায়িত করে তাদের জলপান,
অসুস্থ চিতাটি দূরে সরিয়ে নেয়

অবিশ্বাস্য তার শুষ্ক নাসাগ্র,
যখন শিশিরকণা শুকোয় অলক্ষিতে—
পাতার বলিষ্ঠতায়,
হালকা পায়ে ঢেউ তুলে পাতিহাঁস
আগাছার ঠাঁসা ও দীর্ঘ জট এড়িয়ে
যেন সাঁতার কাটে প্রা নদী বরাবর

হ্যাঁ, মনে পড়ছে
রাফিয়া ঘাঘরার ঘূর্ণাবর্ত আর
সে রাতে যে গান তুমি গেয়েছিলে,
প্রাণবন্ত হাড়গুলির ভাষাহীন চঞ্চলতা
হ্যাঁ, আমি মনে করতে পারছি
সেইসব গান যা তুমি গেয়েছিলে
যা একে একে ঘটে গিয়েছে সেসব
এবং আমাদের চিন্তা ও ভাবনাসূত্রের বাইরে
—যা কিছু আমাদের অনারব্ধ

যারা কৌতুকপ্রিয় ও ছলনাময়ী,
বয়সোচিত লালিমায় যাদের আয়ত নয়ন লাল বড়বড় চুমুকে
মাঝেমাঝেই ঢকঢক করে পান করে থাকে
সেইসব সুন্দরীদের গান তুমি গাও
তুমি গান গাও আনন্দের ও উৎসবের
উৎসর্গীকৃত ভেড়ার গল-বৃত্তে জুড়ে লাল রক্তরেখায়,
তুমি গতি উপহার গ্রহণ ও বর্জনের
যা কিছু উৎসর্গ করা হয়েছে বা হয়নি।

নামী কিন্তু সুনাম হারান
ভাল মানুষ ও তাদের ভবিতব্য
নিক্ষিপ্ত পাশা এবং সাজিয়ে তোলা ছক
কেন খামার বাড়ীর কুকুরের চীৎকার করে ওঠা
চাঁদ লক্ষ্য করে—যখন সে গায়
আর কেনই বা ইঁদুরটি দাঁতে ধরা

প্রিয় শস্য ফেলে দিয়ে ভীতিদীর্ণ নরম আলোয় চোখ রেখে
চকিতে দাঁড়াতে বাধ্য হয়
—সেই গান তুমি গাও

স্বপ্নক্লান্ত রাতে
পাতাগুলোর নরম পেটে
আমি দেখি দীপ্তিময় এক আলো,
আলোর মতন স্পষ্ট
যা দিনকে আলাদা করে রাতের থেকে ;
আসলে জয়োল্লাসের পানীয় তেমনই স্বচ্ছ
যেমন অশরীরি আত্মার পথ জলের মতন
এবং তার চুল যেন ঈগলের কালো চোখ—
বরাবর লক্ষ্য রাখে পুরুষের গতিবিধি।
তথাপি নদী চলেছে
বয়ে নিয়ে পচা কাষ্ঠভার
পাহাড় অতিক্রম করে
পারে তার সাদা বালি আর
ঘাস, পাতা, ফুল—শ্বাস
এই মাটি এবং সহস্রের হাড়
যাদের বেঁচে থাকা অনিবার্য ছিল
কৌশলে এইটা বা আর একটা
এইটা বা অন্য যুদ্ধে লড়াই করার জন্য,
যে চালনা করছে তাকে ভুল দিকে ঠেলে দেওয়া
এবং যে ঘটনাকে চালনা করছে
সে সর্বদা চালিত হচ্ছে অনিশ্চিতে।

তথাপি লড়াই
তথাপি মৃত্যু অথবা জয়
এটাই নিয়তি—আমরা ধারণ করে আছি
আমাদের হৃদয়ের মলিন গঠনে।
তবুও লড়তে হবে
জয় করবার জন্য।

গাংচিল উড়ে যায়
যেন টুকরো কাগজ লবণাক্ত নীল সমুদ্রে,
তবুও আমরা বাঁচি জয় করতে ;
তাই আমরা যুদ্ধের কথা বলি
তাদের প্রিয় রমণীদের সঙ্গে
যদিও তারা কেঁদেছিল উপত্যকা জুড়ে।
তবু জল বয়ে যায়।

এবং যা কিছু নতুন ছিল তা পুরনোই
এবং যা কিছু নতুন তা ছিল ক্ষণস্থায়ী
যদিও তা ছুঁয়ে যেত পালাবদলের পথ।
আসলে যা নতুন, চিরদিন তা পুরনো এবং নতুনই চিরদিন,
একদা যা ছিল—আজ অন্যরকম
শেষপর্যন্ত, সবসময়েই তা একইরকম...
তার চুল ছিল কালো আর
ছিল দীপ্র অহঙ্কার
কিন্তু তার ছায়ার সঙ্গে
বলবানদের ধূলিমলিন চেষ্টা ছিল একইরকম
—তথাপি নদী বয়ে চলেছে
নদী বয়ে যায়।

একদা, যেমন সর্বদা হত—
পোষাকের ভাঁজ থেকে
উঁকি দিত তার উরুদেশ,
কিন্তু যারা হাতে তীর ও কাঁধে ধনুক নিয়ে
এই মাটির কুড়ে ঘরে শুয়েছিল,
তারা নিঃশব্দে, ধীরে হামাগুড়ি দিয়ে
ফিরে গেছে রাস্তা বরাবর
পরিখায়, অস্ত্রঘরে
তারা দেওয়াল তুলেছে মসৃণ সাদা পাথরের,
ছেড়েছে সে আড়াল যা

দিয়েছিল আশ্রয় তাদের শান্তিকে
যাকে মনের শান্তি বলা যায়
আর এখন ঐ মেঘে যে ভেসে চলেছে
যেন শান্তি যা সঞ্চারিত করে সম্ভাবনা।
এবং মেঘ গৃহমুখী
ঐ পাহাড় শ্রেণীর পিছনে বৃষ্টিস্নাত গুহাদেশে
এখন শান্তি বিরাজমান
নিজেদের সম্ভাবনা এগিয়ে নিতে
—যদি এটাই সময়
আমাদের হৃদয়কে নিয়ন্ত্রণে আনার
তাই কর ;
এখনি।

ভাষান্তর : অলোক সেন

ফেরা

এম্বেল সোন দিপোকো (ক্যামেরুন)

এবং এইভাবে বহুমুখে
আমি ভালবাসার গান গেয়েছি
পুরনো দিনের সুরে সন্দেহ এবং শঙ্কা
এবং চাপা উৎকণ্ঠাও ছিল
আমি আবার কৃষকের খামার দেখেছি
আমি আবার যৌবনের নরম স্বপ্ন নিয়ে
খেলা করেছি
এবং আমার গানের ফিরে-আসা
প্রতিধ্বনি শুনে আমি আজ
বিনীত অনুভব করি।

ভাষান্তর : মানবেন্দ্রনাথ দত্ত

মাকে

এম্বেল সোন দিপোকো

তোমার আমার মধ্যে
একটা সামান্য চুমো খাওয়ার চেয়েও
সুদৃঢ় আবেগ রয়েছে
কেননা তোমার কারণে আমি সিংহজাতক
যদিও আমাকে দেখতে এখন
একটা ডাইকার হরিণ, যে শিকারির বন্দুক
আর বিষাক্ত গুল্ম এড়িয়ে বেঁচে আছে,
তার চেয়ে আরও বিধ্বস্ত।
আমার সিংহিনী মা
যদি কখনও আবার আমাদের
জোড়া নক্ষত্রের আলোয় ঘরে ফিরতে পারি—
তুমি আমার ক্ষতচিহ্ন দেখে
ককিয়ে উঠবে।
ওইসব ক্ষতচিহ্ন সয়েছি এক লড়াইয়ে
সে লড়াই আমার আত্মাকে অক্ষত রাখার জন্য।

ভাষান্তর : মানবেন্দ্রনাথ দত্ত

প্রগতি

এম্বেল সোন দিপোকো

অসীমে উড়ন্ত পাখিদের গান গাও
হে মজ্জাহীন অজড় মানুষ
তুমি তো সম্পূর্ণ আড়ম্বরে পূর্ণ পোশাকের অন্তরালে
মজ্জাহীন শুধু হাড়

যা আমার দৃষ্টিকেই প্রলোভিত করে মহাশূন্যে
এক নীড়ের দিকেই।
বিমুখ শিশুসুলভ স্মৃতি
অনিচ্ছুক পায়ে ফেলে আসে নদীর কিনারা
যেখানে আমার প্রেম ও অন্য প্রাচীন জনগোষ্ঠীর মজ্জা
পাশাপাশি নোঙর করেছে।

পাখিদের সঙ্গে আজ
আত্মাহীন রাজত্ব সমাজ
হয়তো আগামী কাল আমিও হারাব আমার সকল মজ্জা আর
উড়োজাহাজ আর রকেটের জায়মান জনগোষ্ঠীর ভিতর,
যখন জন্ম নিচ্ছে নতুন পালক নীড়ে ফেরার
যেখানে আমার ভালোবাসা আর প্রাচীন উৎসের মজ্জা
পাশাপাশি নোঙর করেছে।

শোনো,
তোমার জন্যই আমি গাইছি গান
হে দূরবর্তী নদীর কিনারের ও বালকবয়স,
পলায়নপর এ-বস্তুজগতের গর্জনের ভিতর।

যন্ত্রণা

এস্থেল সোন দিপোকো

সব কিছু শান্ত ছিল খুব এ-শহর উদ্যানে
যতক্ষণ-না বাতাস নাভিশ্বাস তুলে ঘোষণা করেছিল
অত্যাচারীর আগমন
আর তখনই গাছেগাছে শাখাপ্রশাখাগুলি ককিয়ে উঠেছিল যন্ত্রণায়।
মনে কি পড়ে সে-ঝড়ের তাণ্ডব?

তবুও হতাশ ফুলগুলি ভয়ের ভিতরও
সাজিয়ে তোলে সান্ধ্যভোজের আসর বিকটরাজার ;
উল্কাগুলি যেন তার মুকুটের রেশমী বাহার।
যখন ভয় দেখিয়েছিল ঝঞ্ঝা তখন গাছেগাছে শাখাগুলির মতন
আর্ত চিৎকার করে উঠেছিলুম আমরা যন্ত্রণায়
আর অনুভব করেছিলুম অদৃশ্য এক ছোরার শীতল পাতের আঘাত।

আমাদের ছিন্নভিন্ন শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি ভেসে যায় বৃষ্টিধারায়
কিন্তু অমোচনীয় সকল শোণিত
নিবিড় জড়িয়ে যায় দেওয়ালে দেওয়ালে
গাছেদের গুঁড়িতে গুঁড়িতে লেগে থাকা হিংস্র আদিম আঠার মতন।

ভাষান্তর : মনোজ নন্দী

নয়নহীন বন্দুকগুলি

খালেদ এল মহাদিন (লিবিয়া)

আমি প্রধান প্রধান খবরের মধ্যে শুনেছিলাম
আমি প্রথম খবরের মধ্যে শুনেছিলাম
আমি একের পর এক খবরের মধ্যে শুনেছিলাম
আমি জেগে ছিলাম আর আমার রেডিও ঘুমিয়ে পড়েছিল
হৃদয়ের নয়নেরা কখনো ঘুমায় না
আমি কেঁদেছিলাম কেননা প্রিয়তম একবারের জন্যেও কাঁদেনি
কেননা প্রিয়তমের বুলেটগুলো
উড়ে যাওয়া চোখের মতো ছিল।
আমি কেঁদেছিলাম কেননা আমরা শুধু দুজন
আর আমাদের হত্যাকারীকে হত্যা করা হয়েছিল।

কেন আমার বন্ধুরা?
দুঃখ এসে আমাদের ডুবন্ত হৃদয়গুলোকে একত্রিত করার পর
আমি তোমাদের মধ্যে বৃথাই খুঁজেছি
এবং এমনকি প্রেমের চিহ্নমাত্র খুঁজে পাই নি
আমরা আমাদের পথ হারানোর পর
দুঃখ এসে আমাদেব চোখ উপড়ে নেওয়ার পর
এবং ছিন্ন করার পর
বুলেটগুলো প্রথমজনের হৃদয় তিক্ত করলে।
ও শেষজনের হৃদয় পোড়ালো
সুতরাং আমরা তার জন্য বিলাপ করলাম
এবং বিলাপ করলাম
এবং বিলাপ করলাম
এবং তার চোখগুলো স্থির
আত্মত্যাগের আয়নাগুলো জনবসতিহীন স্থানে বিদ্যমান।

কেন আমার বন্ধুরা?
গ্রীষ্মরাতে এই তুষারপাত
এবং মৃত্যু
কেন শব্দ ও হাসি হারিয়ে গেছে
এবং নৈঃশব্দ
কেউ লজ্জায় গাইছে না কিন্তু লজ্জায় পেঁচা গাইছে
(ও গৃহ, কে তোমাকে বিলীন করলো
ও আমার বন্ধুর গৃহ
কোনো হাত এসে দুঃখ মুছে দেয় না
কোনো নেকড়ে দেখা কবতে দৌড়ে আসে না)
এবং যদিও স্থির বিষণ্ণতা আমার ক্ষত পান করেছে
আমি তোমার ক্ষত যুগসঞ্চিত
দুঃখ ও বেদনা দিয়ে আলিঙ্গন করলাম।

জর্ডন তার ক্ষত মুছে ফেলেছে
তার অনুশোচনায় ছিল ঝুড়িভর্তি ডুমুর
এবং ওলিভ

এবং আঙুর
এবং এমনকি সেই রক্তিমতা
যে দরজা খুলেছে
এবং যে এই মৃত বাতাস তৈরি করেছে
আমাদের ঢেঁকিঘরে ঝড় তুলেছে

যে দড়িগুলো শিশুদের শ্বাসরুদ্ধ করে
আমাদেরও রক্তাক্ত করে
নগ্ন করে
এবং বিচ্ছিন্ন করে
আত্মত্যাগের ছাইয়ের মতো মরুভূমির উপর
এবং তুমি তীব্র অনুশোচনায় কাঁদতে পারো না
আমার শহরের পাহাড়গুলো আমার বন্ধুদের
পায়ের কাছে মৃত হয়ে পড়ে আছে
আর তুমি তীব্র অনুশোচনায় কাঁদতে পারছো না
আমার শহরের যুবকেরা আমার বন্ধুদের অস্ত্রে মরেছে
আর তুমি তীব্র অনুশোচনায় কাঁদতে পারছো না
সুতরাং ধ্বংসস্তূপে বসে গাও
কিন্তু তোমার জন্য কে গাইবে

যদি তুমি ঘরে ফেরো
আর তোমার ঘরের কংক্রিটের চাতাল
তোমাকে স্বাগত না জানায়
আর তুমি যাওয়ার সময়
তোমার শহরের মেয়েরা যদি চোখ তুলে না চায়
সুতরাং গাও
সুতরাং ধ্বংসস্তূপে বসে গাও
ও আমার বন্ধুরা
চোখের রক্ত কখনো হৃদয়ের ক্ষত মুছে ফেলতে পারে না
এবং মৃত্যু মুক্ত নয়
কখন এসে, বলতে পারো শব্দ,
মানুষ তোমার মধ্যে জন্মাবে?

ভাষান্তর : গৌতম মিত্র

যা ছিল তখনকার

কুপেণ্ডা আসেট

আমি স্মরণ করি সেই সময়কে
যখন তুমি আমাকে
ভদ্রমহোদয়া ব'লে সম্বোধন করেছিলে,
সেই সময়েই তুমি, আস্ত্রা,
আমাকে ডিনার টেবিল থেকে সরিয়ে এনেছিলে
এবং আমার জন্য দরজা ধ'রে দাঁড়িয়েছিলে
এবং আশ্বস্ত করেছিলে এই ব'লে যে
আমার নিরাপত্তার কারণে
তুমি ফুটপাতে অপেক্ষায় ছিলে
এবং
সেই সময়েই তুমি ভরসা দিয়েছিলে
আমি কাদায়
পা রাখতে যাচ্ছি না।

সেই সময়েই
কলাকেন্দ্রে আমরা
জায়োনজা আর নেম্‌-এর সঙ্গে
চিৎকার করছিলাম।

সেই সময়েই তুমি
আমার প্রতি তোমার
মৃদু হাসি
গোপন করতে পারছিলে না।

সেই সময়েই তুমি
আমাকে এলিজার সঙ্গে
আলাপ করিয়ে দিয়েছিলে
এবং আমরা

বেসমেণ্ট হাউজ পার্টির
ব্লু লাইট অপেরা শুনছিলাম
সেই সময়েই তুমি
আমার সঙ্গে রাত্রিযাপন করেছিলে
যদিও আমরা কেউ কিছুই করিনি

এখন
একটি মাস অতিক্রান্ত
তোমার সঙ্গে দেখা হয়নি
এখন
তোমার কাছে শুনি
তিন দিনেই
সপ্তাহ ফুরিয়ে যায়
তুমি তোমার ব্যস্ততায় ডুবে থাকো
এবং কখনই সহজলভ্য হও না
এবং সর্বদাই
তোমার কিছু-না-কিছু করার থাকে

এখন
আমাদের মধ্যে আর
দূরভাষে সৌজন্যমূলক
আলাপচারিতাও নেই
কালেভদ্রে যখনই যোগাযোগ হয়
তখনই তোমাকে বলতে শুনি
অন্যকে চিঠি লেখায়
অন্যের সঙ্গে কথা বলায়
কিম্বা আরো বিবিধ ব্যাপারে
আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে আছো।
তুমি আমাকে
ভদ্রমহোদয়া ব’লে সম্বোধন করেছিলে,
কিন্তু এখন আমি
বিস্ময়বোধ করছি

তুমি সেই মহিলাদের সঙ্গে
কি রকম ব্যবহার করো
যারা 'ভদ্র' নয়।

ভাষান্তর : অজিত বাইরী

ইংরেজ জরি

কার্ল বয়েস টেলর

ঘণ্টা তিনেক কেটে গেলো
একবারও বেজে উঠলো না দূরভাষ
দরজায় টোকা পড়লো না একবারও

আজ রাতে মনে হলো দুবার তোমাকে দেখেছি
রাস্তার বাতির নিচ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছো
তোমার মুখের উপর বেগুনি রঙের আলো।

আমার বাঁ হাত রগড়াতে থাকে
শরীরের সামান্য স্ফীতি
আর স্তনবৃন্ত শক্ত হয়ে আসে
দীর্ঘ নীলাভ গ্রীষ্মের শেষে
যখন তোমার স্পর্শ ভাঙা খোসার মতো
সূর্যের প্রখর তাপে দগ্ধ হয়ে গেছে।

আমি ইংরেজ জরি দিয়ে বিছানা পেতেছি
বেগুনের তরকারি রেঁধেছি
পুঁতি আর ঝিনুক মালায়
বালিকাসুলভ চুল বেঁধেছি

সাদা ঘাঘরা পেখমের মতো মেলে দিয়েছি
আর আমার ঠোঁট ছড়ে ফেলেছি
স্মৃতির মতো রক্তধারা আসুক নেমে
সমস্ত কিছুর, যা ছিল অতীতে আমাদের
আর যা-কিছু আমরা হারিয়ে ফেলেছি।

ভাষান্তর : অজিত বাইরী

আমার অভ্যন্তরের বীজ

জোসে ক্রাভিরিহ্না (লুবাসোঁ মার্কুইসে)

জীবন্ত অথবা মৃত
আমার ভিতরে বীজ
আমার হাড়ের মত ধবলতা সর্বজনগ্রাহ্য।

সকলে ভুগছে
এক অস্বস্তিতে
সন্দেহহীন এ ধবলতা আমার হাড্ডির
এত ধবল যা ইনগ্রিডের স্তনযুগল বা মারিয়াদের স্তন
দূরের স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ার দ্বীপে পাওয়া যায়
অথবা আমার সেই পুরানো শহর
পোলানাতে তার বেশ ঝকমকে অংশে
সকলে ভুগছে
এক অস্বস্তিতে
আমার শিরায় যে রক্ত বইছে লাল
নিশ্চয় তা প্রত্যেকের রক্তেরই অংশ
এবং অনুচ্চারিত শান্তিতে পূর্ণ পবিত্র সহজ
যে জন্ম এবং যে মৃত্যু পবিত্র সহজ

—এ সব কিছুই এক ঝাঁক জটিলতা
ফের সৃষ্টি করে আমার হাড্ডির বীজ থেকে

কিন্তু যে রাতে গাছেরা ভারী ফল নিয়ে পেটে
বারবার ঝাপটায় ঘর্মাক্ত পাথর
কিংবা অশ্রুসিক্ত নদী

সকলে ভুগছে
এক অস্বস্তিতে
আমার ভেতরের ধবল বীজ
অভিশাপে জ্বলা এক অনিশ্চয়তা এনেছে
এবং একদিন
দূর দূর দেশ হতে জাতি হতে সব মারিয়ারা
দুঃখ করবে কাঁদবে হাসবে
সঙ্গীতের ছন্দে ছন্দে ভালবাসা
আমার হাড্ডিকে একান্তে বলবে
ক্ষমা করে দাও ভাই, ক্ষমা করো।

ভাষান্তর : কালিদাস সমাজদার

আফ্রিকার লোককথা

বলবতী চড়ুই (কঙ্গো)

একদিন সকাল বেলায় বাদামী রঙের এক চড়ুই তেঁতুল গাছের মাথায় তার বাসাভর্তি ডিম আগলে বসেছিল।

সক্কালবেলা, জঙ্গল এত শান্ত সে চড়ুই-এর প্রায় ঘুম এসে গেছিল। এমনসময় সে শোনে, ধুপ-ধাপ-ধুপ—এক হাতি এগিয়ে আসছে তেঁতুল গাছের দিকে।

ডিমের ওপর গুছিয়ে বসার আগেই তার বাসাটা নড়ে উঠল আর ডিমগুলোয় ঠোকাঠুকি লেগে ঠকঠক শব্দ উঠল।

খুব রেগে চড়ুই গলা ফুলিয়ে কিচিরমিচির করে হাতিকে বলল। 'হাতি, তুমি আবার সেই একই কাজ করছ। এই নিয়ে তিন দিন তুমি যাবার সময় গাছে ধাক্কা দিয়ে ডিম নাড়িয়ে দিলে। কিভাবে ওগুলো ফুটিয়ে ছানা বের করব ভেবে দেখেছ?'

শুনে হাতি তো হো হো ক'রে হেসে উঠল আর তার শুঁড় দিয়ে হুড়মুড়িয়ে অনেকখানি বাতাস বেরিয়ে এল।

"আমি তোমার গাছ ছুঁইও নি। আর গাছে এত আস্তে নাড়া লেগেছে যে তুমি ছাড়া আর কেউ বোধহয় সেটা টেরও পায় নি" হাসির চোট সামলে হাতি বলল।

—"তোমার মত কম বুদ্ধির লোকদের নিয়ে চলা সত্যিই মুশকিল। কাল থেকে যদি এই গাছে নাড়া দিয়েছ সে এত শক্ত একটা দড়ি দিয়ে তোমায় বেঁধে রাখব যে তুমি আর এক পা-ও এখান থেকে নড়তে পারবে না।"

এবারে হাতির হাসি আর থামতেই চায় না। "বেঁধে রাখবে। আমায় বেঁধে রাখবে! জন্মে এর চেয়ে মজার কিছু শুনি নি।" শুঁড় নাড়াতে নাড়াতে, গাছগুলোয় দোলা দিয়ে আপনমনে বলতে বলতে হাতি নিজের পথে চলে গেল।

চড়ুই আবার তার ডিমের ওপর ঠিকঠাক হয়ে বসল। জঙ্গল আবার শান্ত হয়ে এল। সূয্যি মাথার ওপর উঁচুতে, আরও উঁচুতে উঠতে লাগল। দিন এত গরম হয়ে উঠল যে চড়ুই-এর মনে হ'ল এক্ষুনি খানিকটা জল না খেলে সে বুঝি অজ্ঞান হয়ে যাবে।

ডিম ছেড়ে চড়ুই উড়ে গেল ঘাসে ভরা নদীর পাড়ের দিকে। এমনিতে ঘাসের পাতার ওপর বসে সেখান থেকে গলা বাড়িয়েই চড়ুই নদীর জল খেয়ে নিতে পারে। কিন্তু সেদিন আর সে পারল না। একটা বিরাট বাদামী রঙের কুমির জলের ধারে ঠিক তার বসার জায়গাটার ওপর শুয়ে আছে। রেগে গিয়ে চড়ুই কিচিরমিচিব করে উঠল

"এই সপ্তাহে এই নিয়ে তিন দিন তুমি আমার বসার জায়গার উপর শুয়ে রইলে। বল তো বসার জায়গা না থাকলে আমার মত একটা ছোট্ট চড়ুই কিভাবে এই বিরাট নদী থেকে জল খায়?"

কুমির তার বিশাল মুখটা খুলে চড়ুই-এর দিকে তাকিয়ে আগে খানিকটা হাসল। তারপর বলল, "নদীটা যেমন তোমার, আমারও তেমনি।" তোমার খাওয়ার জন্য আমি সরতে যাব কেন?"

"তোমার মত স্বার্থপর লোকেদের নিয়ে সত্যিই চলা যায় না। কাল থেকে যদি আমার নদীর পাড়ে তোমায় দেখি তাহলে এত শক্ত একটা দড়ি দিয়ে তোমায় বেঁধে রাখব যে তুমি এক পা-ও এখান থেকে নড়তে পারবে না।"

এবারে কুমিরের হাসি তো আর থামেই না। "বেঁধে রাখবে! আমার একটা দাঁতের মাপের ছোট্ট একটা চড়ুই কিভাবে আমায় বেঁধে রাখে সেটাই আমি দেখতে চাই", হাসির চোট একটু কমলে কুমির বলল।

চড়ুই আর কি করে! মনের দুঃখে সে উড়ে চলল সামনের দিকে। নদীর পাড়ের একখানে একটু ফাটল ছিল। তারই ফাঁক দিয়ে খানিকটা কাদাগোলা জল খেয়ে সে উড়ে চলল বাসার দিকে। চিন্তাভাবনা করতে করতে বাকী দিনটা চড়ুই-এর কেটে গেল।

পরের সকালবেলায় আবার হাতি এল আর রোজ যেমনটি হয়, চড়ুই-এর বাসায় নাড়া লাগিয়ে তার দিকে তাকিয়ে হাতি হাসল।

"তোমায় না করেছিলাম। বলেছিলাম এরকম করলে তোমায় বেঁধে রাখব", চড়ুই বলল।

"ঠিক বলেছ। আসলে হাতির চেয়ে গায়ের জোর বেশী এমন চড়ুই তো আমি দেখি নি, কেমন ক'রে তুমি আমায় বাঁধ সেটা দেখার জন্য ইচ্ছে করেই তোমার বাসায় নাড়া দিয়েছি।"

"দাঁড়াও দেখাই", বলে চড়ুই একটু দূরের বিশাল গাছটার দিকে উড়ে গেল। গাছের গা বেয়ে উঠেছিল মস্ত লম্বা আর পোক্ত ধরনের একটা লতা।

লতার একপ্রান্ত মুখে ক'রে নিয়ে এসে হাতির গলায় তা দিয়ে আচ্ছা ক'রে ফাঁস দিল চড়ুই। তারপর হাতিকে বলল, "এবার আমি নদীতে যাব জল খেতে। জল খেলে আমার গায়ে শক্তি হবে। তারপর আমি যখন তোমায় বলব তখন চেষ্টা করে দেখো এক পা-ও এখান থেকে নড়তে পার কিনা।"

এবারে হাতির হাসি আর থামতেই চায় না। তবে সে কিনা আদতে লোক ভাল ছিল, তাই চড়ুই যেমনটি বলেছিল তেমনিভাবেই সে দাঁড়িয়ে রইল।

এদিকে চড়ুই লতার আর একটা দিক মুখে করে উড়ে চলল নদীর পাড়ের দিকে। সেখানে শুয়ে ছিল সেই কুমির। কুমিরকে দেখে মনে হচ্ছিল সে যেন ঘুমিয়ে পড়েছে। কিন্তু চড়ুই তার পাশে যেতেই সে কুতকুতে চোখ খুলে বলল, "কখনো না। এখান থেকে আমি নড়ব না। কালকের মত আজকেও তোমায় কাদাজল খেতে হবে।"

চড়ুই বলল, "তোমায় না করেছিলাম। এবার আমি তোমার এখন বেঁধে রাখব যে ঠাণ্ডা হবার জন্য এখান থেকে নদী পর্যন্ত তোমায় আর যেতে হবে না।" কুমির বলল, দেখি কেমন পার। তুমি এককফোঁটা সময়ও আমায় আটকে রাখতে পারবে না।"

ছোট্ট চড়ুই তখন লতার অন্যপ্রান্ত দিয়ে কুমিরকে খুব করে বাঁধল। আর যাওয়ার আগে কুমিরকে বলে গেল, "শোন, শিগগিরিই আমার শক্তির প্রমাণ পাবে তুমি। আমি এখন জঙ্গলের মধ্যে আমার দড়ির অন্য দিকটা ধরে রাখতে যাচ্ছি। যখন বলব 'এবার নড়' তখন নড়ার চেষ্টা কোরো তুমি।"

কুমির রাজী হ'ল, চড়ুই উড়ে চলল হাতির দিকে। হাতিকে গিয়ে সে বলল "আমার জল খাওয়া হয়ে গেছে। জল খেয়ে আমার শক্তি কত বেড়ে গেছে তুমি ভাবতেও পারবে না। একটু দাঁড়াও. আমি উড়ে খানিকটা দূরে আমার দড়ির অন্যপ্রান্তটা আছে সেটা ধ'রে রাখতে যাচ্ছি। তারপর যেই বলব 'এবার টান' টানার চেষ্টা কোরো।"

এবার চড়ুই উড়ে হাতি আর কুমীরকে যে লতা দিয়ে বেঁধেছিল তার মাঝ বরাবর একটা জায়গায় গেল।

'টান', চড়ুই তার সরু গলায় চিৎকার করে বলল। চড়ুই আর হাতি দুজনেই তার গলা শুনতে গেল। দু'জনেই একসাথে টানতে শুরু করল। কুমীর টানল নদীর দিকে যাবার জন্য পেছন দিকে আর হাতি জঙ্গলের ভেতর যাবার জন্য সামনের দিকে। দুজনের কেউই একচুলও নড়তে পারল না।

"জোর সে লাগাও, কমজোরী লোকেরা, আরও জোর"—চড়ুই আবার হাঁকল।

"আমি টানছি", হাতির হুঙ্কার শোনা গেল, "আমার ধারণাই ছিল না তোমার গায়ে এত জোর।" "আমি টানছি।" কাদায় বসে যেতে আর পেছল কাটা সামলাতে সামলাতে কুমির চিৎকাব জুড়ল, "তুমি কি একটা জাদু চড়াই? গায়ে এত জোর কোত্থেকে পেলে?"

সারাটা সকাল জুড়ে হাতি আর কুমির দড়ি টানাটানি করল, গর্জন করল, চিৎকার-চেঁচামেচি করল। কিন্তু দুজনের গায়ের জোরই ছিল এক্কেবারে সমান সমান। কেউ-ই নিজের জায়গা ছেড়ে এককফোঁটা নড়তে পারল না।

এবার চড়াই-এর হাসবার পালা। দুজনের গলা পেলেই সে বলতে লাগল, "জোরসে লাগাও, আরও জোর।"

কিছুক্ষণের মধ্যে কুমিরের কান্না শোনা গেল "আমি আর পারছি না। তোমার গায়ে আমার থেকে অনেক বেশি জোর। আমি যদি আর কোনোদিন তোমার জায়গা দখল কবব না বলে কথা দিই আমায় খুলে দোবে?"

প্রায় একই সাথে হাতি ডুকরে উঠল, "আমি আর দড়ি টানাটানি করতে পারছি না। শিগগির এই দড়িটা আমার গলা থেকে খুলে নাও। কথা দিচ্ছি আর কোনোদিন তোমার গাছে ধাক্কা দেব না।"

এবার চড়ুই এর গলা শোনা গেল "ঠিক আছে। আর টানতে হবে না। আমি এসে তোমায় খুলে দিচ্ছি।"

চড়ুই গেল কুমিরের কাছে। গলার দড়ি খুলে দিতেই সরসর করে কুমির নদীর দিকে রওনা দিল। আর যাবার আগে চড়ুইকে বলে গেল, "আমি আর কক্ষনো তোমায় নিয়ে হাসব না। সারা পৃথিবীতে তোমার থেকে শক্তিশালী পাখি আমি আর দেখি নি।"

তারপর চড়ুই গেল হাতির কাছে। গলার দড়ি খুলে দিতেই হাতি চটপট বনের দিকে হাঁটা দিল। আর যাবার আগে বলে গেল, "তোমায় নিয়ে হাসাটা আমার ভুল হয়েছিল। আমার ধারণাই ছিল না তোমার গায়ে এত জোর থাকতে পারে"।

চড়ুই তার ডিমের দিকে উড়াল দিল। দিনটা খুব গরম ছিল তাই সেগুলো একটুও নষ্ট হয় নি। ক'দিন পরে ডিম ফুটে ছানা চড়ুইরা বেরিয়ে এল।

হাতি আর কুমিরের কি হ'ল? তারা তাদের কথা রেখেছিল। আর কোনোদিন তারা ছোট্ট চড়ুইকে জ্বালাতন করে নি।

শিকারী (ঘানা)

একদিন এক শিকারী তার তীর ধনুক নিয়ে বনের মধ্যে শিকার খুঁজে বেড়াচ্ছিল। চলতে চলতে সে হঠাৎ একটা কুয়োর সামনে পড়ে থমকে দাঁড়াল। আর এক পা এগোলেই সে ঐ কুয়োটার মধ্যে পড়ে যেত।

কুয়োর মধ্যে থেকে এমন অদ্ভুত সব আওয়াজ আসছিল যে শিকারী আশ্চর্য হয়ে গেল। কুয়োর দিকে গলা বাড়িয়ে সে জিজ্ঞেস করল, "ভেতরে কে আছ?"

'বাঁচাও', ভেতর থেকে একগাদা গলা শোনা গেল, 'আমাদের বাঁচালে তোমায় পুরস্কার দেব।'

কুয়োয় উঁকি মেরে শিকারী দেখে একটা ইঁদুর, একটা চিতা, এক সাপ আর একজন মানুষ তাতে পড়ে আছে। আর কুয়োর দেওয়ালটা এমন খাড়া আর পেছল যে কিছুতেই ওরা ওখান থেকে বেরিয়ে আসতে পারছে না।

শিকারী বলল, 'তোমাদের বাঁচাতে যাব কেন? ইঁদুর আমাদের গোলা থেকে ধান খেয়ে যায়, সাপ এমন কামড় দেয় যে আমরা মরে যাই। আর চিতার দুষ্টুমীর তো কোনো শেষ নেই। আমাদের গরু ছাগল খেয়ে নেয়, আমাদের ছেলেমেয়েদের ভয় দেখায়। শুধু মানুষ ছাড়া আমি আর কাউকে বাঁচাব না।'

কিন্তু আর-আর জীবজন্তু যারা ছিল তারা এত কাকুতি মিনতি করতে লাগল, শুধু তাই নয়, পুরস্কার দেবে বলে এমন কথা দিল যে শেষ অবধি শিকারী তাদের অনুরোধ ঠেলতে পারল না।

কাছের একটা গাছের গা থেকে লতা ছিঁড়ে নিয়ে তা দিয়ে শক্তপোক্ত এক দড়ি পাকাল সে। দড়ি বেয়ে ইঁদুর, সাপ, চিতা, মানুষ ওপরে উঠে এল।

ইঁদুর, সাপ, চিতা জঙ্গলে ফিরে গেল। যাওয়ার আগে কথা দিয়ে গেল শিগগীরই তারা তাদের উদ্ধারকর্তার জন্য কিছু উপহার নিয়ে ফিরে আসবে। কিন্তু মানুষটি বলল সে কিনা খুব গরীব, তাই শিকারীকে সে কিছুই দিতে পারবে না। শিকারীর প্রাণে দয়ামায়া ছিল, সে সেই গরীব লোকটিকে নিজের কুটীরে নিয়ে গেল, তাকে নিজের রাত্রের খাবার থেকে ভাগ দিল আর শোওয়ার বিছানা দিল।

পরদিন সাত সকালে চিতা শিকারীর কুটিরের দরজায় হাজির। শিকারীকে সে বলল, "তুমি আমায় কুয়ো থেকে বাঁচিয়েছ তাই প্রতিদিন দিনের বেলায় তোমার হয়ে শিকার ধরব আর রাত্তিরে সেই মাংস তোমায় দিয়ে যাব।"

শিকারী তো চিতার কাছে ভারী কৃতজ্ঞ। কেননা রোজবোজ তীর-ধনুক দিয়ে শিকার ধরা মোটেই সোজাকথা নয়। কথা মত রোজ সন্ধ্যেবেলা চিতা শিকারীকে মাংস এনে দিত—কখনো বুনো শুয়োর, কখনো বা জংলী হরিণ—এত মাংস যে শিকারী আর শিকারী মানুষটিকে উদ্ধার করেছিল দু'জনের জন্যই প্রচুর খাবার থাকত।

কয়েকদিন পরে সাপ শিকারীর কুটীরের দরজায় হাজির। শিকারীকে সে বলল, "তুমি আমার জীবন বাঁচিয়েছ তাই তোমার জন্য এমন একটা জিনিষ এনেছি যা একদিন তোমার জীবন বাঁচাবে। তোমায় আমি এমন একটা জিনিষের গুঁড়ো দেব যা কোনো বিশ্বাসঘাতকের রক্তের সাথে মেশাতে পারলে তা দিয়ে সাপে কামড়ানো যে কোনো মানুষকে বাঁচানো যাবে।"

সাপকে ধন্যবাদ দিয়ে শিকারী ঐ জাদু গুঁড়ো একটা ভালো জায়গায় লুকিয়ে রেখে দিল।

আরও কিছুদিন পরে হাজির হ'ল ইঁদুর। তার মুখে ছোট একটা পুঁটুলি। পুঁটুলিটা শিকারীকে দিয়ে ইঁদুর বলল, 'তোমাকে কথা দিয়েছিলাম জীবন বাঁচানোর জন্য তোমাকে কিছু পুরস্কার দেব। আমি দূর-দূরের গ্রাম থেকে সারা জীবনে যত দামী জিনিষ জোগাড় করেছি সব এই পুঁটুলিতে আছে। এটা আজ থেকে তোমার।'

পুঁটুলি খুলে শিকারীর চোখে ধাঁদা লেগে গেল। ঐ ছোট্ট নোংরা পুঁটুলির মধ্যে ভর্তি সোনা রূপোর গয়না আর চমৎকার সব হাতির দাঁতের টুকরো।

যে মানুষটিকে উদ্ধার করেছিল তার কাছে দৌড়ে গিয়ে শিকারী খবর দিল, "আর আমার সুখে থাকা আটকায় কে!"

ইঁদুরের দেওয়া সেইসব দামী জিনিষ বিক্রী করে শিকারী অপূর্ব সুন্দর একটা বাড়ি কিনল আর অসাধারণ সব জিনিষপত্র দিয়ে তা সাজাল। তারপর সে আর যে মানুষটিকে সে উদ্ধার করেছিল দুজনে মিলে সেই বাড়িতে থাকতে লাগল। তাদেব আর কোনোকিছুর অভাব রইল না।

এদিকে সব দেখেশুনে কৃতজ্ঞ হওয়ার বদলে কুয়োর মানুষটির শিকারীর ওপর খুব হিংসা হল। মনে মনে সে ঠিক করল সুযোগ পেলেই শিকারীর ক্ষতি করতে হবে।

একবার হয়েছে কি, নগর প্রধানের বাড়ী থেকে অনেক টাকা আর গয়নাগাঁটি চুরি গেছে। নগরপ্রধান দিকে দিকে চর পাঠিয়ে ঘোষণা করলেন যে চোর ধ'রে দেবে তাকে পুরস্কার দেওয়া হবে।

অকৃতজ্ঞ কুয়োর মানুষ দেখল শিকারী ক্ষতি করাব, তাকে লজ্জার মধ্যে ফেলার সুযোগ তার হাতের মুঠোয়। নগরপ্রধানের কাছে গিয়ে সে বলল, "আমি জানি কে তোমার গয়না আর টাকা চুরি করেছে। যে শিকারীর সাথে আমি থাকি সে একটা সুন্দর বাড়ি তৈরী করেছে। চুরি না করলে একটা গরীব শিকারী এতবড় বাড়ি তৈরির টাকা কোত্থেকে পেল?"

প্রধান শিকারীর বাড়ি গেল। সেখানকার জাঁকজমক দেখে কুয়োর মানুষের কথা সবটাই তাঁর বিশ্বাস হ'ল। বেচারা শিকারীকে টানতে টানতে তিনি নিয়ে গেলেন বিচারালয়ে।

বিচারশালায় প্রধান শিকারীকে জিজ্ঞেস করলেন "এত ধনদৌলত তুমি কোথায় পেলে?"

শিকারী তখন কিভাবে চিতা, সাপ, ইঁদুর আর মানুষটাকে কুয়ো থেকে উদ্ধার করেছে তা বলল। কিভাবে আর সব প্রাণীরা তাকে পুরস্কার দিয়েছে আর মানুষটি তাকে বিপদে ফেলেছে তাও বলল।

নগরপ্রধান আর বৃদ্ধরা কেউ তার কথা বিশ্বাস করলেন না। খুব একচোট হাসাহাসি করার পর তাঁরা বললেন "গল্পখানা ভালই ফেঁদেছ। তোমাকে এক্ষুনি জেলে দেওয়া দরকার।"

এমন সময় প্রধানের বাড়ী থেকে কান্নার রোল শোনা গেল। একজন চাকর বেরিয়ে এসে প্রধানের কাছে কেঁদে পড়লেন, "তোমার বড় ছেলেকে সাপে কামড়েছে। সে মারা যাচ্ছে।'

এবার শিকারী কাকুতিমিনতি করল, "আমাকে একটিবার বাড়ী যেতে দাও। আমি জানি সাপের দেওয়া সেই গুঁড়ো দিয়ে তোমার ছেলেকে বাঁচানো যাবে।"

প্রধান এবং বৃদ্ধরা রাজি হলেন, শিকারীও এক দৌড়ে বাড়ী থেকে সেই জাদু গুঁড়ো নিয়ে এল। "এবার এই জাদু গুঁড়ো কোনো বিশ্বাসঘাতকের রক্তের সাথে মেশাতে হবে", শিকারী বলল। কুয়োর সেই মানুষ প্রধানের বাড়ীতেই ছিল। তার হাত থেকে কয়েক ফোঁটা রক্ত নিয়ে ওষুধ তৈরী করল শিকারী।

কয়েক মুহূর্তের মধ্যে প্রধানের ছেলে সেরে উঠল। সবাই জানল শিকারী সত্যি কথা বলেছে।

প্রধান বিশ্বাসঘাতক কুয়োর মানুষকে দেশ থেকে তাড়িয়ে দিলেন। আর বাড়ি ফেরার আগে শিকারীকে নানান দামী উপহার দিলেন। এরপরে অনেকদিন সুখে শান্তিতে বেঁচে ছিল শিকারী।

তিন আশ্চর্য ছেলে (সিয়েরা লিওন)

আজ আমি তোমাদের যে গল্পটা বলব সেটা আফ্রিকার ঠাকুর্দারা রাত্তিরে আগুন পোয়াতে পোয়াতে তাঁদের নাতিদের প্রায়ই বলেন।

একসময় এক বাবার তিন আশ্চর্য ছেলে ছিল।

বড় ছেলে এত বেশী শুনত যে লম্বা ঘাসের আড়ালে ছোট্ট একটা পোকার নড়াচড়াও সে শুনতে পেত।

মেজ ছেলে এত ভাল দেখতে পেল যে এক মাইল দূরে ধুলোর ওপব পড়ে থাকা একদানা শস্যও তার নজর এড়াত না।

ছোট ছেলে যা দেখত তা-ই গুনে ফেলত—তা গাছের পাতা-ই হোক বা আকাশের তারা-ই হোক।

একদিন তিন ছেলে মিলে বাবাকে বিদায় জানিয়ে অনেক দূরের একটা দেশে রওনা দিল। পথে খাবার জন্য তারা সঙ্গে নিল একবস্তা জনার।

পথে যেতে যেতে তাদের সামনে পড়ল এক নদী। সেটা পেরোনোর জন্য তিন ভাই মিলে জেলেদের থেকে ডিঙি নৌকো ভাড়া করল।

তিনজনে খুব সাবধানে নৌকোয় উঠল আর আরও সাবধানে নৌকোয় তুলল জনারের বস্তাটাকে।

মাঝি দাঁড় বাইতে শুরু করল।

কিছুদূর যাওয়ার পর বড় ভাই হঠাৎ হেঁকে উঠল, "নৌকো থামাও। এইমাত্র বস্তা থেকে একদানা জনার নদীর জলে পড়ে গেল। আমি আওয়াজ শুনতে পেলাম।"

"ঠিক আছে নদীর জলে নেমে এক্ষুনি ওটা তুলে আনছি", বলে মেজ ভাই নদীর জলে ঝাঁপ দিল।

ইতিমধ্যে ছোট ভাই বস্তার সব শস্য জলে ফেলেছিল। সে বলল, "ভাইরা তোমরা ঠিকই বলেছ। আমি গুনে দেখেছি বস্তায় একদানা শস্য কম আছে। শিগগির ওটা তুলে আন যাতে আমরা তাড়াতাড়ি রওনা দিতে পারি।"

অল্প সময়ের মধ্যে জলের ওপরে ভেসে উঠল মেজ ভাই। "এই খুঁজে পেয়েছি। ভাগ্যিস বড়দা আওয়াজ পেয়েছিল", বলতে বলতে নৌকোয় উঠে এল সে। তার হাতে জনারের ছোট্ট দানাটি।

"খুব ভাল করেছ। মাঝি, এবার তুমি নৌকো ছাড়তে পার", খুশী হয়ে ছোট ভাই বসল।

এবার বলত কোন ছেলের ক্ষমতা সবচেয়ে বেশী? যে শুনতে পেত তার, যে দেখতে পেত তার, না যে গুনতে পারত তার?

মাওয়ালকা ও কাক (কেনিয়া)

একসময় এক মেয়ে ছিল। তার নাম ছিল মাওয়ালকা। বাড়ীতে ছিল তিনজন। মাওয়ালকা, তার মা আর বাবা। তিনজনে খুব সুখে ছিল। তাদের বাড়ি ছিল নদীর ধারে।

কিন্তু সুখের দিন বড় হয় না। একদিন মাওয়ালকার মা মারা গেল আর তার বাবা আবার বিয়ে করলেন। মাওয়ালকার নতুন মায়ের মাওয়ালকার বয়সী এক মেয়ে ছিল। বিয়ের আগে নতুন মা কথা দিয়েছিল মাওয়ালকার সাথে খুব ভাল ব্যবহার করবে, এক্কেবারে তার নিজের মেয়ের মতই।

কিন্তু হ'লে হবে কি? বাবার সামনে ভালো ব্যবহার করলেও বাবা না থাকলেই সৎমা মাওয়ালকার সাথে খুব খারাপ ব্যবহার করত। সারা দিন সৎ বোন খেলে বেড়াত আর মাওয়ালকাকে বাড়ির সব কাজ করতে হ'ত।

সকালবেলায় মাওয়ালকা বাড়ি ঝাঁট দিত, নদী থেকে লাউয়ের খোল ভরে ভরে জল আনত, সন্ধের আগুন তৈরীর জন্য জঙ্গলে জঙ্গলে কাঠ কুড়োত, ভারী জাঁতা দিয়ে অনেক অনেক জোয়ার গুঁড়ো করত। এসব শেষ হ'লে সৎ মা মাওয়ালকাকে ধান ঝাড়তে পাঠাত। আর সবশেষে কাজ দেখতে এসে সৎমা যদি খড়ের গায়ে একটা ধানও লেগে থাকতে দেখত তা হ'লে মাওয়ালকার আর রক্ষে থাকত না।

কাজ সারতে সারতে অনেকসময় বেলা বয়ে সূর্য ডুবে যেত। আর সেসব দিনে বাড়ি ফিরে মাওয়ালকা খাবার পেত না। সৎমা বলত, "আজ রাত্তিরে তোমার জন্য খাবার নেই। তোমার উচিত তাড়াতাড়ি কাজ শেষ ক'রে খাওয়ার সময়ের আগে বাড়ি ফিরে আসা। ইচ্ছে করেই তুমি আস্তে আস্তে কাজ কর। তাই তোমায় খানিকটা শিক্ষা দেওয়া দরকার।"

আফ্রিকার ঐ অঞ্চলের রীতি অনুযায়ী বাড়ির ছেলেরা আর মেয়েরা আলাদা আলাদা খেত। কাজেই মাওয়ালকার না খেয়ে থাকার কথা মাওয়ালকার বাবা জানতে পারতেন না। নতুন বৌ তাঁকে কথা দিয়েছিল মাওয়ালকাকে যত্ন করে। নিজে সৎ মানুষ বলে নতুন বৌয়ের কথা তিনি পুরোপুরি বিশ্বাস করেছিলেম। এদিকে দিনে দিনে মাওয়ালকা রোগা হয়। এভাবে একদিন সে মরে গেল।

মাওয়ালকা মারা যাওয়ায় বাবার খুব দুঃখ হ'ল। বৌ তাঁকে বলল ডাইনীতে জাদু ক'রে মাওয়ালকাকে মেরে ফেলেছে। বাবা আর কি করেন, চোখের জল ফেলতে ফেলতে মাওয়ালকাকে জঙ্গলের মধ্যে মাটি চাপা দিলেন তিনি।

এদিকে জঙ্গলের এক উঁচু গাছের মাথায় বাসা বেঁধেছিল এক জাদু কাক। সে বাবার কান্না আর দীর্ঘশ্বাস শুনতে পেল। তারপর অন্ধকার নামলে সে নেমে এল মাওয়ালকার কবরের ওপর। অদ্ভুত সুরে কা-কা করে, ডানা ঝাপটে আর অদ্ভুত সব নাচ নেচে মাওয়ালকাকে বাঁচিয়ে তুলল।

জীবন ফিরে পেয়ে ধড়মড় ক'রে উঠে বসল মেয়ে। বিরাট এক হাই তুলে সে জিজ্ঞাসা করল, "আমি কোথায়?" কাক বলল, "তুমি বনের শেষপ্রান্তে ঘুমিয়ে ছিলে। এইমাত্র তোমায় আমি বাঁচিয়ে তুললাম।"

মাওয়ালকা বলল, "আমি এক্ষুণি বাড়ি যাব। নইলে বাবা চিন্তা করবেন আর সৎমা আমায় মারবে।"

"তুমি আর কোনোদিনও বাড়ি যাবে না। বাড়ি গেলে কোনো না কোনোভাবে সৎমা আবার তোমায় মেরে ফেলবে", কাক বলল।

আসলে কিভাবে সৎমা সারাদিন কাজ করিযে আর না খেতে দিয়ে মাওয়ালকাকে মেরে ফেলেছে সেটা জানত জাদু কাক। তাই মাওয়ালকাকে সে বলল, "তোমার জলের নীচে বেঁচে থাকতে শিখিয়ে দেব। তাহলে কোনোদিন সৎমা জানতে পারবে না যে তুমি এখনো বেঁচে আছ।"

জাদু কাক মাওয়ালকাকে সুন্দর পোশাক দিল, সোনার গয়না দিল, জলের তলায় কেমন করে বেঁচে থাকতে হয় শেখাল। মাছেদের সাথে খেলে আর শ্যাওলার মধ্যে সাঁতার কেটে মাওয়ালকার দিন কাটতে লাগল। তারপর এক রাত্তিরে সে নদীর পাড়ে উঠে এল। জাদু কাক তাকে অপূর্ব সব খাবারদাবার এনে দিল। সেগুলো খেয়ে মাওয়ালকা আগের মত মোটাসোটা আর সুন্দর হয়ে উঠল।

একদিন হয়েছে কি, মাওয়ালকার সৎ বোন আব গাঁয়ের আরও কটি মেয়ে নদী থেকে জল নিতে এসেছে। সৎ বোন, যে সারাদিন শুধু খেলে আর ঘুমিয়ে কাটাত, তাকে কাজ করতে দেখে জলের তলায় বসে বসে মাওয়ালকা ফিক করে হেসে ফেলল। মেয়েরা সবাই বিরাট লাউয়ের খোলে জল ভরে নিল। তারপর এক এক করে একজন আরেকজনের মাথায় সেগুলো তুলে দিল।

শেষ অবধি বাকী রইল মাওয়ালকার সৎ বোন। তার মাথায় কেউ তার মাথায় জলের কলসী তুলে দিল না, উল্টে তাকে নিয়ে হাসাহাসি ক'রে গাঁয়ের পথ ধরে মেয়েরা ফিরে গেল।

একা পড়ে সৎ বোন পা ছড়িয়ে কাঁদতে লাগল। সন্ধ্যের খাবার তৈরীর আগে অনেক জল নিয়ে বাড়ী ফিরতে না পারলে মা বকবে, ওদিকে বেশিরভাগ জল না ফেলে ঐ জলভর্তি খোল মাথায় তোলা তার পক্ষে সম্ভব না।

জলের তলায় বসে মাওয়ালকা সব দেখছিল। সে তো আর তার সৎ-মায়ের মত নিষ্ঠুর ছিল না তাই সৎ বোনকে কাঁদতে দেখে তার খুব দুঃখ হ'ল।

জাদু কাকের বারণ ভুলে সে জলের একেবারে ওপরে উঠে এল। বোনকে সান্ত্বনা দিয়ে বলল, "আর কেঁদো না। আমি তোমার মাথায় জলের খোল তুলে দেব।"

মাওয়ালকাকে দেখে সৎ বোন প্রথমেই ভয়ে দিল এক চিৎকার। সে ভাবল নির্ঘাৎ কোনো অশুভ আত্মা মাওয়ালকার মত চেহারা ক'রে তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু

মাওয়ালকা তাকে বুঝিয়ে বলল যে সে সেই একই মাওয়ালকা–সে বেঁচেই আছে আর ভালো আছে। এবার সৎ বোন খুশী হ'ল। মাওয়ালকা তার মাথায় জলের খোল তুলে দিল। যা হ'ল তা কাউকে বলবে না কথা দিয়ে সৎ বোন চলে গেল।

পরের দিন একই ঘটনা ঘটল। মেয়েরা নিজেদের মাথায় জলের খোল তুলে নিয়ে সৎ বোনকে একা ফেলে চলে গেল। সৎ বোন নদীর ধারে একলা কাঁদতে লাগল।

মাওয়ালকা একটুক্ষণ অপেক্ষা ক'রে জলের ওপরে উঠে এল। মাথায় জলের খোল তুলে দেওয়া মাত্র ভারী খুশী হয়ে সৎ বোন চলে গেল।

গাঁয়ের প্রান্তে অন্য মেয়েরা অপেক্ষা করছিল। তারা দল বেঁধে সৎ বোনকে ধরল কে তোর মাথায় রোজ জলের পাত্র তুলে দেয়?"

সৎ বোন উত্তর দিল, "সেটা বলা বারণ।"

তার কথায় গাঁয়ের মেয়েরা চিন্তায় পড়ল। শেষে সবাই মিলে এক ফন্দী আঁটল। ঠিক করল পরের দিন লুকিয়ে লুকিয়ে পুরো ব্যাপারটার ওপর তারা নজর রাখবে।

রোজকার মত পরদিনও নিজের জলের খোল মাথার তুলে মেয়েরা গাঁয়ের দিকে রওনা দিল। কিন্তু তারা করল কি, কিছুটা গিয়ে জলগুলো সব মাথা থেকে নামিয়ে রাখল। তারপর চুপিসাড়ে আবার জঙ্গল ফিরে এসে ঝোপের আড়ালে, গাছের ফাঁকে লুকিয়ে দেখতে লাগল শেষ অবধি কি হয়।

কিছুক্ষণ বাদে অবাক হয়ে সবাই দেখে তাদের খেলার সাথী মাওয়ালকা, যে মারা গেছে বলে তারা জানত, সে-ই এসে তার সৎ বোনের মাথায় জল তুলে দিচ্ছে।

সেদিন রাত্তিরে মাওয়ালকার বাবাকে আর সৎমাকে মেয়েরা যা দেখেছে খুলে বলল। সৎমা তো ভয়ে অস্থির। মিথ্যে কথা বলছে বলে সে মেয়েদের গাল দিল। কিন্তু বাবা কথা দিলেন পরদিন নিজে তিনি সবকিছু দেখবেন।

পরের দিন বাবা আগে ভাগে গিয়ে এক ঝোপেব আড়ালে লুকিয়ে রইলেন। কিছু পরে মেয়েরা জল নিতে এল। নিজেদের মাথায় জলের খোল নিয়ে তারা গাঁয়ের পথে চলে গেল। সৎ বোন একা একা কাঁদতে থাকল।

অন্যদিনের মত মাওয়ালকা জল থেকে উঠে এল। এখন সে মোটাসোটা, গায়ে চমৎকার পোশাক আর সোনার গয়না। বাবা আর পারলেন না। ছুটে গিয়ে মেয়েকে জড়িয়ে ধরলেন তিনি।

"তুমি সত্যিই বেঁচে আছ? এদিকে আমি কেঁদে কেঁদে সারা। গাঁয়ে ফিরে গিয়ে আমায় বল নি কেন যে তুমি বেঁচে আছ?" কেঁদে হেসে বাবা বললেন।

জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এল জাদু কাক। বাবাকে সবকিছু বলল সে। ডাইনী নয়, সৎ-মা-ই কেমনভাবে একটু একটু করে মাওয়ালকাকে মেরে ফেলেছে।

বাবা সব শুনে খুব রেগে গিয়ে বললেন, "এক্ষুণি ঐ মেয়েকে আমি বাড়ী থেকে বের করে দেব। তারপর আমি আর আমার মেয়ে আবার ভালো থাকব।"

সবাই মিলে গাঁয়ে ফিরে এল। আর তাদের ফিরে আসার খবর পেয়ে সৎমা তার মেয়েকে নিয়ে ছেড়ে এমন উধাও হ'ল যে কোথাও তাদের খুঁজে পাওয়া গেল না।

মাওয়ালকা আর তার বাবার আনন্দে দিন কাটতে লাগল। যতবার খাওয়ালকা নদীর তীরে যেত জাদু কাকের জন্য খানিকটা সেদ্ধ আলু অথবা কয়েক মুঠো জনার এরকম ভালো ভালো সব খাবারদাবার নিয়ে যেত। আর কাকও সবসময় তার খোঁজখবর নিত।

ভাষান্তর : পায়েল ভট্টাচার্য

আফ্রিকার পুরাণ

স্থল ভাগের সৃষ্টি

আদিতে সব কিছুই ছিল জল। মহত্তম দেবতা ওলডোম্যোঁর তখন স্বর্গ থেকে দেবতা ওবাতালাকে পাঠালেন স্থলভাগ (শুষ্ক জমি) সৃষ্টির জন্য। ওবাতালা শিকলের সাহায্যে নীচে নামলো ও সংগে নিয়ে এল শামুকের খোলসের মধ্যে পৃথিবীকে, কিছু লোহার টুকরো ও একটা মোরগ। যখন সে নামলো সে জলের ওপর লোহার টুকরোগুলো ছড়িয়ে তার ওপর পৃথিবীকে বিছিয়ে দিল এবং সবের ওপর বসালো মোরগটাকে। মোরগটা সঙ্গে সঙ্গেই আঁচড়াতে শুরু করলো ও স্থলভাগ ছড়িয়ে গেল চারিদিকে।

যখন স্থলভাগের সৃষ্টি হল তখন অন্য দেবতা 'ওরিশ্যাঁ স্বর্গ থেকে নেমে এলেন স্থলভাগে ওবাতালার সংগে থাকার জন্য।

মানুষের সৃষ্টি

ওবাতালা মানুষের সৃষ্টি করল পৃথিবী থেকেই। মানুষকে নারী ও পুরুষের আকার দেবার পর সে তাদের ওলডোম্যোঁরের কাছে পাঠালো জীবনের নিঃশ্বাসের জন্য।

একদিন যখন ওবাতালা পাম্‌ওয়াইন পান করছিল তখন সে কুঁজো, খোঁড়া, শ্বেতী-যুক্ত ও অন্ধ মানুষ বানাতে শুরু করল।

সেইদিন থেকেই কুঁজো ও যাদের শ্বেতী আছে ও সমস্ত বিকৃত আকারের মানুষেরা ওবাতালাকে ভয় পায়। কিন্তু তার (ভক্ত) অনুরাগীদের কাছে পাম ওয়াইন পান নিষিদ্ধ।

এখনও ওবাতালাই সে, যে মাতৃ জঠরে শিশুর রূপ / আকার দেয়।

ওবাতালা ধ্বংস, তার দাসের হাতে

শুরুতে কেবল একজন ওরিশ্যাঁই ছিল পৃথিবীতে। ওরিশ্যাঁর একটা দাস ছিল যাকে সে খুব পছন্দ করতো ও যে তাকে খুব বিশ্বস্তভাবে সেবা করত। একদিন সেই দাস ওরিশ্যাঁর কাছে একটা খামার চাইল, দেবতা তাকে একখণ্ড জমি দিলেন। সেই দাস জমিতে খামার তৈরী করল ও পাহাড়ের কোলে ছোট একটা কুঁড়ে ঘর বানালো। ওরিশ্যাঁ প্রায়ই সেই দাসের কুঁড়ে ঘরে যেতেন বিশ্রাম নিতে। কিন্তু সেই দাস ছিল শয়তান ও সবসময়েই ওরিশ্যাঁকে ধ্বংস করার মতলব করত। একদিন যখন সেই দাস দেখল ওরিশ্যাঁ তার সাদা পোষাকে এগিয়ে আসছে, সে নিজেকে পাহাড়ের আড়ালে লুকিয়ে ফেললো এবং যে মুহূর্তে ওরিশ্যাঁ কাছাকাছি এল সে পাহাড় থেকে একটা বড় পাথর তার দিকে ঠেলে দিল। ওরিশ্যাঁ শত টুকরোতে খণ্ডিত হল।

যখন এই দুঃসংবাদ চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল, দৈব দেবতা ওরুণমিলা সেখানে গেলেন ও যত টুকরো একত্রিত করা সম্ভব করলেন। তিনি আর্দ্ধেকেরও বেশি টুকরো একত্রিত

করলেন। তিনি পবিত্র টুকরোগুলো একত্রিত করলেন ও 'ওরিশাঁন্যম'—'মহান ওরিশাঁ' —নামে নামাঙ্কিত করলেন। তখন থেকেই পৃথিবীব্যাপী জুড়ে আছে শতশত ছোট ওরিশাঁ।

সৃষ্টি/সৃজন

শুরুতে পৃথিবী যখন শূন্য/পতিত ছিল, স্রষ্টা মাটি থেকে মানুষ তৈরী করলেন। মেঁব্যয়র সেই কাদামাটি থেকে মানুষের আকার গঠন করল। সেই, মানুষের শুরু, আর শুরু হল এক সরীসৃপ/টিকটিকি রূপে। মেঁব্যয়র সেই সরীসৃপ/টিকটিকিকে রাখলো সমুদ্রের হল ভর্তি একটা গামলায়, পাঁচ দিন গেল, সরীসৃপ/টিকটিকিটা জলেই কাটালো। সাতদিন এবং এ সাতদিন সে জলেই থাকল। আট দিনের দিন যখন মেঁব্যয়র এল ও তাকে দেখলো। আর দেখ—সেই সরীসৃপ/টিকটিকিটা জলের বাইরে এল, আর দেখ সে এখন জলের বাইরে। কিন্তু এখন সে এক মানুষ, এবং সে তার স্রষ্টাকে ধন্যবাদ জানালো।

মৃত্যু এবং চাঁদ

বয়স্কদের একজনের নজরে এল যে চাঁদের আলোর মাঝে শুয়ে আছে এক মৃত মানুষ। সে অন্য জানোয়ারদের ডাকলো আর জিজ্ঞাসা করলো তোমাদের মধ্যে কে আমাকে সাহায্য করবে এই মৃত মানুষ ও চাঁদকে নদীর ওপারে নিয়ে যেতে।

দুটো কচ্ছপ এগিয়ে এল। প্রথমটার থাবা বড়। সে চাঁদকে সঙ্গী করল ও নিরাপদেই অন্য পারে পৌঁছে গেল। কিন্তু অন্যটা, যার থাবা ছোট যে মৃত ব্যক্তিকে বহন করছিল এ কারণেই ডুবে গেল।

এজন্যই ডুবে যাওয়া চাঁদ আবার ওঠে কিন্তু মৃত ব্যক্তি ফিরে আসে না।

মেয়েরা

তিনজন মানুষ ওঁএনডির কাছে গেল তাদের প্রয়োজনের কথা জানাতে। প্রথমজন চাইলো একটি ঘোড়া। দ্বিতীয়জন চাইলো একটি কুকুর, তার সঙ্গে শিকারে যাওয়ার জন্য। তৃতীয় জন বললো—আমার একটি মেয়ে চাই, যে আমাকে আনন্দ দেবে।

ওঁএনডি তাদের আশাপূরণ করলেন। কাঙ্ক্ষিত জিনিস দিলেন। সেই তিনজন মানুষ বাড়ী ফেরার পথে। কিন্তু পথমধ্যে ঝড় তাদের জঙ্গলে বন্দী করলো তিন দিনের জন্য। তখন সেই মেয়ে তাদের জন্য রান্না করলো—তাদের তিন জনের জন্য। তিনজন মানুষ তখন ঠিক করলো তারা ওঁএনডির কাছে ফিরে যাবে এবং তারা ফিরে গেল।

তারপর, সেই প্রথম যে ঘোড়া চেয়েছিল, সে একটি মেয়ে চাইলো, এবং দ্বিতীয় যে কুকুর চেয়েছিল সেও একটি মেয়ে চাইলো।

এবং ওঁএনডি, ঘোড়া ও কুকুরকে মেয়েতে পরিণত করলেন।

তারা বাড়ী ফিরে গেল, কিন্তু সেই মেয়েরা যারা ঘোড়ার থেকে এল, তারা হল 'লোভী' যারা কুকুরের থেকে এল, তারা হল 'শয়তান'। কিন্তু 'তারা যারা প্রথম মেয়ের থেকে এলো তারা 'ভালো' হল। কেননা সেই ছিল সমগ্র মানবজাতির 'মা'।

সূর্য এবং চাঁদ

বিশ্বের শুরুতে, ভগবান, এক শিশু, আকাশ, পৃথিবী, সমুদ্র, জন্তু ও গাছ ছাড়া আর কিছুই ছিল না। সেখানে না ছিল সূর্য না ছিল চাঁদ।

ভগবান একটা ফাঁদ পাতলেন। পরের দিন ভোরে বাচ্চাটা সেখানে গেল, ফাঁদে কিছু ধরা পড়েছে কিনা দেখার জন্য। প্রতিবারই সে দেখত কোন জন্তু ধরা পড়েছে, সে ভগবানকে ডাকত ও ভগবান এসে তার জন্য জন্তুটার নামকরণ করত। এভাবে ভগবান বাচ্চাটার জন্য খাবার ব্যবস্থা করত।

একদিন সকালে সেই শিশু এক জন্তু আবিষ্কার করল ফাঁদের মধ্যে। সে ভগবানকে ডাকলো ও ভগবান জোর গলায় তার নামকরণ করল 'সূর্য' এবং ভগবানই তাকে ফাঁদ থেকে বের করে আকাশে প্রতিষ্ঠা করল।

পরের দিন শিশু দেখে ফাঁদে চাঁদ ধরা পড়েছে এবং সে ভগবানকে ডাকলো যে ফাঁদ থেকে চাঁদকে ছিনিয়ে নিয়ে আকাশে প্রতিষ্ঠা করল।

কেন্নো

যখন মানুষ ও জন্তু পৃথিবীতে খুব বেশি দিনের নয়, তখন তাদের চেহারাও ছিল বিকৃত। কেন্নো তখন তাদের জন্য পায়ের ব্যবস্থা করল এবং সেগুলো বিক্রি করে জীবনযাপন করতে শুরু করল। এক দিন সে অন্য এক যাত্রায় বেরলো তার তৈরী পা বিক্রির জন্য। সে এক মানুষের কাছে গেল ও সুন্দর এক জোড়া পা দেখালো, কিন্তু সেই মানুষ তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলল যে তার পায়ের দরকার নেই কেননা সে গত মাসেই তার থেকে পা কিনেছে।

পরের যে মানুষের দেখা পেল, সে দেখলো তার পা আছে এভাবেই তৃতীয়, চতুর্থ..., শেষে সেই কেন্নো দেখলো প্রত্যেক মানুষ ও জন্তুরই পা আছে।

সেই কেন্নো তখন রেগে বলল তোমাদের প্রত্যেকেরই পা আছে, তাহলে এই সুন্দব পা গুলো নিয়ে আমি কি করব? এত পরিশ্রমে তৈরী পাগুলো ফেলে দেব? না, আমিই এগুলো ধারণ করব।

এবং সেই থেকেই কেন্নো চলে বেড়াচ্ছে তার সহস্র পা নিয়ে।

মোরগ ও গাধা

'আমাকে বেশি কথা বলিও না' মোরগ বলল গাধাকে। 'যতবার আমি ডাকি আমাকে বুকে ডানা ঝাপটাতে হয়, আমি ক্লান্ত হয়ে পড়ি।' 'ও, আমি কথা বলতে ভালবাসি' গাধা বলল মোরগকে। 'যেহেতু যখনই আমি ডাকি আমি বায়ুমুক্ত হই ফলে একটু আরাম হয়।

ভাষান্তর : দেবাশিস দাশগুপ্ত

উপন্যাস

তায়েব সালিহ্

উত্তরে দেশান্তরিত হবার মরশুম

(Seasons of Migration to the North)

বুঝলেন মশাইরা, অনে—ক দিন পর মানে ঠিক সাত বছর পর আমি আবার আপনজনের মধ্যে ফিরে এলুম। এতদিন আমি বিলেতে পড়াশুনো করছিলুম। এই সময়ে আমি শিখেছি অনেক কিছুই আবার আমার মাথার উপর দিয়ে উড়ে গেছে অনেক কিছুই—অবশ্য সে গপ্পো স্বতন্ত্র। মোদ্দা কথাটা হল আমি ফিরে এলুম একবুক স্বজন সান্নিধ্যের স্বপ্ন নিয়ে। ফিরে এলুম নীল নদের বাঁকে আমার সেই ছোট্ট গাঁয়ে, আমার আপনজনের মধ্যে। সাতটা বছর আমার কেটে গেছে শয়নে জাগরণে ওদের কথা ভেবে। ঘরে ফিরে তাদের মধ্যে দাঁড়িয়ে এক অভূতপূর্ব রোমাঞ্চ আমার সর্বাঙ্গে। এই মুহূর্তের প্রতীক্ষায় কেটে গেছে আমার সাত সাতটা বছর। আমাকে নিয়ে ওদের আহ্লাদ, আদিখ্যেতার যেন আর শেষ নেই। ওদের হৃদয়ের উষ্ণতায় আমার অন্তরের জমাট বাঁধা বরফ একটু একটু করে গলতে শুরু করল। ব্যাপারটা ঠিক কেমন জানেন? আমি যেন হিমঘরে জমানো কিছু আর তার উপর ঠিকরে পড়ছে ওদের হৃদয়ের উষ্ণতা —ওরা, মানে যারা আমার আপনার জন, যাদের থেকে দূরে ছিলাম অনেকদিন, যারা আমার আপন কৌম, গোষ্ঠী, উপজাতি যাদের 'মাছ মরে যায় ঠাণ্ডায়', তারা।

ওদের গলার স্বর, দেহের গড়ন, চেহারার আদলে আবার ধাতস্থ হয়ে উঠেছিলুম একটু একটু করে। বিদেশে ওদের কথা এত ভেবেছি অথচ প্রথম দিন একটুও সহজ হতে পারছিলাম না, যেন ওদের আর আমার মধ্যে একটা কুয়াশার আড়াল তৈরী হয়েছে। আড়ালটা সরে গেল পরের দিন। সকাল বেলা ঘুম ভাঙ্গল, এই সেই বিছানা, ঘর, দেওয়াল—আমার কতদিনের চেনা, আমার শৈশব, কৈশোরের ভাবনাহীন, আনন্দময় দিনগুলোর নীরব সাক্ষী। বাতাসে কান পাতলে এখনো তো শুনতে পাচ্ছি সেই চেনা ফিসফিসানি, তার আবার কত রকমফের। ভুট্টাখেতের দমকা হাওয়ার শব্দ তো তাল বনের শনশনানির থেকে একদম আলাদা। শুনতে পেলুম কোথায় যেন ঘুঘু ডাকছে। জানলাটা হাট করে খুলে দিলুম। ওই তো উঠোনে সেই বুড়ো তালগাছটা দাঁড়িয়ে রয়েছে। এখনো আগের মতই স্বচ্ছ, মোটা কাণ্ডটা সোজা আকাশের দিকে উঠে গেছে, মাটির নীচে বাড়িয়ে দিয়েছে শক্ত শিকড়ের গুচ্ছ, মাথায় ঝলমলে সবুজ পাতার বাতাসে আন্দোলন। গাছটাকে দেখে ভরসা পেলুম — বুঝলুম জীবনটা এখনো মধুর। নিজেকে আর ঝড়ে ওড়া ঝরা পালক বলে মনে হচ্ছে না, বরং মনে হচ্ছে ওই তালগাছটার মত আমারও একটা অতীত আছে, শিকড় আছে, লক্ষ্য আছে।

মা চায়ের গেলাস নিয়ে এলেন, পিছনে আব্বাও। এর মধ্যেই তাঁর নমাজ পড়া, কোরান পাঠ সারা হয়েছে। একটু পরে চা নিয়ে আমার ভাই বোনেরাও হাজির। আমরা সবাই চা খেতে খেতে গল্পে মশগুল হয়ে গেলুম। সকালের চায়ের আসরের এই আড্ডা চলে আসছে সেই কবে থেকে, বোধহয় আমার চৈতন্যের উষালগ্ন থেকে। নাঃ, জীবনটা সত্যিই রমণীয়, পৃথিবীটা ঠিক আগের মতই রয়েছে, একটুও বদলায় নি।

আমার হঠাৎ মনে পড়ল আগের দিন যারা আমাকে স্বাগত জানাতে এসেছিল তাদের ভিড়ে দেখা একটা অচেনা মুখের কথা। বয়েস পঞ্চাশ হয়েছে কি হয়নি, মাঝারি গড়ন, এঁক

মাথা চুলে পাক ধরেছে, দাড়ি নেই তবে ছোট্ট গোঁপ—আমাদের গাঁয়ের লোকেরা যেমন রাখে তার থেকেও একটু ছোট—বেশ সুদর্শন বলা যায়। চেহারার বর্ণনা শুনে আব্বা বললেন — 'ও তো মুস্তাফা'।

কে মুস্তাফা? সেই যারা আমাদের গাঁ থেকে বিদেশে গিয়েছিল তাদের কেউ ফিরে এলো নাকি?

আব্বা জানালেন এ মুস্তাফা আমাদের গাঁয়ের লোক নয়, বাইরে থেকে এসেছে। বছর পাঁচেক হল আমাদের গাঁয়ে এসে জমি জিরেত কিনে বাড়ি তৈরী করে থিতু হয়েছে। শাদিও করেছে আমাদেরই গাঁয়ের মাহমুদের মেয়েকে। মুস্তাফা নাকি কারোর সাতে পাঁচে থাকে না, নিজের কাজকর্ম নিয়েই সারাদিন ব্যস্ত। ওর সম্পর্কে কেউ বিশেষ কিছু জানে না।

কেন যে লোকটার সম্পর্কে আমার কৌতূহল হল তা ঠিক বলতে পারব না, তবে আমার বেশ মনে আছে সেদিন যখন সবাই আমাকে স্বাগত জানাতে এসে নানা কথা শুধোচ্ছিল, এইলোকটা তখন একটাও কথা বলে নি, ও শুধু সবার কথা শুনছিল। ওদের ঔৎসুক্যের আর শেষ নেই। মাঝে মাঝে আমিও এটা সেটা জিজ্ঞেস করে জেনে নিচ্ছিলুম ওদের খবরাখবর। ওদের কৌতূহল যতটা না আমাকে নিয়ে তার চাইতে অনেক বেশি ইউরোপ নিয়ে। ওখানকার লোকজন কেমন—আমাদের মত না অন্যরকম? জিনিসপত্তর কি এখানকার চাইতে শস্তা না দামী? শীতের সময় লোকেরা কী করে, কীভাবে দিন কাটায়? ওদেশের মেয়েদের নাকি বোরখা টোরখার বালাই নেই, আর সবার সামনেই পুরুষ মানুষদের সঙ্গে ধেই ধেই করে নেচে বেড়ায়? প্রশ্নের আর শেষ নেই। ওয়াদ রাইয়েস্ তো লজ্জা শরমের মাথা খেয়ে বলেই ফেলল—'হ্যাঁগো, ওদেশের মেয়েছেলেরা নাকি পুরুষ মানুষের সঙ্গে একসাথে থাকে শাদি না করেই? কী পাপ! কী পাপ!'

যতদূর পারি ওদের কৌতূহল মেটানোর চেষ্টা করলুম। শেষে বললুম যে, ইউরোপের লোকেরা ওদের মতই মানুষ, ওদের মতই বিয়ে শাদি করে সংসার ধম্মো করে, ছেলেপুলের জন্ম দেয়, তাদের প্রতিপালন করে। নিজেদের সমাজের রীতিনীতি মেনে চলে। শুনে তো ওরা অবাক। আরো বললুম যে ইউরোপীয়দের নীতিবোধ যথেষ্ট—মোটের উপর তাদের বেশ ভালোই বলা যায়। মাহ্‌জুব জিজ্ঞেস করল— 'আচ্ছা ওদের দেশে কৃষক আছে?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ ওদের দেশে সব রকমের লোকই আছে। কৃষক আছে, মজুর আছে, ডাক্তার, বদ্যি, মাষ্টার—সবই আছে, ঠিক আমাদের মতন।' ওদের কথার জবাব দিতে দিতে আমার আরো একটা কথা মনে হলো, সেটা অবশ্য ওদের আর বললাম না—'ওরাও আমাদের মতই জন্ম নেয়, মরে যায়, জন্মানোর পর থেকে কবরে পৌঁছানো পর্যন্ত স্বপ্ন দেখে, সেই স্বপ্নের কিছু সফল হয়। কিছু হয় না। অজানাকে তারাও ডরায়. বিবি-বাচ্চার শীতল ছায়ায় ভালোবাসা খোঁজে, তৃপ্তি পেতে চায়। কেউ কেউ হকের অনেক বেশিই পায় জীবনে, আবার কেউ কেউ কম—তবে ফারাকটা কমে আসছে। সমাজের দুর্বল যারা তারা আর এখন ততটা দুর্বল নেই।'

ভাবলাম মাহ্জুবকে এই কথাগুলো বলি। কারণ ও খুব চৌখশ লোক, এখন গাঁয়ের একজন মাথা। আবার ভাবলুম যদি আমার কথা না বোঝে। এই সব সাত পাঁচ ভেবে আর কিছুই বললাম না।

আমাদের কথার মধ্যে বিন্ত মাঝুব হাসতে হাসতে ফোড়ন কাটল—'আমরা ভাবলুম তুমি না আবার সুন্নত না দেওয়া একটা কাফিরকে শাদি করে নিয়ে আস! আমরা তো ভয়েই মরি!'

এই সব গপ্পোগাছা যখন চলছিল তখন মুস্তাফাকে দেখেছিলাম একদম চুপ। মাঝে মাঝে তার মুখে একটা রহস্যময় স্মিত হাসি। সে যেন নিজের মনে কথা বলছে নিজের সঙ্গে।

সে দিনের পর মুস্তাফাকে আমি বেমালুম ভুলে গিয়েছিলাম। গাঁয়ের মানুষজনের সঙ্গে পুরোন সম্পর্কটা ঝালিয়ে নিতে নিতে আমার বেশ আনন্দে দিন কাটছিল। আরসিতে প্রথমবার নিজেকে দেখে শিশুরা যেমন আহ্লাদে আটখানা হয়, আমিও তেমনি এক নির্ভেজাল খুশিতে মজে গিয়েছিলাম। আমার মায়ের খবরের ঝুলি আর ফুরোয় না। আমি যখন ছিলুম না তখন কার কার এন্তেকাল হয়েছে, আবার কে কে শাদি করেছে, কাদের বাড়ি গিয়ে শোক জানাতে হবে, কাদের মুবারক—এই ফিরিস্তি আর শেষই হয় না। মায়ের কথা না শুনে নিস্তার নেই। তাই কটা দিন আমার কেটে গেল বাড়ি বাড়ি ঘুরে। কোথাও গিয়ে জানাই শোক, কোথাও মুবারক। শেষে একদিন গিয়ে বসলাম গাঁয়ের প্রান্তে নদীর ধারের এক লম্বা বাবলা গাছের তলায়। এই জায়গাটা আমার আবাল্য প্রিয়। এইখানে বসে কত দিবাস্বপ্ন দেখেছি। আমার কল্পনা পাখনা মেলে হারিয়ে গেছে দিগন্ত থেকে দিগন্তে, কত সময় কেটে গেছে নদীতে পাথর ছুঁড়ে ছুঁড়ে। এখানে বসেই শুনতে পেতাম জলচক্রের [waterwheel] ক্যাঁচকোঁচ আওয়াজ, দূর থেকে ভেসে আসে খেতের মুনিষদের ঝগড়া কাজিয়ার আওয়াজ, কখনো শুনতে পাই বলদের হাম্বা কিম্বা গাধার ডাক। কোন কোনদিন কপাল ভালো থাকলে দেখতে পেতাম স্টিমারটাকে, ভেসে যাচ্ছে নদীর উজানে বা ভাঁটায়। এই বাবলা গাছের শীতল ছায়ায় বসে আমি দেখতাম কীভাবে একটু একটু করে বদলে যাচ্ছে আমার গ্রাম। নীল নদের ধার থেকে আস্তে আস্তে উঠে গেল খেতে জল দেবার বড় বড় জলচক্রগুলো, সেখানে বসল পাম্পসেট। এক একটা পাম্পসেটের ক্ষমতা একশো জলচক্রের সমান। আমি দেখতাম দিনে দিনে কীভাবে নদীর পাড় একদিকে ভেঙে যাচ্ছে আর অন্যদিকে গড়ছে। এইসব দেখতে দেখতে আমার মাথায় কত না উদ্ভট চিন্তা কিলবিল করত। নদীর ভাঙাগড়া দেখতে দেখতে মনে হত এরই নাম জীবন—এক হাতে পূর্ণ কর পাত্র শূন্য করে দাও অন্য হাতে। হয়ত এই প্রত্যয়ে পৌঁছতে আমার আরো অনেক দিন লেগেছে। এই সত্যের উপলব্ধি শুধুই আমার মনে, কারণ এখনো আমার পেশি সবল, হৃদয় আশাবাদী। আমি জোর করে আদায় করে নেব জীবনের কাছ থেকে আমার হকের পাওনা। আমি দিতে চাই নিজেকে উজাড় করে, চাই আমার হৃদয় উৎসারিত ভালোবাসা পরিণতি পাক। এখনো অনেক দিগন্ত আমাকে পেরোতে হবে। তুলতে হবে অনেক ফসল, পড়তে হবে অনেক কেতাব। জীবনের

সাদা পাতায় গোটা গোটা অক্ষরে লিখতে হবে অনেক কথা। নদীর জল ঘোলাটে হতে শুরু করেছে, সুদূর ইথিওপিয়ার পাহাড় ধুয়ে দিয়ে বর্ষার জল এসে মিশছে নদীতে। মাঠে যারা কাজ করছে তাদের অবয়ব দেখা যাচ্ছে—কেউ লাঙ্গল ঠেলছে, কেউ ব্যস্ত অন্য কাজে। চাষের খেত বিস্তৃত হয়ে মরুভূমিতে মিশেছে যেখানে সেইখানটায় রয়েছে গাঁয়ের ছোট ছোট বাড়িগুলো। একটা চেনা পাখী ডেকে গেল, কোথাও একটা কুকুর ঘেউ ঘেউ করে উঠল, কে যেন কাঠ কাটছে—শোনা যাচ্ছে কুড়ুলের ঠক্ ঠক্ আওয়াজ। এইখানে বসে আমার মনটা শান্ত, স্থির হয়ে উঠলো। এই আমি, অবিচ্ছিন্ন, অখণ্ড-জরুরি। না, আমি কোন পাথরের টুকরো নই যে আমাকে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হবে নদীতে, আমি খেতে বোনা একটা বীজ। দাদুর কাছে যখন গল্প শুনতে বসি—তিরিশ চল্লিশ এমন কি সত্তর আশি বছরের আগের কথা, তখন আমার নিরাপত্তার বোধ খুব জোরদার হয়। খুব ছোটবেলা থেকে দাদুর কছে পুরোন দিনের গল্প শুনতে শুনতে আমি অবাক হয়ে যেতাম। দাদুও পুরোন দিনের গল্প বলতে ভালো বাসতেন। দাদু আর আমার মধ্যে গড়ে উঠেছিল একটা নিবিড় সখ্য। গ্রাম ছেড়ে দূরে কোথাও গেলে মনে হত ফিরে এসে আর বোধহয় দাদুর সঙ্গে দেখা হবে না। প্রবাসে যখন সবার জন্যে খুব মন কেমন করত তখন মাঝে মাঝে দাদুকে স্বপ্ন দেখতাম। বাড়ি ফিরে ওনাকে এ কথা বলতে উনি তো হেসেই খুন। হাসতে হাসতে বললেন—'আমার যৌবনে একজন জ্যোতিষ বলেছিল আমি যদি পয়গম্বরের বয়েস অর্থাৎ ষাট ছাড়াতে পারি তাহলে একশো বছর টিকব।' দুজনে মিলে হিসেব করে দেখেছি ওনার একশো পুরতে আরো বারো বছর বাকী।

দাদু আমাকে তুর্কি আমলের একজন জেলা শাসকের গল্প বলেছিলেন। আমি জানি না ঠিক সেই সময়েই কেন মুস্তাফার কথা মনে পড়ল। ঠিক করলাম দাদুকেই ওর কথা জিজ্ঞেস করব। কারণ গাঁয়ের সবার নাড়ি নক্ষত্র তাঁর জানা। আর শুধু তাই না, নদীর উজান ভাটার আরো দশখানা গাঁয়ের লোকজনের ঠিকুজি কুলুজি তাঁর নখদর্পণে। কিন্তু তাঁকে জিজ্ঞেস করেও কোন লাভ হল না। যেটুকু জানা গেল তা প্রায় সবার জানা—'মুস্তাফা খার্তুমের কাছের কোন জায়গা থেকে বছর পাঁচেক আগে এই গাঁয়ে এসে কিছু জমি জায়গা কেনে। যাদের কাছ থেকে জায়গা কিনেছে তাদের পরিবারের একজন বুড়ি ছাড়া আর সবাই গ্রাম ছেড়ে চলে গেছে বহুদিন আগে। সবাই বলে মুস্তাফা নাকি বুড়িটাকে টাকা দিয়ে বশ করে জমিটা কিনে নিয়েছে। বছর চারেক হল মাহ্মুদ তার একটা মেয়ের সঙ্গে ওর শাদি দিয়েছে।

'কোন মেয়েটা?'

'বোধহয় হোস্‌না।' তারপর মাথা ঝাঁকিয়ে একটু বিরক্তির সঙ্গে বললেন—'ওই জাতের লোকেরা যার তার সঙ্গে মেয়ের শাদি বসায়।' তারপর অবশ্য দাদুর সুরটা নরম হল। বললেন যে মুস্তাফা যতদিন এই গাঁয়ে আছে, তার সম্পর্কে নিন্দে করার মত কিছু কেউ দেখে নি। প্রতি জুম্মায় ও মসজিদে যায় নমাজ পড়তে আর গাঁয়ের মানুষের সুখে দুঃখে সাহায্যের হাত বাড়িয়েই আছে।

দাদুর সঙ্গে এসব আলোচনার দিন দুই পরে একদিন বিকেলের দিকে, কী একটা বইমুখে

দিয়ে বসে ছিলাম। আমার মা আর বোন পাড়ার কয়েকজন মেয়ের সঙ্গে দাওয়ার অন্য প্রান্তে বসে আড্ডা জমিয়েছে। অন্য ঘরে আব্বা তাঁর দৈনন্দিন দ্বিপ্রাহরিক নিদ্রায় বিভোর। ভাইদের কাউকে দেখতে পাচ্ছি না, আছে বোধহয় আশেপাশে কোথাও। বাইরে থেকে কে যেন ডাকল। সদর দরজা খুলে বেরিয়ে দেখি মুস্তাফা দাঁড়িয়ে আছে এক ঝুড়ি কমলালেবু আর ইয়াব্বড়া একটা তরমুজ হাতে নিয়ে। আমাকে অবাক হতে দেখে বলল—'আপনার ঘুম ভাঙালাম না তো। ভাবলাম আমার খেতের প্রথম ফসল আপনাকে খাওয়ার জন্যে দিয়ে যাই, আর ভাবলাম আপনার সঙ্গে একটু আলাপও হবে। অবশ্য এই ভরদুপুরে কারুর বাড়িতে আসা ঠিক নয়। মাপ করবেন।'

মুস্তাফার অতি বিনয় আমার নজর এড়ালো না। আমাদের গাঁয়ের মানুষ এতো বিনয়ের ধার ধারে না। দরকার পড়লে সে সকাল হোক আর দুপুর হোক সোজা হাজির হবে আর সরাসরি আসল কথায় চলে আসবে। ওসব মাপ টাপ চাওয়ার ধার ধারে না। আমি তার বন্ধুত্বের বাড়ানো হাত ধরে ঘরে এনে বসালাম, চা এসে গেল একটু পরেই।

এই প্রথম মুস্তাফাকে খুঁটিয়ে দেখার সুযোগ পেলাম। লোকটাকে বেশ ভালো দেখতে। চওড়া কপাল, চাঁদের মত দুই ভুরুর মধ্যে একটু ফাঁক, মাথায় ঠাসা চুল—কাঁচাপাকা, বৃষস্কন্ধ সুঠাম গড়ন। খাড়া ছুঁচলো হয়ে আসা নাক থেকে কয়েক গুচ্ছ চুল বেরিয়ে আছে। কথা বলতে বলতে ও যখন মুখ তুলে আমার দিকে তাকাচ্ছিল তখন লক্ষ্য করলাম ওর মুখখানায় দৃঢ়তা আর দুর্বলতার এক অদ্ভুত মিশেল। ছোট্ট মুখে প্রশান্তি, বড় বড় স্বপ্নালু চোখ, সব মিলিয়ে বেশ শ্রী খুলেছে। আমার সঙ্গে কথা বলছিল আস্তে আস্তে, কিন্তু কথাবার্তায় প্রত্যয়ের ছাপ স্পষ্ট। হাসলে সারা মুখটাতে ছড়িয়ে যায় কমনীয়তা আর যখন একমনে অন্যের কথা শোনে তখন মুখখানায় ফুটে ওঠে দৃঢ়তার ছাপ। হাত দুটো সবল, পেশিবহুল, সরু চাঁপার কলির মত আঙুল। দুই হাত থেকে দৃষ্টি যখন মুখের উপর এসে থামে তখন মনে হয় যেন পর্বত থেকে উপত্যকায় নেমে এলাম।

ভাবলুম ওকে দিয়েই বেশি বলাতে হবে। ওর নিশ্চিত আমাকে কিছু বলার আছে নইলে এই ভরদুপুরে খাঁ খাঁ রোদের মধ্যে আমার বাড়ি হাজির হবে কেন? অবশ্য নেহাত সৌজন্যের খাতিরেও হতে পারে। আমি যখন এইসব আশকথা পাশকথা ভাবছি তখন মুস্তাফা বোধহয় আমার মনের কথাটা আঁচ করে বলল—'এই গাঁয়ে আপনিই বোধহয় একমাত্র লোক যার সঙ্গে এখনো আমার ভালো করে আলাপ করার সৌভাগ্য হয় নি।' ওর এই অতিভদ্রতার কারণ আমার এখনো পরিষ্কার হচ্ছে না। এই গাঁয়ের লোকেরা অতশত ভদ্রতার ধার ধারে না। কারুর উপর খেপে গেলে—'শূয়োরের বাচ্চা' বলে গাল পাড়তে এক সেকেণ্ডও দেরি হয় না।

'আপনার কথা খুব শুনেছি আপনার আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবের কাছে।'

তাতে আর অবাক হওয়ার কী আছে? আমি নিজেকে বেশ কেষ্ট বিষ্টু ভাবতাম।

'শুনলাম আপনি নাকি কী একটা বড় সার্টিফিকেট পেয়েছেন।'—কী যেন বলে? ডক্টরেট? আপনারা কী বলেন?' আমার কীর্তি কাহিনী বোধহয় দেশের এক কোটি মানুষের

কারুর আর জানতে বাকী নেই। একটু বিরক্তি বোধ করলুম। মুস্তাফা অবশ্য তখনো থামে নি—'সবাই বলে আপনি নাকি সেই ছোটবেলা থেকেই খুব মেধাবী।' যদিও আমার বেশ গর্বই হচ্ছিল তবুও বিরক্তি লুকিয়ে বললুম 'তেমন কিছু না।'

'একজন ডক্টরেট—বাপরে। বিরাট ব্যাপার।'

এবার আমি বেশ বিনয়ের সঙ্গে বললাম যে ব্যাপারটা আসলে এমন কিছু না। একজন অখ্যাত ইংরেজ কবির নাড়ি নক্ষত্র ঘাঁটতে ঘাঁটতে বছর তিনেক কাটিয়ে দেওয়া আর কি। আমাদের কথাবার্তা যখন বেশ সহজ তালে এগোচ্ছে তখন হঠাৎ সুরটা কেটে গেল ওর নির্লজ্জ হাসিতে। ঠেস দিয়ে ও বলে উঠল—'আমাদের এখানে কবি বা কবিতা—কোনটারই প্রয়োজন নেই। এর চাইতে আপনি যদি কৃষিবিদ্যা বা ইনিজিনিয়ারিং বা নিদেন পক্ষে ডাক্তারিটাও শিখে আসতেন, তাহলে আমাদের খুব উপকার হত।'

সত্যি বলছি মশাইরা, আপনাদের কাছে গোপন করব না, ওর কথা শুনে আমার হাড়পিত্তি জ্বলে গেল। এমনভাবে 'আমাদের' বলল যেন এটা ওর গ্রাম আর আমি বাইরের লোক। আসলে ওই তো বাইরের লোক। আবার সেই ভুবনমোহিনী হাসি, বলল—'আমার কথায় কিছু মনে করবেন না। আমরা চাষাভুষো লোক, সবার আগে নিজেদের দরকারের কথাই মনে হয়।' ওর চোখের তারার ঝিলিক আর স্মিত হাসির বিভায় মুখের কাঠিন্য সরে গেল। ও আবার প্রসন্ন হয়ে বলল—'অবশ্যই আমাদের দেশটাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সব রকমের জ্ঞানেরই প্রয়োজন আছে।'

ওর কথার কোন জবাব দিলুম না কারণ তখন আমার মনে একগাদা প্রশ্ন ভিড় করে আছে। এ লোকটা কে? কী চায়? কোথা থেকে এসে আস্তানা গেড়েছে আমাদের গাঁয়ে? আস্তে আস্তে সব জানতে হবে, তাড়াহুড়োর কিছু নেই। আমার ভাবনার স্রোত থামিয়ে দিয়ে ও আবার কথা শুরু করল—'এই গাঁয়ের লোকজন বেশ ভালো আর মিশুকে। জীবন এখানে সরল সহৃদয়।' আমিও ভদ্রতা করে বললুম—'সবাই তো আপনার খুব প্রশংসা করে। বিশেষ করে আমার দাদুতো আপনার প্রশংসায় পঞ্চমুখ।'

আমার কথায় ও খুব জোরে হেসে উঠলো কথাটা ওর মনে ধরেছে। বোধহয় দাদুর সঙ্গে ওর সাক্ষাতের কথা মনে পড়ে গেল। হাসি থামিয়ে বলল—'আপনার দাদুর মত লোক হয় না। এরকম মানুষ আজকাল খুব একটা দেখা যায় না। দেখুন নব্বই-এর কোঠায় বয়েস অথচ কীরকম ঋজু, একটাও দাঁত পড়ে নি, চোখের জ্যোতি অম্লান। এখনো কী অনায়াসে গাধার পিঠে লাফিয়ে চড়ে বসেন। রোজ ভোর বেলায় দেখি গট গট করে সটান মসজিদে চলে যান নিজের বাড়ি থেকে। এরকম লোক আর কোথায় পাবেন।' মুস্তাফার কথায় বিন্দুমাত্রও শ্লেষের চিহ্ন নেই, বরং প্রশংসার সুর। অবশ্য হবে নাই বা কেন, দাদুকে দেখলে সত্যিই অবাক হতে হয়।

লোকটার সম্পর্কে কিছু জেনে ওঠার আগেই পাছে সরে পড়ে সেই ভয়ে তাড়াতাড়ি শুধোলুম—'আপনি কি খার্তুম থেকে এসেছেন?' আসলে আমি আর কৌতূহল চাপতে পারছিলুম না। তাই আগাপাছা বিচার না করেই কথাটা জিজ্ঞেস করা হয়ে গেল।

আমার প্রশ্নে ও একটু বিব্রত বোধ করল। মুখের উপরে একটা বিরক্তির ছায়া এসেই আবার মিলিয়ে গেল। নিজেকে সামলে নিয়ে বলল 'খার্তুমের কাছে, শহরতলিতে আমি থাকতাম। খার্তুমই বলতে পারেন।' ও খানিক্ষণ যেন কী ভাবল। হয়ত একটা ধন্ধে পড়ে গেল, আমায় সব কথা বলা সমীচীন হবে কি না তাই ভেবে। তারপর যেন আবার ওর মুখে হাসি ফুটল, সেই রহস্যময় হাসি। আমার চোখ চোখে রেখে বলল—

'খার্তুমে আমার একটা ব্যবসা ছিল। নানা কারণে আমি ঠিক করলাম এবার চাষবাস করব। সারা জীবন স্বপ্ন দেখতাম এরকম জায়গায় এসে বাসা বাঁধব, জীবনটা কাটাব। কেন—তা জানি না। একদিন কিছু না ভেবেই ষ্টিমারে চেপে বসলাম। এই গ্রামের ঘাটে এসে যখন ষ্টিমার ভিড়ল তখন আমার জায়গাটা বেশ পছন্দ হয়ে গেল। আমার ভিতর থেকে কে যেন বলে উঠলো—এই তো সেই জায়গা। আমি ষ্টিমার থেকে নেমে পড়লাম। তারপরের কাহিনী তো সবার জানা। তবে এটা সত্যি, এই গাঁয়ের মানুষজন বা নিসর্গ আমাকে হতাশ করে নি।'

এরপর কথাবার্তা আর তেমন জমল না। একটু পরেই ও মাঠে যাবার নাম করে উঠে পড়ল। যাবার সময় আমাকে দুদিন পর ওর বাড়ি রাতে খাওয়ার নেমন্তন্ন করে গেল। আমি ওকে এগিয়ে দিতে সদর দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিতে গেলুম। বিদায় নেবার আগে এক গাল রহস্যময় হাসি হেসে সে বলল—'গোপন কথাটা কেবল আপনার দাদুরই জানা আছে।'

গোপন কথা আবার কি? আমার দাদু কোন গোপন কথাটথা জানেন না। কিন্তু কথাটা ওকে বলা হল না, তার আগেই ও হন হনিয়ে মাঠের দিকে চলে গেল। ওর ঋজু শরীরটা আস্তে আস্তে দূরে মিলিয়ে গেল।

মুস্তাফার বাড়ি গিয়ে দেখি সেখানে আরো অনেকে হাজিব। আমার আব্বা, মাহ্‌জুব, ওম্‌দা, দোকানদার সাঈদ। খেতে বসে নানান রকম গল্পে আসর একদম জমজমাট। কিন্তু এই আসরে মুস্তাফা বেশ চুপচাপ। আমাদের কথার মধ্যে একটা হুঁ হাঁ করে পাশ কাটিয়ে যাচ্ছে। আস্তে আস্তে আমারও উৎসাহ হারিয়ে যাচ্ছিল। মুস্তাফার বাড়িটা গ্রামের আর পাঁচজন সম্পন্ন গৃহস্থের বাড়ির মতন দুটো ভাগে ভাগ করা। একটা জেনানা মহল অন্যটা পুরুষ মহল। বাইরের লোকজনের বসার ঘরটাও বার বাড়িতে। বৈঠকখানার ডান দিকে একটা ঘর ঠিক অন্য ঘরগুলোর মত নয়। লাল ইঁটের দেওয়াল, সবুজ জানলাওয়ালা চৌকো একটা ঘর, ছাতটা তিনকোনা, ষাঁড়ের পিঠের মত অনেকটা।

আমি আর মাহ্‌জুব সবার কাছ থেকে বিদায় নিলুম। পথে মাহ্‌জুবকে জিজ্ঞেস করেও মুস্তাফা সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা গেল না। ও শুধু বলল—'মুস্তাফা গভীর জলের মাছ।'

মুস্তাফার বাড়ি নেমন্তন্ন খাওয়ার পর প্রায় দু মাস কেটে গেছে। শুয়ে বসে বেশ আলস্যেই দিন কাটাচ্ছি। এর মধ্যে বার কয়েক মুস্তাফার সঙ্গে দেখা হয়েছে এখানে সেখানে। তবে কথাবার্তা তেমন হয় নি। মাহ্‌জুব একদিন আমাকে ওদের কৃষিপ্রকল্পের মিটিং-এ নিয়ে গেল। মাহ্‌জুবের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব খুব ছোটবেলা থেকেই, আর ও এই কমিটির প্রেসিডেন্ট। সভায় গিয়ে দেখি মুস্তাফাও সেখানে হাজির। সেও এই কমিটির সদস্য। সভার সেদিনের

আলোচনার বিষয় ছিল খেতের জলবণ্টন ব্যবস্থা। গ্রামের কেউ কেউ নির্ধারিত সময়ের আগেই তাদের জমিতে জল ছেড়ে দেওয়ায় অন্যরা যথেষ্ট পরিমাণে জল পাচ্ছে না। অভিযুক্তদের মধ্যে কয়েকজন কমিটি মেম্বারও আছে। আলোচনাটা ক্রমশ বেশ গরম হতে হতে যখন তুমুল ঝগড়ায় পরিণত হয়েছে তখন মুস্তাফা হঠাৎ উঠে দাঁড়াল আর সঙ্গে সঙ্গে সব চেঁচামেচি গণ্ডগোল থেমে গেল। দেখি সবাই তার কথা বেশ মন দিয়ে শুনছে। মুস্তাফা থেমে থেমে পরিষ্কার করে সভাকে উদ্দেশ্য করে বলল—'আপনারা সবাই যদি নিয়ম না মানেন তাহলে আমাদের জলবণ্টন প্রকল্পটাই মাটি হয়ে যাবে। যাঁরা এই কমিটির সদস্য তাদের উপর নিয়মমানার দায়টা অন্যদের থেকে বেশি, কারণ সাধারণ মানুষ তো তাদের দৃষ্টান্তই অনুসরণ করবে।' ওর কথায় সবাই চুপ। যারা অভিযোগ করেছিল তারা তো বটেই, এমন কি যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ তারাও।

মুস্তাফা যে সাধারণের থেকে অন্যরকম একজন সে বিষয়ে আমার আর কোন সংশয় রইল না। যোগ্যতায় ওরই প্রেসিডেন্ট হওয়া উচিত ছিল। হয়ত স্থানীয় লোক নয় বলে ওকে করা হয় নি।

এই মিটিং-এর হপ্তাখানেক পরে এমন একটা ঘটনা ঘটল যে আমি একদম তাজ্জব বনে গেলাম। সেদিন মাহ্‌জুব আমাকে গ্রামের শুঁড়িখানায় দুপাত্তর খাওয়ার জন্য ডেকে নিয়ে গেল। আমরা বেশ কয়েক পাত্তরা চড়িয়ে যখন গল্পে মশগুল তখন সেখানে হঠাৎ মুস্তাফা এসে হাজির। গ্রামের কৃষি প্রকল্প নিয়ে মাহ্‌জুবের সঙ্গে ওর কী সব দরকারি আলোচনা ছিল। তাকে বসতে বলায় প্রথমে ইতস্তত করছিল। তারপর মাহ্‌জুবের পীড়াপীড়িতে রাজি হল। লক্ষ্য করলুম মাহ্‌জুবের জোরাজুরিতে ও একটু ভুরু কুঁচকালো তারপর আবার সহজ হয়ে আমাদের আড্ডায় বসে পড়ল।

মাহ্‌জুব তার দিকে এক পাত্তর এগিয়ে দিতে ও আবার আপত্তি করল। কিন্তু মাহ্‌জুবের সঙ্গে পেরে ওঠা দুষ্কর। তাই ও পাত্তরটায় একটা চুমুক দিয়ে সরিয়ে রাখল। তারপর আবার কী ভেবে, মাহ্‌জুবের দিব্যির ভয়ে, না নাচার হয়ে এক চুমুকে পাত্তরটা খালি করে দিল। ভাবলুম মাহ্‌জুবকে নিরস্ত করি কারণ ওর অনীহা বেশ বোঝা যাচ্ছিল, কিন্তু কী ভেবে নিজেকে নিরস্ত করলুম। প্রথম পাত্তরটা শেষ করার সময় মুখটা এমন করলো যেন কেউ ওকে জোর করে তেতো ওষুধ গেলাচ্ছে। তারপর দ্বিতীয়টা শেষ করে যখন তিন নম্বর পাত্রটায় চুমুক দিচ্ছে তখন ওর চোখ মুখের কাঠিন্য দ্রবীভূত হয়ে যাচ্ছিল লাবণ্যে। মনে হচ্ছিল ও শরাবটা বেশ উপভোগ করছে। ক্রমশ পানের মাত্রা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ওর চোখ দুটো যেন হারিয়ে গেল অন্য কোন দূরের জগতে। এখন আর তাকে সাধাসাধি করার দরকার হচ্ছেনা। একটা পাত্র শেষ করে আরেকটার জন্য হাত বাড়িয়ে দিচ্ছে। অবশ্য মাহ্‌জুবের দিব্যি গালাও সমানে চলছে। পঞ্চম পাত্রটা যখন এলো তখন ও সেটা দুহাতে ধরে সামনে পা ছড়িয়ে গা এলিয়ে দিল। শিবনেত্র হয়ে রইল কিছুক্ষণ, তারপর পরিষ্কার সাহেবি উচ্চারণে একটা ইংরাজি কবিতা আবৃত্তি করল। কবিতাটা অনেকদিন পরে একটা সংকলনে পড়েছিলাম। সেটা ছিল প্রথম যুদ্ধের উপর লেখা কবিতার সংকলন। কবিতাটা এই রকম—

Those women of Flanders
Await the lost,
Await the lost who never will leave the harbour
They await the lost When the train will never bring
To the embrace of those women with dead faces
They await the lost, who lie dead in the trenches,
The barricade and the mud,
In the darkness of night,
This is Charing Cross station, the hour's past one,
There was a faint light.
There was a great pain.

কই সে তো ফিরল না।
যুদ্ধ ফেরত সৈনিকের দলে কেউ আর
তাকে খুঁজে পাবে না
তাকে নিয়ে বন্দর ছাড়বে না কোন জাহাজ
আসবে না কোন ট্রেন
ট্রেঞ্চে, ব্যারিকেড, রণাঙ্গনের কর্দমাক্ত
পথপ্রান্তে
তার লাশ পড়ে আছে, তবুও
উষ্ণ চুম্বনের তরে অধীর, মৃতপ্রায় ওষ্ঠ, অধর।
নিশুত রাতের রেলগাড়ি ছেড়ে যায়
চারিং ক্রশ স্টেশন
পড়ে রইল ম্লান আলো আর হাহাকার।
কতদিন কেটে গেল পথ চেয়ে। ফ্ল্যানডার্সের ললনাদের।।

আবৃত্তি শেষ হলে ওর নিজের অজান্তেই বেরিয়ে এলো একটা দীর্ঘশ্বাস। হাতে পানপাত্তরটা তখনো ধরা রয়েছে। ও তখন হারিয়ে গেছে আপন মনের গহনে কোন অজানা জগতে।

মশায়রা, আমি আপনাদের হলপ করে বলতে পারি যে সেই মুহূর্তে কোন দত্যিদানো যদি আমার সামনে মাটি ফুঁড়ে উঠে মুখ দিয়ে লকলকে আগুনের শিখা বের করত তাহলেও বোধহয় আমি এতটা শঙ্কিত হতাম না। আমি যেন একটা দুঃস্বপ্নের ঘোরের মধ্যে রয়েছি। আমার চারপাশে এত লোক, এই শুঁড়িখানা কিছুই সত্যি নয়, সব মায়া। নিজের জায়গায় উঠে দাঁড়িয়ে মুস্তাফাকে চিৎকার করে বললুম কী আবোলতাবোল বকছেন? আমার কথার জবাব না দিয়ে সে উঠে দাঁড়ালো তারপর আমাকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে বেরিয়ে গেল দৃপ্তপদে। একদল গ্রামবাসীর সঙ্গে হৈ হুল্লোড়ে ব্যস্ত থাকা মাহ্‌জুব আমাদের লক্ষ্যই করল না।

পরদিন মুস্তাফার খেতে গিয়ে দেখি ও একটা লেবু গাছের গোড়ায় মাটি নিড়োচ্ছে। পরণে একটা আধময়লা খাকি হাফপ্যান্ট, গায়ে শস্তা সুতির জামা, মুখে কাদার ছিটে লেগেছে। আমাকে বিনীত অভিবাদন করে বলল—'এই লেবু গাছটার কয়েকটা ডালে গন্ধলেবু আর

অন্য ডালগুলোয় কমলা লেবু হয়।' ইচ্ছে করেই ইংরাজিতে বললুম—'বাঃ বেশ মজার ব্যাপার তো।'

আমার কথা শুনে চমকে উঠল, বলল—'কী বললেন?' আমি আবার ইংরাজিতেই বললুম—'বাঃ বেশ মজার ব্যাপার তো।' আমার উত্তরে ও হা হা করে হেসে উঠলো। আমাকে বিদ্রূপ করে বলল—'মশাই কি অনেকদিন ইংলণ্ডে থেকে আরবি ভুলে গেলেন? নাকি ভাবলেন আমরা সবাই ইংরেজ বনে গেছি!' আমি ওকে মনে করিয়ে দেবার চেষ্টা করলুম—'কাল রাতে তো বেশ ইংরাজি কবিতা আওড়াচ্ছিলে।' ও কোন জবাব না দিয়ে নিজের কাজ করে যেতে লাগল। জবাব না পেয়ে আমার মেজাজটা চড়ে গেল, ধমকে বললুম—'যা সেজে আছেন তা যে আপনি নন তা বুঝতে অসুবিধে হয় না। তা এবার আসল পরিচয়টা জানালে ভালো হয় না কি?' ও এ কথারও কোন জবাব দিল না। নিজের কাজেই মগ্ন রইল। তারপর হাত ঝাড়তে ঝাড়তে বলল—'মাতালের কথায় কান দেন কেন? কাল রাতে আমি কিছু আপনাকে বলে থাকলে জানবেন তা মাতালের প্রলাপ মাত্র। এর কোন গুরুত্ব নেই। এই যে আপনার সামনে দাঁড়িয়ে আছি, গাঁয়ের সবাই আমাকে যা জানে তার বাইরে আমি কিছু না। সত্যি আমার লুকোনোর কিছু নেই।'

সেদিন বাড়ি ফেরার পথে মুস্তাফার কথা ভাবছিলুম। ওর পিছনে যে একটা কোন কাহিনী আছে আর সেটা ও প্রকাশ করতে চাইছে না, সে ব্যাপারে আমি নিঃসন্দেহ। সেদিন রাতে শুঁড়িখানার ঘটনা আমি ভুলি নি। আমার কান আমাকে প্রতারণা করে নি। স্পষ্ট শুনেছি ওর ইংরাজি কবিতা আবৃত্তি। সে রাতে আমি মাতালও হইনি, ঘুমিয়েও পড়ি নি। দুহাতে পানপাত্রটা নিয়ে গা এলিয়ে পা দুটো সামনে টান টান করা ওর চেহারাটা এখনো আমার চোখে ভাসছে। একবার ভাবলুম আব্বাকে ব্যাপারটা বলি, আবার ভাবলুম মাহ্‌জুবকে বলি। লোকটা কি খুন খারাবি করে গা ঢাকা দিয়েছে? না কি অন্য কোন ধান্ধা আছে? আমাদের গাঁয়ে ওর কীই বা ধান্ধা থাকবে! লোকটার কি স্মৃতিভ্রংশ হয়েছে? শুনেছি কেউ কেউ বড় রকমের দুর্ঘটনার পর স্মৃতিভ্রংশতায় ভোগে। এই সব সাত পাঁচ ভাবতে ভাবতে ঠিক করলাম কাউকে কিছুই বলার দরকার নেই। দিন দুই তিন অপেক্ষা করাই যাক তারপর ও যদি কিছু না জানাতে চায় তখন একটা ব্যবস্থা নিলেই হবে।

আমাকে অবশ্য খুব একটা অপেক্ষা করতে হল না। সেদিনই সন্ধে বেলায় মুস্তাফা আমার সঙ্গে দেখা করতে এলো। আমি তখন আব্বা আর ভাইদের সঙ্গে গপ্পো করছিলুম। ও আমার সঙ্গে আলাদা কথা বলতে চাইছে শুনে আমি ওকে নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলাম। রাস্তায় এসে ও বলল—'কাল সন্ধেবেলায় একটু আসবেন আমার বাড়ি? আপনার সঙ্গে একটু নিরিবিলি আলাপ করা যাবে।' সম্মতি জানিয়ে বাড়ি ফিরতেই আব্বা জানতে চাইলেন—'মুস্তাফা কী চায়?' সত্য গোপন করে বললুম—'ওর খার্তুমের জমি জিরেত নিয়ে কীসব ঝামেলা হয়েছে, সে ব্যাপারে আমার পরামর্শ চায়।'

পরের দিন সন্ধের মুখে ওর বাড়ি গিয়ে দেখি ও একাই রয়েছে, সামনে চায়ের পট। আমাকে চায়ের কথা জিজ্ঞেস করায় অসম্মতি জানালুম মাথা নেড়ে। তখন কৌতূহলে আমি

প্রায় ফাটব ফাটব করছি। ও আমার দিকে একটা সিগারেট বাড়িয়ে দিল, সেটা নিয়ে ধরিয়ে ফেললাম। ভাবছি ও বোধহয় সত্যি কথাটা এবার জানাবে।

আমি অধীর অপেক্ষায় বসে আছি ওর কথা শুনব বলে আর ও একমনে সিগারেট টেনে চলেছে, কী যেন ভাবছে। শান্ত মুখে দৃঢ়তার ছাপ। নাঃ এই লোক আর যাইহোক খুনি নয়—হিংস্রতা মানুষের মুখে এমন একটা চিহ্ন রেখে যায় যা নজর এড়ায় না। স্মৃতিভ্রংশ হলেও হতে পারে। অবশেষে ও যখন কথা বলা শুরু করল তখন ওর চোখের তারায় ঝিলিক খেলে গেল বিদ্যুতের মতন।

'আমি আপনাকে এখন যে কথাগুলো বলব সে সব কথা এর আগে কাউকে বলি নি, কারণ এর আগে তার দরকার পড়ে নি। আপনি কাব্যচর্চা করেছেন, আপনার কল্পনা যাতে পাখা না মেলে তাই ঠিক করেছি সব কিছুই আপনাকে খুলে বলব।' ওর কথার খোঁচাটুকু নীরবে হজম করলাম। ও অবশ্য মিষ্টি করে হেসে খোঁচাটুকু মোলায়েম করার চেষ্টা করল। তারপর আবার শুরু করল—

'আমি ভেবেছিলাম আপনি হয়ত সারা গ্রামে চাউর করে দেবেন যে এই লোকটাকে তোমরা সবাই যেরকম দেখছ, ও আদৌ সেরকম নয়। সেটা অবশ্য আমার এবং তাদের বিড়ম্বনার কারণ হত। আপনার কাছে একটাই অনুরোধ, যা আমার কাছে আজ শুনবেন তা ঘুণাক্ষরেও প্রকাশ করবেন না। আপনাকে কথা দিতে হবে—আপনার উপর আমার দিব্যি রইল।'

আমি জবাব দিলুম—'সেটা নির্ভর করবে আপনি কী কথা বলবেন তার উপর। দেখুন আপনাকে আমি ভালো করে চিনি না, জানি না, আপনাকে আমি কথা দিই কেমন করে।'

'আপনাকে দিব্যি দিয়ে বলতে পারি যে আমি এখন আপনাকে যা বলব তার সঙ্গে এই গ্রামের কোন যোগ নেই। আমি শান্তিপ্রিয়, স্থির বুদ্ধির মানুষ। আর সত্যিই আমি এই গ্রামের আর গ্রামবাসীদের মঙ্গলই চাই।

সত্যি বলছি মশাইরা, আপনাদের কাছে কিছু লুকোব না, আমি কিন্তু এসব শুনে ইতস্তত করছিলাম। এদিকে ওর গল্পটা শোনার আগ্রহটাও তীব্রতর হচ্ছিল। তাই ওর কথা মত দিব্যি গেলে প্রতিজ্ঞা করলুম। ও তখন এক তাড়া কাগজ আমার দিকে এগিয়ে দিল। তাড়াটা খুলে দেখি পয়লা কাগজটা ওর বার্থ সার্টিফিকেট। লেখা রয়েছে: মুস্তাফা সঈদ, জন্ম ১৬ই আগস্ট, ১৯০৮, খার্তুম, পিতা-সঈদ ওথকান (প্রয়াত), মাতা-ফতিমা আবদুসসাদেক। তারপর বেরল একটা পাশপোর্ট, তাতে নামধাম জন্মের স্থান, তারিখ, বার্থ সার্টিফিকেটে যা লেখা তাই তবে পেশা লেখা রয়েছে 'ছাত্র'। পাশপোর্ট জারি করার তারিখ—১৯১৬, কায়রো আর নবীকরণের তারিখ-১৯২৬ লন্ডন। কাগজের তাড়াটার মধ্যে থেকে আর একটা পাশপোর্ট বেরল। বৃটিশ পাশপোর্ট, জারির তারিখ ১৯২৯, লনডন। এই পাশপোর্টের পাতায় নানা দেশের শিলমোহর: ফ্রান্স, জার্মানি, চিন, ডেনমার্ক। এসব দেখে আমার চক্ষু চড়কগাছ। পাতা ওল্টানো বন্ধ করলুম। উত্তেজনায় তখন আমি কাঁপছি। ও কিন্তু নির্বিকার সিগারেটে টান দিয়ে চলেছে। অনেকক্ষণ পর ও সিগারেটটা যখন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে তখন ওর চটকা ভাঙল। আমার দিকে ফিরে বলল—

'সে এক লম্বা কাহিনী, তবে সব কথা আপনাকে বলছি না। কিছু খুঁটিনাটি ব্যাপার আপনার ধৈর্যচ্যুতির কারণ হতে পারে, আবার অন্যান্য ব্যাপারগুলো....। দেখলেন তো আমার জন্ম খার্তুমে আর শৈশবেই আমি পিতৃহীন। আমার জন্মের কয়েকমাস আগেই আব্বার এন্তেকাল হয়েছে। ওনার ছিল উট বেচাকেনার ব্যবসা। মৃত্যুর সময় সামান্য যা টাকাপয়সা রেখে গিয়েছিলেন তাতেই আমার আর মায়ের কোন রকমে চলে যেত। ও, আপনাকে তো বলা হয় নি, আমার আর কোন ভাইবোন ছিল না। তাই আমাদের মায়ে পো-এর সংসারে তেমন অনটন ছিল না। চোখ বুঁজলে মায়ের মুখটা এখনো অবিকল দেখতে পাই—পাতলা দুটো ঠোঁট কোন অটল সংকল্পে দৃঢ়, মুখের উপর যেন একটা মুখোস, কেমন তা আপনাকে বোঝাতে পারব না। একটা পুরু মুখোস অনেকটা সমুদ্রের জলের উপরিতলের মত। আপনি কি ঠিক বুঝতে পারলেন? সেই মুখোসটার বিশেষ কোন রঙ নেই—অনেকগুলো রঙ, কখনো একসঙ্গে আবার কখনো আলাদা আলাদা লুকোচুরি খেলে। আমাদের কোন আত্মীয়স্বজন ছিল না। আমরাই ছিলাম একজন অন্যজনের আত্মীয়। আমার মা যেন এক পথে চলা অচেনা মানুষ আর ঘটনাচক্রে তাঁর সঙ্গে আমি জুড়ে গিয়েছি। হয়ত আমিই ছিলাম একটা অদ্ভুত জীব কিংবা তিনি--ঠিক বলতে পারছি না। আমাদের মধ্যে কথাবার্তা খুব একটা হত না। আপনি শুনলে বোধহয় একটু অবাক হবেন, একা একা ছাড়া গরুর মত ঘুরে বেড়াতে আমার খুব মজা লাগত, আমি ছিলাম সম্পূর্ণ স্বাধীন। আমাকে এক জায়গায় খুঁটোয় বেঁধে রাখার মত কেউ ছিল না— না বাবা, না মা। আমি নিজের ইচ্ছেয় পড়তুম, ঘুমোতুম আবার যখন খুশি রাস্তার ছেলেদের সঙ্গে খেলা করে বেড়াতুম—আমাকে বাধা দেবার বা শাসন করার মত কেউ নেই। সেই ছেলেবেলা থেকেই কেন জানি না আমার মনে হত আমি আর পাঁচটা ছেলের মত নয়, একটু অন্যরকম। কোন কিছুতেই বিচলিত হই না, মার খেয়ে কাঁদি না, মক্তবের মাষ্টার ভালো বললে খুশি হই না—আমার কিছুতেই কিছু এসে যায় না। আমি অনেকটা গোল রবারের বলের মত, জলে ফেললে ভেজে না, ছুঁড়ে ফেললে লাফিয়ে ফেরত আসে। এরকম সময়ে আমাদের ওখানে একটা ইস্কুল তৈরী হল। আমার বেশ মনে আছে, প্রথমদিকে গ্রামের লোকজন বা উপজাতীয়রা ইস্কুলের নাম শুনলেই পালাত। মাঝে মাঝে গভরমেন্টের শিক্ষা দফতরের অফিসারেরা আসত গ্রামের লোকজনদের বোঝানোর জন্যে। কিন্তু অফিসারদের দেখলেই সবাই তাদের ছেলেপিলেদের লুকিয়ে রাখত যাতে তারা অফিসারদের চোখে না পড়ে। সবারই ইস্কুল সম্পর্কে একটা ভীতি ছিল। ওরা ভাবত ইস্কুলগুলো সব শয়তানের কারখানা, আর এই শয়তানগুলো তাদের জীবনে যত রাজ্যের অমঙ্গল ডেকে আনবে। একদিন আমাদের বাড়ির সামনের রাস্তায় পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে খেলছি এমন সময় সেখানে ঘোড়ায় চড়ে হাজির হল এক উর্দিপরা অফিসার। ঘোড়াটা এসে দাঁড়াল আমাদের সামনে। তাকে দেখে যে যেদিকে পারল পালাল শুধু আমিই সেখানে দাঁড়িয়ে রইলাম। কাছে এসে উনি আমার নাম ধাম জানতে চাইলেন। আমার নির্ভীক জবাবে মনে হল উনি সন্তুষ্ট হলেন, জিজ্ঞেস করলেন আমার বয়স কত। আমি বললাম, 'জানি নে।' উনি আর কথা না বাড়িয়ে সোজাসুজি জিজ্ঞেস করলেন—'ইস্কুলে পড়বে?' আমি অবশ্য

জানতাম না ইস্কুল ব্যাপারটা ঠিক কী, তাই উল্টে জিজ্ঞেস করলাম,—'ইস্কুল আবার কী?' আমার প্রশ্নে উর্দিওয়ালা বেশ মজা পেয়ে হাসতে হাসতে বললেন—'নীল নদের ধারে সুন্দর বাগান ঘেরা পাথরের তৈরী বিরাট বাড়ি। ঘণ্টা বাজবে আর তুমি অন্য সব ছেলেদের সঙ্গে গিয়ে বসবে ক্লাশঘরে, পড়তে শিখবে, লিখতে শিখবে, অঙ্ক কষতে শিখবে, আরো কত কী শিখবে!' জানতে চাইলাম,—'আমি বড় হয়ে আপনার মত পাগড়ি পরব?' উনি এবার ঘোড়া থেকে নেমে বললেন 'এটাকে বলে হ্যাট'। এই বলে সেই 'হ্যাট' আমার মাথায় পরিয়ে দিলেন, আমার চোখমুখ সব ঢেকে গেল। লোকটা আবার বলল, —'বড় হয়ে ইস্কুলের পড়া শেষ করে যখন গভরমেন্টের অফিসার হবে তখন তুমিও এরকম 'হ্যাট' পরবে।' আমি সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে বললাম—'আমি ইস্কুলে পড়ব।' আমার কথায় সন্তুষ্ট হয়ে লোকটা আমাকে ওঁর ঘোড়ায় তুলে নিলেন। কিছুক্ষণ পরে আমরা পৌঁছে গেলাম নদীর ধারে একটা বিরাট পাথরের বাড়িতে। লোকটা ঠিকই বলেছিলেন—বাড়িটার চারপাশে বেশ সুন্দর ফুলের বাগান, বড় বড় গাছ। লোকটা আমাকে নিয়ে গেল একজন দাড়িওয়ালা সাদা জোব্বা পরা লোকের কাছে। তিনি আমার পিঠ চাপড়ে জিজ্ঞেস করলেন—'তোমার বাবা কোথায়?' বললাম—'আজ্ঞে আমার বাবা নেই।' উনি জানতে চাইলেন—'তোমার অভিভাবক কে?' আমি তার জবাব না দিয়ে বললাম, 'আমি ইস্কুলে পড়ব।' উর্দি লোকটার এবার মনে হয় একটু দয়া হল, একটা জাব্‌দা খাতা বের করে আমার নাম ধাম লিখে আবার জিজ্ঞেস করলেন—'বয়েস কত?' আবার বললাম —'জানি নে। তখনই হঠাৎ ঢঙ ঢঙ করে ঘণ্টা বেজে উঠলো আর আমি এক দৌড়ে একটা ঘরে ঢুকে পড়লাম। আমার পিছন পিছন লোকদুটো এসে আমাকে নিয়ে গিয়ে অন্য একটা ঘরে একপাল ছেলের সঙ্গে বসিয়ে দিল। দুপুরে ইস্কুল ছুটির পর আমার মা আমাকে পাকড়াও করে জানতে চাইলেন সারাদিন কোথায় ছিলাম। সব শোনার পর আমাকে আর কিছু না বললেও তাঁর মুখের প্রসন্নতা দেখে বুঝতে পারলাম আমার আচরণে ওনার প্রচ্ছন্ন সম্মতি রয়েছে। এই মুহূর্তটা আমার জীবনে দারুণ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে রইল কারণ এটাই আমার প্রথম স্বাধীন সিদ্ধান্ত।

'আপনাকে অবশ্য আমার সব কথা বিশ্বাস করতে বলছি না। আপনি-আমার কাহিনী বা আমাকে সন্দেহ করতে পারেন, সব আপনার মর্জি। এসব অনেকদিন আগের কথা। আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন এখন আর এসব কথার তেমন মূল্য নেই। কথাগুলো আমার মনে এলো তাই বলা। জানেনই তো এক কথা বলতে আরো পাঁচ কথা এসে পড়ে।'

'সে যাই হোক আমি এই ইস্কুলের নতুন জীবনে একদম মগ্ন হয়ে গেলাম। অল্পদিনের মধ্যেই আবিষ্কার করলাম, আমি যে কোন বিষয় খুব সহজেই বুঝতে পারি আর মনেও রাখতে পারি। কোন বই একবার পড়লে আর ভুলি না। সব কিছুই আমার মাথায় পাকাপোক্ত হয়ে থেকে যায়। পাটিগণিত নিয়ে বসলে যে কোন অঙ্কের জটিলতা খুব সহজে আমার কাছে আলগা হয়ে আসে, যেমন সহজে জলে নুন ফেললে তা গুলে যায়। হপ্তা দুয়েকের মধ্যে লিখতে শিখলাম তারপর থেকে তরতর করে এগিয়ে চললাম—আমাকে আর ঠেকায় কে! আমার মনটা ধারাল ছুরির ফলার মত সবকিছু বিদ্ধ করতে পারে। শিক্ষকদের পিঠ চাপড়ে

দেওয়া, সহপাঠীদের তারিফ বা ঈর্ষা কিছুই আমাকে তেমন স্পর্শ করে না। শিক্ষকরা আমাকে প্রতিভাধর ভাবতেন, অন্যান্য ছেলেরা আমার বন্ধুত্বের জন্য উদগ্রীব হত। আমি তখন আমার মগজের আশ্চর্য শক্তিতে মশগুল। বরফঠাণ্ডা মাঠের মত ঠাণ্ডা আমার অন্তর, দুনিয়ার কোন কিছুই আর আমাকে নাড়া দেয় না।'

'মাত্র দুবছরেই প্রাথমিক স্তরের পাঠ শেষ করে আমি ভর্তি হলাম মধ্যবর্তী স্তরে আর আবিষ্কার করতে লাগলাম একটার পর একটা রহস্যময় বিষয়। এই সব বিষয়ের একটা ছিল ইংরাজি ভাষা। আমি তখন সামনে যা পাচ্ছি শিখে ফেলছি অবলীলায়। ভিজে মাটিতে লাঙলের ফলা যেমন অনায়াসে চষে যায় আমার মগজও তেমনি অনায়াসে সমস্ত পাঠ্যবিষয়গুলো আয়ত্ত করে ফেলছে। বাক্য, শব্দবন্ধ আমার কাছে গাণিতিক সমীকরণের মত সরল, বীজগণিত জ্যামিতি কবিতার মত ছন্দোময়। ভূগোল পড়ার সময় দুনিয়াটাকে মনে হত একটা দাবার ছক। সেই সময়ে এই মধ্যবর্তী স্তরের পরে আর পড়াশুনা করার সুযোগ ছিল না। এই ইস্কুলে তিন বছর পড়াশুনো করার পর আমাদের হেডমাষ্টারমশাই একদিন আমাকে ডেকে বললেন—'তোমাকে আর কিছু শেখানোর শক্তি আমাদের নেই। এ দেশে তোমার মত মেধাবী ছাত্রের আর পড়াশুনো করার সুযোগ নেই। তুমি বরং বিদেশে চলে যাও। মিশর, লেবানান কিংবা ইংল্যাণ্ড—তোমার যেখানে ইচ্ছে যেতে পার। আমি কোনো কিছু না ভেবেই সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে বললাম—'আমি কায়রো যেতে চাই।' হেডমাষ্টারমশায় নানা জায়গায় চিঠিপত্র লিখে আমার জন্যে একটা সরকারি বৃত্তি আর কায়রোয় একটা মাধ্যমিক ইস্কুলে ভর্তির ব্যবস্থা করে দিলেন। ইস্কুলে আমার কোন বেতন লাগবে না। আমি লক্ষ্য করেছি, আমার জীবনে যখনই কোন ঠেকায় পড়েছি তখনই কোন না কোন নিঃস্বার্থ সাহায্য পেয়েছি। কিন্তু তাঁদের প্রতি আমার কোন আলাদা দরদ বা কৃতজ্ঞতা ছিল না। আমার ভাবখানা এমন যেন আমাকে সাহায্য করে তাঁরা বর্তে গেছেন।

'হেডমাষ্টারমশাই আমাকে যখন জানালেন, কায়রো যাবার সব ব্যবস্থা পাকা হয়ে গেছে তখন আমার মায়ের কাছে কথাটা পাড়লাম। সব কিছু শোনার পরেও তিনি নির্বিকার। মুখের সেই পুরু মুখোসটা যেন আরো আঁটোসাটো হল। শুধু একবার এক লহমার জন্যে তাঁর পাতলা ঠোঁটদুটো যেন একটু ফাঁক হল আর একটা পাতলা হাসি খেলে গেল। তারপর উনি উঠে পাশের ঘরে চলে গেলেন আর যখন ফিরে এলেন তখন দেখি হাতে একটা পয়সার থলি। থলিটা আমার হাত দিয়ে বললেন—"তোমার বাবা আজ বেঁচে থাকলে তুমি যে পথ বেছে নিয়েছ তাতে অসম্মত হতেন না। তোমার যা মরজি তাই করবে। ইচ্ছে হলে থাক, না হলে চলে যাও। তোমার জীবন, সেটা নিয়ে তুমি কী করবে তা তোমার ব্যাপার। এই থলিতে সামান্য কিছু টাকা পয়সা আছে, তোমার কাজে আসবে।' ব্যাস্! এই আমাদের বিদায় অনুষ্ঠান। কোন অশ্রুমোচন নেই, আবেগমথিত চুম্বন নেই, নেই কোন আলিঙ্গন বা প্রলাপোক্তি। দুটো মানুষ যেন কিছুদিন এক রাস্তায় হাঁটার পর যে যার পথে চলে গেল। সেই আমাদের শেষ দেখা, শেষ সংলাপ। এই ঘটনার অনেক পরে আমি তাঁর কথা ভেবে কত কেঁদেছি নানা বিচিত্র অভিজ্ঞতার মুহূর্তে। কিন্তু সেই বিদায় বেলায় আমার কোন কষ্টও হয়নি, চোখে জলও

আসে নি। একটা সুটকেসে আমার সামান্য জামাকাপড় যা ছিল তা গুছিয়ে নিয়ে আমি ট্রেনে চড়ে বসলাম। কেউ তুলে দিতে আসেনি স্টেশনে, আমার বিদায় ব্যথায় কেউ কাঁদেনি। ট্রেনটা মরুভূমির মধ্যে দিয়ে চলতে শুরু করল। মনে হচ্ছিল ফেলে আসা শহরটা যেন একটা পাহাড়, যেখানে আমি তাঁবু ফেলে রাত কাটিয়েছি আর সকাল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁবুটাবু গুটিয়ে একটা উটের পিঠে চাপিয়ে ফের রওনা হয়েছি। ট্রেনটা ওয়াদি হলফায় পৌঁছল। আমার মন জুড়ে তখন কায়রোর চিন্তা। কায়রো যেন আর একটা বড় পাহাড় যেখানে দু এক রাত কাটিয়ে আমি আবার রওনা হব নতুন কোন গন্তব্যে।

'ট্রেনে আমার সামনে বসেছিলেন পাদ্রীর পোষাক পরা এক ভদ্রলোক, গলায় ঝোলানো একটা বড় সোনার ক্রুশ। ভদ্রলোক আমার সঙ্গে ইংরাজিতে গপ্পো জুড়ে দিলেন। আমিও সমানে তাল দিয়ে চললাম। বুঝতে পারছিলাম উনি আমার কথাবার্তায় বেশ অবাক হচ্ছেন। উনি হঠাৎ আমাকে জিজ্ঞেস করলেন—'তোমার বয়েস কত?' পাছে উনি অবিশ্বাস করেন সেই ভয়ে বয়েসটা বছর তিনেক বাড়িয়ে বললাম—'পনেরো।' ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার সংলাপটা হল এই রকম—

"কোথায় চললে?"

"আজ্ঞে কায়রো, মাধ্যমিক ইস্কুলে পড়তে।"

"একা?"

"হ্যাঁ। আমি একা চলাই পছন্দ করি। ভয়ের কী আছে?"

এরপর একগাল হেসে ভদ্রলোক যে কথাটা বললেন, সেই সময়ে কথাটাকে খুব একটা পাত্তা দিইনি—"তোমার ইংরাজি বলাটা আশ্চর্যরকম সাবলীল।"

কায়রো পৌঁছে দেখি মি. রবিনসন এবং তাঁর স্ত্রী আমাকে নিতে এসেছেন। আমার খার্তুমের ইস্কুলের হেডমাষ্টার মিঃ ষ্টকওয়েল এঁদের চিঠি দিয়ে আমার আসার কথা জানিয়েছিলেন। ভদ্রলোক আমার করমর্দন করে বললেন—"কেমন আছেন মিঃ সাঈদ?"

"আজ্ঞে ভালো। ধন্যবাদ।" ওঁর স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিতেই দেখি শ্রীমতি আমাকে দুহাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে গালে ঠোঁট চেপে ধরলেন। আমার চারপাশে ষ্টেশনের ভিড়, ব্যস্ততা, কলরব; আমার গলা জড়িয়ে রয়েছে একজন নারীর সুডৌল বাহু, গালে তাঁর ঠোঁটের উষ্ণ স্পর্শ, নাকে একটা অদ্ভুত শরীরী—ইউরোপীয় গন্ধ, আমার শরীরে তাঁর স্তনের নরম চাপ—সব মিলিয়ে আমি, একটা বারো বছরের কিশোর এমন এক অবশ করা আবেশে ডুবে গেলাম, যার অভিজ্ঞতা আগে কখনো হয় নি। এই আমার কায়রো, একটা বিরাট পাহাড় যেখানে আমার উটটা আমাকে নিয়ে এসেছে, একজন ইউরোপীয় মহিলা—ঠিক শ্রীমতি রবিনসনের মতন, যার হাত দুটো আমাকে জড়িয়ে ধরেছে. যার শরীরের গন্ধের সঙ্গে পারফিউমের গন্ধ মিশে আমাকে ভরিয়ে দিচ্ছে একটা অদ্ভুত আবেশে। ওঁর চোখের রঙ কায়রোর রঙের মত—ধূসর সবুজ, রাতের অন্ধকারে যা জোনাকির মত মিটমিটিয়ে জ্বলে। "মিঃ সাঈদ, তোমার মনে রসকস নেই একটুও।"—শ্রীমতি রবিনসন প্রায়ই আমাকে বলতেন। অবশ্য এটাও ঠিক যে হাসি ঠাট্টা আমার তেমন আসে না। উনি মাঝে মাঝেই রসিকতা করে বলতেন—"তুমি

কি এক মুহূর্তের জন্যেও তোমার মেধার কথা ভুলতে পার না।" আরো অনেকদিন পরে ওল্ড বেইলি আদালতে আমার যখন সাত বছরের কারাদণ্ড হল তখন উনি ছাড়া আমার কাছে আর কেউ ছিল না। ওনার বুকে মাথা রেখে যখন আমি ভেঙে পড়েছিলাম তখন উনি আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলেছিলেন—"কেঁদো না সোনা আমার।" রবিনসন দম্পতি নিঃসন্তান। রবিনসন সাহেব আরবি ভাষা খুব ভাল জানতেন আর ইসলাম ধর্ম ও স্থাপত্যে খুব অনুরাগী ছিলেন। ওঁদের সঙ্গে আমিও প্রায়ই যেতাম কায়রোর মসজিদ, মিউজিয়াম দেখতে। কায়রো শহরের আল-আঝহার মসজিদের কাছে একটা কাফেতে তেঁতুলের শরবত খেতে খেতে রবিনসন সাহেব একটার পর একটা আল-মারি-র কবিতা আবৃত্তি করে শোনাতেন। সেই সময়টায় আমি নিজেকে নিয়ে এমন মশগুল ছিলাম যে আমার প্রতি তাঁদের অসীম মমতা এবং ভালোবাসা আমার মনে কোন রেখাপাতই করত না। শ্রীমতি রবিনসন ছিলেন বেশ গোলগাল হাশিখুশি মহিলা, গায়ের উজ্জ্বল তামাটে রঙ কায়রোর সঙ্গে বেশ খাপ খেয়ে যায়। উনি যেন এমন একটা ফ্রেমে বাঁধানো ছবি যেটা দেওয়ালের রঙের সঙ্গে খুব মানানসই। ওঁর বাহুমূলের সোনালী চুলে শিহরণ জাগত আমার সর্বাঙ্গে। আমার এইরকম আকর্ষণের কথা উনি বোধহয় বুঝতেন। তা সত্ত্বেও আমার সঙ্গে অত্যন্ত মধুর ব্যবহার করতেন। ওর স্নেহ ভালোবাসা ছিল জননীর মতন।

আলেকজান্দ্রিয়া বন্দর থেকে জাহাজ ছাড়ার সময় রবিনসন দম্পতি জাহাজঘাটায় এসেছিলেন আমাকে বিদায় দিতে। শ্রীমতি রবিনসন ঘন ঘন চোখ মুছছিলেন রুমাল দিয়ে আবার সেই রুমালটা নাড়ছিলেন। এই দৃশ্যটা আমি জাহাজের ডেক থেকে দেখতে পাচ্ছিলাম অনেক দূর পর্যন্ত। পাশে কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়ানো মিঃ রবিনসনের নীল চোখ দুটোও যেন দেখতে পাচ্ছিলাম। অবশ্য আমার মনে বিষাদের ছিঁটেফোঁটাও ছিল না। আমার তখন একমাত্র চিন্তা কীভাবে লণ্ডন পৌঁছাব—আর একটা পাহাড়, কায়রো থেকেও বড়, এখানে কত রাত যে কাটাতে হবে কে জানে। যদিও আমার বয়েস মাত্র পনেরো, কিন্তু আমাকে দেখতে কুড়ি বছরের তাজা জোয়ান। ইস্কুলের চমকপ্রদ সাফল্য পিছনে রেখে এগিয়ে চলেছি, সঙ্গে রয়েছে আমার একমাত্র অস্ত্র—শানানো ছুরির ফলার মত মগজ আর পাথর কঠিন হৃদয়। একটু একটু করে তটরেখা সরতে সরতে হারিয়ে গেল দিগন্তে। চারপাশে দিগন্তজোড়া সমুদ্রের সঙ্গে একটা অদ্ভুত নৈকট্য অনুভব করলাম। এই বিরাট সবুজ দাগের উথাল পাথাল আমার পাঁজরে। আমি একা, কেউ কোথাও নেই, আমার সামনে পিছনে রয়েছে মহাশূন্য নয়ত অনন্ত—এরকম একটা বোধ পুরো সমুদ্রযাত্রা জুড়ে আমার মনকে আচ্ছন্ন করেছিল, আর আমিও সেই অনুভূতিটা বেশ উপভোগ করছিলাম। সমুদ্র শান্ত থাকলে তার অন্যরকম রূপ, অন্য এক মরীচিকা, প্রতি মুহূর্তে তার রঙের বদল অনেকটা আমার মায়ের মুখোসের মতন। এখানেও এক নীল সুবজ মরুভূমি আমাকে যেন হাতছানি দিয়ে ডাকছে—'আয়, আয়'। এই রহস্যময় হাতছানি আমাকে তাড়িয়ে নিয়ে চলেছে, ডোভার উপকূলে, লণ্ডনে এবং ট্রাজেডিতে।

এর অনেক দিন পরে আমি যখন ওই পথেই ফিরছিলাম তখন ভাবছিলাম যা যা আমার জীবনে ঘটে গেছে তার কোনটাই কি এড়ানো যেত। ধনুকের ছিলা টান টান, এখন তিরটার

সামনে ছিটকে যাওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। এদিক ওদিক দেখছি, চারপাশে ঘন সবুজের সমারোহ, দূরে পাহাড়ের কিনারায় অ্যাঙলো স্যাকসন গ্রাম। বাড়িগুলোর লাল চালা গরুর পিঠের মত ঢালু। স্বচ্ছ কুয়াশার পাতলা চাদরে ঢাকা রয়েছে সমস্ত উপত্যকা। আর রঙের কী বাহার! জায়গাটার গন্ধটাও অদ্ভুত, অনেকটা শ্রীমতি রবিনসনের গায়ের গন্ধের মতন। চরাচর শান্ত, স্নিগ্ধ, মাঝেমধ্যে পাখির ডানা ঝাপটানোর আওয়াজ। বুঝলাম এটা একটা সাজানো জগৎ। বাড়ি, ঘর, রাস্তা, মাঠ সব কিছুই পরিকল্পিত নিয়ন্ত্রিত। ছোট্ট নদী, আপন খেয়ালে এঁকে বেঁকে না চলে কৃত্রিম বাঁধানো পাড়ের ধার দিয়ে বয়ে যাচ্ছে। স্টেশনে ট্রেনগুলো দাঁড়ায়, যাত্রীরা চটপট ওঠানামা করে, আবার গাড়ি ছেড়ে দেয়। কোথাও কোন হট্টগোল নেই, এলোমেলো বিশৃঙ্খলা নেই—সবই সুস্থির, পূর্বনির্ধারিত।

ভাবছিলাম কায়রোর কথা। ওখানে থাকার সময় আমার জীবনে তেমন কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে নি। আমারই এক সহপাঠী প্রথমে আমার প্রেমে পড়েছিল, তারপর আমার কাছ থেকে তেমন সাড়া না পেয়ে ভীষণ চটে গিয়ে বলেছিল—'তুমি মানুষ নও। তুমি একটা হৃদয়হীন যন্ত্র।' কায়রোর পথে পথে অনেক ঘুরে বেড়িয়েছি। থিয়েটার দেখতে গিয়েছি, অপেরা শুনতে গিয়েছি, একবার সাঁতরে নীল নদ পারাপারও করেছি। এ ছাড়া বলার মতন তেমন কিছু ঘটে নি, শুধু আমার শরীরটা আরো সুঠাম ও সবল হয়েছে, ধনুকের ছিলার টানটা একটু বেড়েছে। তিরটা এবার ছিটকে বেরিয়ে যাবে অজানা কোন দিগন্তে।

"ট্রেনটা একটা স্টেশন ছেড়ে চলতে শুরু করল। ইঞ্জিনের ধোঁয়া কুণ্ডলী পাকিয়ে আকাশে উঠে মিলিয়ে যাচ্ছে পাতলা কুয়াশায়। বোধহয় একটু ঝিমুনি এসেছিল। দেখলাম কেন্দ্রীয় মসজিদে নমাজ পড়ছি, হাজার ঝাড়বাতির আলো ঠিকরে পড়ছে মসজিদের লাল পাথরের মেঝেতে, ঝলমলিয়ে উঠছে চারপাশ, আমি একদম একা। একটু যেন ধূপের গন্ধ পেলাম। কায়রো শহরটা শ্রীমতি রবিনসনের মতই প্রাণোচ্ছল। উনি চাইতেন আমি ওনাকে নাম ধরেই ডাকি। কিন্তু আমি এলিজাবেথ না বলে সবসময় ওনাকে শ্রীমতি রবিনসন বলেই ডাকতাম। ওনার কাছ থেকেই আমি উপভোগ করতে শিখেছি বাখ-এর সংগীত, কিটস-এর কবিতা। মার্ক টোয়েনের নাম প্রথম শুনি ওঁর কাছেই। কিন্তু এসব আমাকে তেমন নাড়া দিত না। শ্রীমতি রবিনসন ঠাট্টা করে আমাকে বলতেন, 'তুমি কি তোমার মেধার কথা একটুও ভুলতে পার না?" বিলেত থেকে ফেরার পথে আমি ভাবছিলাম যে যা ঘটে গেছে তার অন্যথা হবার কোন উপায়ই ছিল না। আমার মনে পড়ছে কায়রোর পথে ট্রেনের সহযাত্রী পাদ্রীর কথা—"অন্তিমে আমাদের সবার যাত্রাই সঙ্গীহীন, একক!" বুকে ঝোলা সোনার ক্রশটায় হাত বোলাতে তাঁর সহাস্য মন্তব্য—"তোমার ইংরাজি বলাটা আশ্চর্যরকম সাবলীল।" এখন এই ট্রেনে, লণ্ডনের পথে যে ভাষা আমার কানে আসছে তা আমার ইস্কুলে শেখা ভাষা থেকে একদম আলাদা। এ ভাষার টানই আলাদা, প্রকৃতি—সজীব। আমার মন ধারালো, ঔৎসুক। কিন্তু এই ভাষা আমার নয়। শুধু অধ্যবসায় এবং পরিশ্রমের জোরে আমি এই ভাষায় কথা বলতে শিখেছি। ট্রেনটা আস্তে আস্তে এসে দাঁড়াল ভিক্টোরিয়া স্টেশনে আর সেই সঙ্গে আমাকে পৌঁছে দিল জিন মরিসদের জগতে।

জিন মরিসের সঙ্গে দেখা হওয়ার আগে আমার জীবনে যা কিছু ঘটেছে তা একটা আগামবোধ ; আর তাকে খুন করার পরে যা করেছি তাকে বলা যায় এক ধরনের মার্জনাভিক্ষা, অবশ্য তাকে খুন করার জন্যে নয়, আমার এই মিথ্যা জীবনের জন্যে। আমি তখন একটা পঁচিশ বছরের তরতাজা জোয়ান। চেলসিতে একটা পার্টিতে তাকে প্রথম দেখি। দরজা দিয়ে ঢুকেই একটা লম্বা প্যাসেজের শেষে হলঘর। আমাকে দরজা খুলে দিয়ে একটু ইতস্ত- করছিল। আমার দৃষ্টি ঝাপসা, তাকে মনে হচ্ছিল যেন তপ্ত মরুভূমির মাঝখানে একটা ঝিলমিলে মরীচিকা। আমার তখন উতরোল অবস্থা, হাতে আর্ধেক খালি মদের গেলাস, সঙ্গে দুটো মেয়ে যারা আমার অশ্লীল রসিকতায় হেসে গড়িয়ে পড়ছিল। লম্বা লম্বা পা ফেলে আমাদের সামনে এসে তির্যক ভঙ্গিতে দাঁড়াল। শীতল ঔদ্ধত্য আর বিরক্তি নিয়ে আমার মুখের দিকে চেয়ে রইল কিছুক্ষণ তারপর আমি কিছু বলার আগেই চলে গেল গট গট করে। আমার সঙ্গিনীদের জিজ্ঞেস করলাম—"মাগীটা কে?"

লণ্ডন তখন যুদ্ধের বিভীষিকা আর ভিক্টোরিয়া যুগের দমবদ্ধ করা পরিবেশ একটু একটু করে কাটিয়ে উঠছে। আমি তখন চেলসির পাব, হ্যাম্পস্টেডের ক্লাব আর ব্লুমস্‌বেরির আড্ডাগুলোতে ঘুরে বেড়াচ্ছি। কোথাও কবিতা পড়ছি, কোথাও ধর্ম আর দর্শনের উপর বক্তৃতা দিচ্ছি, কোথাও আলোচনা করছি চিত্রকলা। আবার কোথাও বা আলোচনা করছি প্রাচ্যের আধ্যাত্মিকতা। কোন মহিলাকে বিছানায় নিয়ে যাবার জন্যে আমি তখন পারি না হেন কাজ নেই। আর একবার শোয়ানোর পরেই আমার শুরু হয়ে যায় নতুন শিকার খোঁজা। অথচ এতে যে আমার খুব মজা বা ফুর্তি হত তা কিন্তু নয়। ঠিক যেমনটি শ্রীমতি রবিনসন বলতেন, আমার মধ্যে ফুর্তির বোধ নেই একফোঁটাও। স্যালভেশনে আর্মি, কোয়েকার সোসাইটি, ফেবিয়ান চক্রের মেয়েরা ছাড়াও আরো অনেক মেয়েকেই আমি ভুলিয়ে ভালিয়ে আমার শয্যাসঙ্গিনী করেছি। যখনই লিবারেল, কনসার্ভেটিভ, লেবার, বা কমিউনিষ্ট পার্টির সভা হত তখনি আমি, আমার উটের পিঠে জিন চড়িয়ে সেখানে হাজির হতাম। দ্বিতীয়বারের সাক্ষাতে জিন মরিস বলেছিল—"উঃ তুমি কি কুৎসিত? তোমার মত কুদর্শন মানুষ আমি আর দেখি নি।" আমি জবাব দেবার আগেই সে চলে গেল। সেই মুহূর্তে ঠিক করলাম এর মাশুল আদায় করতেই হবে। ঘুম ভাঙল, অ্যান হ্যামণ্ড আমার পাশে। অ্যান হ্যামণ্ড যে আমার মধ্যে কী দেখেছিল কে জানে। ওর বাবা ছিলেন 'রয়্যাল ইনজিনিয়ার্স'-এর একজন অফিসার। মা লিভারপুলের এক ধনী পরিবারের মেয়ে। অথচ কত সহজে মেয়েটা আমার শিকার হল। ওর সঙ্গে যখন আলাপ হল তখন ওর বয়েস মাত্র কুড়ি, অকস্‌ফোর্ডের প্রাচ্যভাষার ছাত্রী। প্রাণোচ্ছল লাস্যময়ী, মনটা সজাগ, চোখে বুদ্ধির ঝিলিক। ওর চোখে আমি যেন ধূসর গোধূলি, ভোরের বিভ্রম। ক্রান্তীয় আবহাওয়া, প্রখর সূর্যের নিষ্ঠুর দাবদাহ, রাঙানো দিগন্তের জন্যে ও ছিল ভীষণ ব্যাকুল, আমার একদম উল্টো। আমি ছিলাম ওর সব চাওয়ার প্রতীক। আমি যেন দক্ষিণ, যার কাঙ্ক্ষিত হল উত্তর আর বরফ। অ্যান হ্যামণ্ডের শৈশব কেটেছে কনভেন্ট স্কুলে। ওর খুড়িমা ছিলেন পার্লিয়ামেন্টের মেম্বর। অথচ আমার পাল্লায় পড়ে হয়ে উঠলো একটা সস্তা বেশ্যা। আমার শোবার ঘরটা যেন গোরস্থান যেখান থেকে দেখা যায়

একটা বাগান। ঘরের পর্দাগুলো গোলাপী, আমার বিশেষভাবে পছন্দ করা, কার্পেটের রঙ উষ্ণ সবুজ, বিছানাটা বেশ বড়সড় আর বালিশগুলো খুব নরম। ঘরের কোনায় কোনায় লাগান ছিল ছোট ছোট লাল, নীল, বেগুনী রঙের লাইট, দেওয়ালে লাগান বড় বড় আয়না। এই ঘরে যখন কোন মেয়ের সঙ্গে রতিকর্মে লিপ্ত হতাম, মনে হত যেন একটা হারেমের সবকটা মেয়ের সঙ্গে একসঙ্গে লিপ্ত হয়েছি। আমার ঘরটা সব সময় ধূপ ধুনো আর চন্দনের খুশবুতে ভরে থাকত। সংলগ্ন বাথরুমে থাকত প্রাচ্যদেশীয় নানা সুগন্ধি আতর, গোলাপজল, চন্দনের গন্ধওয়ালা পাউডার, নানা রকম উত্তেজক জড়িবুটি, আরো কত কী। শোয়ার ঘরটা যেন একটা অপারেশন থিয়েটার। সব মেয়ের মনের গহীনে রয়েছে একটা নিস্তরঙ্গ জলাশয়। আমি জানতাম কীভাবে সেখানে তুফান তুলতে হয়। অ্যান হ্যামগুকে একদিন মৃত অবস্থায় পাওয়া গেল। নিজেকে হত্যা করেছে বিষাক্ত গ্যাস নিয়ে। তার মৃতদেহের পাশে পাওয়া গিয়েছিল একটা চিরকুট, তাতে লেখা—'মিঃ সঈদ, ঈশ্বর তোমাকে নরকে পাঠান।" আমার মনটা একটা ধারালো ছুরির ফলা। ট্রেনটা আমাকে নিয়ে পৌঁছে গেল ভিক্টোরিয়া স্টেশনে, জিন মরিসদের জগতে।

'লণ্ডনের আদালতে আইনজীবীরা যখন আমাকে নিয়ে বাগবিতণ্ডা চালাচ্ছিল দিনের পর দিন, আমি তখন অত্যন্ত নিস্পৃহভাবে কাঠগড়ায় বসে থাকতাম যেন অন্য কাউকে নিয়ে আলোচনা হচ্ছে, ব্যাপারটায় আমার আদৌ কিছু আসে যায় না। পাবলিক প্রসিকিউটর স্যার আর্থার হিগিনস তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমান ব্যক্তি। আমি ওনাকে চিনতাম, অকস্‌ফোর্ডে আমাদের ক্রিমিন্যাল ল পড়িয়েছেন। আগেও অনেকবার দেখেছি এই আদালতে আসামীদের সওয়াল করতে। তাঁর ক্ষুরধার প্রশ্নের বজ্র আঁটুনি থেকে বেরিয়ে আসা ছিল প্রায় অসাধ্য। অনেক সময় দেখেছি তাঁর সওয়াল করা শেষ হলে কাঠগড়ায় বসা আসামী কান্নায় ভেঙে পড়ছে বা জ্ঞান হারাচ্ছে। কিন্তু এবার উনি যেন একটা মৃতদেহের সঙ্গে কুস্তি করছেন।

"আপনিই কি অ্যান হ্যামণ্ডের মৃত্যুর কারণ?"

"জানি না।"

"আর শিলা গ্রিণউড?"

"জানি না।"

"আর ইসাবেল সেমুর?"

"জানি না।"

"আপনিই কি জিন মরিসকে হত্যা করেছেন?"

"হ্যাঁ।"

"এই হত্যা কি ইচ্ছাকৃত?"

পাবলিক প্রসিকিউটরের গলাটা যেন অন্য জগৎ থেকে ভেসে আসছে। উনি সুকৌশলে একটা নরদানবের ভয়ঙ্কর চেহারা একটু একটু করে উদঘাটিত করছিলেন। এই নরদানবটার জন্যে দুটো নিষ্পাপ মেয়ে আত্মহত্যা করেছে, একজন বিবাহিত মহিলার জীবনটা ছারখার হয়ে গেছে আর ও নিজের বউটাকে হত্যা করেছে। একটা আত্মসর্বস্ব জন্তু যার জীবনের

একমাত্র উদ্দেশ্য হল বাসনার নিবৃত্তি। কাঠগড়ায় বসে বসে ঝিমুনি এসে গিয়েছিল। হঠাৎ চটকা ভাঙল, আমার প্রাক্তন শিক্ষক অধ্যাপক ফস্টার কিন আমাকে ফাঁসীর দড়ি থেকে বাঁচানোর চেষ্টায় তীক্ষ্ণ সওয়াল করে চলেছেন। ইচ্ছে হল চিৎকার করে আদালতকে বলি— "এই মুস্তাফা সাঈদের কোন অস্তিত্ব নেই, সে একটা বিভ্রম মাত্র, একটা মিথ্যা। আমার একান্ত অনুরোধ, আপনারা হুকুম দিন এই মিথ্যাকে খতম করার।" কিন্তু এসব কিছু না বলে আমি বসে রইলাম প্রাণহীন নিস্পন্দ ছাই-এর ঢিবির মত। অধ্যাপক ম্যাকসওয়েল ফস্টার কিন তখন একটু একটু করে গড়ে তুলছেন একজন বিশিষ্ট প্রতিভাধরের চিত্রকল্প। উনি বোঝাতে চাইছিলেন কীভাবে পরিস্থিতির চাপে কামোন্মত্ত অবস্থায় সে খুনটা করে ফেলেছে। উনি আদালতকে জানালেন আমি কীভাবে মাত্র চব্বিশ বছর বয়সে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতির অধ্যাপক পদে বহাল হয়েছিলাম। উনি আদালতকে আরো বললেন যে অ্যান হ্যামণ্ড বা শিলা গ্রিণউড এমন এক ধরনের মেয়ে যারা আত্মহননের পথই খুঁজে মরছিল। ওদের সঙ্গে মুস্তাফা যাঈদের পরিচয় না হলেও আত্মহত্যা ওরা করতই। উনি জুরিদের উদ্দেশ্যে বললেন— "মাননীয় ভদ্রমহোদয়গণ, মুস্তাফা সাঈদ একজন শিক্ষিত, সম্ভ্রান্ত উদারচেতা মানুষ। তিনি পাশ্চাত্য সভ্যতার নির্যাসটুকু অনায়াসে আত্তীকৃত করেছেন, কিন্তু তাঁর মন ভেঙে গিয়েছে। মুস্তাফা সাঈদ এই মহিলাদের হত্যা করে নি, এদের হত্যা করেছে একটা মারাত্মক ব্যাধির বীজাণু, যে বীজাণুর সংক্রমণ শুরু হয়েছে হাজার বছর আগে। এই সময়ে আমার ইচ্ছে হল আবার উঠে দাঁড়িয়ে বলি—"এটা ডাহা মিথ্যে, সাজানো গপ্পো। আমিই ওদের হত্যা করেছি, আমি তৃষ্ণার্ত মরুভূমি। আমি ওথেলো নই, আমি একটা মিথ্যা। আপনারা কেন আমাকে ফাঁসীর সাজা দিয়ে এই মিথ্যেটাকে খতম করছেন না?" কিন্তু অধ্যাপক ফস্টার কিন বিচারটাকে ঘুরিয়ে দিলেন দুটো দুনিয়ার সংঘাতে, যে লড়াইয়ের আমি একজন শিকার। ট্রেনটা আমাকে নিয়ে পৌঁছে গেল জিন মরিসদের জগতে।'

'আমি তিন বছর ধরে ওকে অনুসরণ করে গেছি। প্রতিদিন ধনুকের ছিলার টান বাড়ছে একটু করে। আমার কাফেলা তৃষ্ণার্ত, আমার কামনার দিগন্তে মরীচিকার ঝিলমিল। ধনুকের লক্ষ্য স্থির, মর্মান্তিক ঘটনাটা ঘটে যাওয়া এখন অবশ্যম্ভাবী। "তুমি একটা বুনো ষাঁড়, ধাওয়া করার ক্লান্তি নেই একটুও। তোমার তাড়া খেয়ে ছুটতে ছুটতে আমি পাগল হয়ে যাচ্ছি, আর পারছি না। তুমি আমাকে বিয়ে কর।" আমি ওকে বিয়ে করে ফেললাম। আমার শোয়ার ঘরটা হয়ে উঠল যুদ্ধের রঙ্গমঞ্চ, আমার বিছানাটা একটা নরক। তাকে আলিঙ্গন করতে গেলে সে ফস্কে যেত মেঘের মত, ধরা দিয়েও সে অধরা থেকে যেত খসে পড়া তারার মত। আর তার সঙ্গে দৈহিক মিলন যেন ফৌজি ঘোড়ার কুচকাওয়াজ। তার ঠোঁটে সবসময়েই লেগে থাকত তিক্ত হাসির আভাস। আমার বিনিদ্র রাতগুলো কেটে যেত তির, ধনুক, বল্লম, তরোয়াল নিয়ে লড়াই করতে করতে। ভোর হলে দেখতাম তার সেই তির্যক হাসিটা অবিকল রয়েছে। বুঝতে পারতাম এই লড়াইয়ে আমি হেরে গেছি। আমি যেন শহরজাদীর মুখোমুখি একটা ক্রীতদাস। শহরইয়ার যাকে মাত্র কয়েকটা দিনার দিয়েই কিনে ফেলা যায়। আমার সারাটা দিন কেটে যায় কিনেস আর টউনি-র তত্ত্বচর্চা করে আর রাতের বেলায় শুরু হয়ে

যায় তির, ধনুক, বল্লম দিয়ে যুদ্ধ। আমি দেখেছি সেইসব যুদ্ধ ফেরত সৈনিক, ট্রেঞ্চের লড়াই, উকুন, অনাহার আর মারি-র আতঙ্ক যাদের চোখেমুখে। একটা যুদ্ধ থেকে ফিরে এসে আর এক যুদ্ধের বীজ বুনছে ভার্সাই চুক্তিতে। আমি দেখেছি ক্লাইভ জর্জের হিতসাধক রাষ্ট্রের ভিত্তি স্থাপন। শহরটা ক্রমশ একটা নারীর রূপ নিচ্ছিল। এই নারীর রহস্যময় আহ্বান তার প্রতীক-এর দিকে আমি ছুটেছি আমার উটের পিঠে চেপে। সেই ছোটা থামে নি যতক্ষণ না আমার উটের পেশিগুলো ব্যথায় বিবশ আর আমি সেই নারীর কামনায় মৃতপ্রায় হয়েছি। আমার শোয়ার ঘরটা যেন দুঃখের ফোয়ারা, মারাত্মক ব্যাধির আঁতুড় ঘর। এই ব্যাধির সংক্রমন হাজার বছরের পুরোন হলেও আমি সেই সুপ্ত ব্যাধিকে এমন জাগিয়ে তুলেছি যে নিয়ন্ত্রণহীন হয়ে তার মারণরূপের প্রকাশ হয়েছে। লিষ্টার স্কোয়ারের থিয়েটারগুলো তখন গম গম করছে প্রেম, ফুর্তির নাটকে, কিন্তু তা আমার হৃদয়ে কাঁপন ধরায় না এতটুকু। কে জানত শিলা গ্রিণউডের আত্মহত্যা করার সৎসাহস হবে। সোহো অঞ্চলের একটা রেষ্টুরেন্টের পরিচারিকা, সরল, সাদাসিধে মিষ্টি মেয়ে। হল শহরের উপকণ্ঠের কোন গ্রামে তার বাড়ি। আত্মীয় পরিজন সবাই গ্রামের সাধারণ মানুষ। আমি তাকে ভুলিয়েছিলাম নানা উপহার, মিষ্টি মিষ্টি কথা, আমার চোখের যাদু দিয়ে। আমার জগতটা ওর কাছে এতই অভিনব যে তার আকর্ষণ সে ঠেকাতে পারে নি। আমার ঘরের ধূপ ধুনোর গন্ধে কেমন যেন আবিষ্ট হয়ে যেত। ওর গলায় একটা হাতির দাঁতের নেকলেস ফাঁসীর দড়ির মত পরিয়ে দিয়েছিলাম। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে সেই নেকলেসটার গায়ে হাত বুলোতে বুলোতে নিজের প্রতিবিম্বের দিকে তাকিয়ে ও হেসেই আকুল। আমার ঘরে ঢোকার আগে ও ছিল সতী, সাধ্বী, কুমারী আর যখন চলে গেল শরীরে নিয়ে গেল আত্মহননের বীজ। ও মারা যাবার সময় কোন কথা বলে নি। আমার বস্তাপচা বুলির ভাণ্ডার অফুরান। ভিন্ন ভিন্ন অনুষ্ঠানের জন্যে আমার কাছে রয়েছে ভিন্ন ভিন্ন ভেক।'

"১৯২২ সনের অক্টোবর মাস থেকে ১৯২৩ সনের ফেব্রুয়ারি মাস, শুধু এই সময়টুকুতেই আপনি একই সঙ্গে পাঁচজন মহিলার সঙ্গে সহবাস করছিলেন—এটা কি সত্যি?"

"হ্যাঁ"

"আর সবাইকে আপনি বিয়ে করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন?"

"হ্যাঁ"

"আর প্রত্যেকের সঙ্গে আপনি পরিচিত ছিলেন ভিন্ন নামে।"

"হ্যাঁ"

"আপনার নামগুলো ছিল—হাসান, চার্লস, আমিন, মুস্তাফা, রিচার্ড?

"হ্যাঁ"ং

"এতদসত্ত্বেও আপনি ওই একই সময়ে লিখছেন এবং বক্তৃতা করছেন অর্থনীতির এমন একটা ধারার উপর যার ভিত্তি হল ভালোবাসা, পরিসংখ্যান বা সংখ্যা নয়? আচ্ছা এটা কি সত্যি নয় যে আপনার খ্যাতি অর্থনীতিতে মানবতার ভূমিকা রাখার আহ্বান জানানোয়?

"হ্যাঁ"

'তিরিশটা বছর। পার্কের উইলো গাছগুলো সাদা থেকে সবুজ থেকে হলুদ হয়ে যায় ; প্রতিবছর নিয়ম করে কোকিলের ডাক শুনে বসন্ত আসে, বসন্ত যায়। এই তিরিশ বছরের প্রতিটি রজনীতে অ্যালবার্ট হল ভরে যায় বিটোভেন বাখ্-এর সঙ্গীতে অনুরক্ত মানুষের ভিড়ে, হাজার হাজার বই ছাপা হয় শিল্পকলা, চিন্তা বিষয়ে। 'দি রয়্যাল কোর্ট', আর 'হে মার্কেট' থিয়েটারে মঞ্চস্থ হচ্ছিল বার্নার্ড শ-এর নাটকগুলো। সবাই মজে আছে এডিথ সিটওয়েলের কবিতায়। 'দি প্রিন্স অফ ওয়েলস্' থিয়েটার গমগম করছে পাদপ্রদীপের উজ্জ্বল আলো আর যৌবনের কলরোলে। ব্রাইটন আর বোর্নমাউথ-এর উপকূল ধুয়ে যায় সমুদ্রের জোয়ার ভাটায়, লেক ডিষ্ট্রিক্ট ফুলে ভরে ওঠে প্রতি বছর। দ্বীপটা যেন একটা মিষ্টি সুর—আনন্দ আর বিষাদময়, বদলে যায় মরীচিকার মত ঋতু বদলের সঙ্গে সঙ্গে। তিরিশটা বছর এসবই আমার জীবনে ওতপ্রোত জড়িয়েছিল। এই সৌন্দর্যের মধ্যে দিন কাটালেও আমাকে স্পর্শ করে নি কোন কিছুই। আমার একমাত্র চিন্তা, কীভাবে যোগাড় হবে প্রতি রাত্রের নতুন সঙ্গিনী।'

'কী যেন বলছিলাম? হ্যাঁ—তখন গরমকাল। বেশ গরম পড়েছে। সবাই বলছে একশো বছরের মধ্যে নাকি এরকম গরম পড়ে নি। এক শনিবারে বাড়ি থেকে বেরিয়ে হাঁটছি। ইতি উতি দেখছি আর ভাবছি এবার শুরু হবে আমার শিকার ধরার খেলা। পৌঁছে গেলাম হাইড পার্কে বক্তৃতা করার কোণটাতে। দেখি লোক গিজ্ গিজ্ করছে। একটু দূরে দাঁড়িয়ে শুনছি বর্ণবৈষম্য নিয়ে বক্তৃতা করছে ওয়েষ্ট ইনডিজ-এর একজন। আমার চোখ গেল একজন মহিলার দিকে। মহিলা ভিড়ের পিছন থেকে ঘাড় উঁচু করে বক্তাকে দেখার চেষ্টা করছিলেন। আমার চোখ গেল পায়ের দিকে। পায়ের পাতায় ভর দিয়ে গোড়ালি উঁচু করার দরুন তার স্কার্টের প্রান্ত হাঁটুর উপর উঠে গেছে। সুডৌল নধর তামাটে দুটো পা। এই তো আমার শিকার। গুটি গুটি এগিয়ে গেলাম তার দিকে যেমনটা স্রোতের টানে ভেসে যায় ডিঙ্গি নৌকো। আমি পাশে গিয়ে ওর শরীরে শরীর ছুঁইয়ে দাঁড়ালাম—ভাবখানা এমন যেন ভিড়ের ঠেলায় চাপাচাপি হচ্ছে। ওর শরীরের তাপ লাগছে আমার গায়ে, নাকে ওর শরীরের ঘ্রাণ, ঠিক যেমনটা পেয়েছিলাম অনেকদিন আগে কায়রো ষ্টেশনে শ্রীমতি রবিনসনের গা থেকে। একটু পরে আমার শরীরের অনুভব পেয়ে হঠাৎ ঘুরে দাঁড়াল আমার দিকে। ওর দিকে তাকিয়ে মিষ্টি করে হাসলাম। তখনো জানি না এই হাসির পরিণতি কোথায়, তবে প্রাণপণে চাইছি আমার চেষ্টা যেন সফল হয়। তবে বেশি বাড়াবাড়ি করিনি পাছে চটে যায়। খানিকক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে থাকার পর ওর মুখে হাসি ফুটল। আমি ওই ভাবে দাঁড়িয়ে আরো মিনিট পনেরো বক্তৃতা শুনলাম। মাঝে মাঝে বক্তার কথায় হেসে উঠছি একসঙ্গে যেন হাসিটা কত সংক্রামক। তারপর সেই মুহূর্তটা এলো যখন মনে হল আমরা যেন একটা ঘোড়া আর তার বাচ্চা, একই ছন্দে পাশাপাশি ছুটছি। নিজের অগোচরে আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল—"চলুন এই ভিড়, গরম থেকে দূরে কোথাও গিয়ে গলাটা একটু ভিজিয়ে নেওয়া যাক।" ও অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল আমার দিকে। আমি একগাল হেসে ব্যাপারটা হাল্কা করতে চাইলাম যাতে মেয়েটার অবাক হওয়াটা রূপান্তরিত হয় কৌতূহলে। আমি যখন হেসে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি তখন ওকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছি। ইতিমধ্যে আমি নিশ্চিত হয়ে গেছি—

এই আমার শিকার। একজন পাকা জুয়াড়ির মত আমি চিনতে পারি সেই মুহূর্তটাকে যখন সবকিছুই সম্ভব। ও যখন আমার প্রস্তাবে সম্মতি জানাল তখন আমি খুশিতে ডগমগ। সেই জুলাই-এর পড়ন্ত বেলার ঝলমলে রোদ্দুরে আমরা দুজন হাঁটতে শুরু করলাম। ওর শরীরটা যেন একটা ব্রোঞ্জের ভাস্কর্য—যেন একটা আনন্দোচ্ছল, রহস্যঘেরা শহর ওর খোলামেলা হাসিটা আমার বেশ লাগছিল। এরকম ভয়ডরহীন মেয়েদের দেখা মেলে ইউরোপে। এরা জীবনকে গ্রহণ করে আনন্দোচ্ছ্বাসে, কৌতূহলে, আর আমি একটা তৃষ্ণার্ত মরুভূমি, দখিনে কামনার বন্যতা। চা খেতে খেতে ওর সঙ্গে গল্প হচ্ছিল। আমার দেশের সম্পর্কে এক ঝুড়ি বানানো গপ্পো শুনিয়ে ওকে একদম চমৎকৃত করে দিলাম। শ্বাপদসঙ্কুল জঙ্গল আর সোনা রঙের মরুভূমির বালির গল্প শোনাতে শোনাতে লক্ষ্য করছিলাম ওর আয়ত চোখের মুগ্ধতা। আমি দ্বিগুণ উৎসাহে আমার গল্পে আজগুবি কল্পনার মিশেলের মাত্রা বাড়িয়ে দিলাম। আমি ওকে বলছিলাম কীভাবে আমাদের দেশের রাস্তাঘাট হাতি, সিংহয় ভরে থাকে, কীভাবে দুপুরের দিকে কুমীরগুলো নদী থেকে গুটি গুটি পায়ে উঠে আসে রাস্তায়। আমার কথায় অবোধ বিস্ময় আর বিশ্বাসে ও মাঝে মাঝে হেসে গড়িয়ে পড়ছিল। হাসলে ওর চোখ দুটো কখনো কখনো বন্ধ হয়ে যায় আর আমি লক্ষ্য করছিলাম ওর গণ্ডদেশ কেমন রাঙা হয়ে উঠছে। মাঝে মাঝে আবার শান্ত হয়ে যাচ্ছিল, তখন ওর চোখ খ্রিষ্টিয় দরদ। এইভাবে, কি জানি কখন ওর চোখে আমি বদলে গেছি একটা আদিম বন্য মানুষে। নগ্ন শরীর, হাতে বল্লম আর তির ধনুক, গভীর জঙ্গলে শিকার করছি হাতি, সিংহ। ভালো কথা, ওর কৌতূহলটা বদলে গেল উচ্ছ্বাসে আর উচ্ছ্বাসটা বদলে গেল দরদে। আর আমি যখন ওর মনের গহীনের স্থির জলাশয়টাতে তুফান তুলব তখন এই দরদ রূপান্তরিত হবে বাসনায়, তখন সেই টানটান ছিলার উপর শুরু হবে আমার ভেল্কি। "এশিয়া না আফ্রিকা মহাদেশীয়—তুমি কোথাকার লোক?"

জবাব দিলাম—"আমি ওথেলো—আরব—আফ্রিকান।"

মুখের দিকে চেয়ে বললে—"হ্যাঁ তোমার নাকটা ছবিতে দেখা আরবদের মত হলেও চুলগুলো তেমন নরম আর মিশকালো নয়।"

"আমি তো ঠিক তাই। আমার মুখটা আরব মরুভূমির মত আর মাথাটা আফ্রিকার লোকদের মত, রাজ্যের দুষ্টুমিতে ভরা। ও আবার হেসে গড়িয়ে পড়ল—"তোমার কথাগুলো যা মজার!"

'কথায় কথায় আমার বাড়ির কথা উঠল। আমি যে শৈশবে পিতৃহীন এই সত্যি কথাটা বললাম। আর তার পরেই একটা আষাঢ়ে গপ্পো ফাঁদলাম। ওকে বললাম আমার যখন মাত্র বছর ছয়েক বয়েস তখন কীভাবে আমার বাবা মা আরো জনা তিরিশ লোকের সঙ্গে নীলনদে নৌকোডুবি হয়ে হারিয়ে গেছেন। গপ্পোটা বেশ যুতসই হয়েছিল। শুনে ওর চোখ ছল-ছলিয়ে উঠল। আর তারপরেই যে ব্যাপারটা হল সেটা করুণার অভিব্যক্তি থেকে অনেক ভালো কারণ এই ক্ষেত্রে করুণা নিশ্চিত পরিণতিহীন একটা আবেগ বৈ আর কিছু নয়। একটু পরেই ও নিজেকে সামলে নিল, চোখ দুটো হঠাৎ উত্তেজনায় উজ্জ্বল হয়ে উঠল, উচ্ছ্বসিত হয়ে

বলল—"আরেব্বাস নীল নদ!"

"হ্যাঁ, নীল নদ।"

"তার মানে তোমার বাড়ি নীল নদের ধারে?"

"প্রায় নীল নদের উপরেই বলা যায়। কোন কোন রাতে যখন ঘুম আসতে চায় না তখন আমি জানলা দিয়ে হাত বাড়িয়ে নদীর জল নিয়ে খেলা করি যতক্ষণ না আমার দুচোখ জুড়ে ঘনিয়ে আসে গভীর ঘুম।"

এইবার মুস্তাফা বাবাজি, পাখি ফাঁদে পড়েছে! সেই নীল নদ, সেই সাপের দেবতা আবার একটা নতুন শিকার ধরেছে। শহরটা আবার নারীতে রূপান্তরিত। আর কয়েকদিন বা কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই আমি পাহাড় চুড়োয় তাঁবুর খুঁটো পুঁতব আর তাঁবু ফেলব। তুমি, হে রমণী, তুমিও আক্রান্ত সেই মারাত্মক রোগের বীজাণু দ্বারা, ঠিক যেমনটি হয়েছিল কারনারভনের যখন সে ঢুকেছিল তুতেনখামেনের সমাধিতে। তুমি জান না এই রোগবীজাণুর উৎস, কিন্তু আজ হোক কাল হোক, এই রোগেই তোমার ধ্বংস নিশ্চিত। বস্তাপচা বুলিতে আমার ভাণ্ডার পূর্ণ। আমি বুঝতে পারছিলাম আমাদের কথোপকথনের ধরতাইটা আমার নিয়ন্ত্রণে এসে গেছে, ঠিক যেন বাধ্য ঘোড়ার লাগাম—টান দিলেই থেমে যায়, আলগা দিলে এগিয়ে যায়, ডানদিকে বাঁদিকে, যেদিকে ইচ্ছে তাকে আমি চালনা করতে পারি।

অবাক হবার ভান করে বললাম—"কখন যে দুঘণ্টা সময় কেটে গেল বুঝতেই পারি নি। অনেকদিন কারুর সঙ্গে গল্প করে এত আনন্দ পাই নি। আরো কত কথা বলার আছে। চলুন কোথাও গিয়ে ডিনার সেরে নেওয়া যাক, তাহলে আরো কিছুক্ষণ গল্প করা যাবে। কী বলেন?"

আমার প্রস্তাবে ও কিছুক্ষণ নীরব রইল। তাতে অবশ্য আমি খুব একটা ঘাবড়াই নি কারণ আমি টের পাচ্ছি আমার বুকের মধ্যে শয়তানির উষ্ণতা, আর যখনই এরকম হয় তখনি বুঝতে পারি অবস্থাটা সম্পূর্ণ আমার নিয়ন্ত্রণে। আমি জানি ও আমার প্রস্তাব ফিরিয়ে দেবে না। "আমাদের এই দেখা হওয়াটা বেশ অদ্ভুত। একদম অচেনা একজন আমাকে প্রথম সাক্ষাতেই ডিনারে নেমন্তন্ন করছে—ব্যাপারটা বোধহয় ঠিক হচ্ছে না।" তারপর কি ভেবে বলে উঠলো "কেনই বা ঠিক নয়? আপনাকে দেখে আমার একটুও নরখাদক বলে মনে হচ্ছে না। চলুন আমার একটুও আপত্তি নেই।"

আমার বুকের মধ্যে তখন উল্লাসের দামামা। বললাম "দেখবেন আমি আসলে একটা বুড়ো ফোকলা কুমীর। ইচ্ছে থাকলেও আপনাকে চিবিয়ে খাওয়ার শক্তি আমার নেই।" আমি মনে মনে তখন হিসেব করছি, ভদ্রমহিলা আমার থেকে অন্ততপক্ষে বছর পনেরো বড়, বয়েস চল্লিশের কোঠায় হলেও শরীরটা এখনো বেশ রয়েছে, তা সে যে ভাবেই ব্যবহৃত হয়ে থাকুক। কপাল বা ওষ্ঠের প্রান্তে পাতলা বলিরেখা জানান দিচ্ছে যে শরীরটা বুড়িয়ে না গেলেও বেশ পরিপক্ক হয়েছে। আমার প্রস্তাবে সম্মতি জানাতে আমি ওর নাম জিজ্ঞেস করলাম।"

"ইসাবেলা সেমুর।"

"নামটা কয়েকবার মনে মনে আওড়ালাম যেন তারিয়ে তারিয়ে ন্যাসপাতি চিবুচ্ছি।

"তোমার নাম কী?"

"আমিন, আমিন হাসান।"

"আমি তোমাকে হাসান বলেই ডাকব।"

সেঁকা মাংস আর লাল মদ-এর সঙ্গে সঙ্গে ওর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ শিথিল হয়ে আসছিল, আর সেই সঙ্গে দুনিয়ার প্রতি ওর যত মমতা সব আমার উপর ঝরে পড়ছিল। মাঝে মাঝে একটা বিষাদের ছায়া ওর মুখের উপর খেলা করছিল অনেকটা শরৎকালের মেঘের মত। আমি অবশ্য তা নিয়ে খুব একটা চিন্তিত নই। আমার নজর তখন ওর নিটোল পুষ্ট ঠোঁটের দিকে। হাসলে ওর জিভের রাঙা আভা দেখা যায়। সেদিকে তাকিয়ে ভাবছিলাম ওই মুখবিবরে কত না রহস্য লুকিয়ে। "জীবনটা বেদনাময় তা সত্ত্বেও আশায় বুক বেঁধে সৎসাহসের সঙ্গে মোকাবিলা করা দরকার।" ওর এইসব কথার মধ্যে মনে মনে আমি ওকে ছাড়িয়ে ফেলেছি, দেখছি ওর অশ্লীল নগ্নতা।

হ্যাঁ, আমি এখন জেনে গেছি সহজ সরল সাধারণ মানুষের প্রজ্ঞাই আমাদের মোক্ষের সম্বল। একটা গাছ কোন জটিলতা ছাড়াই বেড়ে ওঠে। তোমার দাদুর জীবনটা কী সুন্দর অথচ সহজ, একদিন শেষ হয়ে যাবে সহজভাবেই। এইটাই গোপন কথা। হে রমণী তুমিই ঠিক, সৎসাহস আর আশা। কিন্তু যতদিন না অন্ত্যজের হাতে ভুবনের ভার ন্যস্ত হচ্ছে (meek shall inherit the earth), যতদিন না ভাড়াটে সৈনিকের হাতের অস্ত্র কেড়ে নেওয়া হচ্ছে, নেকড়ের পাশাপাশি ভেড়া চরছে শান্তিতে, নদীর জলে কুমীর আর শিশু ওয়াটার পোলো খেলছে একসঙ্গে, যতদিন না সেই ভালোবাসা আর খুশির দিন ধরায় আসছে ততদিন আমি এইভাবে নিজেকে দুমড়ে মুচড়ে প্রকাশ করে যাব। আর যখন হাঁপাতে হাঁপাতে পাহাড় চুড়োয় পৌঁছে ঝাণ্ডা গেড়ে স্বস্তিতে নিঃশ্বাস নেব তখনই হে সুন্দরী, তখনই পৌঁছবে আবিষ্ট পরমানন্দের শিখরে। এই চরিতার্থতা আমার কাছে যে কোন প্রেম বা অন্য কোন সুখানুভূতির চাইতে বেশি ইঙ্গিত, অন্বিষ্ট। আমি তোমার কোন ক্ষতি করতে চাইনে, যেমন সমুদ্র চায় না ডুবো পাহাড়ে ধাক্কা খেয়ে ভেঙে যাওয়া জাহাজের ক্ষতি করতে, কিংবা যেমন বজ্রপাতে দগ্ধ গাছের ক্ষতি চায়না বিদ্যুত। এই ভাবনাটা যখন মাথায় ঘুরছে তখন আমার চোখ সেঁটে রয়েছে ওর লোমশ কব্জির অনাবৃত অংশে। ওর শরীরটা এই বয়সী মেয়েদের থেকে একটু বেশি রোমশ। আমার কল্পনা তখন মুক্ত বিহঙ্গ। একরকম লোকের ভাবনা থেকে অন্য রকমে—সেগুলো নির্ঘাত শীর্ণ নদীতীরের সাইপ্রাস ঘাসের মত নরম ও প্রচুর। আমি যখন এই ভাবনায় বিভোর তখন ও হঠাৎ শুধালো—"তোমাকে এত বিমর্ষ দেখাচ্ছে কেন?" "তাই নাকি? আমার তো দারুণ লাগছে।" আমার কথা শুনে পরম মমতায় ও আমার হাতটা ধরে বলল "জানো আমার মা স্প্যানিশ?"

"এবার সব বোঝা গেল। বোঝা গেল নেহাতই ঘটনাচক্রে তোমার সঙ্গেই কেন দেখা হল আর দেখা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের বন্ধুত্বটা বেশ জমে উঠল—মনে হচ্ছে আমরা যেন অনেক দিনের, মানে এই ধরা যাক কয়েক শো বছরের চেনা। এখন আমার আর একটুও সন্দেহ নেই যে আমারই পূর্বপুরুষদের মধ্যে কেউ একজন তারিক বিন জায়েদ-এর ফৌজে

সৈনিক ছিলেন, আর তোমার পূর্বপুরুষের কাউকে, এই ধর শেভিয়ে অঞ্চলের আঙুর খেতে, আঙুর তুলতে তুলতে দেখে প্রেমে পড়েছিলেন। তারপর দুজনে একসঙ্গে কিছুদিন কাটানোর পর আমার পূর্বপুরুষ ওঁকে ছেড়ে আফ্রিকায় ফিরে গিয়ে আবার শাদি করেছিলেন। আমি তাঁর আফ্রিকা শাখার বংশধর আর তুমি স্পেনে রেখে যাওয়া অন্য শাখার বংশধর।"

আমার এই আষাঢ়ে গপ্পো, রেষ্টুরেন্ট-এর নরম আলো আর মদ—সব মিলিয়ে ওকে বেশ খুশি খুশি লাগছিল। গলায় একটা ঘড়ঘড়ে আওয়াজ করে হেসে উঠল মেয়েটা, তারপর বলল—

"ইস্! তুমি কি দুষ্টু!"

তখন আমার ভাবনায় ঢুকে পড়েছে স্পেনের সঙ্গে আরব সৈনিকের প্রথম সংস্রব, এই এখন যেমন আমি বসে আছি ইসাবেলা সেমুরের সামনে। একটা দখিনা তৃষ্ণার উত্তরের ইতিহাসের গিরিপথে। সে যাই হোক আমি গৌরবের পিয়াসী নই কারণ আমার মত লোকেরা গৌরব খোঁজে না।

তীব্র আসঙ্গলিপ্সায় জরোজরে অবস্থায় মাসখানেক কেটে যাবার পর একদিন ওকে সঙ্গে নিয়ে আমার ফ্ল্যাটে এলাম। ও তখন আমার উর্বর আন্দালুসিয়ার উপত্যকা। ছোট প্যাসজেটা পেরিয়ে ওকে সোজা নিয়ে গেলাম আমার শোবার ঘরে। ঘরে ঢুকেই চন্দন আর ধূপের গন্ধে ও একেবারে উতলা হয়ে উঠল। ওর ফুসফুস ভরে যাচ্ছে সম্পূর্ণ অচেনা গন্ধে। ও জানে না এই গন্ধ কত মারাত্মক। সেই সময়ে যখন বুঝতাম পাহাড় চূড়ো আমার ধরাছোঁয়ার মধ্যে এসে গেছে, তখন আমার মধ্যে আসত একটা করুণ শান্ত ভাব। হৃদপিণ্ডের ধুকপুকানি, টান টান স্নায়ুতন্ত্রী সব মিলিয়ে এমন একটা প্রশান্তি যা একজন শল্যবিদের মধ্যে দেখা যায়। যখন সে ছুরিটা বিঁধিয়ে দেবে রোগীর শরীরে, ঠিক সেই মুহূর্তে। আমার ফ্ল্যাটের দরজা থেকে শোবার ঘর পর্যন্ত যে সামান্য দূরত্ব আমরা একসঙ্গে হেঁটে গেলাম সেই পথটুকু ওর জন্যে মহত্ব আর ভক্তির মৃদু সৌরভে সুরভিত, আর আমার কাছে এই পথ স্বার্থপরতার গিরিশিখরে পৌঁছানোর শেষ ধাপ। বিছানার প্রান্তে বসে অপেক্ষা করছি, যেন মনে মনে সেই মুহূর্তটাকে ভাবতে চেষ্টা করছি, শীতল দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করছি ঘরের গোলাপী পর্দা, বড় আয়না, ঘরের কোনার মিট মিট করে জ্বলা ছোট বাল্‌ববগুলো তারপর চোখ গেল আমার সামনে দাঁড়ানো সুতনু ব্রোঞ্জের ষ্ট্যাচুর দিকে। আমরা যখন পৌঁছে গেলাম সেই করুণ চরম মুহূর্তে, ও তখন দুর্বল ভাবে কেঁদে উঠলো—"না, না।" এখন আর এই আপত্তিতে কোন কাজ হবে না। যখন তোমার সাধ্য ছিল প্রথম পদক্ষেপ থেকে বিরত থাকার, সেই জরুরী মুহূর্তটা হারিয়ে গেছে। এখন তুমি ঘটনার স্রোতে ভেসে যাচ্ছ, যেমন সবাই যায়, এখন আর কিছু করার নেই। সবাই যদি জানত কীভাবে এই প্রথম পদক্ষেপ থেকে বিরত থাকতে হয় তাহলে দুনিয়ায় অনেক কিছুই বদলে যেত। সূর্যের প্রখর কিরণে কোটি কোটি মানুষের হৃদয় হয়ে যায় শুকনো মরুভূমি আর সেই মরুভূমিতে তৃষ্ণায় ফুটিফাটা হয়ে যায় বুলবুলির গলা, সেইজন্যে কি আমরা সূর্যকে শয়তান বলতে পারি? আমি অলস মন্থরতায় হাতের তালুটা ওর ঘাড়ের পিছনে রেখে ওর ইন্দ্রিয়ানুভূতির উৎস মুখগুলোতে এঁকে দিলাম একটার পর একটা চুম্বন। প্রতিটা চুম্বন,

প্রতিটা স্পর্শে ওর শরীরের, এক একটা পেশী শিথিল হয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ ঔজ্জ্বল্যে ওর মুখটা মাঝে মাঝে দীপ্তিময় আর চোখ দুটো ঝিকমিকিয়ে উঠছিল। অনেকক্ষণ চেয়ে রইল আমার দিকে, ওর চোখে আমি যেন বাস্তব নই, একটা প্রতীক মাত্র। শুনতে পেলাম ওর মিনতি মাখানো সমর্পণের ফিসফিসানি—"আমি তোমাকে ভালোবাসি।" ওর ফিসফিসানি শুনে আমার চৈতন্যের গভীরে কে যেন চিৎকার করে সতর্ক করছিল আমাকে, বলছিল "ক্ষান্ত হও", "ক্ষান্ত হও"। কিন্তু আর মাত্র একটা ধাপ উঠলেই পৌঁছে যাব পাহাড়চূড়ায়, আর তার পরেই আমার বিশ্রাম। আমাদের বেদনার চরম মুহূর্তে বহু পুরোনো স্মৃতির মেঘ ভেসে যাচ্ছিল আমার চৈতন্যে, যেমনটা যায় মরুভূমির লবণহ্রদের বাষ্প। ও ককিয়ে উঠলো যন্ত্রণাময় তৃপ্তিতে আর আমি ঢলে পড়লাম অতীত জর্জরিত নিদ্রায়।'

জুলাই মাসের সেই রাত্তিরে দারুণ ভ্যাপসা গরম পড়েছিল। নীল নদের জল বাড়তে বাড়তে পৌঁছে গেল গ্রামের প্রান্তে, যেখানটায় মরুভূমির সীমানা। ওইখানেই রয়েছে গ্রামের ঘর বাড়িগুলো। নীল নদে বিশ তিরিশ বছর অন্তর এমন বিধ্বংসী বন্যাআসে যে মানুষ অনেকদিন পর্যন্ত তা ভুলতে পারে না। গাঁয়ের বাপ দাদারা তার গল্প শোনায় তাদের সন্তান সন্ততিদের। চারধারে জল আর শুধু চাষের মাঠগুলো জেগে রইল দ্বীপের মত। নৌকোয় বা সাঁতার কেটে ছাড়া চাষের জমিতে পৌঁছনোর আর কোন উপায় নেই। যতদূর জানি, মুস্তাফা সাঈদ ছিল পাকা সাঁতারু। আমি তখন কী একটা কাজে খার্তুমে ছিলাম। আব্বার কাছে পরে শুনলাম সেদিন সন্ধ্যের নমাজের পর গাঁয়ের মেয়েদের চেঁচামেচি কান্না শুনে সবাই ছুটে গিয়ে দেখে মুস্তাফা সাঈদ-এর বাড়ি ভিড় জমেছে, আর বাড়ির মধ্যে থেকে কান্নার আওয়াজ আসছে। খোঁজ নিয়ে জানা গেল মুস্তাফা তখনো ঘরে ফেরে নি। ও সাধারণত সন্ধ্যে হলেই ঘরে ফিরত। কিন্তু সেদিন সন্ধ্যে উৎরে যাবার অনেক পরেও যখন ফিরল না তখন ওর বেগম বাড়ি থেকে বেরিয়ে জনে জনে জিজ্ঞেস করছিল কেউ তাকে দেখেছে কি না। কেউ বলে তাকে চাষের মাঠে দেখেছে, কেউ দেখেছে ঘরে ফেরার পথে, এছাড়া আর কোন সদুত্তর না পেয়ে মুস্তাফা সাঈদের বিবি চেঁচামেচি করে পাড়ার লোক জড়ো করেছে। সেই রাত্তিরেই গ্রামের পুরুষেরা সবাই লন্ঠন হাতে মুস্তাফা সাঈদের খোঁজে বেরিয়ে পড়ল। গ্রাম থেকে নদীর কিনারা পর্যন্ত আঁতিপাঁতি করে খুঁজেও যখন তার কোন টিকি পাওয়া গেল না তখন একদল কয়েকটা নৌকো নিয়ে খুঁজতে বেরল। সারা রাত খোঁজাখুঁজি করেও তার কোন সন্ধান পাওয়া গেল না। 'কারবা' পর্যন্ত নদীর ধারের সব কটা পুলিশ ফাঁড়িতে টেলিফোনে খবর দেওয়া হল। সারা সপ্তাহে নদীতে যতগুলো লাশ ভেসে উঠেছিল তার মধ্যেও মুস্তাফার লাশ পাওয়া গেল না। শেষে সবাই ধরে নিল মুস্তাফা জলেই ডুবেছে আর তার লাশটা কুমীরের পেটে গেছে।

আমার শুধু সেই রাত্রির কথা মনে পড়ে যখন মুস্তাফা আমাকে ইংরাজি কবিতা শুনিয়ে তাক লাগিয়ে দিয়েছিল। হাতে তার সুরার পাত্র, শরীর চেয়ারে এলানো, পা দুটো সামনে লম্বা করে ছড়ানো, আলো আঁধারির খেলা তার মুখে আর চোখের দৃষ্টি কোন দূর দিগন্তে

আপন ম্যনর গহনে ঘুরে মরছে। কোন এক শয়তানের কারসাজিতে বাইরের অন্ধকার তখন গ্রাস করতে চাইছে শুঁড়িখানার টিমটিমে আলো। মাঝে মাঝে ভাবি মুস্তাফা সাঈদ বলে কি কেউ ছিল কোনদিন? আসলে ও একটা অলীক, মিথ্যে, একটা অশরীরি, একটা স্বপ্ন বা দুঃস্বপ্ন, গাঁয়ের লোকের কাছে হাজির হয়েছিল কোন এক নিশুতি রাতের আঁধারে আর ভোরের আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে যেই তারা চোখ খুলল অমনি হারিয়ে গেল। বাড়ি থেকে রওনা হওয়ার সময় আমার শরীর অবসন্ন, মন আচ্ছন্ন। অবশ্য অনেকক্ষণ একভাবে বসে থাকার জন্যেও এটা হতে পারে। তবুও বাড়ি না ফিরে আমি হাঁটতে গ্রামের রাস্তায় হাঁটিতে বেরোলুম। বাড়িগুলোর মধ্যে যে সরু গলি সেই গলিতে গলিতে হাঁটছি একা একা। শিশির ভেজা উত্তুরে হাওয়ার ঝাপটা লাগছে আমার শরীরে মুখে। বাতাস আমোদিত সদ্য ফোটা বাবলা ফুল আর গোবরের গন্ধে, তার সঙ্গে মিশে রয়েছে সেচের জলে ভেজা সোঁদা মাটির গন্ধ, আধপাকা ভুট্টা আর লেবু গাছের সুবাস। সারা গ্রাম তখন নিঝুম নিস্তব্ধ। অনেক দূরে পাম্প সেট চলছে গুনগুনিয়ে, কোথাও একটা কুকুর ডেকে উঠলো, কার বাড়ির মুরগির খাঁচায় একটা মোরগ ডাকলো—ভাবছে বোধহয় ভোর হল, তার পর আবার সব শান্ত। ওয়াদ্ রাইয়েসের বাড়ির একটা নিচু জানলা দিয়ে ক্ষীণ আলো আসছে। পাশ দিয়ে হাঁটার সময় শুনতে পেলুম ওর বিবির রমণতৃপ্ত শীৎকার। ন্যিজর মনেই লজ্জা পেলুম—এসব আমার জ্ঞাতব্য নয়। সবাই যখন গভীর সুষুপ্তিমগ্ন তখন আমার এই একা একা ঘুরে বেড়ানোটা অনুচিত কাজ। এই গ্রামের প্রতিটি বাড়ি, গলি ঘুঁজি আমার অনেকদিনের চেনা। গ্রামের প্রান্তে যেখানে মরুভূমি শুরু হয়েছে, ওখানেই রয়েছে গোরস্থান, তার ঠিক মাঝখানে রয়েছে দশটা দরগার ভগ্নস্তূপ, —আমার ভীষণ চেনা। প্রতিটা কবর আমার চেনা—কতবার গেছি আমার আব্বা, মা আর দাদুর সঙ্গে। আমি জানি কোন কবরটা কার, কারুর এন্তেকাল হয়েছে আমার আব্বার জন্মের আগে কারুর বা হয়েছে আমার জন্মের পরে। আমি কতশত জানাজায় হেঁটেছি, কত গোরে মাটি দিয়েছি তার ইয়ত্তা নেই, কখনো ভোরের আলো ফোটার সময়, কখন ওর দুপুরের চড়া রোদ্দুরে, কখনো রাতের আঁধারে লণ্ঠনের আলোয়। চাষের মাঠগুলো আমার কতদিনের চেনা, সেই যখন জলচক্র দিয়ে খেতে সেচ দেওয়া তখন থেকে, কিংবা সেই যেবার খরায় শুকিয়ে বাদামী হয়ে গেল নদীর কিনারা থেকে মরুভূমির ধার পর্যন্ত সমস্ত জমি। কতলোক চলে গেল গ্রাম ছেড়ে দূরে দূরান্তরে দুমুঠো অন্নের খোঁজে। তারপর একদিন এলো পাম্পসেট, তৈরি হল কৃষক সমবায়। যারা গ্রাম ছেড়ে চলে গিয়েছিল তারাও একে একে ফিরে এলো। চাষের জমি আবার সবুজ হয়ে উঠলো। গ্রীষ্মে ভুট্টার চাষ হত আর শীতে গম। চোখ মেলে জগতের দিকে তাকানোর লগ্ন থেকেই এসব আমার দেখা, কিন্তু শেষ রাতের গ্রাম আমার আগে দেখা হয়নি। ওই যে তারাটা আকাশে জ্বলজ্বল করছে, ওটা নির্ঘাত শুকতারা। এই সময়টায় আকাশটা যেন আরো নীচু হয়ে রয়েছে। ভোরের আলো একটু একটু করে চুঁইয়ে আসছে আর সেই নরম ক্ষীণ আলোয় গ্রামটাকে মনে হচ্ছে যেন ঝুলে রয়েছে আসমান জমিনের মধ্যে। আমার দাদুর বাড়ি আর ওয়াদ রাইয়েসের বাড়ির মাঝখানে বালি ফেলা জায়গাটা পেরোনোর সময় মনে পড়ল মুস্তাফা সাঈদের গল্পের সেই অংশটা আর আমার

দু'কান রাঙা হয়ে উঠলো। যেমনটা হয়েছিল ওয়াদ্ রাইয়েসের বাড়ির পাশ দিয়ে আসার সময় ওর বিবির রমণসুখের শীৎকারে—দুটো কদলীকাণ্ডের মত মসৃন শুভ্র উরুর বিস্তার। দাদুর বাড়ির দরজায় পৌঁছে শুনি ওঁর গলা, মসজিদে রওনা হওয়ার আগে আয়াৎ আবৃত্তি করছেন। উনি কি কখনো ঘুমোন না? সেদিন শুতে গেলুম দাদুর প্রার্থনা শুনতে শুনতে আবার যখন ঘুম ভাঙলো তখনো শুনলুম প্রার্থনা। ওনাকে ঠিক এই রকম দেখছি কতকাল। এই সচল দুনিয়ায় ওঁরই যেন কোন পরিবর্তন নেই। ওঁর কথা ভাবতে ভাবতে আমার মনের অবসাদ কেটে গেল, আমি বেশ উদ্দীপ্ত হয়ে উঠলাম। মুস্তাফা সাঈদের গল্প আমার মনে যে আবিলতা ঘুলিয়ে তুলেছিল সেটা হঠাৎ সরে গেল, আমি যেন দীর্ঘ মানসিক অবসাদ কাটিয়ে আবার উজ্জীবিত হলাম। এখন আর বাড়িগুলো শূন্যে নিরালম্ব মনে হচ্ছে না, আকাশটাকেও আর তেমন ঘোলাটে মনে হচ্ছে না, গাছপালা বাড়িঘর সব আগের মত ঠেকছে। আচ্ছা এটা কি সম্ভব যে মুস্তাফা সাঈদের জীবনে যা ঘটেছিল তা আমার জীবনেও ঘটতে পারত? মুস্তাফা সাঈদ বলেছিল ও একটা মিথ্যা, তাহলে আমিও কি একটা মিথ্যা? আমার এখানকার জন্ম কর্ম সেটাও কি যথেষ্ট বাস্তব নয়? আমিও তো ওদেশে থেকেছি। তবে আমার থাকাটা অবশ্য ওপর ওপর। আমি ওদের ভালোও বাসি নি ঘৃণাও করি নি। আমার এই ছোট্ট গাঁয়ের চিত্রকল্প আমি সবসময়ে আমার মনে যত্নে লালন করেছি, যত দূরেই যাই, তাকে অবিকল দেখতে পাই আমার কল্পনায়।

লণ্ডনে গ্রীষ্মের সময় মাঝে মাঝে কয়েকপশলা বৃষ্টি হয় আর তখন মাটির সোঁদা গন্ধে বুক ভরে নিঃশ্বাস নিতে নিতে মনে পড়ত গাঁয়ের কথা, বেলাশেষের আলোয় মনশ্চক্ষে দেখতে পেতুম গাঁয়ের ছবি। রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আশে পাশের ভিনদেশী মানুষের কথাবার্তায় বিভ্রম হত, মনে হত আমার গাঁয়ের লোকেরা কথা বলছে। আমি বোধহয় সেই প্রজাতির পাখি যারা শুধু পৃথিবীর একটা বিশেষ অঞ্চলেই বাঁচতে পারে। এটা ঠিক যে আমি কাব্য নিয়ে পড়াশুনো করেছি কিন্তু তাতে কিছু যায় আসে না। আমি ইচ্ছে করলেই ইনজিনিয়ারিং বা কৃষিবিদ্যা বা ডাক্তারি পড়তে পারতাম। এগুলো সবই জীবিকার্জনের এক একটা রাস্তা মাত্র। ও দেশের মানুষের মুখগুলো কালো বা বাদামী ভাবলেই তো আমার চেনা লোকদের মত হয়ে যায়। ওদেশ এদেশের মতই, ভালোও নয় মন্দও নয়। কিন্তু আমার দেশ এটা। ওই যে খেজুর গাছটা দাঁড়িয়ে আছে। ওটা আমাদের বাড়ির উঠোনেই বেড়ে উঠেছে, অন্য কোথাও নয়। ওরা আমাদের দেশে এসে জুড়ে বসেছে বলেই কেন যে আমাদের বর্তমান, ভবিষ্যত সব বিষিয়ে তুলতে হবে তা আমি বুঝি না। আজ না হোক কাল ওরা আমাদের দেশ ছেড়ে চলে যাবেই, যেমন ইতিহাস জুড়ে কত লোক কত দেশ ছেড়ে চলে গেছে। এই রেলপথ, জাহাজ, হাসপাতাল, কারখানা, ইস্কুলগুলো আমাদের হবে আর আমরা ওদের ভাষায় কথা বলব—মনে অপরাধবোধ কিংবা কৃতজ্ঞতা নিয়ে। আবার আমরা যা ছিলাম তাই হব—সাধারণ মানুষ—আর আমরা যদি মিথ্যা হই তবে তা হব আমাদের নিজেদের ইচ্ছেয়।

এই ভাবনাটা আমার সঙ্গেই রইল অহর্নিশি। খার্তুমে গিয়ে যখন সরকারের শিক্ষা

দপ্তরের কাজে যোগ দিলাম তখনো চিন্তাটা আমাকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। বছর দুই হল মুস্তাফা সাঈদের এন্তেকাল হয়েছে, কিন্তু এখনো তার সঙ্গে আমার মাঝে দেখা হয়। আমার জীবনের পঁচিশ বছর কেটে গেছে, ওর মত লোকের সঙ্গে আলাপ হওয়া দূরে থাক নামটুকু পর্যন্ত শুনি নি আর হঠাৎ এমন এক জায়গায় তার সঙ্গে আমার আলাপ হল যেখানে তার মত লোকের দেখা পাওয়ার কোন সম্ভাবনাই নেই। এখন থেকে আমার ইচ্ছের বিরুদ্ধেই মুস্তাফা সাঈদ আমার জগতের অঙ্গ, মননের চিন্তা—একটা অশরীরী নাছোড় সঙ্গী। আর সেইজন্যেই আমার মনে একটু একটু করে ভয় বাসা বাঁধছে—ভয়টা সারল্য নিয়ে, কারণ সারল্যই সব নয়। মুস্তাফা সাঈদ বলেছিল আপনার দাদু জানে গোপন কথাটা। 'একটা গাছ বেড়ে ওঠে সহজভাবে আরআপনার দাদু দীর্ঘ জীবনযাপন করে একদিন মরে যাবে সহজভাবেই।' সোজা কথা। কিন্তু যদি ভেবে নিই ও আমার সারল্য নিয়ে মজা করছিল? খার্তুম থেকে 'আল ওবেইদ' যাবার পথে ট্রেনে আমার উল্টোদিকে বসা একজন অবসরপ্রাপ্ত সরকারি আমলার সঙ্গে আলাপ হল। আলাপটা জমে উঠতে বেশি সময় লাগল না। ট্রেনটা যখন 'কোস্তি' ছেড়েছে তখন উনি ওনার ইস্কুল জীবনের গল্প শুরু করলেন। আমাদের শিক্ষা মন্ত্রকের অনেক হোমরা চোমরারা দেখলাম ওনার ইস্কুলের প্রাক্তন ছাত্র, কেউ কেউ আবার ওনার ক্লাশেই পড়তেন। উনি বলে যাচ্ছেন—অমুক আমার এক ক্লাশ উপরে পড়ত এখন খুব বড় ইঞ্জিনিয়ার হয়েছে, অমুক একদম নির্বোধ ছিল কিন্তু যুদ্ধের বাজারে বেশ দুপয়সা কামিয়েছে, অমুক বিখ্যাত সার্জেন-ইস্কুলে পড়ার সময় গোঁড়া দক্ষিণপন্থী ছিল। এইসব নানা লোকের গপ্পো বলতে বলতে হঠাৎ একটু উত্তেজিত হয়ে বললেন 'কী অদ্ভুত ব্যাপার! আমাদের ক্লাশের সব থেকে মেধাবী ছাত্রের কথা আমার এতদিন মনেই পড়ে নি। এই আপনার সঙ্গে গল্প করতে করতে মনে পড়ল। হ্যাঁ ওর নামটাও মনে পড়ছে—মুস্তাফা সাঈদ।'

চোখের সামনে একটা গৌণ ব্যাপার হঠাৎ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠল। আমার সমস্ত চৈতন্য জুড়ে তখন কাড়ানাকাড়া বাজছে। ট্রেনের জানলা দিয়ে রোদের যে সরু ফালিটা ওনার চশমার কাচে এসে পড়ছে সেই সামান্য আলোটুকু যেন মধ্যগগনের সহস্র সূর্যের দীপ্তিতে ঝলসে উঠল। জগৎটা কেমন যেন হঠাৎ বদলে গেল। প্রথমে ওনাকে দেখে আমার মনে হয়েছিল বয়েসটা ষাটের কোঠায় হবে, আর এখন যেন মনে হচ্ছে চল্লিশের বেশি এক দিনও নয়।

'হ্যাঁ আমাদের সময়ে মুস্তাফা সাঈদ ই ছিল সবথেকে মেধাবী ছাত্র। ও আমাদের ক্লাশেই পড়ত, আমার ঠিক আগের বেঞ্চে বাঁ দিকে বেঁকে বসত। কী অদ্ভুত! ইস্কুল ছাড়ার পরে ওর কথা আমার মনেই ছিল না, অথচ সেইসময়ে ওরকম প্রতিভাধর আর কেউ ছিল না। গর্ডন কলেজের সবাই ওকে চিনত। শুধু আমার এগারোজনের চাইতেই নয়, বোর্ডিং-এর অধ্যক্ষ, নাটকের দলের মুখ্য অভিনেতা, দেওয়াল পত্রিকার লেখক বা সাহিত্য বাসরের বক্তা—সবার চাইতে ওর খ্যাতি ছিল অনেক বেশি। যদিও ও কখনো এই সব কর্মসূচীতে অংশ নেয় নি। ও ছিল বিচ্ছিন্ন এবং জেদী, একা একা ঘুরে বেড়াত আর শুধু পড়াশুনো নিয়েই থাকত। আমরা সবাই তখন গর্ডন কলেজের আবাসিক ছাত্র, এমন কি যারা খার্তুম বা

কাছাকাছি অঞ্চল, যেমন উত্তর খার্তুম, ওমদুরমানের ছেলে তারাও হস্টেলেই থাকত। ও সব বিষয়েই ছিল দারুণ মেধাবী। ওর আশ্চর্য মেধার কাছে কোন বিষয়ই কঠিন ছিল না। মাষ্টারমশাইরা ওকে শুধু ভালই বাসতেন না, বেশ সমীহই করতেন। বিশেষ করে ইংরাজি ভাষার শিক্ষকরা যখন পড়াতেন তখন মনে হত ও ছাড়া ক্লাশে যেন আর কোন ছাত্র নেই।'

অবসরপ্রাপ্ত মামুর সাহেব একটু থামলেন। একবার ভাবলাম ওনাকে বলি যে মুস্তাফা সাঈদ আমার চেনা। ভাবলাম আরো বলি যে কীভাবে আমার সঙ্গে তার আলাপ হল, কত সৌহার্দ্যে এক অসহ্য গরমের ভ্যাপসা গহন রাতে সে আমাকে তার জীবনের গল্প শুনিয়েছে, কীভাবে তার জীবনের শেষ দিনগুলো একটা অজ গাঁয়ে কেটেছে আর কীভাবে তার জীবন শেষ হয়েছে—সলিল সমাধিতে নাকি আত্মহত্যায়। তার ইচ্ছাপত্রে সবাইকে ছেড়ে আমাকেই তার সন্তানের অভিভাবক নির্বাচিত করে গিয়েছে। অবশ্য আমি কিছুই বললাম না, 'মামুর' সাহেব আবার শুরু করলেন—

'মুস্তাফা সাঈদ একলাফে তার সুদানের পড়াশুনো শেষ করে ফেলল—যেন সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে দৌড়চ্ছে। আমরা তখনো গর্ডন কলেজে রয়ে গেছি। ওকে একটা বৃত্তি দিয়ে প্রথমে পাঠানো হল কায়রো, তারপর সোজা লণ্ডন। সেই প্রথম একজন সুদানি ছাত্র বৃত্তি নিয়ে বিদেশে গেল। ইংরেজরা ওকে এত প্রশ্রয় দিত যে আমাদের ভীষণ হিংসে হত। তবে আমরা সকলেই ভাবতাম ও নিশ্চয়ই একদিন বিরাট কিছু করে ফেলবে। আমাদের ইংরাজি বলাটা ছিল আরবি বলার ঢঙ-এ। দুটো ব্যঞ্জনবর্ণের মধ্যে একটা স্বরবর্ণ না ঢুকিয়ে কিছুতেই উচ্চারণ করতে পারতাম না। মুস্তাফা সাঈদ ছিল একমাত্র ব্যতিক্রম। ঠোঁটটা বেঁকিয়ে বেঁকিয়ে এমনভাবে শব্দগুলো উচ্চারণ করত যেন ইংরাজিটা ওর মাতৃভাষা। ওর এই আশ্চর্য ক্ষমতায় আমরা যুগপৎ ঈর্ষান্বিত এবং মুগ্ধ হয়ে যেতাম। এই মুগ্ধতা এবং বিদ্বেষের জন্যে আমরা ওর নাম দিয়েছিলাম "কালো ইংরেজ"। আমাদের ছাত্র জীবনে ইংরাজি ভাষায় দখলটা ছিল ভবিষ্যত জীবনে সাফল্যের চাবি। এই পারদর্শিতা ছাড়া কোন কিছু করা প্রায় অসাধ্য ছিল। গর্ডন কলেজটা আসলে ছিল মাধ্যমিক স্তরের চাইতে একটু বেশি পড়াশুনো করার ইস্কুল। বিভিন্ন সরকারি বিভাগে নিচুতলার কর্মচারি হবার জন্য যেটুকু শিক্ষার দরকার ঠিক সেটুকু শিক্ষাই দেওয়া হত। আমি ইস্কুল থেকে বেরিয়ে প্রথমে 'ফামের' জেলায় ক্যাশিয়ারের পদে বহাল হলাম। তারপর অনেক কাঠখড় পোড়ানোর পর প্রশাসনিক পদের জন্যে পরীক্ষা দেওয়ার অনুমতি পাই। ভাবতে পারেন তিরিশটা বছর আমার কেটে গেছে 'সাব-মামুর'-এর পদে চাকরি করে। অবসর নেওয়ার মাত্র দুবছর আগে আমাকে 'মামুর' পদে উন্নীত করা হল। ইংরেজ জিলা কমিশনার তো প্রায় খোদার সমতুল। তাঁর শাসনের পরিধি বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জের চাইতেও বেশি। থাকার বাড়িটা একটা বিশাল প্রাসাদ, চারদিকে অসংখ্য চাকরবাকরের দল, বাইরে পাহারায় শান্ত্রী মোতায়েন—সে এক এলাহি ব্যাপার। এইসব জিলা কমিশনার আচারে ব্যবহারেও প্রায় খোদার তুল্য। এরা আমাদের মানে নেটিবদের নিয়োগ করে সরকারি দপ্তরের নিচু পদে, খাজনা আদায়ের কাজে। জেলার মানুষ আমাদের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ নিয়ে

হাজির হত সাহেবদের দরবারে। ইংরেজ কমিশনার কখনো কখনো দয়া করে কারুর খাজনা মকুব করলেও আমাদের সে ক্ষমতা ছিল না। ফলে আমরা, যারা দেশের সাধারণ মানুষের আত্মীয় তারা হতাম ঘৃণার পাত্র আর ঔপনিবেশিকরা, অর্থাৎ যারা দেশের বাইরে থেকে উড়ে এসে জুড়ে বসেছে তারা হয়ে যেত সাধারণের ভালোবাসার পাত্র। আপনি আমার কথাগুলো খেয়াল করবেন। আমাদের দেশটা কি এখন স্বাধীন হয় নি? আমরা কি নিজের দেশের স্বাধীন নাগরিক নই? একটা ব্যাপারে নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন যে ওরা সবসময়েই দূর থেকে আমাদের নিয়ন্ত্রণ করছে। কারণ ওরা চলে গেলেও রেখে গেছে ওদের মত ভাবনা চিন্তার লোক। ইংরেজের আমলে সরকারের উচ্চতম পদে ওদের বিশেষ আনুকূল্যে বহাল হয়েছে কিছু অপদার্থ লোকজন। আমাদের একটুও সন্দেহ ছিল না মুস্তাফা সাঈদ বড় কিছু একটা করবেই। ওর আব্বা ছিলেন 'আবাবদা' উপজাতির মানুষ। এই উপজাতির লোকেরা মিশর আর সুদানের সীমান্ত অঞ্চলের বাসিন্দা। এরাই স্লাতিন পাশাকে খলিফা আর তাআশি-র কারাগার থেকে পালাতে সাহায্য করেছিল। কিচেনার যখন সুদান পুনর্দখল করলেন তখন এরাই তাঁর ফৌজের গাইড-এর কাজ করত। শোনা যায় ওর মা ক্রীতদাসী ছিলেন, ঝান্দি কিংবা বারিয়া—কোন উপজাতির মেয়ে তা আল্লাই জানেন। ইংরেজ আমলে ভালো চাকরিগুলো পেত সমাজের অপদার্থ, নিষ্কর্মাগুলোই।'

সেদিন বোধহয় পূর্ণিমা, চরাচর ভেসে যাচ্ছে হা হা করা জ্যোৎস্নায়। সময়টা মধ্যরাত্রির একটু পরে, মামুর সাহেব উল্টো দিকের বাঙ্কে নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছেন। ট্রেনটা 'সেন্নার' বাঁধ-এর উপর দিয়ে চলছে। ইংরেজরা এই বাঁধ তৈরি করেছিল ১৯২৫ সালে। আমরা চলেছি পশ্চিমে, 'আল ওবাইদ'-এর দিকে। সামনে রেল লাইন চলে গেছে মরুভূমির বুক চিরে, মনে হচ্ছে যেন দুটো দুর্গম পাহাড়ের মধ্যেকার গিরিখাতে একটা সরু দড়ির সেতু ঝুলছে। নীচে অন্তহীন অন্ধকার গহ্বর। বেচারা মুস্তাফা সাঈদ। এই মামুর, কমিশনারদের জগতে ওর একটা কেউকেটা হবার কথা ছিল অথচ হাজার হাজার বর্গমাইল জোড়া এই দেশে বেচারা তিন হাত জমিও পেল না অন্তিম নিদ্রার জন্যে। আমার মনে পড়ল, ও বলেছিল 'ওল্ড বেইলি' আদালতে রায় দেবার সময় বিচারক বলেছিলেন, 'মিঃ সাঈদ, অসাধারণ শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও আপনি অত্যন্ত বোকা লোক। আপনার আত্মায় একটা অন্ধকার দিক আছে আর সেইজন্যে আপনার হাতছাড়া হয়ে গেল ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ দান—ভালোবাসা।'

মুস্তাফা সাঈদের ভূত খার্তুমেও আমাকে তাড়া করে ফিরছিল। প্রাক্তন মামুর-এর সঙ্গে আলাপ হওয়ার পরে মাসখানেকও কাটে নি, এমন সময় সেই ভূতটার সংস্পর্শে এলাম। ও যেন মুক্তি পাওয়া একটা দানো মানুষের কানে কানে ফিসফিসিয়ে ফিরছে। কিন্তু কী বলতে চায়? আমি জানি না। একদিন একজন অল্পবয়সী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকের বাড়ি আমরা জড়ো হয়েছিলাম। আমি যখন ইংলণ্ডে ছিলাম তখন এই যুবকও ইংলণ্ডে পড়াশুনো করছিল। ওর বাড়িতে একজন ইংরেজ যুবকের সঙ্গে আলাপ হল—সেও তখন আমাদের অর্থমন্ত্রকে কাজ করছিল। কথাবার্তা হচ্ছিল 'মিশ্র বিবাহ' নিয়ে। আলোচনাটা ক্রমশ সাধারণ থেকে বিশেষের দিকে ঘুরে গেল। যেমন কে কে ইউরোপিয় মেয়ে শাদি করেছে, কে কে ইংরেজ

মেয়ে শাদি করেছে? অমুক? না অমুক? না। তারপরেই হঠাৎ—মুস্তাফা সাঈদ। নামটা বলল সেই অল্পবয়সী অধ্যাপক, আর বলার সময় তার মুখটাও প্রাক্তন মামুরের মত আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। খার্তুমের সেই নক্ষত্রখচিত শীতের সন্ধেয় অধ্যাপক ভদ্রলোক বলে চলেছেন — 'সুদানিদের মধ্যে মুস্তাফা সাঈদই প্রথম কোন ইংরেজ মহিলাকে শাদি করেন। শুধু ইংরেজ নয় কোন ইউরোপিয় মহিলাকেই তার আগে আর কেউ শাদি করে নি। আপনারা হয়ত ওর নাম শোনেন নি কারণ উনি অনেকদিন আগে বিদেশে গিয়ে ইংলণ্ডের নাগরিকত্ব নিয়েছেন। তিরিশের দশকে ইংরেজের সুদান সংক্রান্ত ষড়যন্ত্রে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকা সত্ত্বেও কেন যে ওঁকে কেউ মনে রাখে নি এটা আমার খুব অদ্ভুত লাগে। ইংরেজের বিশ্বস্ত সমর্থকদের মধ্যে উনি একজন। বৈদেশিক দপ্তর ওনাকে নানা সন্দেহজনক গোপন কাজের দায়িত্ব নিয়ে মধ্য প্রাচ্যে পাঠিয়েছিল। উনি ১৯৩৬-এর লণ্ডন বৈঠকের সম্পাদকমণ্ডলীর একজন গুরুত্বপূর্ণ সদস্য ছিলেন। এখন উনি কোটিপতি, ইংলাণ্ডের কোন গ্রামে রাজার হালে জীবন কাটাচ্ছেন।'

নিজের অজান্তে আমার মুখ ফস্কে বেরিয়ে গেল—'মারা যাবার সময় মুস্তাফা সাঈদ রেখে গেছেন ছয় একর চাষের জমি, তিনটে গরু একটা ষাঁড়, দুটো গাধা, দশটা ছাগল পাঁচটা ভেড়া, তিরিশটা খেজুর গাছ, বাবলা, সয়াল, হারাজ মিলিয়ে আরো তেইশটা গাছ, পঁচিশটা লেবু, পঁচিশটা কমলা গাছ, নয় বস্তা গম, নয় বস্তা মকাই, পাঁচটা ঘর আর একটা দাওয়া সমেত একটা বাড়ি, যে বাড়িটায় আরো একটা লাল ইঁটের দেওয়াল, সবুজ জানলাওয়ালা দোচালা ঘর আছে। এ ছাড়া ক্যাশ টাকা রেখে গেছেন নশো সাঁইত্রিশ পাউণ্ড, তিন পিয়াস্ত্রে পাঁচ মিলিয়েম!'

আমি লক্ষ্য করলুম সেই অধ্যাপকের চোখে মুখে মুহূর্তের জন্য একটা আতঙ্কের ছায়া খেলে গেল আর সেই মুহূর্তে ওর দৃষ্টি স্থির হয়ে চোয়ালটা ঝুলে পড়ল। ভয় না পেলে আমাকে কেন জিজ্ঞেস করবে—'আপনি কি ওর ছেলে?'

অধ্যাপক ভদ্রলোক বেশ ভালোভাবেই জানেন আমি কে, তাই তাঁর এই প্রশ্নের যথার্থতা আমার মনে হয় উনি নিজেই জানেন না। যদিও আমরা ইংলণ্ডে এক জায়গায় পড়াশুনো করি নি, তবু আমরা সেই দেশে ছিলাম প্রায় একই সময়ে। নাইটসব্রিজ-এর পাব-এ আমাদের দেখা হয়েছে অনেক বার, একসঙ্গে বিয়ার পান করেছি অনেকদিন। তা সত্ত্বেও এক লহমায় স্থান কালের সীমানার বাইরে ওর কাছেও অনেক কিছুই অলীক মনে হচ্ছে। সব কিছুই মনে হচ্ছে সম্ভব। ওই অধ্যাপক ভদ্রলোকও তো মুস্তাফা সাঈদ-এর ছেলে কিংবা ভাই কিংবা খুড়তুতো ভাই হতে পারতেন। সেই মুহূর্তে এক লহমায় পৃথিবীটা অনন্ত সম্ভাবনাময় হয়ে গেল, যেন আদম আর ইভ সবেমাত্র স্বর্গ থেকে পতিত হল।

এরকম হাজারো সম্ভাবনা থিতিয়ে এলো আমার উচ্চকিত হাসিতে, পৃথিবীটা যেখানে ছিল আবার সেখানে ফিরে এলো—সব চেনা মানুষ চেনা নামে, চেনা কাজে ফিরে এলো সেই হৈমন্তী সন্ধ্যায়। অধ্যাপক ভদ্রলোক বেশ অপ্রস্তুত 'আপনি কেন মুস্তাফা সাঈদের... সাঈদের ছেলে বা আত্মীয় হতে যাবেন, হয়ত জীবনে ওর নামই শোনেন নি। আমি ভুলেই

গিয়েছিলাম যে আপনারা কবি, কল্পনার রাজ্যেই আপনাদের বিচরণ।'

আমার হয়েছে এক জ্বালা। পছন্দ করি বা না করি লোকে আমাকে কবি ঠাউরে নেয়. কারণ আমি এক অখ্যাত ইংরেজ কবির জীবনের গলি ঘুঁজির মধ্যে তিন বছর কাটিয়ে দেশে ফিরেছি, তারপর কিছুদিন ইস্কুলে প্রাক্ ইসলামিক সাহিত্য পড়ানোর পর আপাতত সরকারের একজন বুনিয়াদি শিক্ষা পরিদর্শক পদে বহাল হয়েছি।

ইংরেজ ভদ্রলোক এতক্ষণ বিশেষ কিছু বলেন নি। তিনি এবার বললেন যে সুদানে ইংরেজের ষড়যন্ত্রে মুস্তাফা সাঈদের কী ভূমিকা ছিল সে সম্পর্কে তাঁর কোন ধারণা না থাকলেও সে যে খুব নির্ভরযোগ্য অর্থনীতিবিদ ছিল না তা বিলক্ষণ জানেন। আমি ওর কিছু লেখা, যাকে উনি নাম দিয়েছেন "উপনিবেশ গড়ার অর্থনীতি" পড়েছি। ওঁর লেখার মূল ত্রুটি হল ব্যবহৃত পরিসংখ্যানগুলো ঠিক বিশ্বাসযোগ্য নয়। ওঁর চিন্তা ভাবনা অনেকটা ফেবিয়ান ঘরাণার অর্থনীতিবিদদের মত। এরা সাধারণীকরণের পর্দার আড়ালে লুকিয়ে পরিসংখ্যান প্রতিষ্ঠিত তথ্যের মুখোমুখি হওয়া এড়াতেন। বিচার, সাম্য, সমাজতন্ত্র—এগুলো শুধু কথার কথা। অর্থনীতিবিদ তো আর চার্লস ডিকেন্স বা রাজনৈতিক সংস্কারক রুজভেল্টের মত লেখক নন, যে শুধু একটা যন্ত্র যার কোন মূল্যই নেই তথ্য, পরিসংখ্যান বা অঙ্ক ছাড়া। একটা তথ্যের সঙ্গে আর একটা, একটা পরিসংখ্যানের সঙ্গে আর একটার যে সম্পর্ক তার সংজ্ঞা নির্ধারণের বেশি একজন অর্থনীতিবিদ আর কীই বা করতে পারেন পরিসংখ্যান বা অঙ্ক তৈরি করাটা শাসক বা রাজনীতিক-এর কাজ। পৃথিবীর আর রাজনীতিক-এর দরকার নেই। না মশায় আপনাদের এই মুস্তাফা সাঈদকে অর্থনতিবিদ হিসেবে নির্ভর করা যায় না।'

আমি তাকে জিজ্ঞেস করলুম মুস্তাফা সাঈদ-এর সঙ্গে ওনার আলাপ আছে কিনা।

'নাঃ! আমার সঙ্গে ওনার কখনো আলাপ হয় নি। আমি ভর্তি হবার অনেক আগেই উনি অক্সফোর্ড থেকে বেরিয়ে গেছেন, তবে এখান ওখান থেকে ওনার সম্পর্কে অনেক কিছুই শুনেছি। মনে হয় উনি মেয়েদের কাছে খুব প্রিয় ছিলেন। উনি নিজেকে একটা কিংবদন্তী বানিয়ে তুলেছিলেন—সুদর্শন, কালো, একজন আকর্ষণীয় পুরুষ, ছন্নছাড়াদের আড্ডায় ভক্ত পরিবেষ্টিত হয়ে ঘুরে বেড়াতেন।'

'মনে হয় অভিজাত সমাজের কেউ কেউ ওঁকে প্রদর্শনীয় হিসেবে ব্যবহার করছিলেন। এঁরাই বিশ, ত্রিশের দশকে 'লিবারাল'-দের উপর বেশ প্রভাব ফেলেছিলেন। বলা হত উনি নাকি লর্ড অমুক, লর্ড তমুক-এর বন্ধু। আবার ইংরেজ বামপন্থীদেরও খুব প্রিয়পাত্র হয়ে উঠেছিলেন। সেটা অবশ্য খুবই দুর্ভাগ্যের, কারণ বুদ্ধিমান হিসেবে ওনার খ্যাতি তখন সর্বজনবিদিত। দুনিয়ায় এই বামপন্থী অর্থনীতিবিদদের চেয়ে খারাপ আর কিছু হতে পারে না। এমন কি বিদ্যায়তনিক পদটাও আমার ধারণা এইসব কারণেই উনি পেয়েছিলেন, অবশ্য পদটা যে ঠিক কী তা আমার জানা নেই। ওরা বোধহয় বলতে চাইছিল যে এই দেখ জাতি হিসেবে আমরা কত সংস্কারমুক্ত আর সহনশীল। এই আফ্রিকার লোকটি আমাদের মতই একজন। এ আমাদের একজনের কন্যার পানিগ্রহণ করেছে আর আমাদের সমান মর্যাদায় কাজ করছে আমাদের সঙ্গে। দক্ষিণ আফ্রিকা বা আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণের রাজ্যগুলোতে

যে সব পাগল এখনো বিশ্বাস করে শ্বেতাঙ্গরাই মহত্তম, এই লোকগুলো তাদের থেকে কোন অংশে কম শয়তান নয়। এই ধরণের আবেগের আতিশয্য ঠেলে দেয় অতি বাম বা অতি দক্ষিণ পন্থায়। উনি যদি শুধু বিদ্যায়তনিক পঠন পাঠন নিয়েই ব্যস্ত থাকতেন তাহলে দেশে বিদেশে অনেক বন্ধু পেতেন আর আজ এখানেও সবাই তাঁকে জানত। উনি পাশ্চাত্য শিক্ষালব্ধ জ্ঞান নিয়ে ফিরে এসে এদেশের অনেক উপকারে লাগতে পারতেন, বিশেষ করে যখন নানা রকম কুসংস্কার এই দেশ, দেশের মানুষকে এখনো নিয়ন্ত্রণ করছে। এই দেখুন না পুরোণ সংস্কাগুলোর পাশাপাশি কত নতুন ধরণের সংস্কারে এই দেশের মানুষের চৈতন্য আবিল— শিল্পায়ন, জাতীয়করণ, আরব ঐক্য, আফ্রিকার ঐক্য, আরো কত রকমের সংস্কার। আপনারা শিশুর মত বিশ্বাস করেন মাটির নীচে পোঁতা রয়েছে যে অতুল ঐশ্বর্য, কোনো জাদুবলে তা একদিন আপনাদের করায়ত্ত হবে আর আপনাদের সব সমস্যার সমাধান হয়ে প্রতিষ্ঠিত হবে নন্দন কানন। এসব উদ্ভট কল্পনা দিবাস্বপ্ন ছাড়া আর কি? অঙ্ক, পরিসংখ্যানের মাধ্যমে আপনাদের উচিত হবে বাস্তব অবস্থার প্রেক্ষিতে নিজেদের সীমিত সাধ্যের মধ্যে পরিবর্তন আনার চেষ্টা করা। আর এটুকু করা মুস্তাফা সাঈদের মত লোকের সাধ্যের মধ্যেই ছিল। কিন্তু তা হল না। হল না তার কারণ একদল অপদার্থ ইংরেজের পাল্লায় পড়ে সে হয়ে উঠল একটা ভাঁড়।'

রিচার্ড-এর এই যুক্তির প্রতিবাদে মনসুর তর্ক জুড়ে দিল, আমি রইলুম নীরব শ্রোতা হয়ে। কী লাভ তর্ক করে। এই রিচার্ড ছোকরা অত্যন্ত গোঁড়া ইংরেজ। অবশ্য কোন না কোন ভাবে সবাই গোঁড়া। হয়তো ও ঠিকই বলেছে, হয়তো আমরা সত্যিই সংস্কারাচ্ছন্ন কিন্তু রিচার্ড নিজেও তো একটা সমকালীন সংস্কারের নেশায় বুঁদ হয়ে আছে—সেটা হল পরিসংখ্যানের সংস্কার। আমাদের যদি কোন ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখতেই হয়, তবে সেই ঈশ্বর হোক সর্বশক্তিমান। পরিসংখ্যান দিয়ে হবেটা কি? ইতিহাসের একটা বিশেষ কালসীমায় সাদা চামড়ার মানুষ আমাদের শাসন করেছে বলেই আমাদের প্রতি তাদের অবজ্ঞা মিশ্রিত ঘৃণা দীর্ঘদিন ধরেই বলবৎ রয়েছে। আসলে এই মনোভাব দুর্বলের প্রতি সবলের। মুস্তাফা সাঈদ ওদের বলেছিল—'আমি এসেছি তোমাদের জয় করতে।' সন্দেহ নেই এটা একটা অতি নাটকীয় বাক্যবন্ধ। তবে একথাও ঠিক যে আমাদের ভূখণ্ডে ওদের অনুপ্রবেশ আমরা যত বড় ট্রাজেডি ভাবছি আসলে ততটা নয়, আবার ওরাও সেটা যত বড় আশীর্বাদ বলে ভাবতে চাইছে তাও নয়। ওদের আসাটা একটা অতি নাটকীয় ঘটনা যা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়িয়ে যাবে একটা 'মিথ'-এ। মনসুর রিচার্ডকে বলছে—'তোমরা পুঁজিবাদি কোম্পানি ছাড়া আমাদের আর কী দিয়েছ? এই কোম্পানিগুলো এখনো আমাদের রক্ত শুষে চলেছে।' উত্তরে রিচার্ড বলল—'এসব দেখেই তো বোঝা যায় যে আমাদের ছাড়া তোমরা বাঁচতেই পার না। ঔপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে তোমাদের এত অভিযোগ অথচ আমরা চলে যেতেই তোমরা গড়ে তুলেছ নজিরহীন কিংবদন্তী। আমাদের উপস্থিতি, তা সে প্রত্যক্ষই হোক আর পরোক্ষই হোক, তোমাদের কাছে একান্ত জরুরী, জল হাওয়ার মতই অপরিহার্য।' ওদের তর্কে কোন রাগ দ্বেষ-এর চিহ্ন নেই, বেশ হাসিঠাট্টার মধ্যে তর্ক চলছে, বিষুবরেখার একদম কাছের এই শহরে,

অথচ দুজনের মধ্যে কী দুস্তর ব্যবধান। একটা তলহীন ঐতিহাসিক গিরিখাত যেন দুজনকে বিসংলগ্ন করে রেখেছে।

মাননীয় মশায়রা, আপনারা কিন্তু ঘুণাক্ষরেও ভাববেন না যে মুস্তাফা সাঈদ সারাক্ষণ আমার মনকে আচ্ছন্ন, আবিষ্ট করে রেখেছিল। কখনো মাসের পর মাস কেটে যেত, ওর কথা আমার মনেও পড়ত না। যাইহোক সে মরে গেছে, মৃত্যুর কারণ জলে ডোবা না আত্মহত্যা তা আল্লাই জানেন। রোজই তো কত হাজার হাজার লোক মরছে। তাদের প্রত্যেকের মৃত্যু নিয়ে এখন যদি ভাবতে বসি তাহলে আমরা, যারা এখনো বেঁচে আছি তাদের কী হবে? আমরা চাই বা না চাই দুনিয়া তার আপন নিয়মেই চলবে। আমিও কোটি কোটি লোকের মত হাঁটব, চলব, অনেকটাই অভ্যাসের বশে—লম্বা কাফেলার মত, চড়াই-এ উঠব, উৎরাই-এ নামব। মাঝে মাঝে ছাউনি ফেলে রাত কাটিয়ে ভোরের আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে আবার যাত্রা করব। এই কাফেলার জীবন আদৌ খারাপ নয়। আপনারা নিশ্চয়ই এ সম্পর্কে যথেষ্ট অবহিত। দিনের বেলা অসহ্য গরম, সামনে অন্তহীন মরুপ্রান্তর প্রখর তপন তাপে গনগন করছে, আদিগন্ত জনমনিষ্যি নেই, ঘর্মাক্ত কলেবর, তেষ্টায় ছাতি ফেটে যাচ্ছে তবুও আমরা চলতেই থাকি আমাদের সহ্যের সীমানা পর্যন্ত। তারপর সূর্য পাটে বসে, বাতাস শীতল হয়ে প্রাণ জুড়িয়ে দেয়, লক্ষ লক্ষ তারায় আকাশটা ভরে যায়। আমরা খাই দাই, কেউ বা গান ধরে কেউ বা শেখকে অনুসরণ করে একসঙ্গে নামাজ পড়ে আর বাকিরা গোল হয়ে গানের তালে তালি দিই, নাচি। আমাদের সাক্ষী শুধু মূক, মরমী, উষ্ণ আকাশ। কখনো আমরা রাতের আঁধারে চলতে থাকি যতদূর যাওয়া যায়, তারপর যখন সাদা আর কালো সুতোর রঙের ফারাকটা স্পষ্ট হবার মত আলো কাটে তখন আমরা থামি এবং সমবেত কণ্ঠে বলি— 'যখন ভোর হবে তখন কাফেলার সবাই রাতে পথ চলার জন্য কৃতজ্ঞ থাকবে।' কখনো যদি মরীচিকায় পথ ভুল হয় বা অসহ্য গরম আর বুকফাটা তেষ্টায় মনের ভারসাম্য হারিয়ে অবাস্তব এলোমেলো চিন্তার উদয় হয়, তাতেও কিছু এসে যায় না। রাতের প্রেতাত্মা হারিয়ে যায় দিনের আলোয়, দিনের নিষ্ঠুর দাবদাহের জ্বালা জুড়োয় রাতের শীতল বাতাসে। এর কি কোন বিকল্প হয়?

আমি তাই প্রতিবছর মাস দুয়েক কাটাতুম নীল নদের বাঁকের সেই ছোট্ট গ্রামে, যেখানে নদীটা উত্তর-দক্ষিণে চলতে চলতে হঠাৎ সমকোণে বাঁক নিয়ে পূব-পশ্চিমে চলতে শুরু করেছে। নদীটা এখানে খুব চওড়া আর গভীর। নদীর মাঝখানে চর জেগে উঠে ছোট ছোট সুবজ দ্বীপ তৈরি করেছে। এই দ্বীপগুলোর সবুজ গালচের উপর উড়ে বেড়ায় কত শত সাদা পাখি। দুই পারে ঘন খেজুর বনে সবুজের সমারোহ, কোথাও জলচক্র চালিয়ে কোথাও বা পাম্প চালিয়ে চাষের জমিতে সেচ দেওয়া হচ্ছে। লোকগুলো খালি গায়ে লম্বা পাজামা পরে খেতে কাজ করছে—কখনো চারা রুইছে কখনো ফসল কাটছে, যখন স্টিমারটা চলে যায় যেন নদীর মাঝখানে একটা ভাসমান দুর্গ তখন সবাই হাতের কাজ ফেলে তাকিয়ে থাকে সেই দিকে নির্নিমেষে, যতক্ষণ দেখা যায় তারপর আবার যে যার কাজে লেগে পড়ে। হপ্তায়

একদিন দুপুরে ষ্টিমারটাকে দেখা যায়, আর যখন যায় তখন নদীর জল এমন তোলপাড় করে যে নদীর শান্ত জলে খেজুর বনের প্রতিবিম্ব কোথায় হারিয়ে যায়। ষ্টিমারের বাঁশি আমার স্বজনেরা তাদের বাড়িতে বসে যখন দুপুরের কফি খায় তখন শুনতে পায়। ষ্টিমার ঘাটটা অনেক দূর থেকে দেখা যায়। একটা সাদা প্ল্যাটফর্ম আর তার ধারে ধারে সাইকোমোর গাছের সারি। নদীর দুই তীরেই ব্যস্ততা, কেউ গাধার পিঠে কেউ হেঁটে আসছে। নদীর অন্য পারে ছোট ছোট কিস্তি নৌকো আর পালতোলা বজরাগুলো দড়ি খুলে দিয়ে ভেসে পড়ল। ষ্টিমারটা ঘুরে গিয়ে দাঁড়াল প্ল্যাট ফর্মে গা লাগিয়ে। অনেক মহিলা-পুরুষ জড়ো হয়েছে ষ্টিমার ঘাটে। ওই তো আব্বা ওই তো আমার চাচারা আরা চাচাতো ভাইয়েরা, ওরা সবাই সাইকোমের গাছে গাধাগুলো বেঁধে রেখে জটলা করছে। এখন আর কোন পাতলা কুয়াশার অস্বচ্ছ আড়াল নেই ওদের আর আমার মধ্যে। আমি তো এখন আসছি খার্তুম থেকে মাত্র সাতমাস পরে। আমি এখন ওদের দেখছি বাস্তবের চোখ দিয়ে। ওদের পরণের পিরেনগুলো কাচা কিন্তু ইস্তিরি করা নয়, মাথার পাগড়ি গায়ের পিরেনের চাইতে ফর্সা, গোঁপগুলো ছোট বড়, কাঁচা পাকা বা দুইয়ের মিশেল, কেউ দাড়ি রেখেছে কেউ রাখে নি কিন্তু কামায়ওনি। ওদের গাধাগুলোর মধ্যে একটা দেখছি কালো রঙের—কই এটাতো আগে দেখি নি। গাধাগুলো নির্বিকার চেয়ে রয়েছে ষ্টিমারটার দিকে। নোঙর করা হয়ে গেলে যাত্রিরা নামতে শুরু করল একে একে আর অপেক্ষমান জনতা ভিড় করে এগিয়ে এলো সেই দিকে। আমরা নামতেই সবাই তাড়াতাড়ি করে এগিয়ে এসে আমার আর আমার বেগমের করমর্দন করল আর আমার কন্যাকে চুমোয় চুমোয় ভরিয়ে দিল। আমরা যখন গাধার পিঠে চেপে গাঁয়ে ফিরছি তখন সে এর ওর কোলে কোলেই ঘুরতে থাকল। এরকমই হয়ে আসছে বরাবর, সেই যখন ইস্কুলে পড়তুম তখন থেকেই, কখনো এর ব্যত্যয় হয় নি, শুধু বিদেশে থাকার দীর্ঘ সময়টুকু ছাড়া—সে কথা তো আপনাদের আগেই বলেছি। গাঁয়ে ফেরার পথে আব্বার কাছে শুনলুম, কালো গাধাটার বৃত্তান্ত। 'তোমার চাচাকে একটা বেদুইন ঠকিয়েছে। ওই কালো গাধাটা দিয়ে ওর সাদা গাধাটা আর পাঁচ পাউণ্ড হাতিয়ে নিয়েছে।' কোন চাচাকে ঠকালো ভাবতে ভাবতেই পাশ থেকে আবদুল করিম চাচা প্রতিবাদ করে উঠলো—'এই কালো গাধাটার তুলনা নেই। সারা গাঁয়ে এর চেয়ে ভালো গাধা যদি কেউ দেখাতে পারে তাহলে আমি আমার বিবিকে তালাক দিতে রাজি। এটা তো গাধা নয়, একটা ভালো জাতের মাদী ঘোড়ার সমান। আমি চাইলে এখুনি এটাকে তিরিশ পাউণ্ডে বেচতে পারি।' ওপাশ থেকে আবদুর রহমান চাচা ফুট কাটলো—'ওটা যদি গাধী হয় তাহলে বলতেই হবে ওটা বাঁজা। গাধার যদি বাচ্চাই না হয় তাহলে আর কী ফায়দা?' জানতে চাইলুম এ বছর খেজুরের ফলন কেমন, উত্তরটা অবশ্য জানাই ছিল। 'একদম ভালো না।' প্রতি বছর ওই একটাই উত্তর, বুঝতে পারলাম অবস্থা তেমন সঙ্গিন নয়। নদীর ধারে দেখলাম একটা লাল ইঁটের বাড়ি অর্ধেক তৈরি হয়েছে। আবদুল মান্নান চাচা জানালেন — 'ওটা হাসপাতাল, বছর ঘুরে গেল তাও শেষ হল না। যেমন আমাদের সরকার।' সাত মাস আগে যখন গাঁয়ে এসে ছিলুম তখন এই বাড়িটা তৈরি শুরুই হয় নি, আবদুল মান্নান চাচাকে সে কথা বলার চেষ্টা করে কোন লাভ হল না। ওনাকে তখন কথায় পেয়েছে—'ওদের তো

কাজ বলতে একটাই। দু তিন বছর পর পর একটা লরি ভাড়া করে হাতে পোস্টার একদল লোক জুটিয়ে রগ ফাটিয়ে চেঁচালে—অমুক দীর্ঘজীবী হোক, তমুক নিপাত যাক, ব্যস হয়ে গেল।' আর ঠিক সেই সময়েই আমাদের পাশ দিয়ে একটা লঝ্‌ঝড়ে লরিতে একদল লোক স্লোগান দিতে দিতে চলে গেল—'জাতীয় গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রী পার্টি যুগ যুগ জিও।' এরাই কি সেই 'কৃষক' যাদের কথা বই পত্তরে লেখা হয়? দাদুকে যদি বলতুম যে তাঁর নামেই বিপ্লব হয়, সরকার ভাঙা হয়, গড়া হয় তাহলে তিনি হেসেই উড়িয়ে দিতেন। চিন্তাটা এখানে একদম বেমানান যেমন অবিশ্বাস্য এই গাঁয়ে মুস্তাফা সাঈদের জীবন এবং মৃত্যু। মুস্তাফা সাঈদ নিয়মিত মসজিদে নমাজ পড়তে যেত। ও যে কেন এইরকম হাস্যকর বাড়াবাড়ি করত কে জানে। ও কি এই প্রত্যন্ত গাঁয়ে এসেছিল আত্মার শান্তি খুঁজতে? হয়ত ওই চৌকো সবুজ জানলাওয়ালা ঘরটার মধ্যে এর উত্তর পাওয়া যাবে। আমি কী আশা করি? আমি কি আশা করি ওকে দেখব ওই ঘরে, অন্ধকার ঘরে চেয়ারে বসে আছে? নাকি দেখব চাল থেকে গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলে রয়েছে? আর আমার জন্যে গালা দিয়ে সিল করা যে চিঠিটা সে রেখে গেছে সেটাই বা ও লিখল কবে?

'আমি আপনার জিম্মায় আমার স্ত্রী, দুই পুত্র এবং সমস্ত স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি রেখে গেলাম। আমি জানি আপনি যা করবেন তা আপনার মর্যাদা অনুসারি হবে। আমার স্ত্রী জানেন আমার কী আছে, না আছে। তিনি তা নিয়ে যা খুশি করতে পারেন। ওঁর বিচারবুদ্ধির উপরে আমার সম্পূর্ণ আস্থা আছে। আমার পরিবারকে আপনার সাধ্যমত দেখাশুনো এবং সাহায্য করবেন—আপনাকে জানার সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত একজন মানুষ হিসেবে এটাই আমার একান্ত অনুরোধ। আমার ছেলে দুটোকে সদুপদেশ এবং পরামর্শ দিয়ে বিরত করবেন ভ্রমন তৃষ্ণা থেকে। দেখবেন ওরা যেন স্বাভাবিক ভাবে বড় হয়ে সমাজের প্রয়োজনীয় কর্মে ব্রতী হতে পারে। আমার ব্যক্তিগত ঘরের চাবিটা আপনার জন্যে রেখে গেলাম। আপনি যা খুঁজছেন তা ওই ঘরেই পাবেন। আমি জানি আমার সম্পর্কে আপনার অযথা কৌতূহল কত তীব্র। আমি অবশ্য তার কারণটা ঠিক বুঝি না। আমার জীবন যাই হোক না কেন সেটাকে কোনভাবেই শিক্ষণীয় বা সতর্কীকরণমূলক বলা চলে না। আমার অতীতটা জানাজানি হলে এই গ্রামের মানুষদের মধ্যে জীবন কাটানো আমার পক্ষে অসম্ভব হত। নাহলে এই গোপনীয়তার আর কোন প্রয়োজন ছিল না। আপনি সেই রাত্রে গোপনীয়তার যে অঙ্গীকার করেছিলেন, তার প্রয়োজন ফুরিয়েছে। এখন আপনি যাকে খুশি আমার কথা বলতে পারেন। যদি কৌতূহল সম্বরণ করতে না পারেন তাহলে ওই ঘরে পাবেন কিছু কাগজপত্র, আর কিছু রোজনামচা-র প্রয়াস। আমি ছাড়া আর কেউ কখনো ওই ঘরে ঢোকে নি। কোন কাজকর্ম না থাকলে সময় কাটানোর জন্য ঢুকে দেখতে পারেন। আমার ছেলেদের হাতে কবে ওই ঘরের চাবিটা তুলে দেবেন তা আপনিই ঠিক করবেন। ওরা আমার সম্পর্কে আসল সত্যটা জানতে পারবে ওই ঘর থেকেই। ওদের বাবা কেমন মানুষ ছিলেন সেটা জানানো আমার কাছে অত্যন্ত জরুরি, অবশ্য তা আদৌ সম্ভব হবে কি না জানি না। ওরা আমাকে ভালো ভাবল কি না, সে ব্যাপারে আমার কোন মাথাব্যথা নেই। আমার সম্পর্কে মানুষের ধারণা ভালো না মন্দ তাতে আমার কিছু আসে যায় না। তবে আমার সম্পর্কে সত্যটা জানতে পারলে

ওরা নিজেদের সত্যটা জানতে পারবে। তবে এই জানাটা তখনি হওয়া উচিৎ যখন সেটা ওদের জন্যে আদৌ বিপজ্জনক হবে না। ওরা যদি এই গাঁয়ের জল হাওয়ায় বড় হয়, ওদের শোণিতে যদি মিশে যায় এই গাঁয়ের বর্ণ, গন্ধ, ইতিহাস, ওদের মনে যদি আজীবন জেগে থাকে এই গাঁয়ের মানুষজন, ফসল কাটা, বীজ বোনা, নীল নদের দুকূল ভাসানো প্লাবন, তবেই আমার জীবনের একটা অর্থ খুঁজে পাওয়া যাবে, আরো অনেক গভীরতর অর্থের পাশাপাশি। তখন ওরা আমার সম্পর্কে কী ভাববে কে জানে। ওরা হয়ত তখন আমাকে করুণা করবে, কিংবা ওদের কল্পনায় আমি হয়ে উঠব একজন আদর্শপুরুষ। সেটা অবশ্য জরুরি নয়। যেটা জরুরি, সেটা হল আমার জীবনটা একটা অজানার আড়াল থেকে অশুভ আত্মার মত বেরিয়ে এসে যেন ওদের অমঙ্গল ডেকে না আনে। ওদের সঙ্গে থাকতে পারলে কী ভালোই না হত। ওদের একটু একটু করে বেড়ে ওঠা দেখতে দেখতে অস্তিত্বের একটা যথার্থতা খুঁজে পেতাম। আমি জানি না দুটো পথের কোনটায় বেশি স্বার্থপরতা — থাকা না চলে যাওয়া। সেদিন রাতে আপনাকে যা বলেছিলাম তা যদি মনে থাকে তাহলে বুঝবেন যে আমার সামনে আর কোন পথ নেই। নিজেকে ঠকানো নিরর্থক। দূরের ডাক এখনো আমার কানে বাজে। আমি ভেবেছিলাম আমার এখানকার জীবন এবং শাদি সেই ডাক থামিয়ে দেবে। হয়ত আমি এরকমই বা আমার ভাগ্যটাই এরকম—এর যে কী অর্থ তা আমার জানা নেই। গ্রামের হাসিখুশি মানুষদের সঙ্গে জীবনের বাকি দিনগুলো কাটিয়ে দেওয়াটাই যে যুক্তিযুক্ত তা আমার যুক্তিবাদী মনটা জানে। কিন্তু আমার আত্মায়, রক্তে কী যে একটা রহস্য লুকিয়ে আছে, যা আমাকে ঠেলে নিয়ে যায় কোন সুদূরে। এই আহ্বান উপেক্ষা করার শক্তি আমার নেই। এই ভ্রমণ তৃষ্ণাটা একটা অসুখ। আমার ছেলে দুটোর মধ্যে কেউ যদি এই রোগের বীজাণুতে আক্রান্ত হয় তাহলে ব্যাপারটা হবে অত্যন্ত দুঃখের। আপনাকে আমি এই দায়িত্বটা দিতে চাই কারণ আমি লক্ষ করেছি আপনি অনেকটা আপনারা দাদুর মতন। জানি না কবে চলে যাব। তবে বুঝতে পারচি আমার চলে যাওয়ার সময় হয়ে গেছে। তাই, হে বন্ধু বিদায়।'

মুস্তাফা সাঈদ যদি নিজের জীবনের সমাপ্তি নিজেই ঠিক করে থাকে তাহলে বলতে হয় এটাই ওর জীবনের সব থেকে অতি নাটকীয় আচরণ। যদি অন্য সম্ভাবনাটাই সত্যি হত তাহলে প্রকৃতিনির্ধারিত সমাপ্তিই তার কাঙ্ক্ষিত হওয়া উচিত ছিল। একবার ভাবুন মধ্য গ্রীষ্মের জুলাই মাসের সেই রাতটার কথা। উদাসীন নদীটার দুকূল ছাপানো প্লাবনে ভেসে গেল সব কিছু, যেমনটা গত বিশ তিরিশ বছরেও দেখা যায় নি। নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে ঢেকে গিয়েছে চরাচর। এই অন্ধকার এমন এক উপাদানে প্রকৃতির সবকটা উপাদানকে মিশিয়ে দিয়েছে, যা কিনা নদীটার চেয়েও প্রাচীন এবং উদাসীন। এই নায়কের জীবনের পরিসমাপ্তি এই ভাবেই হওয়ার ছিল। হয়ত ও চেয়েছিল এটা ঘটুক উত্তরে, বহুদূর উত্তরে, কনকনে ঝড়ের তারাহীন রাতে, সেইসব লোকের মধ্যে, যাদের থাকা না থাকায় তার কিছুই যায় আসে না— বিজয়ী হানাদারের সমাপ্তি। ও অবশ্য দাবী করেছিল যে ওরা, অর্থাৎ জুরি, উকিল—সবাই ওর বিরুদ্ধে চক্রান্ত করে ওকে বঞ্চিত করেছে এরকম সমাপ্তি থেকে। ও বলেছিল—'জুরিরা তাদের সামনে এমন একজনকে দেখেছিল যে নিজেকে বাঁচাতে চায় নি, যে বেঁচে থাকার

ইচ্ছেটাই হারিয়ে ফেলেছে। আমি সেই রাত্রে ইতস্তত করেছিলাম যখন জিন আমার কানে ঠোঁট রেখে ফিসফিসিয়ে বলেছিল—"আমার সঙ্গে চল, আমার সঙ্গে চল।" আমার জীবনের অভীষ্ট সিদ্ধ হল সেই রাতে, আর তো আমার থাকার কোন মানে হয় না। কিন্তু আমি ইতস্তত করেছিলাম, আর ভয়ও পেয়েছিলাম। আমি অবশ্য আশা করেছিলাম আদালতের রায়ে আমার ইচ্ছাপূরণ হবে, যে ইচ্ছে আমি নিজে পূর্ণ করতে পারিনি। ওরা যেন আমার ইচ্ছের কথা জানতে পেরেই তা পূর্ণ করা থেকে বিরত রইল, এমন কি কর্ণেল হ্যামণ্ড, যাঁকে আমার হিতৈষী বলে ভেবেছিলাম। তিনিও আদালতকে জানালেন আমার লিভারপুল যাবার কথা এবং সেই সময়ে আমার সম্পর্কে ওঁদের ধারণাটা কত উঁচু ছিল সেই কথাও। উনি যে নিজেকে একজন সংস্কারমুক্ত 'লিবারাল' বলে মনে করেন সে কথাও জানালেন। তা সত্ত্বেও উনি বাস্তববাদী এবং বুঝেছিলেন এরকম বিয়ে টিকবে না। উনি মনে করেন যে ওর মেয়ে যখন অক্সফোর্ডে পড়াশুনো করছিল তখনই তার উপর প্রাচ্য দর্শনের প্রভাব পড়েছিল। ও ঠিক করে উঠতে পারছিল না কোন ধর্মকে গ্রহণ করবে—বৌদ্ধ না ইসলাম। উনি জানেন না ওঁর মেয়ের আত্মহত্যার কারণটা ঠিক কী—কোন আধ্যাত্মিক সংকট না মুস্তাফা সাঈদ তাকে ঠকিয়েছে এই বেদনা। অ্যান ওঁর একমাত্র কন্যা, আমার সঙ্গে পরিচয় হওয়ার সময় ও সবে কুড়িতে পা দিয়েছে। আমিই ওকে ঠকিয়েছি, ভ্রষ্ট করেছি, ভুলিয়েছি শাদির প্রতিশ্রুতি দিয়ে, বলেছিলাম আমাদের শাদিটা হবে উত্তর আর দক্ষিণের সেতু বন্ধন আর ওর সবুজ চোখের কৌতূহলের আগুনে জল ঢেলে দিয়েছি। তবু ওর বাবা আদালতে দাঁড়িয়ে শান্তভাবে বলছেন যে তিনি নিশ্চিত নন। এর নাম বিচার। খেলার যেমন নিয়ম থাকে তেমনি যুদ্ধেরও নিয়ম আছে—আক্রমণের আর নিরপেক্ষতার নিয়ম। এটাই সেই ধরণের নিষ্ঠুরতা, যা ক্ষমার মুখোশ খুলে দেয়....।'

কাহিনীর মূল কথাটা হল ওরা মুস্তাফা সাঈদকে জেলে পাঠাল, মাত্র সাত বছরের জন্যে। নিজের ইচ্ছেয় যে সিদ্ধান্ত ওর নেবার কথা সেই সিদ্ধান্ত নিতে ওরা অস্বীকার করল। জেল থেকে ছাড়া পেয়ে ও ঘুরে বেড়াল দেশে দেশে, কখনো প্যারিস কখনো কোপেনহেগেন, কখনা দিল্লি কখনো ব্যাঙ্কক—সিদ্ধান্তটা কার্যকরি করা ক্রমশই পিছিয়ে দিতে দিতে ও শুধু ঘুরে বেড়াল কিছুদিন। তারপর ওর জীবনের সমাপ্তি ঘনিয়ে এলো নীল নদের বাঁকে এই অখ্যাত গাঁয়ে। কেউ নিশ্চিত করে জানে না কীভাবে তার জীবনে যবনিকা নেমে এলো—স্বেচ্ছায় না দুর্ঘটনায়।

কিন্তু আমি তো মুস্তাফা সাঈদের কথা ভাবতে গাঁয়ে আসি নি। সামনে দেখা যাচ্ছে গ্রামের সবুজ রঙ করা ইঁটের আর মাটির ঝুপসি বাড়িগুলো। আমাদের গাধাগুলো ঘাস জলের গন্ধে গন্ধে টিমেতালে এগিয়ে চলেছে। গাঁয়ের বাড়িগুলো রয়েছে মরুভূমির প্রান্তে। দেখে মনে হয় যেন অনেকদিন আগে একদল মানুষ এখানে ঠাঁই গাড়তে চেয়েছিল, তারপর কোন কারণে গাঁ ছেড়ে চলে গেছে। এখানেই সবকিছুর শুরু আবার সবকিছুরই শেষ। দুপুরবেলার মরুভূমি, বালি তেতে আগুন হয়ে আছে, এর মধ্যে নদীর দিক থেকে বয়ে এলো এক ঝলক ঠাণ্ডা বাতাস—যেন মিথ্যে ভরা জগতের মধ্যে একটা অর্ধসত্য। মানুষ, পাখি, জন্তু

জানোয়ারের ডাক মিলিয়ে যায় ফিসফিসানিতে, সেচ দেওয়ার পাম্পসেটে অসম্ভবের গুঞ্জন। আর রয়েছে নদী। এই নদীটা না থাকলে কিছুই থাকত না, না থাকত শুরু না শেষ। আপন খেয়ালে বয়ে চলেছে উত্তরে, তোয়াক্কা নেই কোন কিছুর। এখানে হয়ত পথ জুড়ে দাঁড়াল একটা পাহাড়, নদী ঘুরল পূবে, ওদিকে পড়ল পাহাড়ের ঢল, নদী ঘুরল পশ্চিমে। কিন্তু এদিক ওদিক যেদিকেই ঘুরুক চলা শেষ হবে তার আপন গন্তব্যে। উত্তরের সাগরে গিয়ে মিলবেই।

সকাল বেলায় হাজির হলাম দাদুর বাড়ির দরজায়, হারাজ কাঠের প্রকাণ্ড এই দরজাটা তৈরি করতে বোধহয় একটা আস্ত গাছ লেগেছে। ওয়াদ্ বশির এটা বানিয়েছিল। ওয়াদ্ বশির আমাদের গাঁয়ের ইনজিনিয়ার। জীবনে ইস্কুলে যায় নি, কাজও শেখে নি কারুর কাছে। কিন্তু তাতে কিচ্ছু এসে যায় নি। জল চক্রের চাকা বানায় অনায়াসে, ফোঁড়া কাটতে বা ক্ষতের চিকিৎসাতেও সিদ্ধহস্ত। আর একটা মহৎ গুণ আছে ওর, তা হোল গাধা চেনার ক্ষমতা। ওর পরামর্শ ছাড়া গাধা কেনার কথা গাঁয়ের কেউ ভাবতেই পারে না। ওয়াদ্ বশির আজও বেঁচে আছে, কিন্তু ওকে দিয়ে আর কেউ দরজা তৈরি করায় না। আজকাল সবাই 'জান' কাঠের দরজা বা লোহার দরজা কিনে আনে ওমদুরমান শহর থেকে। পাম্পসেট আসার পর থেকে জলচক্রেরও আর বাজার নেই। দাদুর বাড়ির ভিতর থেকে আসা একাধিক গলার উচ্চকিত হাসির আওয়াজ পেলুম। চিনতে অসুবিধে হল না দাদুর দুষ্টু হাসি, ওয়াদ্ রাইয়েসের ভরাট হাসি বক্‌রি-র অট্টহাসি আর বিন্ত মাঝুবের পুরুষালি হাসি। মনশ্চক্ষে দেখলুম দাদু জায়নামাজে বসে, হাতে চন্দন কাঠের মালাটা ঘুরে যাচ্ছে জলচক্রের মতন, ওঁর পুরোন বন্ধুর দল—বিন্ত মাঝুব, ওয়াদ্ রাইয়েস, বক্‌রি, বসে আছে নীচু কেদারাগুলোয়। দাদুর মতে কেদারার উচ্চতায় গেরস্থর মনোভাব বোঝা যায়—উঁচু মানে দাম্ভিক আর নীচু মানে নম্র। বিন্ত মাঝুব এলিয়ে বসে সিগারেট ফুঁকবে, ওয়াদ্ রাইয়েস গোঁপ মোচড়াতে মোচড়াতে গপ্পো ফাঁদবে আর বক্‌রি চুপচাপ শুনবে। দাদুর বাড়িটা বেশ বড়সড়। তবে দেওয়াল-মেঝে সবই মাটির। চাষের খেতের লাগোয়া এই মাটির বাড়িটা যেন খেতেরই অঙ্গ। উঠোনে একটা পুরোন বাবলা গাছ আর সীমানায় কাঁটাগাছের ঝোপ। খেতের জল চোঁয়ায় দেওয়ালের ফাটলে, সেই ফাটল দিয়ে বেরিয়েছে নানান আগাছা। বাড়িটা একদম এলোমেলো বিশৃঙ্খল, কোন পরিকল্পনা ছাড়াই অনেকদিন ধরে তৈরি হয়ে এখানকার চেহারাটা পেয়েছে। অনেকগুলো ঘর, এক একটার মাপ এক এক রকম, একটার ঘাড়ে আর একটা বিভিন্ন সময়ে সংযুক্ত হয়েছে। কোনটা করা হয়েছে দরকারে, কোনটা আবার হয়েছে দাদুর হাতে দুটো বাড়তি পয়সা আসায়। কোন কোন ঘর অন্য ঘরের মধ্যে দিয়ে যেতে হয় আবার কোনটায় একটাও জানলা নেই। মসৃন দেওয়ালগুলোয় কাদা, বালি আর গোবরের পলস্তারা, ছাদেও তাই। খেজুর আর বাবলা গাছের কাঠ দিয়ে তৈরি সিলিং। বাড়িটা একটা ভুলভুলাইয়া, গরমের সময় ঠাণ্ডা আর শীতের সময় গরম, দেখলে মনে হয় নড়বড়ে—বেশিদিন টিকবে না। কিন্তু কোন জাদুকরের মন্ত্র বলে বাড়িটা টিকে রয়েছে অবিকল।

বাইরের দরজা দিয়ে বাড়ির বিরাট উঠোনে ঢুকে পড়লাম। একধারে শুকোচ্ছে পেঁয়াজ, একদিকে লঙ্কা শুকোচ্ছে। উঠোনের এককোণে বস্তা বস্তা গম, বীন রাখা, বস্তাগুলোর কোনটার মুখ সেলাই করা কোনটা খোলা, আর এক কোণে একটা মাদী ছাগল খড় চিবুচ্ছে আর ছানাপোনাগুলোকে দুধ খাওয়াচ্ছে। এই বাড়িটার নিয়তি জড়িয়ে রয়েছে পাশের খেতের সঙ্গে। খরায় যখন খেতের ফসল শুকিয়ে ঝলসে যায় তখন বাড়িটাও তেমনি শুকিয়ে যায় আবার যখন সবুজ ফসলে ভরে যায় খেতের জমি তখন এই বাড়িটাও সজীব হয়ে ওঠে। দাদুর বাড়িটায় একটা অদ্ভুত গন্ধ আছে। শুকনো খেজুর, পেঁয়াজ, লঙ্কা, গম, মেথির গন্ধর সঙ্গে ধুনোর গন্ধ মিলেমিশে একাকার একটা গন্ধ, সেই গন্ধটা নাকে এসে লাগল। বাড়ির দালানে সব সময় একটা বড় ধুনুচিতে ধুনো জ্বালানো থাকে, সারা বাড়িতে ভেসে বেড়ায় ধুনোর গন্ধ, আর মনে করিয়ে দেয় তাঁর সাত্ত্বিক জীবনচর্যার কথা। জীবন যাপনে দাদু যতই সাত্ত্বিক হোক না কেন, তাঁর প্রার্থনার উপাচারের বিলাসিতা লক্ষণীয়। জায়নামাজটা তিনটে চিতাবাঘের ছাল একসঙ্গে সেলাই করে তৈরি, বেশি শীতে ওটা উনি কম্বলের বদলে ব্যবহার করেন। হাতমুখ ধোবার বদনা আর গামলাটা পেতলের, গায়ে বিচিত্র কারুকর্ম। চন্দন কাঠের জপের মালাটা ওঁর এতই প্রিয় যে মাঝে মাঝে মালা জপতে জপতে নিজের গালে ঘসেন আর নাক টেনে গন্ধ শোঁকেন। নাতি পুতিদের উপর কখনো চটে গেলে তাদের মাথায় মালাটা দিয়ে আস্তে একটা বাড়ি মেরে বলেন যে এবার তাদের মাথা থেকে শয়তানি বিদেয় হবে। এই সব কিছুর একটা করে ইতিহাস আছে, যেমনটা আছে বাড়ির ঘরগুলোর বা মাঠের খেজুর গাছগুলোর। ওঁর মুখে কতবার শুনেছি সেই ইতিহাস, প্রতিবারই ওর আখ্যানে জোড়া হয় নতুন কথা, বাদও যায় কিছু পুরোনো প্রসঙ্গ।

দাদুর সঙ্গে যখনই দেখা করতে যাই, বিশেষ করে কোথাও ঘুরে আসার পরে তখনই মনটা একটা অদ্ভুত প্রশান্তিতে ভরে ওঠে। দাদুর ঘরের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে সেই অনুভূতিটা একটু উপভোগ করার ইচ্ছেয় ইতস্তত করলাম। আসলে আমার মনের এই প্রশান্তির সঙ্গে মিশে থাকে একটা বিস্ময়। এই প্রাচীন মানুষটা এখনো এই দুনিয়ায় রয়েছেন— এটা ভাবতে আমার অবাক লাগে। আমি যখন ওনাকে জড়িয়ে ধরি তখন ওঁর শরীরে একটা অদ্ভুত গন্ধ পাই, কবরখানার পুরোন সৌধ আর শিশুর শরীরের গন্ধ মেশানো একটা গন্ধ। আর ওঁর শান্ত স্নিগ্ধ হাসি একটা সেতু গড়ে তোলে আমার আর সেইসব উদ্বিগ্ন মুহূর্তগুলোর মধ্যে — যে মুহূর্তগুলো এখনো অবয়ব পায়নি বা যে মুহূর্তগুলো হারিয়ে গেছে কালের প্রবাহে বা আকার পেয়েছে একটা বিরাট বাড়ির ক্ষুদ্র অংশে। ইউরোপের শিল্পায়িত দুনিয়ার নিক্তিতে আমরা গরিব চাষি, কিন্তু আমার দাদুর আলিঙ্গনে নিজেকে এত সমৃদ্ধ মনে হয়, যেন এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের হৃদস্পন্দনের ছন্দে আমিও একটা ঘর। উনি, প্রকৃতির উদার দাক্ষিণ্যে উর্বর জমির উপর দাঁড়িয়ে থাকা পল্লবিত শালপ্রাংশু ওক গাছের মত আদৌ নন। বরং ওনাকে বলা যায় সুদানের মরুভূমির সয়াল ঝোপের মত. যার বাকল পুরু আর কাঁটাগুলো তীক্ষ্ণ। তারা মৃত্যুকে জয় করেছে কারণ জীবনের কাছে তাদের চাহিদা ভীষণ কম। এটাই আমার বিস্ময়ের কারণ। উনি এখনো বেঁচে আছেন —মারি এবং দুর্ভিক্ষ, যুদ্ধ এবং শাসকের দুর্নীতি

সত্ত্বেও। এখন উনি শতবর্ষের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে, সবকটা দাঁত শক্ত সবল। ওঁর দীপ্তিহীন চোখদুটোর দিকে তাকালে আপনাদের মনে হতে পারে উনি দৃষ্টিহীন, কিন্তু এখনো উনি ঘুটঘুটে অন্ধকারেও দেখতে পান। ওঁর কৃশকায় শরীরটায় একফোঁটাও মেদ নেই। এখনো উনি অনায়াসে গাধার পিঠে লাফিয়ে ওঠেন, আর কাকভোরে বাড়ি থেকে হেঁটে চলে যান মসজিদে।

জোব্বার প্রান্তটা দিয়ে দাদু চোখ মুছলেন। আড্ডায় বোধহয় কোন হাসির গপ্পো হচ্ছিল। হাসতে হাসতে দাদুর চোখে জল এসে গিয়েছিল। যখন বেশ গুছিয়ে বসেছি তখন তাঁর পারিষদদের দিকে ফিরে বললেন—'যা একখানা গপ্পো ঝাড়লে ওয়াদ্ রাইয়েস, কী বলব!' এই কথার নিহিত অর্থ হল 'ওয়াদ্ রাইয়েস তোমার গপ্পোটা চালিয়ে যাও।' আমি ঘরে ঢোকায় গপ্পো বলায় সাময়িক বিঘ্ন ঘটেছিল। ওয়াদ্ রাইয়েস দ্বিগুণ উৎসাহে শুরু করল—'তারপর, বুঝলেন হজ আহ্‌মেদ, মেয়েটাকে আমি গাধার পিঠে আমার সামনে বসিয়ে দিলাম। মেয়েটা তো হাত পা ছুঁড়ছে প্রাণপণে। আমি তাকে জোরসে চেপে ধরে তার জামা কাপড় একটা একটা করে খুলে নিয়ে একদম উদোম করে দিলাম। মেয়েটা পাশের গাঁয়ের ক্রীতদাসী, সবে ঋতুমতী হয়েছে। আর আপনাকে কী বলব হজ্ আহ্‌মেদ, মেয়েটার স্তনদুটো যেন পিস্তলের মতো, জলের কলসীর মত নিতম্ব। মেয়েটার সারা গায়ে বোধহয় তেল মালিশ করা হয়েছিল, চাঁদের আলোয় শরীরটা চকচক করছিল, গায়েব খুশবুতে নেশা ধরে যায়। আমি ওকে নিয়ে গিয়ে ফেললাম ভুট্টা খেতের মধ্যে খানিকটা পরিষ্কার জায়গায়। তারপর যেই আমি ওকে চিত করে ফেলেছি অমনি শুনি ভুট্টা খেতে খড়মড় আওয়াজ, কে যেন হেঁকে বলল — 'কে ওখানে?' ওঃ হজ আমেদ! যৌবনের পাগলামির কোনো তুলনা নেই। আমি তখন আফ্রিদির মত হুংকার দিয়ে বালি ছোঁড়া শুরু করে দিলাম। আমাকে আসল আফ্রিদি ভেবে যে হেঁকেছিল সে সোজা চম্পট দিল। কিন্তু আমার চাচা প্রথম থেকেই আমার উপর নজর রেখেছিল —সেই সন্ধেবেলা বিয়েবাড়ি থেকে মেয়েটাকে তুলে আনা থেকে ভুট্টা খেতে ঢুকে আফ্রিদির ভাগ করা পর্যন্ত। পরদিন সকালে সোজা হাজির আমার আব্বার কাছে। আল্লা মেহেরবান — ওর আত্মার শান্তি দিন। "তোমার এই ছেলেটা একটা আসল শয়তান। ওকে যদি না এখুনি একটা বিবি যোগাড় করে দাও তাহলে এর হাত থেকে গাঁয়ের মেয়েদের আর রক্ষে নেই, সারা গাঁয়ে ঢি ঢি পড়ে যাবে, আমাদের মুখ দেখানো দুষ্কর হবে।" সেদিনই সবাই আমার নিকে দিল রজব চাচার মেয়ের সঙ্গে। আল্লা মেহেরবান, তার আত্মাকে শান্তি দিন, প্রথম বারেই বাচ্চা পয়দা করতে গিয়ে তার এন্তেকাল হল।' বিন্ত মাঝুব পুরুষালি গলায় হাসতে হাসতে বলল—"তুমি আবার কবে থেকে মদ্দা গাধার মত লাফিয়ে বেড়ালে বাছা!" বিন্ত মাঝুবের গলাটা এমনিতেই ছেলেদের মত, তার উপরে আবার অত্যধিক ধূমপানে গলাটা আরো কর্কশ হয়ে গেছে।

"তোমার চেয়ে ভালো আর কে জানে বিন্ত মাঝুব। তুমি একটা দুটো নয় আট আটটা বরকে গোর দিয়েছ। এখন তুমি বুড়ি হলে কি হবে, কেউ ওটা তোমার দিকে এগিয়ে দিলে তুমি কি আর ফেরাবে?" কপট রাগের ভান করল ওয়াদ্ রাইয়েস।

"আমরা তো শুনেছি বিন্ত মাঝুবের রমণসুখের উল্লসিত শীৎকার, না শুনলে বিশ্বাস করা যায় না।"

বিন্ত মাঝুব আর একটা সিগারেট ধরাতে ধরাতে বলল—"হজ্ আহ্মেদ তোমার দিব্যি রইল। আমার স্বামীদের সঙ্গে সহবাসের উল্লাসে আমি এমন চিৎকার করতাম যে উঠোনে বাঁধা জানোয়ারগুলোও ভয়ে আঁতকে উঠত। একথা যদি সত্যি না হয় তাহলে আমি তালাক দিতে রাজী।"

বক্‌রি এতক্ষণ কিছু বলে নি, শুধুই হাসছিল। এবার সেও যোগ দিল—"আচ্ছা বিন্ত মাঝুব, বলো তো তোমার কোন স্বামীটা সবথেকে ভালো ছিল।"

বিন্ত মাঝুবের সঙ্গে সঙ্গে উত্তর—

"কেন? ওয়াদ্ বশির!"

"ওয়াদ্ বশির—সেই ন্যালা ক্যাবলাটা! ওটা যা ট্যাড়স, ওর সামনে দিয়ে খাবারের থালা ছাগলে টেনে নিয়ে গেলেও কিছুই করতে পারত না।"—বক্‌রির অবাক মন্তব্য।

'নাটকীয় ভঙ্গিতে মাটিতে সিগারেটের ছাই ঝাড়তে ঝাড়তে বিন্ত মাঝুবের গর্বিত উক্তি—"ওর কর্ম শুরু হত সন্ধের নামাজের পরে আর চলত ভোরের আজান পর্যন্ত। আর চরম মুহূর্তে এমন চেল্লাতো যেন ষাঁড় জবাই হচ্ছে। আমি যা বলছি তার একবর্ণ যদি মিথ্যে হয় তাহলে আমি তালাক দিতে রাজী! শেষ হলে মিন্‌সে আবার বলত 'আল্লা মেহেরবান, বিন্ত মাঝুব'।"

"জোয়ান বয়সেই লোকটাকে তুমিই যে মারলে তাতে আর কোন সন্দেহ নেই।" এবার ফোড়ন দিলেন আমার দাদু।

বিন্ত মাঝুব হেসে বলল "ওর নিয়তি। আল্লা যে সময় বেঁধে দিয়েছে সেই সময়েই ওকে যেতে হয়েছে। এসব ব্যাপারে কেউ মরে না।"

বিন্ত মাঝুবের চেহারাটা মহিলাদের তুলনায় বেশ লম্বা, গায়ের রঙ কাঠকয়লার মত কালো, গায়ের চামড়া ভেলভেটের মত মসৃণ। বয়েসটা যদিও সত্তর ছুঁই ছুঁই, একসময়ে উনি যে বেশ সুন্দরী ছিলেন তা বেশ বোঝা যায়। গাঁয়ের মধ্যে তাঁর খুব নাম ডাক, মেয়ে পুরুষ সবাই ওঁর গপ্পো শোনার জন্যে উদগ্রীব, তার কারণটা হল উনি খুব মুখ পাতলা মহিলা। গপ্পো করার সময় ওঁর মুখে কিছু আটকায় না, বিশেষ করে আদিরসাত্মক মন্তব্যে উনি যেমন পটু তেমনি নির্ভীক। উনি পুরুষদের মতই ধূমপান, মদ্যপান করতেন আর কথায় কথায় তালাকের দিব্যি গালতেন। শোনা যায় ওঁর মা ছিলেন দারফুকের একজন ফুর সুলতানের মেয়ে। অনেকবার ওঁর শাদি হয়েছে গ্রামের মাতব্বর স্থানীয় ব্যক্তিদের সঙ্গে। তাঁদের সবার এন্তেকাল হয়েছে আর তাঁরা সবাই বেশ পয়সাকড়ি রেখে গেছেন। ওনার একটাই ছেলে আর অনেকগুলো মেয়ে আছে। মেয়েরা সবাই ডাকসাইটে সুন্দরী আর তাদের মায়ের মতই মুখ পাতলা। শোনা যায় বিন্ত মাঝুবের মেয়েদের মধ্যে একজন মায়ের অমতে একজনকে শাদি করে। লোকটা শাদির পরেই বিবিকে সঙ্গে নিয়ে চলে যায়। বছরখানেক পরে ফিরে এসে লোকটা ঠিক করে শ্বশুরবাড়ির লোকজনকে একটা ভোজ দিয়ে নরম করবে। বিন্ত মাঝুবের

মেয়ে তার মাকে চেনে। তাই সে স্বামীকে পরামর্শ দেয়—"আমার মা ভীষণ মুখ পাতলা মহিলা, তাই ওনাকে একা নেমন্তন্ন করাই যুক্তিযুক্ত হবে।" স্বামীটি এ প্রস্তাবে সম্মত হয়ে তার শাশুড়িকে একাই নেমন্তন্ন করল। সেদিন কয়েকটা মুরগি, ছাগল জবাই করা হল, আরো নানা সুখাদ্যের আয়োজন করা হল। বিন্ত মাঝুব যথেষ্ট পরিমাণ মদ্যপান এবং ভুরিভোজন শেষে জামাইকে শুনিয়ে মেয়েকে বললেন—"আম্না, এই লোকটা তোমার জন্যে বেশ ভালোই মনে হচ্ছে। তোমার বাড়িটা বেশ সুন্দর, পোশাক আশাকও যথেষ্ট ভাল। তোমার হাত, গলা সব সোনায় ভরিয়ে দিয়েছে, লোকটাকে ভালোই বলতে হবে। তবে লোকটাকে দেখে মনে হয় না ও তোমাকে বিছানায় তৃপ্ত করতে পারে। তা তুমি যদি সত্যিকারের তৃপ্তি পেতে চাও তাহলে আমি তোমার জন্যে এমন একটা স্বামীর ব্যবস্থা করতে পারি, যে তোমাকে চরম তৃপ্তিতে ভাসিয়ে দিতে পারবে।" শাশুড়ির মুখে এই কথা শুনে জামাই বেচারা এমন খেপে গেল যে সেই মুহূর্তেই সে তার বিবিকে তালাক দিয়ে দিল।

'তোমার হয়েছে টা কী?' বিন্ত মাঝুব ওয়াদ্ রাইয়েসকে উসকে দিল—'দু বছর হয়ে গেল একই বিবি নিয়ে ঘর করছ? তোমার জোর কমে গেল নাকি?'

ওয়াদ্ রাইয়েস আর দাদুর মধ্যে চোখে চোখে ইশারায় কী যেন কথা হল। কথাটা আমি তখন না বুঝলেও পরে বুঝেছি। মুচকি হেসে ওয়াদ্ রাইয়েস জবাব দিল—'আমার শরীরটা বুড়ো হলে কী হবে, দিল এখনো জোয়ান। আমার সঙ্গে মানাবে এরকম কোন বিধবা বা ডিভোর্সি তোমার হাতে আছে নাকি?'

বক্‌রি আর নিজেকে সংযত রাখতে পারল না—'হায় আল্লা'! ওয়াদ্ রাইয়েস তোমার আর শাদি-র বয়েস নেই। তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে এখনো বছর বছর শাদি করার সাধ আর তোমার যায় না। বয়েস তো প্রায় সত্তর হল! তোমার নাতি নাতনিদেরও ছেলেপিলে হয়ে গেছে, আর তোমার এখন শাদির ধান্ধা! লজ্জা করে না? খাওদাও জপতপ, নমাজ টমাজ নিয়ে থাক আর কেয়ামতের দিনটার জন্যে তৈরি হও!'

দাদু আর বিন্ত মাঝুব এই শুনে হেসে আকুল। কপট রাগের ভাণ করে ওয়াদ্ রাইয়েস বলল 'তোমরা এসবের মর্ম বোঝ? তুমি আর হজ্ আহ্মেদ একজন মহিলা নিয়ে জীবন কাটালো। আর তাঁদের এন্তেকাল হলে আর একটা শাদি করার সাহসই হল না। এই যে হজ্ আহ্মেদ, সারদিন নমাজ পড়ছে আর মালা জপছে। মাঝে মাঝে জপের মালাটাকেই শোনায় যে বেহেস্ত ওঁর জন্যেই তৈরি হয়েছে। আর বক্‌রি! তোমার কথা আর বোল না। তোমার দিনরাত পয়সার ধান্ধা, চোখ না বুঁজলে থামবে বলে মনে হয় না। আল্লা মেহেরবান, শাদির ব্যবস্থা দিয়েছেন আবার তালাকের ব্যবস্থাও তাঁর। "মুক্ত মনে ওদের গ্রহণ কর, আবার মুক্ত মনেই ওদের ত্যাগ কোর। এই দুনিয়ায় নারী ও শিশুই হল জীবনের সর্বোত্তম সজ্জা।" পবিত্র কেতাবে আল্লা একথা বলেছেন।

আমি ওয়াদ্ রাইয়েস্‌কে বললুম যে পবিত্র কোরাণে 'সম্পদ এবং শিশু' বলা হয়েছে, 'নারী ও শিশু' নয়।

ওয়াদ্ রাইয়েস একটু ক্ষুণ্ণ হল, বলল—'সে যাই হোক, নিধুবনের ফুর্তি আর কিছুতে নেই।'

ওয়াদ্ রাইয়েস ছুঁচলো গোঁপ আর একটু মুচড়ে নিয়ে গালভর্তি ঘন সাদা দাড়িতে হাত বোলাতে থাকলো। ট্যান করা চামড়ার মত গাঢ় বাদামি চামড়ার উপর সাদা ধবধবে ঘন দাড়িটা দেখলে মনে হয় মেকি। তবে সাদা দাড়ির সঙ্গে ওর পেল্লায় সাদা পাগড়িটা বেশ মানানসই। ওর বাঁশির মত নাক, বুদ্ধিদীপ্ত চোখ—সব মিলিয়ে চেহারাটা বেশ আকর্ষণীয়! ওয়াদ্ রাইয়েস চোখে সুর্মা লাগাত। যদিও বলত, সুর্মার কথা 'সুন্না'-য় বলা আছে, আমার ধারণা ওটা ও সাজার জন্যেই লাগাত। আর ওর মুখখানা এই বয়সেও বেশ দেখনাই ছিল, বিশেষ করে আমার দাদুর তুলনায়। দাদুর মুখে তো তেমন কোন আলাদা বৈশিষ্ট্যই নেই, আর বক্রির মুখখানা যেন একটা গিলে করা তরমুজ। অবশ্য ওয়াদ্ রাইয়েস যে এ ব্যাপারে বেশ সচেতন তা বোঝাই যেত। শোনা যায় যৌবনে তার কন্দর্পকান্তি চেহারা দেখে আশে পাশের দশখানা গাঁয়ের মেয়েরা প্রেমে হাবুডুবু খেত। ও অনেকবার শাদি করেছে, অনেককে তালাক দিয়েছে। ওর কাছে একজন মহিলার পরিচয় মহিলা ছাড়া আর কিছু না। জিজ্ঞেস করলে বলত— 'মদ্দা ঘোড়ার আবার বাছবিচার কী?' আমার বেশ মনে আছে ওর বিবিদের মধ্যে একজন ছিলেন ডোঙ্গোলা উপজাতির—বাড়ি 'আল্ খানদাক্', আর একজন হাদানদবী উপজাতির— বাড়ি 'আল গেদারেফ', একজন ছিল আবিসিনিয়—খার্তুমে ওর বড় ছেলের বাড়ি দাসী-র কাজ করত, একজন ছিল নাইজিরিয়—যাকে ও চতুর্থবার হজ করে ফেরার সময় নিয়ে এসেছিল। জিজ্ঞেস করলে বলত ও যখন জাহাজে পোর্ট সুদান থেকে জেদ্দা যাচ্ছিল তখন এই মহিলা আর তার স্বামীর সঙ্গে আলাপ হয়। মক্কায় পৌঁছে আরাফাতে বিশ্রামের দিন স্বামীটির এন্তেকাল হল। মরার সময় সে নাকি ওর হাত ধরে বলেছিল—'আমার বিবিটাকে একটু দেখো।' তা শাদি করার চাইতে ভালোভাবে তার দেখাশুনো করা কীভাবে সম্ভব তা ওর জানা না থাকায় ও মহিলাটিকে শাদি করে ফেলল। তারপর তিন বছর ওয়াদ্ রাইয়েস মহিলার সঙ্গে ঘর করে। তিন বছর ওয়াদ্ রাইয়েসের পক্ষে অনেকদিন। মহিলাটি ছিলেন বন্ধ্যা। আর সেটা ছিল ওয়াদ্ রাইয়েসের অতিরিক্ত আহ্লাদের আর একটা কারণ। লোকের কাছে গপ্পো করে বেড়াত—'নাইজিরিয় মেয়েকে যে শাদি করে নি, সে শাদির মর্মই বুঝবে না। এই মহিলার সঙ্গে থাকার সময় ওয়াদ্ রাইয়েস আর একটা শাদি করে ফেলল। ও কী কাজে যেন হামরাত-আল-শেখ্-এ গিয়েছিল। সেখান থেকে ফেরার সময় কাবাবিস্ থেকে এই মহিলাকে শাদি করে নিয়ে এলো। তারপর বাড়ি ফিরতে দুই বিবির লাগল তুমুল ঝগড়া। শেষে কাবাবিসি মহিলাকে তুষ্ট করতে ওয়াদ্ রাইয়েস নাইজিরিয় মহিলাকে তালাক দিল। তার কিছুদিন পরে ওই কাবাবিসি মহিলাও পালাল।

আমার পাঁজরে কনুই দিয়ে খোঁচা মেরে ওয়াদ্ রাইয়েস জানতে চাইল—'আচ্ছা বিধর্মী মেয়েরা শুনেছি দারুণ।'

উত্তর দিলুম, 'আমি জানি না।'

'কী কথার ছিরি! ওয়াদ্ রাইয়েসের তীক্ষ্ণ মন্তব্য—'তোমার মত একটা তরতাজা যুবক

সাতটা বছর একটা আলতুফালতু জায়গায় কাটিয়ে এসে বলছ কিছু জানো না!'

আমাকে নীরব থাকতে দেখে ওয়াদ্ রাইয়েস বলল—'তোমাদের গুষ্টিটা কোন কম্মের না। তোমরা সব একটা মেয়ে নিয়েই জীবন কাটাও। শুধু তোমার চাচা আব্দুল করিমই হল একটা লোকের মত লোক।'

গাঁয়ের সবাই জানে আমাদের বংশে একটার বেশি শাদি করার বা তালাক দেওয়ার রেওয়াজ নেই। শুধু আব্দুল করিম চাচাই এর ব্যতিক্রম। উনি বেশ কয়েকবার শাদি করেছেন আর তালাক দিয়েছেন। অবৈধ প্রণয়েরও ওনার অরুচি নেই।

বিন্ত মাঝুব বলে উঠলেন—'বিধর্মী মেয়েদের এসব ব্যাপারের জ্ঞান ঠিক আমাদের গাঁয়ের মেয়েদের মত হতেই পারে না। ওদের সুন্নত হয় না, আর শুনেছি ওদের কাছে ব্যাপারটা এক গেলাস জল খাওয়ার মতন। আমাদের গাঁয়ের মেয়েরা সন্ধের নমাজের পর সর্বাঙ্গে তেল, সুগন্ধি মালিশ করে রেশমি জোব্বা জড়িয়ে মাদুর পেতে স্বামীর জন্যে বসে থাকে। তাদের আচার ব্যবহার এমন যে তাদের স্বামীরা ভাবে তারা যেন এক একজন 'আবু জাঈদ-আল-হিলানি'। যে কোন ঝিমিয়ে পড়া লোক চাঙ্গা হয়ে উঠবে এক লহমায়।'

আমার দাদু আর বক্‌রি একসঙ্গে হেসে উঠলো। ওয়াদ্ রাইয়েস ধমকে উঠলো—'রাখ তোমার গাঁয়ের মেয়েদের কথা! বিদেশি মেয়েরা শুনেছি দারুণ।'

'তোমার মগজ এখন ভিনদেশে।' বিন্ত মাঝুবের তিক্ত শ্লেষ।

দাদু জানালেন—'ওয়াদ্ রাইয়েসের বেশি পছন্দ সুন্নত না দেওয়া মেয়ে।'

ওয়াদ্ রাইয়েস উত্তেজনা আর চাপতে পারছে না—'আপনাকে দিব্যি দিয়ে বলছি হজ্ আহ্‌মেদ আপনি যদি জীবনে একবার আবিসিনিয়া আর নাইজিরিয়ার মেয়েদের চোখে দেখতেন তাহলে আপনার ওই নামাজ পড়া, মালা জপা সব মাথায় উঠত। ওদের ওটা যেন ঢাকা দেওয়া পিরিচের মত—যার নিচে সব ভালোমন্দ লুকিয়ে আছে। আর আমরা এখানে ওটাকে চেঁছে ফেলি ফসল কাটা মাঠের মত।'

বক্‌রি গম্ভীর হয়ে বলল—'সুন্নত দেওয়াটা ইসলামের শর্ত।' 'তুমি কোন ইসলামের কথা বলছ?' ঝেঁঝে উঠলো ওয়াদ্ রাইয়েস 'এটা তোমার ইসলাম, হজ্ আহ্‌মেদের ইসলাম, কারণ তোমরা জান না তোমাদের কীসে ভালো কীসে মন্দ। নাইজিরিয়রা, মিশরিয়রা, সিরিয়ার আরবিরাও কি আমাদের মত মুসলমান নয়? কিন্তু ওরা জানে ওদের কীসে মঙ্গল তাই ওরা ওদের মেয়েদের আল্লা যেমন গড়েছেন তেমনই দেখে। আর আমরা তাদের লাই দিয়ে মাথায় তুলছি আমাদের পোষা জীবজন্তুদের মত।'

দাদুর দমফাটা অট্টহাসিতে ঘর ভরে গেল। হাসির তোড়ে জপের মালার তিনটে গুলিও ফস্কে গেল। তারপর হাসিটা একটু থামিয়ে বললেন—'মিশরের মেয়েদের সামলানো তোমার মত লোকের কম্মো নয়।'

ওয়াদ্ রাইয়েসের আঁতে ঘা লাগায় ফুঁসে উঠলো—'আপনি মিশরিয় মেয়েদের কী জানেন?' দাদু কিছু বলার আগেই বক্‌রি বলল—'তুমি কি ভুলে গেলে হজ্ আহ্‌মেদ ষষ্ঠ বছরে (হিজিরা মতে ১৩০৬-লেখক) মিশরে গিয়ে নয় মাস ছিল।'

দাদু এবার গম্ভীর হয়ে বললেন—'আমি ওখানে আমার জপের মালা আর বদনাটা নিয়ে ঘুরে বেড়িয়েছি।'

'আর কী করেছেন?' ওয়াদ্ রাইয়েস খোঁচা দিল—'যেমন গিয়েছিলেন তেমনি ফিরে এসেছেন জপের মালা আর বদনাটা সঙ্গে নিয়ে। আপনার জায়গায় আমি হলে এরকম খালি হাতে ফিরতাম না।'

দাদু জবাব দিলেন—'আমি জানি তুমি একটা মেয়ে নিয়ে ফিরে আসতে। তোমার ওই এক চিন্তা। আমি ফিরলাম কিছু টাকাপয়সা জমিয়ে, ফিরে এসে যা দিয়ে জমি কিনলাম, ছেলেদের সুন্নত দিলাম।'

'হায় আল্লা! হজ্ আহ্মেদ বলিহারি তোমার। মিশরের জিনিস একটু চেখেও দেখলে না? ' ওয়াদ্ রাইয়েস হায় হায় করে উঠলো।

দাদু মালা জপ করা থামিয়ে ছাদের দিকে একবার মুখ তুলে দীর্ঘশ্বাস ফেললেন, তারপর দৃষ্টি নামিয়ে কিছু বলার জন্য মুখ খুলতেই বক্রি বলে উঠলো—'ওয়াদ্ রাইয়েস, তুমি একটা পাগল। মেয়েরা সব দেশেই মেয়ে, তা সে মিশরে হোক বা সুদানে হোক বা ইরাকে বা হিজিবিজি দেশেই হোক। কালো হোক, সাদা হোক, লাল হোক—সবাই এক এবং সমান।'

বক্রির কথা শুনে ওয়াদ্ রাইয়েস এত অবাক হল যে ওর মুখে আর কথা সরে না। তারপর নিজেকে একটু সামলে নিয়ে বিন্ত মাঝুবের দিকে করুণ চোখে চাইল, যেন ওর সাহায্য চাইছে। দাদু নীরবতা ভাঙলেন—'আল্লার কিরে, মিশরে আমি প্রায় শাদি করেই ফেলেছিলাম। মিশরিয়রা বেশ ভালো ধর্মপ্রাণ লোক। ও দেশের মেয়েরাও পুরুষদের সম্মান করতে জানে। 'বুলাক'-এ আমার সঙ্গে একটা লোকের আলাপ হয়েছিল। আমরা একসঙ্গে আবু-আলা মসজিদে নামাজ পড়তে যেতাম। একদিন লোকটা আমাকে ওর বাড়িতে ডেকে নিয়ে গিয়ে ওর পরিবারের সবার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিল। লোকটির ভয় মেয়ে, আর সবাই এত সুন্দরী যে এদের যে কেউ চাঁদকে ডেকে বলতে পারত—"নেমে এস আমি তোমার জায়গায় বসব।" দিন কয়েক পরে লোকটা আমাকে বলল—"সুদানি মানুষ, তুমি খুবই ধর্মপ্রাণ লোক। এসো তোমার সঙ্গে আমার একটা মেয়ের শাদি দিয়ে দিই।" তোমাকে সত্যি কথাটা বলি ওয়াদ্ রাইয়েস—বড় মেয়েটাকে আমার খুব মনে ধরেছিল। কিন্তু এই সময়েই বাড়ি থেকে তার পেলুম আমার আম্মার এন্তেকাল হয়েছে। আমি সব ফেলে গাঁয়ে ছুটে এলুম।'

'আল্লা ওঁর আত্মাকে শান্তি দিন।' বক্রি বলে উঠলো—'ওঁর মত মহিলা আর হয় না।' ওয়াদ্ রাইয়েস সে কথায় কান দিল না—'কী আফশোস—জীবন এরকমই। যার দরকার নেই তাকেই আল্লা দিয়ে যান। আমি হলপ করে বলতে পারি, আমি হলে অনেক কিছুই করে ফেলতাম। মিশরেই থেকে যেতাম আর মিশরিয় মেয়েদের সঙ্গে মধুর সম্ভোগে কাটাতাম। আপনি কেন যে এই নিষ্ফলা, রুক্ষ দেশে ফিরে এলেন?'

'হরিণী বলল—"আমার কাছে আমার মরুময় দেশ সিরিয়ার মতই সুন্দর।" বক্রি প্রবাদ আওড়াল।

আর একটা সিগারেট ধরিয়ে জোরে টান দিল বিল্ত মাঝুব তারপর ওয়াদ্ রাইয়েসকে বলল—'এই রুক্ষ, নিষ্ফলা দেশে তো তোমার মধুর সম্ভোগের কিছু কমতি নেই। এই তো বেশ আছ। বয়েসটা তো আর বাড়ছে না, যদিও তা সত্তর পেরিয়েছ।'

'দিব্যি দিয়ে বলছি আমার মাত্র সত্তর হয়েছে। একটা দিনও বেশি নয়। তোমার বয়েস তো হজ্ আহ্মেদের থেকে ঢের বেশি।'

দাদু ওয়াদ্ রাইয়েসকে থামিয়ে দিয়ে বললেন—'তোমার কি আল্লার ডর নেই। আমার যখন বিয়ে হল তখন বিল্ত মাঝুব পয়দাই হয়নি। ও তোমার থেকে দুই তিন বছরের ছোটই হবে।'

বিমর্ষ হয়ে ওয়াদ্ রাইয়েস্ বলল—'আমাদের সবার মধ্যে এখন আমিই সবচেয়ে টগবগে। আর দিব্যি দিয়ে বলতে পারি মেয়েদের সঙ্গে থাকলে আমার ক্ষমতা বেড়ে যায়। আমি তখন আপনার এই নাতিটার থেকেও তুখোড় হয়ে উঠি।

থাকতে না পেরে বিল্ত মাঝুব বলল—'তোমার খালি বাতেল্লা। তুমি মেয়েদের পিছনে দৌড়ে বেড়াও কারণ তোমার ওটা কড়ে আঙুল সমান।'

মুচকি হেসে ওয়াদ্ রাইয়েস বলল—'তুমি যদি আমায় শাদি করতে বিল্ত মাঝুব তাহলে দেখতে ওটা একটা ব্রিটিশ কামানের মত।

বিল্ত মাঝুব একটু উদাসী হয়ে বলল—'কামানটা থেকে গেছে যখন ওয়াদ্ বশিরের এন্তেকাল হয়েছে।' তারপর আবার চাঙ্গা হয়ে বলল—'তোমার মত বাজে বকার লোক আর দেখি নি। তোমার মগজটা বোধহয় ওখানেই থাকে আর ওটার মতই একরত্তি।'

বিল্ত মাঝবের কথায় সবাই অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল। এমন কি বক্রি, যে এতক্ষণ নিঃশব্দে হাসছিল সেও সশব্দে হেসে উঠল। দাদু মালা জপ করা থামিয়ে পাতলা দুষ্টুমি ভরা হাসিতে ফেটে পড়লেন। বিল্ত মাঝুব তার পুরুষালি কর্কশ হাসিতে ঘর ভরিয়ে দিল। ওয়াদ্ রাইয়েস হিসহিসিয়ে হেসে উঠলো। হাসতে হাসতে সবার চোখে জল বেরিয়ে গেছে। চোখ মুছতে মুছতে দাদু বললেন,

'আল্লার কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করছি। তিনি আমার গোস্তাকি মাফ্ করুন।'

বিল্ত মাঝুব বললেন—'আল্লার কাছে আমি ক্ষমা ভিক্ষা করছি।' তারপর একটু থেমে যোগ করলেন—'ওহ্ আজ কী হাসিটাই না হাসলাম সকলে। আল্লার ইচ্ছেয় আবার যেন আমরা মিলতে পারি পালা পার্বনে।'

বক্রি বলল—'আল্লার কাছে আমি ক্ষমা ভিক্ষা করছি। যে কটা দিন এই দুনিয়ায় আছি আমাদের নিয়ে তাঁর যা মর্জি উনি তাই করুন।'

'আমি আল্লার কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করছি' ওয়াদ্ রাইয়েস বলল—'আল্লার দয়ায় আমরা দুনিয়ায় আছি। তিনি আমাদের নিয়ে তাঁর মর্জি পূরণ করুণ।'

বিল্ত্ মাঝুব জোয়ান মানুষের মত এক লাফে সোজা হয়ে দাঁড়ালো। ঋজু মেরুদণ্ড, সোজা ঘাড়, কে বলবে এত বয়েস। বক্রি ওর লাঠিটা ভর দিয়ে উঠে দাঁড়ালো। পিঠটা বেঁকে গেছে, যেন পিঠে ওজন চাপানো হয়েছে। ওয়াদ্ রাইয়েস ওর লাঠিটা নিয়ে একটু হেলে

দাঁড়ালো। দাদু জায়নামাজ ছেড়ে নিচু কেদারাটায় বসলেন। তিনজন বৃদ্ধ আর একজন বৃদ্ধা কবরের কিনারায় দাঁড়িয়ে হাসি ঠাট্টায় মশগুল। কাল এরা চলে যাবে। কাল এদের নাতিরা বাবা হবে, বাবা হবে ঠাকুর্দা—মরুযাত্রিবাহিনী চলতেই থাকবে।

সবাই একে একে বিদায় নিল। ওয়াদ্ বাইয়েস যাবার সময় আমাকে বলে গেলো—'এফোন্দি, কাল আমার বাড়ি তোমার নেমন্তন্ন দুপুরে ওখানে খাওয়া দাওয়া করবে।'

দাদু আরাম কেদারায় শরীরটা একটু এলিয়ে দিয়েছেন। তারপর নিজের মনেই একটু হাসলেন, হয়তো নিজের একাকীত্বের কথা বেশি করে মনে হল যখন দোস্তরা, যাঁদের সঙ্গে হাসি ঠাট্টায় সময়টা আনন্দময় হয়েছিল, চলে যাবার পর। একটু পরে আমাকে জিজ্ঞেস করলেন—'ওয়াদ্ রাইয়েস তোমাকে দুপুরে খাওয়ার নেমন্তন্ন করল কেন বলতো!' আমি বললুম, উনি আমারও দোস্ত, আর এর আগেও উনি আমাকে খাইয়েছেন। দাদু বললেন, 'ও তোমার সাহায্য চায়।'

আমি বললুম—'ও কী চায়?'

'ও বিয়ে করতে চায়।'

দাদুর কথায় হাসার চেষ্টা করে আবার জিজ্ঞেস করলাম—'ওয়াদ্ রাইয়েসের বিয়ের সঙ্গে আমার কী সম্পর্ক?'

'তুমি মেয়েটার অভিভাবক।'

আমাকে নীরব দেখে দাদু ভাবলেন কথাটা বোধহয় আমার মাথায় ঢোকে নি। তাই পরিষ্কার করার জন্যে বললেন—'ওয়াদ্ রাইয়েস মুস্তাফা সাঈদের বিধবাকে বিয়ে করতে চায়।'

আমি আবার নীরবতার আশ্রয় নিলাম। দাদু বললেন—ওয়াদ্ রাইয়েস এখনো প্রাণশক্তিতে ভরপুর। আর ওর টাকা পয়সাও আছে। আর ওই মেয়েটারও একজন পুরুষ মানুষের দরকার রক্ষা করার জন্যে। তিন বছর হয়ে গেল ওর স্বামীটা মরেছে। ওর কি বিয়ে করতে ইচ্ছে করে না?'

আমি বললুম যে মুস্তাফা সাঈদের বিধবার দায়িত্ব আমার নয়। ওর বাপ দাদারা আছে, ওয়াদ্ রাইয়েসের উচিত তাদের কাছে দরবার করা।

তাই শুনে দাদু বললেন—'সারা গাঁয়ের লোক জানে মুস্তাফা সাঈদ তোমাকে তার বিবি আর ছেলেদের অভিভাবক করে গেছে।'

আমি দাদুকে বোঝানোর চেষ্টা করলুম যে আমি শুধু ওর ছেলেদেরই অভিভাবক, ওর বিবির নয়। ওর বিবি নিজের ইচ্ছেয় যা খুশি করতে পারে, আর তার অনেক আত্মীয় স্বজন রয়েছে। দাদুকে থামানো যায় না—'মেয়েটা তোমার কথা শোনে। তুমি বোঝালে রাজি হতে পারে।

আমার সর্বশরীর রাগে জ্বলে গেল। অবশ্য রাগের তেমন কোনো কারণ নেই, এরকম ঘটনা তো গাঁয়ে আকছারই হচ্ছে। দাদুকে বললুম—'ও তো ওয়াদ্ রাইয়েসের চাইতে অনেক কমবয়সী লোককেও ফিরিয়ে দিয়েছে। আর ওয়াদ্ রাইয়েস্ তো ওর থেকে চল্লিশ বছরের

বড়।' কিন্তু দাদু কোন কথা কানে নেন না। আবার আমাকে বোঝানোর চেষ্টা করলেন যে ওয়াদ্ রাইয়েস্ এখনো বেশ সক্ষম, আর ওর পয়সা কড়ি আছে, তাই মেয়েটার বাপ দাদাদেরও অমত হবে না। তবে ওদের ভয় একটাই, তা হোল মেয়েটা নিজে অমত করতে পারে আর তাই আমাকে মধ্যস্থতা করে রাজি করাতে হবে।

রাগে তখন আমার বাক্যি হরে গেছে। চুপ করে থাকাটাই শ্রেয় মনে হল। অশ্লীল চিত্রগুলো আমার মনের পর্দায় একের পর এক হাজির হল আর অবাক হয়ে দেখলুম দুটো ছবিই এক সঙ্গে মিশে গেল : মনে হল যেন মুস্তাফা সাঈদের বিধবা হোস্না বিন্ত মাহ্মুদই দুটো ছবিতেই রয়েছে—একটা হল লণ্ডনের সেই বিসংলগ্ন হাট করা শুভ্র উরুর, অন্যটা নীল নদের বাঁকের অখ্যাত গাঁয়ে শেষ রাত্রে বুড়ো ওয়াদ্ রাইয়েসের শরীরের চাপে কাতরাচ্ছে। একটা যদি অশুভ হয় তাহলে অন্যটাও অশুভ। এটা যদি জন্ম মৃত্যুর খেলা হয় নীল নদের বন্যা আর গাঁয়ের নবান্নর মত, যদি ব্রহ্মাণ্ডের বিশাল তন্ত্রের অঙ্গ হয়, তাহলে অন্যটাও তাই। মনশ্চক্ষে দেখলুম মুস্তাফা সাঈদের বিধবা, হোসনা বিন মাহ্মুদ—বয়েস যার মাত্র তিরিশের কোঠায়, সত্তর বছরের বুড়ো ওয়াদ্ রাইয়েসের শরীরের নীচে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। ওর কান্নাটাই এর পরে ওয়াদ্ রাইয়েসের গল্পের বিষয় হবে, যে সব গপ্পো শুনিয়ে ও গাঁয়ের লোকের মনোরঞ্জন করে। রাগে কাঁপতে কাঁপতে আমি দাদুর বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলাম। উনি পিছন থেকে আমাকে ডাকলেন বেশ কয়েকবার, আমি তার কোন জবাব না দিয়েই বেরিয়ে গেলাম।

বাড়ি ফেরার পর আমার মেজাজটা খিঁচড়ে আছে দেখে আব্বা জানতে চাইলেন, কী হয়েছে। আমার কাছে সব শুনে উনি হাসতে হাসতে বললেন—'এটা রেগে যাবার মত কোন ব্যাপার নাকি?'

বিকেল চারটে নাগাদ মুস্তাফা সাঈদের বাড়ি হাজির হলাম। সদর দরজা দিয়ে ঢুকেই বড় উঠোনে পড়লাম। বাঁদিকে এক লহমা দেখলাম সেই লাল ইঁটের আয়তক্ষেত্রের ঘরটা, নিঝুম তবে কবরের মতন নয়, মাঝ দরিয়ায় নোঙর করা জাহাজের মত। যাইহোক এখনো সময় হয় নি। হোস্না বিন্ত মাহ্মুদ আমাকে বৈঠকখানার বাইরে দাওয়ায় পাথরের উঁচু টেবিলটার ধারে চেয়ারে বসাল। সেবারেও ওই জায়গাটায় বসিয়েছিল মুস্তাফা সাঈদ। এক গেলাস শরবত দিয়ে আপ্যায়ন করল। ছেলে দুটো এসে আমায় আদাব জানাল। বড় ছেলেটার নাম মাহমুদ—হোস্নার বাবার নাম, ছোটটার নাম সাঈদ—মুস্তাফার বাবার নাম। খুবই সাধারণ দেখতে ছেলে দুটো, একজনের বয়েস আট অন্যজনের সাত। দুজনে রোজ সকালে ছয় মাইল দূরের ইস্কুলে যায় একই গাধার পিঠে চেপে। এদের দুজনের দায়িত্ব আমার উপর ন্যস্ত। প্রতি বছর আমার অন্তত একবার গাঁয়ে আসার এটাও একটা মুখ্য কারণ। দেখতে আসি এরা কেমন আছে। এবার আমরা ওদের সুন্নত দেব। সেই উপলক্ষে খুব জাঁকজমক হবে। পেশাদার গাইয়ে বাজিয়ে আনা হবে, আনা হবে ধর্মগ্রন্থ পাঠের লোক—এমন ধুমধাম হবে যাতে ওদের শৈশবের এই স্মৃতি ওদের জীবনে অমলিন থাকে। সে আমাকে নির্দেশ দিয়ে গেছে নজর রাখতে যাতে ছেলেগুলো ভেসে না বেড়ায়। আমি কিছুই করব না। বড় হয়ে

ওদের যদি ভেসে বেড়াতে সাধ যায় তাহলে তাই করতে দেওয়াই উচিত। সকলেই রাস্তার শুরু থেকেই চলতে আরম্ভ করে, আমার দুনিয়াটা তো অন্তহীন শৈশবেই রয়েছে।

ছেলে দুটো চলে গেল, হোস্না বিন্ত মাহ্মুদ দাঁড়িয়ে রইল। ছিপছিপে লম্বাটে চেহারা, বলিষ্ঠ গড়ন কিন্তু আখের লাঠির মত নমনীয়। হাতে পায়ে হেনার ছাপ নেই। সুগন্ধির মৃদু সুবাস ওর শরীর থেকে ছড়িয়ে যাচ্ছে বাতাসে। ঠোঁটটা টুকটুকে লাল, দাঁতগুলো মুক্তোর মত সাদা আর সাজানো। লজ্জা মাখানো বড় বড় করুণ আয়ত চোখে মুখখানা আরো সুন্দর হয়েছে। অভ্যর্থনার উত্তরে ওর হাত দুটো আমার হাতে নিয়ে অনুভব করলুম নরম উষ্ণতা। ওর আচরণে রয়েছে একটা স্নিগ্ধ আভিজাত্য, আর দেখতে বেশ সুন্দরী, তবে ওর সৌন্দর্যটা একটু অন্যরকম— এসব কি আমার কল্পনা না সত্যি কে জানে! হোস্না এমন একটা মেয়ে যার সামনে দাঁড়ালে আমার বুকের মধ্যে এমন দামামা বাজতে থাকে যে আমার মনে হয় দৌড়ে পালাই। এই মেয়েটাকেই ওয়াদ্ রাইয়েস তার কবরের কিনারায় বলি দিতে চায়। এই উৎসর্গের ঘুষ দিয়ে মৃত্যুর কাছ থেকে আদায় করে দিতে চায় বছর কয়েক।

আমি বসতে বলা সত্ত্বেও হোস্না দাঁড়িয়ে রইল দেখে বললুম—'তুমি না বসলে আমি চললুম।' তখন অবশ্য সে বসল। আমাদের কথাবার্তা এত আস্তে আস্তে...তখন অবশ্য সে খেতে খেতে এত আস্তে আস্তে এগোতে থাকল যে সন্ধে হয়ে গেল। সূর্য ডোবার পর বাতাসটা একটু একটু করে ঠাণ্ডা হতে লাগল আর আমাদের কথোপকথনও আস্তে আস্তে সহজ হয়ে এলো। আমার কোন কথায় ও একবার হেসে উঠলো। ওর মিষ্টি রিনরিনে হাসির শব্দে আমার কলজেটা ধড়ফড়িয়ে উঠলো। আকাশের পশ্চিম দিগন্ত তখন পাটে বসা সূর্যের আভায় টকটকে লাল, যেন স্বর্গ মর্তের লড়াইয়ে হত কোটি কোটি মানুষের শোণিত লেগে রয়েছে। হঠাৎ লড়াই থামল মর্তের পরাজয়ে আর সর্বগ্রাসী অন্ধকার ঢেকে দিল জগৎসংসার আর ওর চোখের করুণ লজ্জা। স্নেহার্দ উষ্ণ কণ্ঠস্বর আর সুগন্ধির মৃদু সুবাস ছাড়া যেন আর কিছুই রইল না।

আমি হঠাৎ জিজ্ঞেস করলাম—'তুমি কি মুস্তাফা সাঈদকে ভালোবাসতে?'

ও কোন জবাব দিল না। আমি অপেক্ষা করে রইলাম ওর উত্তরের, কিন্তু ও কোন কথাই বলল না, বুঝলাম এখানে, এই সময়ে আবার এরকম প্রশ্ন করাটা ঠিক হয়নি। আসলে এই অন্ধকার, ওর শরীরের মৃদু সুবাস আমার মাথার মধ্যে কেমন যেন সবকিছু এলোমেলো করে দিচ্ছিল, আমি যেন নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলছিলাম।

আরো একটু পরে ওর গলার স্বরে যেন আবার আমাদের মধ্যে সেতুবন্ধন হল, শুনতে পেলাম—'ও ছিল আমার ছেলেদের বাবা।' নাঃ গলার স্বরটা করুণ নয়, বরং পরম মমতায় ভরা। আমি কোন কথা না বলে চুপ করে রইলাম, আশায় রইলাম এই নীরবতা ওর কানে ফিসফিসিয়ে ওকে দিয়ে আরো কথা বলাবে। ঠিক তাই হল। —'ও ছিল একজন হৃদয়বান স্বামী এবং একজন হৃদয়বান বাবা। ও সারা জীবনে আমাদের কোন অভাব রাখে নি।'

'তুমি কি জানতে ও কোথা থেকে এসেছিল?' অন্ধকারে ওর দিকে একটু ঝুঁকে জিগ্গেস করলুম।

'খার্তুম থেকে।'

'কিসের টানে ও এখানে এসেছিল?' আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম।

'আল্লা জানেন।' ওর ছোট্ট জবাব।

আমি প্রায় হাল ছেড়ে দিয়েছিলাম। ঠিক তখনই এক ঝলক ঠাণ্ডা হাওয়া বয়ে এলো আমার দিকে আর সেই সঙ্গে নিয়ে এলো ওর শরীরের সুগন্ধির সুবাস, এবার একটু তীব্রতর। সেই সুবাসের ঘ্রাণ নিতে নিতে অনুভব করলাম আমি যেন হতাশায় ডুবে যাচ্ছি।

হঠাৎ সেই নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে যেন একটা দরজা খুলে গেল আর বেরিয়ে এলো ওর কণ্ঠস্বর। নদীর মত গভীর দুঃখে করুণ সেই কণ্ঠস্বর—'আমার মনে হয়, ও কিছু গোপন করত।'

'কেন?' আমি ওকে আর একটু বলাতে চাইলাম।

'ও রাত্রে অনেকক্ষণ একা একা ওই ঘরটায় কাটাত।'

'ওই ঘরটায় কি আছে?' আমি নাছোড়।

ও উত্তর দিল—'আমি জানি না। আমি কখনো ওই ঘরে ঢুকি নি। আপনার কাছে তো ওই ঘরের চাবি। আপনি নিজে কেন ঘরটা খুলে দেখছেন না?'

মনে মনে ভাবলুম যদি এই মুহূর্তে আমরা উঠে পড়ি, ও আর আমি, তারপর আলো জ্বালিয়ে দুজনে ওই ঘরটায় ঢুকি তাহলে আমরা কী দেখব—মুস্তাফা সাঈদ চাল থেকে গলায় দড়ি বেঁধে ঝুলছে না কি উবু হয়ে মাটিতে বসে রয়েছে?

আমি ওকে আবার জিজ্ঞেস করলাম—'তোমার কেন মনে হয় যে ও কিছু গোপন করত?'

এবারে ওর স্বরটা বদলে গেল। মমতা বা দুঃখের লেশমাত্র নেই সেই স্বরে, অনেকটা ভুট্টা গাছের পাতার মত ধারাল আর কর্কশ।

'মাঝে মাঝে রাত্রে ঘুমের ঘোরে ও কীসব হাবিজাবি কথা বলত।'

'কী হাবিজাবি কথা।' আমার অনুসন্ধানী প্রশ্ন।

ও বলল—'সেসব আমি ঠিক বুঝতাম না। ইউরোপীয় কথা।'

আমি সেই অন্ধকারে ওর দিকে ঝুঁকে অপেক্ষা করে রইলাম।

'ও ঘুমের ঘোরে কতকগুলো শব্দ বার বার উচ্চারণ করত, যেমন জিনা, জিনি—আমি ঠিক বুঝতাম না।'

এইখানেই, এইরকম সময়েই, এইরকম অন্ধকারে মুস্তাফা সাঈদের কণ্ঠস্বর সমুদ্রে ভেসে ওঠা মরা মাছের মত ভেসে উঠত—'আমি ওর পিছনে ধাওয়া করে বেড়িয়েছি তিন বছর। প্রতিদিন ধনুকের ছিলার টান বেড়েই যাচ্ছিল। আমার মরুযাত্রিদল তৃষ্ণার্ত আর সামনে বাসনার মরুভূমির ঝিলমিলে মরীচিকা। সেই রাত্রে জীন মরিস আমার কানে ফিসফিসিয়ে বলেছিল—"আমার সঙ্গে চল, আমার সঙ্গে চল", আমার জীবনের অভীষ্ট সিদ্ধ হল সেই রাতে, আর তো আমার থাকার কোন মানে হয় না—'। কোথায় যেন একটা বাচ্চা কেঁদে উঠলো।

'ও বোধহয় বুঝতে পেরেছিল যে ওর শেষ ঘনিয়ে এসেছে। হোস্না বলে চলেছে—'মৃত্যুর এক হপ্তা আগে ও সব বিলি ব্যবস্থা শেষ করেছিল। যেখানে যা দেনা ছিল সব মিটিয়ে দিয়েছিল আর যত খুচরো কাজ ছিল সব শেষ করেছিল। মৃত্যুর আগের দিন আমাকে ওর কাছে ডেকে বুঝিয়ে দিয়েছিল ওর কী কী আছে। ছেলেদের ব্যাপারে, একগাদা নির্দেশ দিল। আমার হাতে গালা দিয়ে সিল করা লেফাফাটা দিয়ে বলল—"যদি কিছু হয় তাহলে এটা তাঁকে দিও।" আমাকে বলেছিল কিছু যদি হয়ে যায় তাহলে আপনিই হবেন ছেলেদের অভিভাবক। আরো বলেছিল—"তুমি যা করবে, ওঁর সঙ্গে পরামর্শ করেই করবে।" আমি কেঁদে উঠে বলেছিলাম—'ইনসাল্লাহ্, খারাপ কিছু হবে না।" "বলা যায় না, যদি হয়।" ও আরো বলেছিল—"এই দুনিয়ায় কোন কিছুই বলা যায় না।" সেদিন আমি ওকে কত অনুনয় করলাম মাঠে না যাওয়ার জন্যে। বন্যায় চারধার ভাসছে। আমার ভীষণ ভয় করছিল। আমাকে অভয় দিয়ে বলল ও খুব ভালো সাঁতারু। সারাদিন আমার বুক কাঁপছিল। ওর ফেরার সময় পেরিয়ে গেল তাও আসে না। আমার ধৈর্য আর বাধা মানে না। শেষ খবরটা এলো।

আমি বুঝতে পারছিলাম ও এতক্ষণ নিঃশব্দে কাঁদছিল। এবার সশব্দে ফুঁপিয়ে উঠল, আর সেই শব্দে খান খান হয়ে গেল ওর আর আমার মধ্যেকার অন্ধকার। ওর শরীরের সুবাস, নৈঃশব্দ সব কোথায় হারিয়ে গেল। রইল শুধু এক নারীর কান্না তার স্বামীর জন্যে, যে স্বামীকে সে জানতই না, একটা মানুষের জন্যে যে অকূল সাগরে পাল তুলে ভেসে পড়েছে কোন এক বিদেশী মরীচিকার খোঁজে। আর বুড়ো ওয়াদ্ রাইয়েস নিজের বাড়িতে বসে স্বপ্ন দেখছে রেশমি আবরণের নীচে উতরোল হবার। আর আমি। এই অশান্ত অবস্থার মধ্যে আমি কী করি? আমি কি ওর কাছে যাব ওকে আমার বুকে জড়িয়ে ধরে রুমাল দিয়ে চোখের জল মুছিয়ে দেব। ওকে শান্ত করব নানান সান্ত্বনার কথা বলে? চেয়ার থেকে ওঠার জন্যে একটু ঝুঁকলাম একহাতে ভর দিয়ে, হঠাৎ আমার মনটা এক অজানা বিপদের আশংকায় ভীত হয়ে উঠল। আমি কর্মে প্রবৃত্তি আর নিবৃত্তির দোলাচলে অনড় হয়ে রইলাম। এক অদ্ভুত ক্লান্তিতে অবসন্ন হয়ে চেয়ারে ডুবে গেলাম। অন্ধকার তখন গভীর, গাঢ়, বুনিয়াদি—এই আঁধার আলোর অভাবে নয়, এ আঁধার স্থির, অবিচল যেন কোনকালে আলোর অস্তিত্বই ছিল না। আকাশের তারাগুলো যেন কোন ছিন্ন বসনের ছিদ্র। সুগন্ধির সুবাস যেন একটা স্বপ্ন। যেন বালির ঢিবিতে পিঁপড়ের পদধ্বনি। এই অন্ধকারের জঠর থেকে একটা স্বর ভেসে এলো, এ স্বর ওর নয়, এই স্বরে ভয় নেই, রাগ নেই, বেদনা নেই, স্বরটা যেন শুধু বলছে—'আইনজীবীরা আমার শরীরটা নিয়ে ঝগড়া করছিল। আসলে এই মকদ্দমায় আমি নয় আমার মামলাটাই জরুরী। অধ্যাপক ম্যাকসওয়েল ফস্টার কিন—যিনি অকসফোর্ডের 'নৈতিক পুনরুজ্জীবন' আন্দোলনের মুখ্য প্রবর্তক, 'ফ্রি ম্যাসন' সমিতির সভ্য, আফ্রিকার প্রোটেস্ট্যান্ট মিশনারী সোসাইটির উচ্চ পরিষদের একজন সদস্য—আমার প্রতি বিদ্বেষ গোপন করার কোন চেষ্টাই করেন নি। আমি যখন অকসফোর্ডে ওঁর ছাত্র ছিলাম তখন প্রায়শই বিরক্তি দেখিয়ে বলতেন—"আমাদের আফ্রিকাবাসীদের সভ্য করার যে ব্রত, তার ব্যর্থতার শ্রেষ্ঠ উদাহরণ হলে তুমি, মিঃ সাঈদ। তোমাদের শিক্ষিত করার জন্য আমাদের এত চেষ্টার পরেও

কোন উন্নতি হচ্ছে না। তোমাদের দেখে মনে হয় যেন এই প্রথম জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এলে।" এখন, এখানে উনি আমাকে ফাঁসির দড়ি থেকে বাঁচানোর জন্যে সব রকম কৌশল কাজে লাগাচ্ছেন। সাক্ষী দিতে এসেছিলেন স্যার আর্থার হিগিন্‌স্‌, দুবার বিয়ে এবং ডিভোর্স করেছেন, যাঁর নারীঘটিত কুখ্যাতি আর ও ভবঘুরেদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার কথা সবাই জানে। ১৯২৫ সালের বড়দিনটা আমি ওঁর 'স্যাফরণ ওয়ালডেন'-এর বাড়িতে কাটিয়েছিলাম। উনি আমাকে বলতেন—"তুমি একটা মহা পাজি। অবশ্য আমি পাজিদের অপছন্দ করি না, কারণ আমি নিজেও তাই।" অথচ আদালতে উনি প্রাণপণে চেষ্টা করে গেলেন যাতে আমাকে ফাঁসিতে ঝোলানো যায়। জুরিদের দলেও নানা রকম লোক। এদের মধ্যে ছিল একজন ডাক্তার, একজন শ্রমিক, একজন কৃষক, একজন শিক্ষক, একজন ব্যবসায়ী, একজন ইনস্যুরেন্সের জামিনদার। এদের সঙ্গে আমার কোথাও কোন মিল নেই। আমি যদি এদের কারুর বাড়ির একটা ঘর ভাড়া নিতে চাই তাহলে হয়ত এঁরা কেউ আমাকে ফেরাবেন না। কিন্তু যদি এঁদের কাউকে বলা হয় যে তার মেয়ে একটা আফ্রিকাবাসীকে শাদি করতে চলেছে, তাহলে এঁদের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়বে। তা সত্ত্বেও এরা জীবনে প্রথম নিজেদের সংস্কারকে ছাড়িয়ে যাবে। আবার নিজেকে এঁদের থেকে শ্রেষ্ঠতর বলে মনে হচ্ছিল কারণ এই যে বিচারের অনুষ্ঠান, এটা প্রাথমিকভাবে আমার জন্যেই হচ্ছে, আর আমিই এখানে উপনিবেশকারী এখানে জোর করে ঢুকেছি। আমার ভাগ্য নির্ধারণ হবে এখানে। 'আটবারা'-র যুদ্ধে হেরে যাওয়ার পর যখন মাহ্‌মুদ ওয়াগ আহ্‌মেদকে বন্দী করে আনা হল কিচেনারের কাছে, তখন কিচেনার তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলেন—"তুমি আমার দেশে এসে কেন নরহত্যা, লুণ্ঠন চালাচ্ছ?" গায়ের জোরে যে অনধিকার প্রবেশ করেছে সে এই কথা বলছে জমির যে আসল মালিক তাকে, আর আসল মালিক মাথা নীচু করে চুপ করে রইল। ওই আদালত কক্ষে আমি তখন শুনতে পাচ্ছি কাজের সমরাঙ্গনে অসি ঝনঝনানি, অ্যালেনবির ঘোড়ার খুরের শব্দ—জেরুজালেমের পবিত্র মাটি অপবিত্র করছে। জাহাজগুলো নীল নদ দিয়ে নিয়ে এলো, রুটি নয় বন্দুক, ওদের সৈনিকদের নিয়ে যাওয়ার জন্য বসল রেলপথ, ওরা ইস্কুল তৈরি করল যাতে আমরা ওদের ভাষায় 'ইয়েস' বলতে পারি। ওরা আমদানি করল ঘৃণ্যতম ইউরোপীয় হিংস্রতার বীজাণু—যেমনটা 'সোম' (Somme) আর ভারদুন (Verdun) ছাড়া আর কোথাও কখনো দেখা যায় নি, এক মারাত্মক রোগের বীজাণু, যে রোগে ওরা আক্রান্ত হাজার বছর আগে। হ্যাঁ ; মান্যবরেরা, খোদ আপনাদের বাড়িতে হানা দিতেই আমি এসেছি। আমিই সেই বিষ যা আপনারা ইতিহাসের ধমনীতে ঢুকিয়ে দিয়েছেন। আমি কোন ওথেলো নই, ওথেলো কখনো ছিল না, সে একটা মিথ্যা।'

সে রাতটাও ছিল এরকম একটা রাত। মুস্তাফা ঠিক এইখানেই বসে তার কাহিনী শুনিয়েছিল। সে রাতের কথা ভাবছি, হোস্‌নার ফোঁপানোর শব্দ কানে আসছে। মনে হচ্ছে যেন অনেক দূর থেকে ভেসে আসা সেই শব্দ আরো অনেক চেনা শব্দে দ্রবীভূত হয়ে গির্জার ঘণ্টার মত আমার কানে বেজে যাচ্ছে। একটা শিশু চিৎকার করে কেঁদে উঠলো কারুর বাড়িতে, একটা গাধা ডেকে উঠলো, কোথাও ডেকে উঠলো একটা কুঁকড়ো, নদীর ওপারে

কোন বিয়েবাড়িতে উৎসবের হুল্লোড়—কত রকমের শব্দ, সব একসঙ্গে আমার চৈতন্যে মিলেমিশে একাকার। আস্তে আস্তে অন্যসব আওয়াজ মিলিয়ে গেল, রইল শুধু ওর কান্নায় গুমরে ওঠার শব্দ। আমি কিছু না করে চুপচাপ বসে রইলুম। ভাবলুম কেঁদে নিক। সব কান্না রাতের কাছে উজাড় করে দিক। তবু কিছু বলা দরকার, তাই বললুম—'অতীতকে আঁকড়ে থেকে আর কী লাভ! তোমার দুটো ছেলে রয়েছে, তাদের বড় করে তুলতে হবে। আর তোমার কীইবা বয়েস, জীবনটা সবে শুরু হয়েছে। ভবিষ্যতের কথা ভাবা দরকার। অনেক জোয়ান পুরুষ তোমাকে শাদি করার প্রস্তাব নিয়ে হাজির হবে, আর তুমি হয়ত তাদের কাউকে গ্রহণ করবে।'

এক মুহূর্তও অপেক্ষা না করে ও জবাব দিল—'মুস্তাফা সাঈদের পর আমি আর কোন পুরুষের কাছে যাব না।' ওর এমন স্পষ্ট ঘোষাণার দৃঢ়তায় আমি চমকে উঠলাম।

যদিও আমার কথাটা পাড়ার ইচ্ছে ছিল না, তবু বললুম—'ওয়াদ্ রাইয়েস তোমাকে শাদি করতে চায়। তোমার আব্বা বা পরিবারের অন্যদের কোন আপত্তি নেই। ও তোমার সঙ্গে কথা বলার জন্যে আমাকে খুব ধরেছে।'

হোস্না প্রথমে কোন জবাবই দিল না। অনেকক্ষণ কেটে যাবার পরে আমি ভাবলুম ও বোধহয় আর উত্তর দেবে না। আমি ওর কাছ থেকে চলে যাবার জন্যে উঠতে যাচ্ছি এমন সময় অন্ধকারের ভিতর থেকে ওর গলা ভেসে এলো — শান্ত, ধারালো, —'আমাকে যদি জোর করে শাদি দেওয়া হয় তাহলে আমি ওকে খুন করব', তারপর একটু থেমে বলল— 'সেই সঙ্গে নিজেকেও।'

একসঙ্গে অনেক কথা ভিড় করে এলো আমার মনে, ইচ্ছে হল ওকে সেগুলো বলে ফেলি। কিন্তু বলা হল না। দূর থেকে ভেসে এলো মুয়াজিনের আজান—'আল্লা হো আকবর, ঈশ্বর মহান।' এবার নমাজের সময় হয়েছে। আমি উঠে পড়লাম, সেইসঙ্গে হোস্নাও, আর কোন কথা না বলে ওর বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলাম।

সকালে ঘুম থেকে উঠে যখন কফি খাচ্ছি তখন ওয়াদ্ রাইয়েস এলো। ভাবছিলাম আমিই ওর বাড়ি যাব, কিন্তু তার আগেই ও এসে গেল। আমার সামনে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসতে বসতে এমন ভাব দেখাল যেন আমাকে নেমন্তন্নর কথা মনে করিয়ে দিতে এসেছে। আমি অবশ্য বুঝতে পারলাম আগেরদিন হোস্নার সঙ্গে আমার কী কথা হল তা জানার জন্য ওর আর তর সইছে না। তাই কথা না বাড়িয়ে সোজাসুজি বললাম।

'কোন লাভ হল না। আমার মনে হয় আপনার ওকে ভুলে যাওয়াই উচিত। হোসনা বিয়েই করতে চাইছে না।'

আমার কথায় ওয়াদ্ রাইয়েস এতটা ভেঙে পড়বে বুঝতে পারি নি। লোকে যেমন গাধা পাল্টায়, ও তেমনি বৌ পাল্টায়। বেজার মুখে বসে বসে ঠোঁট কামড়াতে লাগল আর হাতের লাঠিটা দিয়ে মাটিতে আঁকিবুকি কাটতে থাকল। বুঝলাম ভীষণ উত্তেজিত হয়েছে আর সেই উত্তেজনা চাপবার জন্যে পায়ের চপ্পল একবার খুলছে আর একবার পরছে, যেন চলে যাবার উপক্রম করছে আবার পরক্ষণেই বসে পড়ছে। ওর এই অভাবনীয় প্রতিক্রিয়া

দেখে আমার সন্দেহ হল—তাহলে কি ওয়াদ্ রাইয়েস প্রেমে পড়ল? সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করলুম—'শাদি করার মতন আর কোন মেয়ে নেই, এমন তো নয়।'

ওর বুদ্ধিদীপ্ত চোখ দুটো এখন ভাঁটার মত জ্বলছে। শান্ত গলায় বলল—'আমি ওকে ছাড়া আর কাউকে বিয়ে করব না। ওর পছন্দ হোক বা না হোক, আমাকে ওর শাদি করতেই হবে। ও নিজেকে মহারাণী না রাজকন্যে ভাবছে? ভুখা মানুষের চাইতেও বিধবার সংখ্যা বেশি এই গাঁয়ে। ওর কপাল ভালো আমার মত একজন ওকে শাদি করতে চাইছে।

আমি বললুম—'ও যদি আর পাঁচটা মেয়ের মত হয় তাহলে এত জেদাজেদির কী দরকার। আপনি তো জানেন ও এর মধ্যে আপনি ছাড়া আরোও অনেককে ফিরিয়ে দিয়েছে, তাদের কেউ কেউ আপনার চেয়ে বয়সে অনেক ছোট। আর ও যদি ছেলে দুটোকেই শুধু মানুষ করতে চায় তাহলে ও যা করতে চায় তাই করতে দেবেন না কেন?

এতক্ষণ মনের মধ্যে যে রাগ ও চেপে রেখেছিল তা হঠাৎ আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের মতো বেরিয়ে এলো। কাঁপতে কাঁপতে যা বলল তাতে আমি বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলুম। ও বলল—'নিজেক জিজ্ঞেস কর মাহমুদের মেয়ে কেন শাদি করতে চায় না। তুমিই এর কারণ—তোমাদের দুজনের মধ্যে নিশ্চয়ই কিছু চলছে তুমি কেন নাক গলাচ্ছ? তুমি ওর বাপও নও, দাদাও নও এমনকি অভিভাবকও নও। তুমি বা সে যাই বল বা কর, আমাকে তার শাদি করতেই হবে। বাপ দাদারা মত দিয়েছে, ওর আবার ইচ্ছে অনিচ্ছের কী আছে। তোমাদের ওই সব ইস্কুলে শেখা কথাবার্তা এখানে চলবে না। এই গ্রামে মেয়েদের অভিভাবক পুরুষরাই।'

ঠিক সেই সময়ে আমার আব্বা যদি না এসে পড়তেন তাহলে না জানি কী হয়ে যেত। তিনি এসে পড়ায় আমি ওখান থেকে চলে এলাম।

আমি বাড়ি থেকে বেরিয়ে সোজা মাহ্জুবের সঙ্গে দেখা করতে গেলাম ওর খেতে। আমরা এক বয়সী, এক সঙ্গে বড় হয়েছি। বুনিয়াদী ইস্কুলে পাশাপাশি বসতুম আমরা। ও আমার থেকে অনেক তুখোড় ছিল। বুনিয়াদি ইস্কুলের পড়া শেষ হলে ও আমাকে বলেছিল—'আমার জন্যে এটুকু লেখা পড়াই যথেষ্ট—লিখতে পড়তে পারি, পাটিগণিত শিখেছি, এই ঢের। আমরা তিন পুরুষের চাষি। চাষির লেখাপড়া শেখার দরকার সেইটুকুই যাতে করে সে চিঠি লিখতে পারে, খবরের কাগজ পড়তে পারে আর জেনে নিতে পারে নমাজের নিয়মকানুন। আর আমাদের যদি কোন সমস্যা হয় তাহলে যাতে করে আমরা সরকারি মহলে দরখাস্ত পাঠাতে পারি।'

আমি আমার পথে গেলাম আর মাহ্জুব গ্রামের একজন কেউকেটা হয়ে উঠল। ও এখন কৃষি প্রকল্প কমিটির চেয়ারম্যান, কৃষি সমবায়ের চেয়ারম্যান, হাসপাতাল কমিটির সদস্য। যে কোন রাষ্ট্রিয় অবিচারের সুরাহা করতে জিলা পরিষদে যে সব প্রতিনিধিদল যায় ও তার সবগুলোতেই থাকে। স্বাধীনতার পর মাহ্জুব, জাতীয় গণতান্ত্রিক সমাজবাদী পার্টির একজন স্থানীয় নেতা হয়েছে। সবাই ওর কথা মান্য করে। মাঝে মাঝে আমরা ছোটবেলার

গল্প করি। ও আমাকে বলে—'তুমি এখন কোথায় আর আমি কোথায়। তুমি এখন কত বড় সরকারি চাকুরে, আর আমি এই অজ পাড়াগাঁয়ের একটা চাষা।'

'আসলে তুমিই জীবনে সফল।' আমি ওকে আমার মনের কথাটা বলার চেষ্টা করলুম,—কারণ তুমিই দেশের আসল মানুষের জীবনে প্রভাব ফেলতে পার। আমাদের মত সরকারি আমলা দেশের খুব একটা কাজে আসে না। আইনত তোমার মত লোকেরাই দেশের আসল ক্ষমতার উত্তরাধিকারী। তোমরাই দেশের শক্তির উৎস, মাটির প্রাণ।'

মাহ্‌জুব হেসে বলে—'আমরা যদি মাটির প্রাণ হই তাহলে সেই মাটি ফ্যাকাসে।'

আমার সঙ্গে ওয়াদ্ রাইয়েসের ঝগড়ার কথা শুনে ও হেসেই খুন। বলল—'ওয়াদ্ রাইয়েস একটা বুড়ো বাচাল। ও যা বলে তা অত ধরতে নেই।'

'তুমি তো জান হোস্‌নার সঙ্গে আমার সম্পর্কটা কর্তব্যের ছাড়া আর কিছু নয়'—আমি ওকে চিন্তিত হয়ে বললুম।

মাহ্‌জুব আমার কথাটা উড়িয়ে দিয়ে বলল—'ওয়াদ্ রাইয়েসকে অত পাত্তা দিও না। এই গাঁয়ে সবাই তোমাকে চেনে। তোমার চরিত্রে কোন কলঙ্ক নেই সে কথা সবাই জানে। তুমি মুস্তাফা সাঈদের ছেলেদের দেখাশুনো কর বলে সবাই তোমার কত গুণগান করে। আল্লা ওর আত্মাকে শান্তি দিন। মুস্তাফা সাঈদ্ তো এ গাঁয়ের লোকই না, আর তোমার সঙ্গে ওর কোন আত্মীয়তাও নেই।' তারপর একটু দম নিয়ে বলল—'মহিলার বাপ দাদারা যদি রাজি থাকে তাহলে কারুর কিছু করার নেই।'

'কিন্তু সে যদি শাদি করতে না চায়?' অবাক হয়ে বললুম।

আমাকে হাতের ভঙ্গিতে থামিয়ে দিয়ে বলল—'তুমি তো জান এখানকার রীতিনীতি। মেয়েরা এখানে পুরুষের সম্পত্তি। আর পুরুষ মানুষ পুরুষ মানুষই, তা সে যতই বাঁকা ত্যাড়া হোক।'

একটু ক্ষুব্ধ হয়ে বললুম—'কিন্তু দুনিয়া বদলে গেছে। এইসব ধারণা আজকের যুগে অচল।'

মাহ্‌জুব বিজ্ঞের মত বলল—'দুনিয়া যতটা বদলেছে ভাবছ ততটা বদলায়নি। মানছি কিছু কিছু বদলেছে যেমন, জলচক্রের বদলে এসেছে পাম্পসেট, লাঙ্গলের ফলা কাঠের বদলে হয়েছে লোহার ; আমাদের মেয়েরা ইস্কুলে যাচ্ছে, রেডিও এসেছে, গাড়ি চলছে, আমরা তাড়ি আর দিশি মদের বদলে খেতে শিখেছি হুইস্কি, বিয়ার—কিন্তু তা সত্ত্বেও রীতিনীতি সবই আগের মতন রয়েছে।' এবারে ওর মুখে হাসি ফুটল, বলল—'দুনিয়াটা সত্যিই বদলাবে যখন আমার মত লোকেরা সরকারের মন্ত্রী হয়ে বসবে। আর সেটা প্রায় অসম্ভব।'

ওর মুখে হাসি দেখে ভরসা হোল। জিজ্ঞেস করলুম—'আচ্ছা তোমার কি মনে হয় ওয়াদ্ রাইয়েস হোস্‌না বিন্ত মাহ্‌মুদের প্রেমে পড়েছে?'

হাসি না থামিয়ে বলল—'অসম্ভব কিছু না। ওয়াদ্ রাইয়েসের মত লোকেরা সব কিছু পাবার জন্যে ব্যস্ত। প্রায় দুবছর ধরে ও হোস্‌নার গুণ গেয়ে বেড়াচ্ছে। ও হোস্‌নাকে শাদির

প্রস্তাব দিল, ওর বাপ দাদারা রাজি হল কিন্তু ওর মত হল না। ওরা সবাই অপেক্ষা করে রয়েছে, ভাবছে কিছুদিন গেলে ওর মত হবে।'

অধৈর্য হয়ে বললাম—'তা হঠাৎ এই আসক্তির কারণটা কী? ওয়াদ্ রাইয়েস তো হোস্না বিন্ত মাহ্মুদকে ছোটবেলা থেকেই চেনে। তোমার মনে আছে ছোটবেলায় ও কীরকম উদোম হয়ে নদীতে সাঁতার দিত? হঠাৎ এখন ওর মনোভাব বদলে গেল কেন?'

মাহ্জুব আমার কথায় যেন একটু অবাক হল। বলল—'ওয়াদ্ রাইয়েস সেই ধরণের লোক যারা গাধা দেখলে কেনার জন্যে পাগল হয়ে যায়! ওর কোন গাধাকে ভীষণ পছন্দ হয় যখন দেখে অন্য কেউ সেই গাধাটায় চেপে যাচ্ছে। তখনই ওর গাধাটাকে এত ভালো লাগে যে ওটাকে যেন তেন ভাবে কেনার জন্যে মরিয়া হয়ে ওঠে। যত টাকাই লাগুক, সেই গাধাটা ও কিনবেই, তাতে যদি গাধাটার দামের তিনগুণ দাম দিতে হয়, তাও সই।'

এবার মাহ্জুব একটু থামল, যেন অনেকক্ষণ এক নাগাড়ে কথা বলে একটু দম নিল, তারপর বলল—'এটা সত্যি, মাহ্মুদের মেয়ে মুস্তাফা সাঈদের সঙ্গে শাদি হওয়ার পর অনেক বদলে গেছে। অবশ্য শাদির পরে সব মেয়েরাই বদলে যায়, তবে ওর বদলটা অন্যদের মতন নয়। ও যেন অন্য মানুষ হয়ে গেছে। এমন কি আমরা, যারা ওর সঙ্গে একসঙ্গে বড় হয়েছি, ছোটবেলায় কত খেলেছি তারাও ওকে চিনতে পারি না। ও যেন অন্য কোন মেয়ে আনকোরা, নতুন—অনেকটা শহুরে মেয়েদের মত। তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ আমি কী বলতে চাইছি।'

আমি মাহ্জুবকে মুস্তাফা সাঈদ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। ও বলল—'আল্লা ওর আত্মাকে শান্তি দিন। আমরা একে অপরকে সমীহ করে চলতাম। প্রথম প্রথম অবশ্য আমাদের তেমন মাখামাখি ছিল না। পরে প্রকল্প কমিটির কাজে আমরা দুজনে খুব কাছাকাছি এসে গেলাম। ওর মৃত্যুতে আমাদের খুব ক্ষতি হয়ে গেল। জান তো, আমাদের প্রকল্পের সংগঠনে নানাভাবে ও সাহায্য করেছে। সে ঋণ শেষ হবার নয়। ও আমাদের হিসেব পত্তর সামলাত, আর ওর ব্যবসা করার পূর্ব অভিজ্ঞতা আমাদের খুব কাজে লেগেছে। ওই তো আমাদের বুদ্ধি দিল প্রকল্পের লাভের টাকায় একটা ময়দা কল বসাতে। এখন আমাদের অনেক সাশ্রয় হচ্ছে ; আর দূর দূর থেকে লোকে আমাদের কলে আসে। এই যে সমবায় ভাণ্ডারটা তৈরি হয়েছে, সেটাও ওরই পরিকল্পনা। এখন আমাদের এই অজ পাড়াগাঁয়ে জিনিসপত্তর, সওদা, খার্তুমের দরেই পাওয়া যায়। তুমি তো জানই, আগে সব কিছু খার্তুম থেকে ষ্টিমারে আসত মাসে একবার কি দুবার। ব্যাপারিরা সেই মাল মজুদ করে রাখত আর বাজারে যখন সওদা শেষ হয়ে যেত তখন চারগুণ দামে সেই মাল বেচত। এখন আমাদের প্রকল্প দশটা লরির মালিক। দুই একদিন পরপরই মাল নিয়ে আসছে সোজা খার্তুম আর ওমদুরমান থেকে। আমি ওকে চেয়ারম্যান হবার জন্যে কত চাপাচাপি করেছি। কিন্তু ও সবসময়ই এই প্রস্তাব এড়িয়ে যেত, বলত আমিই নাকি চেয়ারম্যান পদে সব থেকে যোগ্য লোক। ও ওমদা, আর ব্যাপারিদের দু চক্ষের বিষ হয়ে উঠেছিল কারণ, গাঁয়ের লোকের চোখ খুলে দিয়েছিল ও আর সেই সঙ্গে ওদের লোক ঠকানোও বন্ধ করে দিয়েছিল। ও মারা যাবার পর গুজব উঠেছিল, ব্যাপারিরাই ওকে খুন করেছে—একদম বাজে কথা। সে বছর বহু লোক জলে ডুবে

মরেছিল। ওর মত দূরদর্শী লোক লাখে একটাও মেলে না। এই দুনিয়ায় যদি সুবিচার বলে কিছু থেকে থাকে, তাহলে ওর একজন মন্ত্রী হওয়া উচিত ছিল।

একটু বিরক্ত হয়ে বললুম—'রাজনীতি করে তোমার মাথাটা গেছে। সব কিছু শুধু ক্ষমতার ভিত্তিতেই দেখ! সরকার, মন্ত্রীত্ব এসব বাদ দিয়ে বল মানুষটা কেমন ছিল।'

আমার বিরক্তিতে ও বেশ অবাক হয়ে গেল। একটু তেতে উঠে বলল—'মানুষ কেমন ছিল বলতে তুমি কী বোঝাতে চাইছ? আমি যেমনটা বললাম, ও ঠিক তেমনটাই ছিল।' আমি মাহ্‌জুবকে বোঝানোর ভাষা খুঁজে পেলাম না। তা সত্ত্বেও ও বলল—'সে যাই হোক মুস্তাফা সাঈদের ব্যাপারে তোমার যে কেন এত উৎসাহ্ তা বুঝতে পারি না। তুমি এর মধ্যে অনেকবার আমাকে ওর সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করেছ।' আমি জবাব দেওয়ার আগেই ও আবার বলল—'ও যে কেন তোমাকে ওর ছেলেদের অভিভাবক নির্বাচিত করে গেল তা আমি আজও বুঝি না। অবশ্য তুমি সেই আস্থার যথাযোগ্য মর্যাদা দিয়েছ। তুমি যেভাবে সে দায়িত্ব পালন করেছ তাতে তারিফ না করে পারা যায় না। কিন্তু তোমার সঙ্গে ওর পরিচয় তো মাত্র কদিনের তুমি ওকে কতটুকুই বা আর চিনতে! আমরা ওকে অনেক বেশি চিনতাম। তোমার সঙ্গে তো বছরে মাত্র একবার দেখা হত, আর আমরা ওর সঙ্গে এই গাঁয়েই থাকতাম। আমি ভেবেছিলাম আমাকে বা তোমার দাদুকেই ও অভিভাবক করবে। তোমার দাদুকে ওর খুব পছন্দ ছিল। ওঁরা দুজনে ছিল ঘনিষ্ঠ বন্ধু, আর ও তোমার দাদুর সঙ্গে গপ্পো করতে খুব ভালোবাসত। আমাকে বলত—"বুঝলে মাহ্‌জুব, এই হজ্ আহ্‌মেদ একটা অদ্ভুত লোক।" আমি বলতুম—'ধুর! হজ্ আহ্‌মেদ একটা বাক্যবাগীশ বুড়ো।" এতে ও খুব চটে যেত, বলত—"ও কথা বোল না। হজ্ আহ্‌মেদ আমাদের ইতিহাসের একটা অংশ।"

আমি মাহ্‌জুবকে বললুম—'আমি নামেই ওদের অভিভাবক। আসল অভিভাবক তো তুমিই। তুমি এই গাঁয়েই থাক আর আমি থাকি হাজার মাইল দূরে, খার্তুম।'

মাহ্‌জুব বলল—'ছেলেদুটো বেশ বুদ্ধিমান আর ভদ্র সভ্য। অনেকটা ওদের বাপের মত। আর পড়াশুনোতেওং ওয়াদ্ রাইয়েসের এই হাস্যকর বিয়েটা হয়েই যায়?'

'অত ঘাবড়াবার কিছু নেই। ওয়াদ্ রাইয়েস কিছুদিনের মধ্যেই অন্য আর একটা মেয়ের পিছনে ছুটবে। আচ্ছা না হয় ধরেই নিলাম ওয়াদ্ রাইয়েসের সঙ্গে হোস্‌নার বিন্ত মাহ্‌মুদের শাদিটা হয়েই গেল। আমার মনে হয় না ওয়াদ্ রাইয়েস দেড় দু বছরের বেশি বাঁচবে। তারপরেই হোস্‌না ওয়াদ্ রাইয়েসের এই অঢেল সম্পত্তির অংশীদার হবে।' তারপরেই হঠাৎ নাকের উপর একটা ঘুসির মত আমার কানে এসে বিঁধল মাহ্‌জুবের কথা—'আচ্ছা, তুমি ওকে শাদি করছ না কেন?' আমার বুকের মধ্যে ধড়াস করে উঠলো। প্রায় নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলছিলাম। অনেক কষ্টে সামলে নিলাম। কাঁপতে কাঁপতে বললাম—'তুমি নিশ্চয়ই মজা করছ?'

মাহ্‌জুব বলল—'সত্যি, আমি মজা করছি না। তুমি ওকে শাদি করছ না কেন? আমি নিশ্চিত তোমাকে ও ফেরাবে না। তুমি ওদের ছেলেদের অভিভাবক, না হয় পুরোপুরি আব্বাই হয়ে গেলে।'

আমার মনে পড়ে গেল আগের দিনের সন্ধের অন্ধকারে হোস্‌নার শরীরের সুবাস। সেই অন্ধকারে ওকে ঘিরে যে ভাবনা আমার মনে শিকড় গেড়েছে সে কথাও মনে এলো।

চটক ভাঙলো মাহ্‌জুবের হাসিতে। ও হাসতে হাসতে বলল—'আমাকে বলতে এসো না যে তুমি কারুর স্বামী, কারুর আব্বা। রোজ কেউ না কেউ দ্বিতীয় বিবি ঘরে তুলছে! তোমাতে তার শুরুও হবে না, শেষও না।'

আমি ততক্ষণে আবার নিজেকে সামলে নিয়েছি। হাসতে হাসতে বললাম—'তুমি একদম পাগল হয়ে গেছ।'

মাহ্‌জুবের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বাড়ির পথ ধরলুম। মাহ্‌জুবের সঙ্গে কথা বলার সময় একটা ব্যাপার নিশ্চিত হয়ে উপলব্ধি করলুম—আমি কোন না কোন ভাবে মুস্তাফা সাঈদের বিধবা হোস্‌না বিন্ত মাহ্‌মুদের প্রেমে পড়েছি। এই উপলব্ধি অবশ্য পরে আমার অনেক অশান্তি, বহু বিনিদ্র রজনীর কারণ হয়েছিল। আমি সেদিন আরও উপলব্ধি করলুম যে, মুস্তাফা সাঈদ, ওয়াদ্ রাইয়েস এবং আরো কোটি কোটি লোকের মত আমিও নিরাপদ নই সেই বীজাণু সংক্রমণের হাত থেকে, যে বীজাণু চুঁইয়ে চুঁইয়ে পড়ছে এই ব্রহ্মাণ্ডের শরীর থেকে।

মুস্তাফা সাঈদের দুই ছেলের সুন্নত অনুষ্ঠানের পরেই আমি খার্তুমে ফিরে এলাম। আমার বিবি আর মেয়েকে গ্রামে রেখে কৃষি প্রকল্পর একটা লরিতে মরুভূমির সড়ক পথে রওনা হয়েছিলাম। সাধারণত আমি ষ্টিমারে করে 'কারিমায়' নেমে ট্রেন ধরে 'আবু হামাদ' আর 'আটবারা' হয়ে খার্তুমে ফিরতাম। কিন্তু এবার আমার একটু তাড়া ছিল, কোন বিশেষ কারণে নয় অবশ্য, তাই শর্টকাট রাস্তায় রওনা দিলাম। ভোরবেলা লরি ছাড়ল আমার গ্রাম থেকে তারপর নীল নদের ধার দিয়ে পুব মুখে ঘণ্টা দুয়েক চলার পর সমকোণে ঘুরে দক্ষিণমুখো পথ ধরল আর একটু পরেই মরুভূমির মধ্যে ঢুকে পড়ল। চার দিক কোথাও কোন ছায়া নেই, রোদের তেজ আস্তে আস্তে বাড়ছে। একটু পরেই চারধার তেতে আগুন হয়ে উঠল। রোদটা যেন কোন পুরোনো আক্রোশে ঠিকরে পড়ছে পৃথিবীর মানুষের উপর। লরির কেবিনের চালটা ছাড়া আর কোথাও কোন ছায়া নেই। সামনে বৈচিত্র্যহীন টানা রাস্তা উঁচু নিচু গড়িয়ে চলেছে দিগন্তের দিকে। যে দিকে তাকাই শুধু বালি আর বালি। এদিক ওদিক ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে ঝোপ ঝাড় যার শুধু কাঁটা আছে, কোন পাতা নেই—দুঃখী গাছগুলো, বেঁচেও নেই আবার মরেওনি। লরিটা ঘণ্টার পর ঘণ্টা চলছে অথচ কোন মানুষ বা জন্তুর দেখা নেই। তারপর হঠাৎ একপাল উট দেখা গেল রাস্তার ধারে—লরিটার মতই শীর্ণকায়। খয়াটে চেহারা ছিটেফোঁটা মেঘের লেশ নেই আকাশে। ঢাকনার মত আকাশটা হুমড়ি খেয়ে আছে পৃথিবীর উপর। এখানে দিনের কোন মূল্য নেই। শুধু রাত্রির প্রতীক্ষায় থাকা জীবজন্তুর যন্ত্রণা সইবার জন্যেই আছে দিন। রাতগুলো হল মুক্তি। অসহ্য গরমে আমার প্রায় বিকারগ্রস্ত অবস্থা। নানা এলোমেলো ভাবনা মাথায় ভীড় করে এলো, কত টুকরো কথা, কত মুখ, কত কণ্ঠস্বর—শুকনো, ধোঁয়াটে, যেন পতিত জমির উপর দিয়ে বয়ে যাওয়া দমকা হাওয়া। তাড়ার কি

আছে? তাড়ার কি আছে? সে আমাকে শুধিয়েছিল। 'আরো এক হপ্তা থেকে গেলে হয় না?' সে বলেছিল। 'কালো গাধাটা তোমার চাচাকে ঠকিয়ে ওই কালো গাধাটা বেচেছিল একটা বেদুইন।'

'এটা রেগে যাবার মত কোন ব্যাপার নাকি?' আব্বা বলেছিলেন। পুরুষের মন রেফ্রিজারেটারে থাকে না। রোদ্দুরটা আর সহ্য করা যাচ্ছে না। মগজটা গলিয়ে দিচ্ছে। পঙ্গু করে দেয় চিন্তার শক্তি। মনের আয়নায় মুস্তাফা সাঈদের ছবি, তারপরই ছবিটা মিলিয়ে গেল ইনজিনের গোঙানি আর মরুভূমির পথের পাথরে চাকার ঘষটানির শব্দে। যত চেষ্টাই করছি, কিছুতেই আর ছবিটা ফিরে আসছে না।

ছেলেদের সুন্নতের অনুষ্ঠানের দিন হোস্না মাথার কাপড় ফেলে দিয়ে নেচেছিল, যেমনটা নাচে মায়েরা তাদের ছেলের সুন্নতের অনুষ্ঠানে। কী অদ্ভুত মেয়ে! তুমি ওকে শাদি করছ না কেন? ইসাবেলা সেমুর কীভাবে ওকে আদর করতে করতে কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করত? 'তুমি একটা আফ্রিকার দানব, আমাকে পিষ্ট কর, মথিত কর, লুণ্ঠন কর। তুমি একটা কালো দেবতা, তোমার মন্দিরের আগুনে আমাকে পোড়াও। তোমাদের এই বুনো নৈর্ব্যক্তিক আকার অনুষ্ঠানে আমাকে ছটফটাতে দাও।' এইখানেই তো আগুনের উৎস, এই তো মন্দির। নাঃ কিছুই না। এই সূর্য, মরুভূমি শুকনো আগাছা, শীর্ণ জন্তু জানোয়ার—এসব কিছুই না। গাড্ডায় পড়ে লরিটা কেঁপে উঠলো। রাস্তার ধারে একটা মরা উটের কঙ্কাল পড়ে রয়েছে, এই ধূ ধূ মরুভূমিতে তেষ্টায় মরেছে। মুস্তাফা সাঈদের মুখটা আবার ভেসে উঠলো ওর বড় ছেলেটার মুখের সঙ্গে—ওরই ভীষণ মিল ওর আব্বার সঙ্গে।

সুন্নতের দিন আমি আর মাহ্জুব আকণ্ঠ গিলেছিলাম। গ্রাম জীবনের একঘেয়েমি কাটাতে গ্রামের লোকেরা ছুতোনাতায় ফুর্তির বন্যা বইয়ে দেয়। রাত্রে যখন গাইয়ে বাজিয়ের দল গান বাজনা করছে আর সবাই সেই তালে হাততালি দিচ্ছে, আমি মাহ্জুবের হাত ধরে টলতে টলতে সেই ঘরটার দরজায় এসে দাঁড়ালাম। ওকে বললাম—'এ ঘরের চাবি শুধু আমার কাছেই আছে।' সামনে লোহার দরজা।

মাহ্জুব জড়ানো গলায় বলল—'ভিতরে কী আছে তা জানো?'

বললুম—'হ্যাঁ'

'কী আছে?' ও আবার জড়ানো গলায় জিজ্ঞেস করল।

হাসতে হাসতে বললুম—'কিচ্ছু না।' আমার তখন বেশ নেশা চড়েছে। আরো বললুম—'কিছুই না। এই ঘরটা একটা বিরাট ঠাট্টা—জীবনের মত। তুমি ভাবছ এই ঘরটার মধ্যে একটা গোপন কথা লুকিয়ে আছে। আসলে কিচ্ছু নেই। কিছুই নেই।'

মাহ্জুব আমার কথা রসিকতা ভেবে বলল, 'তুমি একদম মাতাল হয়ে গেছ। এই ঘরের মেঝে থেকে ছাদ পর্যন্ত ধনরত্নে ভরা : সোনা দানা. হীরে জহরৎ, মণি মুক্তো, সব ভর্তি। তুমি জান মুস্তাফা সাঈদ কে?'

মাতালের হাসি হেসে বললুম মুস্তাফা সাঈদ একটা মিথ্যে। 'তুমি মুস্তাফা সাঈদ সম্পর্কে সত্য জানতে চাও?'

মাহ্‌জুব বলল—'তোমার যে শুধু নেশা হয়েছে তাই না, তুমি একটা আস্ত পাগল।' জড়ানো গলায় আরো বলল—'মুস্তাফা সাঈদ আসলে পয়গম্বর 'আল-কিদ্‌র', হঠাৎ দেখা দিল তারপর হঠাৎই মিলিয়ে গেল। ওই ঘরে যে ধনরত্ন আছে তা রাজা সলোমনের গুপ্তধনের মত। কোন জিন বা দানো সেই ধনরত্ন এই ঘরে এনে রেখেছে আর তোমার কাছে রয়েছে ওই ধনরত্নের চাবি। চিচিং ফাঁক—খুলে দাও দরজা আর ওই ধনরত্ন ভাগ করে দাও সবাইকে।' মাহ্‌জুবের গলা ক্রমশ চড়ছিল। ও চেঁচিয়ে প্রায় লোক জড়ো করতে যাচ্ছিল, আমি হাত দিয়ে ওর মুখ চাপা দিয়ে ওকে নিরস্ত করলাম। পরদিন সকালে আমরা নিজেদের বাড়িতেই ঘুম থেকে উঠলুম, জানি না কে পৌঁছে দিল। সামনে পথ অন্তহীন, সীমাহীন, মাথার উপরে সূর্য ক্লান্তিহীন। মুস্তাফা সাঈদ যে উত্তরের কনকনে ঠাণ্ডায় পালাবে তাতে অবাক হবার কিছু নেই। ইসাবেলা সেমুর ওকে বলেছিল : 'খ্রিষ্টানরা বলে তাদের দেবতাকে ক্রুশবিদ্ধ করা হয়েছিল যাতে তিনি ওদের পাপের বোঝা বইতে পারেন। তাঁর মৃত্যুটা অযথা, কারণ হে আমার প্যাগান দেবতা ওরা যাকে পাপ বলে তা আসলে তোমাকে আলিঙ্গনের তৃপ্তি বৈ তো কিছু নয়। তুমিই আমার দেবতা, তুমি ছাড়া আর কোন দেবতা নেই।' এটাই তো ওর আত্মহত্যার কারণ, ক্যানসারের রোগযন্ত্রণা নয়। ওর সঙ্গে আলাপ হওয়ার সময় মেয়েটা আস্তিক ছিল, পরে নিজের ধর্মবিশ্বাস ছেড়ে অন্য দেবতার পুজো আরম্ভ করল ইজরায়েলের সন্তানদের সোনালী বাছুর পুজোর মতন। কী অদ্ভুত! কী মর্মান্তিক হাস্যকর! বিষুবরেখার উপর জন্ম বলে কিছু উন্মাদ তাকে ভাবে ক্রীতদাস, কেউ ভাবে দেবতা- এর মাঝামাঝি অবস্থাটা তাহলে কী? মধ্যবর্তী পথটা কোথায়? আর সরু গলার স্বর, দুষ্টুমি ভরা হাসি নিয়ে আমার দাদুর অবস্থানটা এই বৃহৎ তন্ত্রের (System) ঠিক কোন জায়গায়? উনি কি আমি যা ভাবছি তাই? নাকি এই বিশৃঙ্খলার ঊর্ধ্বে? আমার জানা নেই। যাই হোক উনি, মারি, প্রকৃতির রোষ, ক্ষমতাবানদের দুর্নীতি সত্ত্বেও বেঁচে রয়েছেন। মরার সময় উনি যে মৃত্যুর উপর অবজ্ঞার হাসি হাসবেন সে ব্যাপারেও আমি নিশ্চিত। এটাই কি যথেষ্ট নয়? এর চাইতেও বেশি কী আর দাবী করা হয়েছিল আদম পুত্রেব কাছে?

সামনের একটা পাহাড়ের পিছন থেকে হঠাৎ একজন বেদুইন বেরিয়ে আমাদের লরিটার দিকে দৌড়ে এলো। আমরা লরি থামালাম। কাছে আসতে দেখি তার জামাকাপড় নোংরা, ফাটা ছেঁড়া। লরির ড্রাইভার তাকে জিজ্ঞেস করল সে কী চায়।

সে বলল 'আল্লার দোহাই একটা সিগারেট বা একটু তামাক দাও। দুদিন হয়ে গেল একটুও তামাক জোটে নি।' আমাদের কাছে তামাক না থাকায় ওকে একটা সিগারেট দিলাম। তারপর ভাবলাম আমরাও গাড়ি থামিয়ে একটু জিরিয়ে নিই।

এরকম তৃপ্তি করে কাউকে সিগারেট খেতে জীবনে দেখি নি। বেদুইনটা মাটিতে উবু হয়ে বসে চোখ দুটো বন্ধ করে সিগারেটে এমন টান দিচ্ছিল যাতে একটুও অপচয় না হয়। কয়েক মিনিটের মধ্যে সিগারেটটা শেষ করে আবার হাত বাড়াল। আমি ওকে আর একটা সিগারেট দিলাম সেটাও ও নিমেষে শেষ করে চোখ বন্ধ করে মাটিতে মৃগী রুগির মত ছটফট করতে থাকল কিছুক্ষণ তারপর চোখ বন্ধ করে মড়ার মতন পড়ে রইল। আমরা আরও প্রায়

মিনিট কুড়ি বিশ্রাম নিলাম। এর মধ্যে বেদুইনটা একবারও চোখ খোলে নি। আমাদের লরির ইনজিনে স্টার্ট দিতেই লোকটা তড়াক করে লাফিয়ে উঠলো যেন মরা মানুষ জ্যান্তো হয়ে উঠলো তারপর আমাদের ধন্যবাদ দিতে দিতে বলল 'আল্লা আপনাকে দীর্ঘায়ু করুন'। আমি আধখালি সিগারেটের প্যাকেটটা ছুঁড়ে দিলাম ওর দিকে, লরিটা ততক্ষণে চলতে শুরু করেছে। গাড়িটার পিছনে ধুলোর কুয়াশা, তার মধ্যে দিয়ে দেখলুম বেদুইনটা ছুটে চলে গেল দূরে কাঁটাঝোপের আড়ালে থাকা ছেঁড়াখোঁড়া কয়েকটা তাঁবুর দিকে। তাঁবুর বাইরে ঘুরে বেড়াচ্ছে কয়েকটা হাড় জিরজিরে শিশু আর ভেড়া। হায় ভগবান, কোথায় ছায়া ? এরকম দেশে পয়গম্বর ছাড়া আর কিছু পাওয়া যায় না। এই খরার আরোগ্যের হদিস শুধু আকাশটারই জানা আছে।

পথ আর ফুরোয় না, সূর্যও ক্ষমাহীন। রাস্তার একটা অংশে শুধু পাথর, লরিটা ক্যাঁচ কোঁচ করতে করতে চলেছে। 'আমরা বরবাদী মানুষ, মজার গল্পের হাসির খোরাক'। —কে বলল কথাটা? তারপরেই আবার 'মরুভূমির মাঝখানে আটকে পড়া সেই লোকটার মত, যে সব কটা উটের পিঠেই চেপেছে অথচ পেরোয়নি এতটুকুও রাস্তা।' ড্রাইভার সাহেব তো কথা বলছে না। ওর দৃষ্টি সামনের দিকে স্থির, ও সেই যন্ত্রটার মত যে যন্ত্রটার ও এখন পরিচালক। মাঝে মাঝে যন্ত্রটাকেই একটু গাল পাড়ছে। চারদিকের মরুভূমি মরীচিকায় ডুবে যাচ্ছে। একটা মরীচিকা আমাদের তুলে ধরে আর একটা নীচে নামায়, এক মরুভূমি থেকে বেরিয়ে আর এক মরুভূমিতেই ঢুকে যাই।' মোহম্মদ সাঈদ আল-আব্বাসি, কী কবিই ছিলেন, আহা! আবু নুয়াস্। 'আকণ্ঠ পানে সেই তৃষ্ণা মিটিয়েছি, যে আমাদের সঙ্গী 'আ-দ'-এর সময় থেকে।' এটা হতাশা আর কবিতার দেশ কিন্তু গাইবার কেউ নেই।

রাস্তায় দেখি একটা সরকারি গাড়ি খারাপ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। গাড়িটাকে ঘিরে আছে একজন সার্জেন্ট আর পাঁচজন সৈনিক—সবার হাতে রাইফেল। আমাদের গাড়িটা দাঁড় করালাম ওদের কাছে। ওরা আমাদের কাছ থেকে জল আর অল্প খাবার দাবার চাইল। আমরা সেই সঙ্গে খানিকটা পেট্রোলও দিলাম ওদের। ওদের কাছে শুনলাম যে আল-মিরিসাব উপজাতির একজন মহিলা তার স্বামীকে খুন করেছে, ওরা চলেছে তাকে গ্রেপ্তার করতে। মহিলার নাম কী? স্বামীর নামই বা কী? মহিলা খুন করল কেন? ওরা জানে না — ওরা শুধু এটুকুই জানে যে মেয়েটা আল-মিরিসাব উপজাতির আর সে একটা লোককে খুন করেছে, লোকটা ছিল মেয়েটার স্বামী। কিন্তু এরা জানবে আল-মিরিসাব উপজাতি, আল-হাওয়য়িরি আর আল-কাবাবিস উপজাতির লোকেরা, বিচারকেরা, স্থায়ী আর যাযাবর উপজাতিরা, উত্তর করদোফানের কমিশনার, উত্তর প্রদেশের দক্ষিণ অঞ্চলের কমিশনার, পূর্ব খার্তুমের কমিশনার, জলাশয়ের চরুয়ারা, শেখ আর নাজিররা, লোমের তাঁবুতে থাকা বেদুইনরা। এরা সবাই মেয়েটার নাম জানবে কারণ একটা মেয়ে স্বামী তো দূরে থাক, কোন পুরুষকে খুন করেছে, এরকম সাধারণত শোনা যায় না। এই দেশে মারবার কাজটা সূর্যই করে থাকে। আমার মাথায় একটা মতলব এলো, ভাবলাম এই সরকারি ফৌজিদের সেটা বলে দেখি ওরা কী বলে। আমি ওদের বললাম যে মেয়েটা আসলে খুন করে নি, ওর স্বামীটা

গর্মিতে মরেছে যেমনটা মরেছিল ইসাবেলা সেমুর, শিলা গ্রিণউড, অ্যান হ্যামণ্ড আর জিন মরিস। শুনে কিছুই বলল না, কোন প্রতিক্রিয়াই নেই। শুধু সার্জেন্টটা বলল পুলিশ 'মেজর ব্রুক বলে আমাদের একটা যাচ্ছেতাই পুলিশ কম্যানডানট্ জুটেছে, একে নিয়ে আর পারা যায় না।' ব্যস হয়ে গেল। আর কোন তাপ উত্তাপ নেই। কোন লাভ হল না। ওরা ওদের রাস্তায় রওনা দিল, আমরা আমাদের রাস্তায়।

সূর্যই আসল দুশমন। এখন সূর্য আকাশের সেইখানে আরবরা যাকে বলে আকাশের যকৃৎ। কী ভয়ঙ্কর যকৃৎ! এখানটায় এখন সূর্যটা দাঁড়িয়ে থাকবে ঘণ্টার পর ঘণ্টা। কিংবা বলা যায় পৃথিবীর উপর যত জীবিত প্রাণী আছে তাদের মনে হবে সূর্যটা অনড়, যখন পাথরও আর্তনাদ করবে, গাছগুলো কাঁদবে, লোহাও সহায় খুঁজবে আর্তস্বরে। একটা পুরুষের নীচে একটা নারীর ভোরের কান্না, বিসংলগ্ন হাট করা দুই শ্বেত শুভ্র উরু। ওরা মরুভূমিতে ছড়ানো মরা উটের হাড়ের মত। কোন স্বাদ নেই, গন্ধ নেই। শুভ নয়, অশুভ নয়। লরির চাকাগুলো যেন তীব্র আক্রোশে রাস্তার পাথরে দাঁত ঘষছে। 'ওর বাঁকা রাস্তা অচিরেই নিয়ে যায় সর্বনাশের দোরগোড়ায়। সাধারণভাবে এই সর্বনাশ ও পরিষ্কার দেখতে পায়, তাই আমরা অবাক হয়ে ভাবছি এরকম বুদ্ধিমান মেধাবী একজন কী করে এত নির্বোধ হতে পারে। আমরা মানছি ও অত্যন্ত শিক্ষিত এবং বুদ্ধিমান কিন্তু ওর কোন প্রজ্ঞা বা বোধ নেই। ও একজন বুদ্ধিমান নির্বোধ।' শাস্তির কথা ঘোষণা করার আগে ওল্ড বেইলি আদালতের বিচারক একথাই বলেছিলেন।

পথ অন্তহীন, সূর্য গনগন করছে মাথার উপর। আমি ঠিক করলাম শ্রীমতি রবিনসনকে চিঠি লিখব। উনি এখন 'আইন অফ ওয়াইট'-এর একটা ছোট শহর 'স্যাঙ্ক্লিন'-এ থাকেন। সেদিনের মুস্তাফা সাঈদের কথা আমার অবিকল মনে আছে। ওঁর ঠিকানাটা মুস্তাফা সাঈদ আমায় কথায় কথায় বলেছিল। ওর স্বামীর টাইফয়েডে এন্তেকাল হয়েছে কায়রোতে। ওঁকে কবর দেওয়া হয়েছে ইমাম সাফি-র কবরখানায়। হ্যাঁ, উনি ইসলামে দীক্ষিত হয়েছিলেন। মুস্তাফা সাঈদ বলেছিল, শ্রীমতি রবিনসন আদালতে উপস্থিত ছিলেন বিচারের প্রথম থেকে শেষ দিন পর্যন্ত। ও বিচারের সময় নির্বিকার ছিল। রায় বেরোনর পরে ও শ্রীমতি রবিনসনের বুকে মুখ গুঁজে কান্নায় ভেঙে পড়েছিল। উনি ওর কপালে চুমু খেয়ে মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বলেছিলেন—'বাছা, কেঁদো না।' উনি জিন মরিসকে পছন্দ করতেন না। মুস্তাফা সাঈদকে সতর্কও করেছিলেন ওকে শাদি করার সময়। উনি হয়ত কোন আলোকপাত করতে পারবেন, হয়ত ওনার এমন কিছু মনে পড়বে যা মুস্তাফা সাঈদ আমাকে বলতে ভুলে গিয়েছিল। তারপরই হঠাৎ যুদ্ধ থামল বিজয়ে। সূর্য ডুবল। আকাশটা তো লাল হল না, মেয়েদের পায়ে লাগান মেহেন্দির রঙে রাঙিয়ে গেল। নীল নদের উপত্যকা থেকে বয়ে এলো এক ঝলক ঠাণ্ডা হাওয়া যার সুবাস আমার মনে বেঁচে থাকবে আজীবন। মরুভূমির উটের বাহিনী যেমন দিনের শেষে চলা থামায়, আমরাও তেমনি চলা থামিয়ে লরিটাকে পথ থেকে নামিয়ে পাশে এক জায়গায় দাঁড় করান হলো। আজকের মত পথ চলা শেষ, এবার বিশ্রাম। আমাদের পথের বেশির ভাগটাই পেরিয়ে এসেছি! আমরা রাতের খাওয়াদাওয়ার পাট মেটালাম। কেউ কেউ এর মধ্যে রাতের নামাজ সেরে নিল। ড্রাইভার আর তার সাঙ্গপাঙ্গ

ারা লরি থেকে কয়েক বোতল দিশি মদ বার করল। আমি একটু দূরে একটা সিগারেট ধরিয়ে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়লাম। একটু পরেই একটা দুটো করে তারা ফুটতে ফুটতে আকাশটা তারায় তারায় ভরে গেল। আমি সেই অপরূপ সৌন্দর্যের আয়োজনে হারিয়ে গেলাম। লরিটাকেও ড্রাইভার আর খালাসিরা তেল, জল খাইয়ে এলো। এখন ওটা দাঁড়িয়ে আছে, তৃপ্ত ঘোড়া যেমন দাঁড়িয়ে থাকে তার আস্তাবলে। হঠাৎ যুদ্ধ থামল আমাদের সবার বিজয়ে। এই পাথর, গাছ, জন্তু জানোয়ার, লোহা লক্কড় সবার। এই অপূর্ব দরদী আকাশের নীচে শুয়ে আমার হৃদয়ে অনুভব করলাম সবাই আমার ভাই—মাতাল, ধার্মিক, চোর, ব্যাভিচারী, গুণ্ডা, খুনী সবাই। সবারই উৎস এক। আল্লার মনের খবর কেউ জানে না। হয়ত ওঁর কোন মাথাব্যথা নেই, হয়ত ওনার কোন রাগ নেই। এরকম একটা রাতে মনে হয় একটা দড়ির মই বেয়ে আকাশে উঠে যাওয়া সম্ভব। এটা কাব্য আর সম্ভাবনার দেশ—আর আমার মেয়ের নাম 'আশা'। আমরা ভাঙব, আমরা গড়ব, এই নিষ্ঠুর সূর্যকে বশ করব আমরাই, আমাদের কাছে হার মানবে দারিদ্র্য। সারাদিন আমাদের ড্রাইভার একটাও কথা বলে নি, এখন গান গাইছে। বেশ ভরাট সুরেলা গলা, ভাবাই যায় না ওর গলা এত ভালো। অতীতে কবিরা যেমন তাদের উটের প্রশস্তি গাইত, ও তেমনি ওর গাড়ির প্রশস্তি গাইছে :

কী ভালো আমার ইস্টিয়ারিং-এর চাকা আর অ্যাক্সিল,
আজ রাতে আর বিরাম নেই, আমাদের পৌঁছতে হবে সিট লাফুর।
দূর থেকে আর একটা গলায় উত্তর ভেসে এলো :
আমরা আসছি 'কাওয়াল' আর 'কামবু'-র দেশ থেকে
মাথা উঁচু করে উদার অহঙ্কারে, আমাদের খুশি মেনে নিল অনায়াসে।
ঘামে ভিজে গেল কাঁধ, পিঠ, সারা গা
আগুন ঝরায় পাথুরে পদক্ষেপে

কোথা থেকে আর একটা গলা ভেসে এলো আগের দুজনের জবাবে :
Woe to me, what pain does grip my breat
As does the quaryry tire my dog in chare
The man of God his very faith you'd wrest
And turn aside at Jeddah the Pilgrim to Hejaz.

এমনি চলল। রাস্তা দিয়ে যত লরি যাচ্ছিল, সব এসে দাঁড়িয়ে পড়ল একে একে। আজ রাতে এখানেই বিশ্রাম। আস্তে আস্তে জমায়েতটা বিরাট হয়ে গেল, প্রায় একশো লোক জমে গেল। কেউ খাওয়া দাওয়া করছে, কেউ মদের বোতল খুলে বসে পড়ছে, কেউ নামাজ পড়ছে, কেউ মাতাল হচ্ছে।

আমরা সবাই গোল হয়ে বসে গেলাম। কয়েকজন অল্পবয়সী ছোকরা সেই চক্রের মধ্যে লাফিয়ে পড়ে মেয়েদের মত নাচ শুরু করে দিল। আমরা সবাই একসঙ্গে গলা মিলিয়ে হাততালি দিতে দিতে গান ধরলাম। মরুভূমির মাঝখানে এই নিশুতি রাতে কোথাও কেউ নেই, আমাদের উৎসব জমে উঠলো। কেউ একটা ট্রানজিস্টার বার করে চক্রের মাঝখানে

রাখল আর আমরা সেই রেডিওর গানের তালে হাততালি দিতে দিতে নাচ শুরু করলুম। একজন মতলব দিলে—গাড়িগুলোকে গোল করে দাঁড় করিয়ে আমাদের চক্রের উপর হেড-লাইটের আলো জ্বালিয়ে দিতে। মতলবটা সবার মনে ধরল। গাড়িগুলো আমাদের বৃত্তটা ঘিরে দাঁড়িয়ে গেল আর আমাদের উপর হেডলাইটগুলো জ্বলে উঠলো। ছেলেগুলো নাচতে নাচতে মুখ দিয়ে মেয়েদের মত আওয়াজ দিচ্ছে। উৎসবে মেয়েরা এরকম আওয়াজ করে। সব কটা গাড়ির হর্ণ একসঙ্গে বাজিয়ে দিল। জায়গাটা উৎসবে, আনন্দে উচ্ছল মুখর হয়ে উঠল। এত আলো আর আওয়াজে আশে পাশের বেহেড় আর পাহাড়ের আড়াল থেকে একদল বেদুইন মেয়ে, পুরুষ এসে হাজির হল। দিনের আলোয় এদের দেখা যায় না। রাত পোহালেই এরা কোথায় হারিয়ে যায়। একটা বিরাট সমাবেশ হয়ে গেল।

এবারে সত্যিকারের মেয়েরা আমাদের চক্রের মধ্যে ঢুকে পড়ল। আপনারা, বাবু মশায়রা, যদি তাদের দিনের বেলায় দেখেন তাহলে সঙ্গে সঙ্গে মুখ ঘুরিয়ে নেবেন। কিন্তু ওইখানে ওই নিশুতি রাতে ওদের ভারী সুন্দর লাগছিল। বেদুইনদের মধ্যে থেকে একজন কোথা থেকে একটা ভেড়া এনে জবাই করে ফেলল, তারপর আগুন জ্বেলে সেটাকে ঝলসাতে শুরু করল। একজন যাত্রি দু কেস বিয়ার নিয়ে এসে সবাইকে বাঁটল তারপর হেঁকে বলল—'সুদানের সুস্বাস্থ্যের জন্যে। সুদানের সুস্বাস্থ্যের জন্যে।' সিগারেটের প্যাকেট, মিষ্টির বাকসো হাতে হাতে ঘুরতে লাগল, বেদুইন মহিলারা নাচে গানে আসর মাতিয়ে তুলল। আমাদের এই মহতী উৎসবে মরুভূমি জেগে উঠল, তার আকাশে বাতাসে ছড়িয়ে গেল গানের সুর, তালির শব্দ, কলহাস্যের আওয়াজ। মনে হচ্ছিল আমরা যেন একপাল অশরীরি ভোজসভা বসিয়েছি। কথা নেই বার্তা নেই একটা বিরাট ভোজের আসর জমে গেল, যে আসরের আলাদা কোন উপলক্ষ নেই, ঠিক যেমন মরুভূমির বুকে বালির ঘূর্ণিঝড় ওঠে আর তারপরেই মিলিয়ে যায়। সকাল হল, আমরা আবার রওনা হলাম যে যার পথে। বেদুইনরা ফিরে গেল ওয়াদির বেহেড়ে, সবাই সবাইকে বিদায় জানিয়ে যে যার গাড়িতে গিয়ে উঠল। ইনজিনগুলো চালু হল, একটু আগের অন্তরঙ্গ অবস্থা থেকে গাড়িগুলো সরে গিয়ে আবার রাস্তায় উঠল—পড়ে রইল শুধু মরুভূমির পথ। ধূলো উড়িয়ে লরিগুলো চলে গেল। কোনটা গেল উত্তরে, কোনটা দক্ষিণে। দুটো পথই চলে গেছে নীল নদের দিকে। ওমদুরমান সহরটা ভেসে উঠলো দিগন্তে এদিকে কেরারি পাহাড়ের উপর তখন সূর্য উঠছে।

ষ্টিমারটা ঘুরে এসে দাঁড়াল জেটিতে। সব কিছুই আগের মতই চলছে। ষ্টিমারের হুইস্‌ল বেজে উঠলো জোরে ; উল্টো পারের ছোট নৌকোগুলো দড়ি খুলে ভেসে পড়ল ; সাইকামোর গাছের সারি, যাত্রি নামার পাটাতনটার কাছে হুড়োহুড়ি—সবই আগের মতন আছে। শুধু একটাই পার্থক্য। আমি নামতেই মাহ্‌জুব এসে আমার হাত ধরল কিন্তু মুখটা অন্যদিকে ফেরানো, এবারে শুধু ও একা আমাকে নিতে এসেছে ষ্টিমার ঘাটায়। ওকে কোন কারণে বেশ অপ্রস্তুত লাগছিল যেন কোন অপরাধ করে ফেলেছে বা কোন অঘটনের দায় চাপাতে চাইছে আমার উপর।

ওর হাত ধরে করমর্দন না করেই জিজ্ঞেস করলুম—'তুমি এটা কী করে ঘটতে দিলে?'

আমার চাচা আব্দুল করিমের লম্বা কালো গাধাটার পিঠে জিন চড়াতে চড়াতে বলল—'যা হয়ে গেছে তাকে যেতে দাও। ছেলে দুটো আমার বাড়িতে আছে। ভালই আছে।'

এই ভয়ঙ্কর যাত্রায় একবারের জন্যেও ছেলে দুটোর কথা আমার মনে পড়ে নি। সবসময় আমার মনটা জুড়ে ছিল তার চিন্তায়। আবার মাহ্‌জুব্যক বললুম—'কী হয়েছিল?'

মাহ্‌জুব আমার দিকে তাকাচ্ছে না। ও চুপ করে এক মনে ওর গাধার পিঠের জিনটা শক্ত করে বাঁধছিল, তারপর লাগাম হাতে এক লাফে চেপে বসল গাধাটার পিঠে। আমি তখনো ওর জবাবের আশায় দাঁড়িয়ে আছি, তারপর জবাব না পেয়ে আমিও গাধাটার পিঠে চড়ে বসলাম। ও গাধাটার পেটে গোড়ালি দিয়ে গুঁতো মেরে চলতে শুরু করল। তারপর বলল—'তোমাকে টেলিগ্রামে যা লিখেছিলাম তাই হয়েছে। ওসব নিয়ে আর ভেবে লাভ নেই। আর তুমি যে চলে আসবে সেটা আমরা আশা করি নি।'

আমি বললুম—'তোমার কথামত ওকে শাদিটা করে ফেললেই হোত।' ভাবলুম আমার কথা শুনে ও নীরবতা ভাঙবে, ও বলতে সব কথা বলতে শুরু করবে। কিন্তু কিছুই হল না, ও আরো গভীর নীরবতায় নিজেকে লুকোল। বুঝতে পারলাম ও খুব রেগে আছে, অকারণে গাধাটার পেটে গোড়ালি দিয়ে জোরে খোঁচা দিল। আমি ওর গাধাটার পিছন পিছন আরো গতি বাড়িয়ে বললুম, 'তোমার টেলিগ্রাম পাবার পর থেকে আমি এক লহমার জন্যেও ঘুমোতে পারি নি, খেতে পারি নি, কারুর সঙ্গে ভালো করে কথাও বলতে পারি নি। খার্তুম থেকে আসার পথে রেলে, ষ্টিমারে এই তিন দিন সবসময় আমি শুধু তার কথাই ভেবেছি আর নিজেকে শুধিয়েছি এটা কী করে হল। আমি কোন জবাব পাই নি।'

মমতামাখানো গলায় মাহ্‌জুব বলল, যেন আমার জন্যে ওর খুব কষ্ট হচ্ছে—'তুমি এর আগে কখনো এত অল্প দিনের মধ্যে ফিরে আসনি।'

বললুম—'নাঃ, ঠিক বত্রিশ দিন পরে ফিরলাম।' ও খোঁজ নেবার ভান করে বলল—'খার্তুমের নতুন কোন খবর আছে নাকি?'

জবাব দিলুম—'আমরা একটা সম্মেলন নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম।' লক্ষ করলুম খার্তুমের খবর জানার উৎসাহ খুব, বিশেষ করে ঘুষ, ক্ষমতাবানদের দুর্নীতি এইসব বিষয়ে।

খুব উৎসাহ নিয়ে জিজ্ঞেস করল—'এবারের সম্মেলন কী নিয়ে?'

আমার বেশ রাগ হয়ে গেল ওর হাবভাব দেখে। এত তাড়াতাড়ি ও এরকম একটা ব্যাপার ভুলে গেল। বিরক্তি ঢাকার চেষ্টা না করে উত্তর দিলুম—'শিক্ষা মন্ত্রক এবার একটা আয়োজন করেছিল, তাতে আফ্রিকার কুড়িটা দেশের প্রতিনিধিরা আমন্ত্রিত হয়েছিল। সম্মেলনের উদ্দেশ্য হল সারা মহাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে কীভাবে ঐক্যবদ্ধ করা যায় তার আলোচনা করা। আমি ওই সম্মেলনের সম্পাদকমণ্ডলীর একজন সদস্য ছিলাম।'

'আগে ইস্কুল তৈরি করুক,' মাহ্‌জুব ফুঁসে উঠলো—'তারপর ওসব ঐক্যবদ্ধ করার কথা ভাবা যাবে। এরা যে কোন জগতে থাকে কে জানে। এরা সময় কাটাচ্ছে সম্মেলন আর আল ফাল কাজে, আর এদিকে আমাদের ছেলেমেয়েদের কয়েক মাইল দূরের ইস্কুলে যেতে হবে।

কেন, আমরা মানুষ নই? আমরা ট্যাক্স দিই না? এদেশে আমাদের কি কোন অধিকার নেই? সব কিছুই খার্তুমে। 'মেরায়ি'-তে মাত্র একটা হাসপাতাল যেখানে পৌঁছতে আমাদের লাগে তিন দিন। সারা দেশের ব্যয় বরাদ্দের সবটা খার্তুমের জন্যে খরচ হবে,কেন? বাচ্চা হওয়ার সময় মেয়েরা মরছে অথচ গাঁয়ে একটা আধা শিক্ষিত দাইও জোটে না। আর তুমি খার্তুমে বসে কী করছ? আমাদেরই একজন সরকারি দফতরে থেকে কী লাভ হল আমাদের, তুমি যখন কিছুই করবে না?

আমার গাধাটা ওকে ছাড়িয়ে এগিয়ে গেছে তাই লাগাম টেনে গতি শ্লথ করলাম। যাতে ও এগিয়ে আসে। অন্য সময় হলে আমি চেঁচিয়ে ঝগড়া শুরু করে দিতুম, কিন্তু এখন চুপ করে রইলাম। আমরা আবাল্য বন্ধু। কিন্তু রেগে গেলে দুজনে দুজনকে বকে, ঝগড়া করে গ্রাম মাথায় করতুম আবার খানিক পরেই সব মিটমাট হয়ে যেত। কিন্তু এখন আমি ক্লান্ত, ভীষণ খিদেও পেয়েছে আর শোকে দুঃখে মনটা ভারি হয়ে আছে। অন্য সময়ে, আমাদের দেখা হলে ওকে সম্মেলনের গপ্পো শুনিয়ে রাগাতুম, হাসাতুম। আফ্রিকার অন্যান্য সব দেশগুলোর নতুন শাসকদের চেহারাটা যদি ও দেখত, ওর বিশ্বাসই হত না লোকগুলো কী জিনিস। মুখখানা পালিশ করা, কথা বার্তা ধূর্ত নেকড়ের মত, আঙুলে ঝিক্‌মিক করছে দামী রত্ন খচিত আঙটি, গায়ে দামী সেন্ট-এর গন্ধ ভুরভুর করছে, পরণে ভীষণ দামী সাদা, কালো, নীল সবুজ স্যুট প্যান্ট, কাঁধে আরো দামী সিল্ক ঢেউ খেলছে—যেন শ্যাম দেশের বিড়ালের লোম, আর জুতোগুলো থেকে ঝাড়বাতির আলো ঠিকরোচ্ছে, মার্বেল পাথরের উপর দিয়ে চলার সময় কী মস্ মস্ আওয়াজ। মাহ্‌জুব বিশ্বাসই করবে না, নয় দিন ধরে এই সব লোকেরা আফ্রিকায় শিক্ষা ব্যবস্থার অগ্রগতির সমস্ত দিক খতিয়ে দেখছিল। সম্মেলনের আয়োজন হয়েছিল 'স্বাধীনতা হল'-এ। হলটা এইরকম সব সম্মেলনের জন্যে তৈরি। এটা তৈরি করতে খরচ হয়েছিল কয়েক কোটি পাউণ্ড। সিমেন্ট, পাথর, কাচ, লোহা দিয়ে তৈরি এক বিশাল নয়নাভিরাম ইমারত। বাড়িটা গোল করে বানানো, ওর নকশা তৈরি হয়েছে লণ্ডনে। বারান্দার সাদা মার্বেল ইতালি থেকে আনানো আর জানলাগুলো সেগুন কাঠের ফ্রেমে ছোট ছোট রঙিন কাঁচ কৌশলে লাগিয়ে তৈরি। মূল হলঘরের মেঝেয় পাতা দামী পারস্যের কার্পেট, ঘরের ছাদ সোনালী গিল্টি করা গম্বুজাকৃতির, ছাদ থেকে নেমে এসেছে অনেকগুলো ঝাড়বাতি যার প্রত্যেকটা বড় উটের মত প্রকাণ্ড। যে মঞ্চে দাঁড়িয়ে আফ্রিকার দেশগুলোর শিক্ষা মন্ত্রীরা বক্তৃতা করল নয় দিন ধরে, সেই মঞ্চটা লাল মার্বেলের তৈরী, অনেকটা নেপোলিয়নের সমাধি 'লা ইনভ্যালিদেঘ' এর মত। উপরটা মসৃণ আর পিচ্ছিল। দেওয়ালে বিরাট বিরাট তেলরঙে আঁকা ছবি ঝুলছে, প্রধান দরজার দিকে মুখ করা দেওয়ালে আফ্রিকার একটা বিরাট ম্যাপ নানা রঙের মোজাইক দিয়ে তৈরি, প্রত্যেকটা দেশের রঙ আলাদা। কি করে মাহ্‌জুবকে বলি সেই বাক্যবাগীশ মন্ত্রীর কথা, তুমুল হাততালিতে যার বক্তৃতা শেষ হয়েছিল : 'ইস্কুলে ছাত্রেরা যা শিখবে আর জনজীবনের বাস্তবতার মধ্যে কোন বিরোধিতা বা অসংগতি থাকাটা অভিপ্রেত নয়। আজ যারা লেখাপড়া শিখছে তারা সবাই পাখার তলায় ডেস্কে বসে কাজ করতে চায়, থাকতে চায় শীততাপ নিয়ন্ত্রিত বাগানঘেরা বাড়িতে। তারা

চলাফেরা করতে চায় রাস্তার সমান চওড়া আমেরিকায় তৈরি মোটরগাড়িতে। এই অসুখের বীজ যদি আমরা সমূলে উৎপাটিত না করতে পারি তাহলে আমরা পাব একটা বুর্জোয়াকে, যার সঙ্গে আমাদের জীবনের বাস্তবতার কোন সম্পর্ক নেই, আর সেটাই হবে আফ্রিকার ভবিষ্যতের পক্ষে সবথেকে বিপজ্জনক, এমনকী সাম্রাজ্যবাদীদের থেকেও ভয়ঙ্কর বেশি।' মাহ্জুবকে কী করে বলব যে এই লোকটাই গরমকালে আফ্রিকা থেকে চলে যায় সুইজারল্যাণ্ডে, সেখানে লুসার্ণ হ্রদের ধারে ওর একটা ভিলা আছে। সেইখানেই লোকটা সপরিবারে গরমকালটা কাটায়। ওর স্ত্রী লণ্ডনে হ্যারডের দোকান থেকে বাজার করে, ওখান থেকে সব জিনিসপত্তর ওর ব্যক্তিগত অ্যারোপ্লেনে চলে যায় বাড়িতে। ওই মন্ত্রীর প্রতিনিধি দলের অন্যরাও খোলাখুলি বলছিল যে ওর মত ঘুষখোর, দুর্নীতিপরায়ণ লোক খুব কম দেখা যায়। এর প্রচুর বিষয় সম্পত্তি, নানারকম ব্যবসা, দেশের অর্থ উলঙ্গ অসহায় খেটে খাওয়া মানুষদের ঠকিয়ে টাকার পাহাড় তৈরি করেছে। এই ধরণের লোকেরা শুধু নিজেদের পেট আর যৌন চরিতার্থতা ছাড়া আর কিছুই বোঝে না। দুনিয়ায় কোথাও আত্মসংযম বা সুবিচার নেই। মুস্তাফা সাঈদ বলেছিল 'কিন্তু আমি গৌরব খুঁজি না কারণ আমার মত লোকেরা গৌরব খোঁজে না।' মুস্তাফা সাঈদ যদি প্রথাগত রাস্তায় জীবন কাটাত তাহলে ও হয়ত এই নেকড়ের পালেই যোগ দিত। এদের সবাইকে ওর মতই দেখতে সুদর্শন, সারা শরীরে ভোগের চিহ্ন। একদিন একজন মন্ত্রী সম্মেলনের শেষ দিনের ভোজসভায় বলছিলেন—'আপনাকে আমার খুব চেনা একজনের মত দেখতে, লণ্ডনে তাঁর সঙ্গে আমার খুব ঘনিষ্ঠতা ছিল, উনি আমার খুব বন্ধু ছিলেন—ওঁর নাম ডঃ মুস্তাফা সাঈদ। উনি ছিলেন আমার মাষ্টারমশাই। ১৯২৮ সালে উনি Society for the Struggle for human Freedom-র প্রেসিডেণ্ট ছিলেন, আর আমি ছিলাম কমিটির সাধারণ সদস্য। ওঃ কী দারুণ লোক! এরকম উঁচুদরের আফ্রিকার লোক আমি আরদেখি নি। সব রকম প্রভাবশালী মহলের সঙ্গে ওঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। ওঁর তুলনা নেই—মেয়েরা ওঁকে দেখলে আর নিজেদের ঠিক রাখতে পারত না। উনি রসিকতা করে বলতেন "আমি আমার লিঙ্গ দিয়ে আফ্রিকা স্বাধীন করব।" উনি এমন প্রাণখোলা হাসি হাসতেন যে ওঁ আলজিভ দেখা যেত।' আমি ভাবলুম মুস্তাফা সাঈদ সমুর্কে ওনাকে দুই একটা প্রশ্ন করি কিন্তু উনি তার অবকাশ না দিয়ে রাষ্ট্রপতি আর মন্ত্রীদের ভিড়ে হারিয়ে গেলেন। মুস্তাফাকে নিয়ে আমার আর কোন মাথাব্যথা নেই কারণ মাহ্জুবের টেলিগ্রামটা পাবার পর থেকে সব কিছু বদলে গেছে, আমার নিজের দুশ্চিন্তা নিয়ে এসেছে। শ্রীমতি রবিনসনের চিঠিটা আর একবার পড়েছিলাম। চেষ্টা করছিলাম ভাবনাচিন্তাগুলো মাথা থেকে সরিয়ে দিতে, কিন্তু তা হবার নয়।

গাধা দুটো দুলতে দুলতে চলেছে গ্রামের দিকে, তাদের ক্ষুরে লেগে পাথরের টুকরোগুলো ছিটকে যাচ্ছে এদিক ওদিক। মাহ্জুব খোঁটা দিল—'এত চুপচাপ কেন? মনে হচ্ছে বোবা হয়ে গেছ। কিছু বলছ না কেন?'

গম্ভীর হয়ে বললুম—'আমার মত সরকারি আমলারা কোন কিছু পাল্টাতে পারে না। আমাদের কর্তারা যদি বলে "এটা কর" আমরা করি, যদি বলে "সেটা কর" আমরা করি

ফেলি সঙ্গে সঙ্গে। তুমি তো জাতীয় গণতান্ত্রিক সমাজতান্ত্রিক পার্টির এখানকার আঞ্চলিক প্রধান। পার্টির রাজত্ব, তুমি তাদের কাছে তোমার রাগটা দেখাও না কেন?'

একটু কৈফিয়তের সুরে মাহ্‌জুব বলল—'এই অঘটনটা যদি না ঘটত.... এই দুর্বিপাক....সেইদিনই আমরা তৈরি হচ্ছিলাম মিছিল করে গিয়ে আমাদের দাবীপত্র পেশ করার জন্য। আমাদের দাবী ছিল, একটা বড় হাসপাতালের জন্যে বাড়ি, গ্রামের জন্যে একটা ছেলেদের মাধ্যমিক ইস্কুল, মেয়েদের বুনিয়াদি ইস্কুল, একটা কৃষি ইস্কুল আর....' ওর গলাটা হঠাৎ মিলিয়ে গেল কোন অসহায় মৌন রাগে।

আমাদের বাঁদিকে ভয়াবহ নদীটা ঝিলমিল করছে, সেদিক থেকে ভেসে আসছে নানা রহস্যময় শব্দ। সামনে দূরে দেখা যাচ্ছে কবরখানার মাঝখানের দশটা গম্বুজের চুড়ো আর আমার মনে পড়ল সেই হৃদয় চেরা ঘটনা।

'আমরা ওদের সকালবেলায় গোর দিলাম কোন অকারণ হৈ চৈ না করে।' মাহ্‌জুব বলছিল—'আমরা মেয়েদের কোন শোকপ্রকাশ করতে বারণ করলাম। আমরা সবরকম পারলৌকিক ক্রিয়া বাদ দিয়েছি, কাউকে কোন খবরও দিই নি। কারণ তাহলে পুলিশ আসত আর তদন্তের নামে যত কেচ্ছা কেলেঙ্কারির চূড়ান্ত হত।'

'পুলিশ কেন?' আমার প্রশ্নের জবাবে মাহ্‌জুব নির্বাক আমার দিকে চেয়ে রইল। অনেকক্ষণ পরে বলল—'তুমি চলে যাবার দিন দশেক পরে হোস্‌নার বাবা ওয়াদ্ রাইয়েস্‌কে কথা দিয়েছি'—এই বলে ওয়াদ্ রাইয়েসের সঙ্গে হোস্‌না বিন্ত মাহমুদ-এর শাদি দিয়ে দিল। হোস্‌নার বাবা তাকে গালিগালাজ মারধোর করে বলেছিল ওয়াদ্ রাইয়েসকে শাদি করতেই হবে তার পছন্দ হোক বা না হোক। আমি অবশ্য বিয়েতে যাই নি। কেউই যায় নি, গিয়েছিল শুধু ওয়াদ্ রাইয়েসের বন্ধুরা—'তোমার দাদু, বক্‌রি আর বিন্ত মাঝুব। আমি ওয়াদ্ রাইয়েসকে নিরস্ত করতে চেয়েছিলাম, কিন্তু ও কোন কথা কানেই তুলল না, গোঁ ধরে রইল। হোস্‌না বিন্ত মাহ্‌মুদের বাবার সঙ্গে কথা বললাম, তারও ওই এক গোঁ, বলল যে ওর মেয়ে বাপের কথা শোনে না এই বলে গ্রামের লোক হাসাহাসি করবে তা ও হতে দিতে পারে না। শাদি হয়ে যাবার পর আমি ওয়াদ্ রাইয়েস্যক বলেছিলাম একটু বুঝে সুঝে চলতে।'শাদির পরে দু-হপ্তা দুজনে একসঙ্গে ছিল কিন্তু হোস্‌না একটাও কথা বলে নি। দুজনের অবস্থাই প্রায় পাগলের মত। ওয়াদ্ রাইয়েস জনে জনে বলে বেড়াতে লাগল কীভাবে আল্লা এবং তাঁর পয়গম্বরের কানুন অনুযায়ী শাদি করা বিবি একবাড়িতে থাকছে। তাদের দুজনের সম্পর্ক পুরুষ এবং তার বিবি-র মত স্বাভাবিক আদৌ নয়। আমরা ওকে বললাম ধৈর্য ধরতে, আর তারপর....'

গাধা দুটো একসঙ্গে ডেকে উঠলো আমি আর একটু হলেই পড়ে যাচ্ছিলাম। দুদিন ধরে গ্রামের প্রায় সবাইকে জনে জনে জিজ্ঞেস করলাম কী হয়েছিল, কিন্তু কেউ মুখ খোলে না। দেখা হলে সবাই আমার থেকে মুখ ঘুরিয়ে নেয় যেন সকলেই একটা ভয়াবহ অপরাধের শরিক।

আম্মা জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কাজকর্ম ফেলে চলে এলে কেন?'

বললুম—'ছেলে দুটোর জন্যে।'

আমার দিকে অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন কিছুক্ষণ তারপর বললেন—'ছেলে দুটো না ছেলে দুটোর মায়ের জন্যে? তোমার আর তার মধ্যে কি চলছিল? সে তোমার বাবার কাছে এসে সোজা বলে দিল, কথাগুলো খেয়াল কর : "আপনার বড় ছেলেকে বলুন আমাকে শাদি করতে।" কী নির্লজ্জ বেহায়া মেয়েরে বাবা। আর তারপরে যা করল সে আর মুখে আনা যায় না।'

আমার দাদুও মুখ খুলছে না। ওঁর বাড়ি গিয়ে দেখি নীচু কেদারাটায় বসে আছেন, ক্লান্ত অবসন্ন। ওঁকে ওরকম কখনো দেখিনি। মনে হচ্ছিল ওঁর জীবনীশক্তির উৎস শুকিয়ে গেছে। আমি ওঁর কাছে বসলুম, তাও কোন কথা বললেন না। মাঝে মাঝে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে উঠেছিলেন—'আল্লা আমাকে তুলে নাও, আমাকে শয়তানের হাত থেকে রক্ষা কর।' যখনই উনি এরকম বলে উঠছিলেন তখনই আমার বিবেকে একটা খোঁচা লাগছিল যেন শয়তান আর আমি এক গোত্রের। অনেকক্ষণ পরে ছাদের দিকে তাকিয়ে ককিয়ে উঠলেন : 'আল্লা সমস্ত মেয়েদের অমঙ্গল করুন, এরা শয়তানের সহোদরা। ওয়াদ্ রাইয়েস! ওয়াদ্ রাইয়েস রে! এই বলে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন। আমি ওনাকে কখনো কাঁদতে দেখিনি। খানিকটা কাঁদার পর জোব্বার প্রান্তে চোখ মুছে স্থির হয়ে রইলেন। অনেকক্ষণ সাড়া শব্দ না পেয়ে ভাবলাম উনি বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছেন। আমি উঠে পড়ব ভাবছি এমন সময় উনি বলে উঠলেন—'আল্লা তোমার আত্মাকে শান্তি দিন ওয়াদ্ রাইয়েস।' তারপর আবার বললেন—'আল্লা ওকে ক্ষমা করুন, ওকে তাঁর করুণায় ঢেকে দিন।' দাদু এরপর বিড় বিড় করে প্রার্থনা করলেন তারপর বললেন—'ওর মতন লোক হয় না—সদা হাস্যময়। কারুর বিপদে আপদে সবসময় সাহায্যের হাত বাড়িয়েই আছে। কেউ কিছু চাইলে কখনো না বলত না। আমার কথাটা যদি একটু শুনত! ইস কীভাবে শেষ হয়ে গেল। আল্লা ছাড়া আর কারোর কোন ক্ষমতা নেই—আল্লার রহমতে এরকম ঘটনা এই গ্রামে আর কখনো হয় নি। কী দিনকাল পড়েছে।'

সাহস করে জিজ্ঞেস করলাম—'কী হয়েছে?'

আমার কথায় কান না দিয়ে উনি একমনে মালা জপতে লাগলেন। বেশ খানিকক্ষণ পরে বললেন—'ওই জাতটা শুধু গণ্ডগোল পাকাতেই আছে। আমি ওয়াদ্ রাইয়েসকে বলেছিলাম—"এই মেয়েটা অপয়া, শুধুই অমঙ্গল ডেকে আনে। ওর থেকে দূরে থেক।" শুনলে আমার কথা। সবই নিয়তি।'

তৃতীয় দিনে পকেটে একবোতল হুইস্কি নিয়ে বিন্ত মাঝুবের সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। বিন্ত মাঝুবই আমার শেষ ভরসা, ও যদি কিছু না বলে তাহলে আর কেউ কিছু বলবে না। বিন্ত মাঝুব একটা অ্যালুমিনিয়ামের কাপে অনেকটা হুইস্কি ঢেলে বলল—'তোমার নির্ঘাৎ কিছু দরকার আছে তা বোঝা যাচ্ছে। সহরের এইসব ভাল ভাল মদ তো আমাদের এখানে জোটে না।'

সোজাসুজি বললাম—'আমি জানতে চাই কী হয়েছিল। কেউ আমায় কিছুই বলছে না।'

এক চুমুকে অনেকটা গিলে নিয়ে মুখ কুঁচকে বলল—'বিন্ত মাহ্‌মুদ যা করেছে সে কথা সহজে কেউ মুখে আনবে না। এরকম ঘটনার কথা আমরা সাত জম্মে শুনি নি।'

বিন্ত মাঝুব কথা বন্ধ রেখে হুইস্কিতে মন দিল। আমি ধৈর্য ধরে বসে আছি। চোখের সামনে বোতলটা শেষ হয়ে গেল। বিন্ত মাঝুব-এর কোন বিকার নেই, শুধু একটু উদ্দীপ্ত হয়ে উঠল। বোতলের ছিপিটা লাগাতে লাগাতে বলল—'অনেক হয়েছে ম্লেচ্ছদের মদ খাওয়া। তবে এটা বেশ কড়া, আমাদের খেজুর রসের তাড়ির চাইতে অনেক ঝাঁঝালো।'

আমি অনুনয়ের দৃষ্টিতে তাকালুম ওর দিকে। ও বলল—'তোমাকে আমি যা বলব তা তোমাকে এই গাঁয়ের কেউ বলবে না, কারণ তারা এই কাহিনী হোসনা বিন্ত মাহ্‌মুদ আর ওয়াদ্ রাইয়েসের সঙ্গে গোর দিয়েছে। এসব খুব লজ্জার কথা, আলোচনা করা যায় না।' এই পর্যন্ত বলে আমার দিকে চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে রইল।

'এসব কথা তোমার শুনতে ভালো লাগবে না। বিশেষ করে যখন....' এইটুকু বলে বিন্ত মাঝুব চোখ নামাল।

বেপরোয়া হয়ে বললুম—'আমিও সবার মত, আমি জানতে চাই কী ঘটেছিল শুধু আমাকেই কেন সত্যি কথাটা জানতে দেওয়া হবে না।'

আমার দেওয়া সিগারেটটা ধরিয়ে একটা লম্বা টান দিয়ে বিন্ত মাঝুব আবার শুরু করল—'সন্ধের নামাজের পর ওয়াদ্ রাইয়েস-এর বাড়ি থেকে হোস্‌না বিন্ত মাহ্‌মুদ-এর চিৎকার শুনে আমি চমকে জেগে উঠেছিলাম। সারা গ্রাম নিস্তব্ধ, কোথাও কোন আওয়াজ শোনা যাচ্ছে না। আল্লার নামে শপথ করে বলছি, আমি ভাবলাম অবশেষে ওয়াদ্ রাইয়েসের অভীষ্ট সিদ্ধ হয়েছে। বেচারার প্রায় পাগল পাগল অবস্থা হয়েছিল। দু হপ্তা কেটে গেছে, মেয়েটা ওর সঙ্গে একটা কথা বলা তো দূরে থাক কাছে ঘেঁষতেও দেয় নি। আমি একটু কান পেতে শুনলাম ওর চিৎকার। আল্লা আমাকে মাফ করুন, আমি চিৎকার শুনে নিজের মনে হাসলাম আর ভাবলাম ওয়াদ্ রাইয়েসের এখনো যোশ রয়েছে। ক্রমশ চিৎকার বাড়তে লাগল, বক্‌রির বাড়ির দিক থেকেও মানুষের গলার আওয়াজ পেলাম। শুনলাম বক্‌রি চেঁচিয়ে বলছে—'ওয়াদ্ রাইয়েস, তোমার লজ্জা হওয়া উচিত, রাত দুপুরে এসব কী কেলেংকারি?" তারপর শুনলাম সাঈদা, বক্‌রির বিবি-র গলা—"বিন্ত মাহ্‌মুদ তোমার মান সম্মান নেই। এসব কী হচ্ছে? বিয়ের প্রথম রাতেও মেয়েরা এমন চেঁচায় না, এমন করছ যেন আগে কখনো পুরুষ মানুষ দেখ নি।" কিন্তু বিন্ত মাহ্‌মুদের চিৎকার তো থামলই না বরং বেড়ে গেল। তারপর ওয়াদ্ রাইয়েস-এর চিৎকার শুনতে পেলাম—"বক্‌রি, হজ্ আহ্‌মেদ, বিন্ত মাঝুব বাঁচাও, আমাকে মেরে ফেলল।" আমি তড়াক করে বিছানা থেকে লাফিয়ে নেমে যা পরেছিলাম তাই পরেই দৌড় দিলাম, প্রথমে বক্‌রির দরজায় তারপর মাহ্‌জুবের দরজায় ধাক্কা দিয়ে ছুটে গেলাম ওয়াদ্ রাইয়েসের বাড়ি, ওর দরজা ভিতর থেকে বন্ধ। আমি যত জোরে পারি চিৎকার করে সাবইকে ডাকলাম। প্রথমে এলো বক্‌রি তারপর মাহ্‌জুব। এর মধ্যে অনেক লোক জড়ো

হয়েছে। আমরা যখন ওয়াদ্ রাইয়েসের বাড়ির দরজা ভাঙছি তখন শুনলাম একটা আকাশ কাঁপানো আর্তনাদ—'ওয়াদ্ রাইয়েসের আর তার পরেই হোসনা বিন্ত মাহ্মুদের আর্তনাদ। আমি, বক্রি আর মাহ্জুব ভিতরে ঢুকলাম। মাহ্জুবকে বললাম—"কাউকে ভিতরে ঢুকতে দিও না। কোন মহিলা বাড়ির মধ্যে ঢুকবে না।" মাহ্জুব বাইরে গিয়ে চেঁচিয়ে ফরমান জারি করল। তারপর যখন আবার ফিরে এলো তখন দেখি ওর সঙ্গে রয়েছে তোমার চাচা আবদুল করিম, সাঈদ, তাহির রাওয়াসি আর তোমার দাদুও বাড়ি থেকে চলে এসেছেন।'

বিন্ত মাঝুবের কপাল থেকে বিন্দু বিন্দু ঘাম গড়িয়ে পড়ছে। ওর গলা শুকিয়ে গেছে, আমাকে আঙুল দিয়ে জলের পাত্রটা এগিয়ে দিতে বলল। বিন্ত মাঝুব ঢক ঢক করে অনেকটা জল খেয়ে ধাতস্থ হল তারপর মুখ মুছে নিয়ে আবার শুরু করল—'আল্লা সর্বশক্তিমান, আমাকে ক্ষমা করুন। আমরা বাড়িতে ঢুকে ওয়াদ্ রাইয়েসের রাস্তার পাশের নীচু ঘরটাতে দুজনাকে দেখতে পেলাম। কেরোসিনের বাতিটা তখনো জ্বলছে। ওয়াদ্ রাইয়েস পড়ে আছে সম্পূর্ণ উদোম, আর এক পাশে পড়ে আছে হোস্না বিন্ত মাহ্মুদ, পরণে শুধু অন্তর্বাসটুকু—তাও ছিন্নভিন্ন। মাদুরটা রক্তে ভেসে যাচ্ছে। লম্ফটা উঁচু করে দেখলাম বিন্ত মাহ্মুদের সারা শরীরে আঁচড় কামড়ের দাগ — পেট, উরু, ঘাড়, এক ইঞ্চিও বাদ নেই। একটা স্তনের বৃন্ত কামড়ে ছিঁড়ে নেওয়া হয়েছে, নীচের ঠোঁট থেকে গল গল করে রক্ত পড়ছে। আল্লা ছাড়া আর কারোর কোন শক্তি নেই। ওয়াদ্ রাইয়েসের সর্বাঙ্গে ছোরা মারার চিহ্ন, অন্ততপক্ষে দশ জায়গায়—পেটে, বুকে, মুখে আর দুই উরুর মাঝখানটায়।'

বিন্ত মাঝুবের গলা ধরে এলো। হাত কাঁপছে, চোখটা জলে ভরে গেছে। জল খেয়ে মুখ মুছে একটু ধাতস্থ হল, তারপর আবার শুরু করল—'হায় আল্লা! তোমার ইচ্ছের বিরুদ্ধে কে কী করতে পারে? হোস্না চিত হয়ে পড়ে আছে আর ওর কলজেয় বিঁধে রয়েছে ছোরাখানা। মুখটা হা করা, চোখ দুটো খোলা যেন ছাতের দিকে তাকিয়ে আছে। ওয়াদ্ রাইয়েসের চোয়াল ঝুলে পড়েছে আর জিভটা বেরিয়ে রয়েছে, হাত দুটো শূন্যে বাড়ান।

বিন্ত মাঝুব এবার কান্নায় ফুঁপিয়ে উঠল। বলতে বলতে ও বেশ বিচলিত হয়ে পড়েছে। দরদর করে ঘামছে। আর একটু শান্ত হয়ে বেশ কষ্ট করেই আবার বলতে শুরু করল—'আল্লা গোস্তাকি মাফ করুন। দুজনেই একটু আগেই মরেছে। তখনো বিন্ত মাহ্মুদের কলজে আর ওয়াদ্ রাইয়েসের দুই উরুর মাঝখান থেকে গরম রক্ত ঝরছে। সারা ঘরে রক্তের যেন বান ডেকেছে। মেঝে, বিছানা সব রক্তে ভেসে যাচ্ছে। মাহ্জুবের, আল্লা ওকে দীর্ঘজীবী করুন, খুব মনের জোর। মাহ্মুদের গলা পেয়ে এক লাফে বাড়ির বাইরে গিয়ে তোমার বাবাকে বলে এলো ওকে যেন বাড়ির মধ্যে আসতে না দেয়। তারপর মাহ্জুব আর কয়েকজন ছেলে মিলে ওয়াদ্ রাইয়েসের লাসটা নিয়ে গেল বাইরে, বক্রির বিবি, আমি আর জন কয়েক বয়স্থা মেয়ে মিলে বিন্ত মাহ্মুদের লাসটা বাইরে নিয়ে এলাম। আমরা ওদের কফ্নে ঢেকে তৈরি করে দিলুম আর ওরা লাস দুটো সকাল হওয়ার আগেই গোর দিল। বিন্ত মাহমুদকে গোর দিল ওর আম্মার কবরের পাশে আর ওয়াদ্ রাইয়েসকে গোর দিল ওর পয়লা বিবি বিন্ত রজবের কবরের পাশে। গ্রামের মেয়েরা কয়েকজন ওখানেই প্রার্থনার অনুষ্ঠান করার চেষ্টা করছিল

কিন্তু মাহ্‌জুব, আল্লা ওকে আশীর্বাদ করুন, ওদের থামিয়ে দিয়ে বলল, কেউ যদি এই ব্যাপার নিয়ে মুখ খোলে তাহলে ও তার ঘাড় ভেঙে দেবে। বাছা এই অবস্থায় আর কী প্রার্থনা করা যায়? আমাদের গ্রামের উপর এ কী অভিশাপ নেমে এলো! সারা জীবন আল্লা আমাদের রক্ষা করেছেন আর এখন এটা কী হল! হে আল্লা! আমি অনুতপ্ত, আমায় মার্জনা করো।'

আমার দাদুর মত বিন্ত মাঝুবও ঝর ঝর করে কেঁদে ফেলল। খানিকক্ষণ কাঁদার পর হঠাৎ কী মনে হতে হেসে ফেলল, বলল—'অদ্ভুত ব্যাপারটা হল, এই এত চেঁচামেচি, হই হট্টগোল সত্ত্বেও ওয়াদ্ রাইয়েসের বড় বৌ মাবরুকার কিন্তু ঘুম ভাঙেনি। আমি ওর ঘরে গিয়ে ওকে ঠেলে তুলতে, ও বেশ অবাক হয়ে আমাকে জিজ্ঞেস করল—'বিন্ত মাঝুব এত রাত্রে তুমি! কী ব্যাপার?" আমি বললুম "শীগ্‌গির ওঠো, তোমার বাড়িতে খুন হয়েছে।" ও বলল "কে খুন হয়েছে?" আমি ওকে খাটে বসিয়ে দিয়ে বললুম—'বিন্ত মাহ্‌মুদ ওয়াদ্ রাইয়েসকে খুন করে নিজে আত্মহত্যা করেছে।' 'বেশ হয়েছে।' এই বলে ও আবার শুয়ে পড়ল আর একটু পরে ওর নাক ডাকার আওয়াজ পেলুম। আমরা যখন লাস দুটো তৈরি করছিলুম কবরের জন্যে ও আর উঠলই না। পরদিন সকালে আমরা যখন কবর দিয়ে ফিরছি তখন দেখি মাবরুকা দাওয়ায় বসে কফি খাচ্ছে। ওকে দেখে কয়েকজন মেয়ে সান্ত্বনা দিতে গেল, তখন —'তোমরা যে যার নিজের চরকায় তেল দাও গে যাও।' বলে চেঁচিয়ে সবাইকে খেদিয়ে দিল। ও সবাইকে চেঁচিয়ে বললো—'ওয়াদ্ রাইয়েস নিজের কবর নিজেই খুঁড়েছে আর বিন্ত মাহ্‌মুদ, আল্লা ওকে আশীর্বাদ করুন, ওর পাওনা কড়ায় গণ্ডায় চুকিয়ে দিয়েছে।' তারপর চিৎকার করে আনন্দে নেচে উঠলো। হায় আল্লা, সত্যি বলছি সে কী উল্লাস না দেখলে বিশ্বাস হয় না। তারপর আবার চেঁচিয়ে বলল—"ব্যাপারটা ভালো না! কারুর যদি ভালো না লাগে তবে নদীতে গিয়ে জল খেয়ে নাও গে যাও।" আল্লা আমাকে মাফ্ করুন। সেদিন রাতে হোস্‌নার বাপ মাহমুদতো কাঁদতে কাঁদতে মূর্চ্ছা যায় আর কি, ষাঁড়ের মত ফুঁসছিল। তোমার দাদুর অবস্থাও খুব খারাপ—'তিনি শুধু কাঁদছেন আর শাপমন্যি করছেন। তোমার চাচা আবদুল করিম, বক্‌রির সঙ্গে অযথা ঝগড়া বাধিয়ে ওকে দুষল—"তোমার বাড়ির পাশে লোক খুন হয়ে গেল আর তুমি ঘুমিয়েই রইলে।" গাঁয়ের সবারই প্রায় অবস্থা—যেন শয়তানের শাপ লেগেছে। শুধু মাহ্‌জুব একাই শান্ত থেকে সবদিক সামলাল। আল্লা জানেন কোথা থেকে দুটো কফন জোগাড় করে আনল, ওয়াদ্ রাইয়েসের ছেলেপুলেগুলোকে শান্ত করল। আল্লার দয়ায় তোমাকে যেন এই দৃশ্য দেখতে না হয়। ওফ্, সে যে কী বীভৎস দৃশ্য, দেখলে চুল খাড়া হয়ে যায়। এসবের কোন মানেই হয় না। আচ্ছা তুই তো বাবা একটা ভিনদেশীকে নিকে করেছিলি—তাহলে ওয়াদ্ রাইয়েস্যক নিকে করতে এত আপত্তি কিসের?

চাষের মাঠ আগুন আর ধোঁয়ায় ভরে গিয়েছে। গমের বীজ ফেলার সময় হয়ে গেছে। জমি তৈরির কাজ চলছে। মাঠে আগের ফসলের পড়ে থাকা চারার গোড়াগুলো তুলে গাদা করে রাখা হয়েছে এখানে সেখানে। কোথাও কোথাও এই গাদাগুলোয় আগুন দেওয়া

হয়েছে। শুকনো খড় দাউ দাউ করে জ্বলছে আর তার ধোঁয়া বাতাসে ছড়িয়ে যাচ্ছে সারা মাঠে। পোড়ানো হয়ে গেলে সেই ছাই মাঠে ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। জমি সমান করা হচ্ছে। লোকেরা কেউ লাঙল দিচ্ছে, কেউ চারা রুইছে। মাঠে মাঠে ব্যস্ততার আর শেষ নেই। মৃদু হাওয়ায় খেজুর গাছের পাতা দুলছে। ওদিকে ছাগল ভেড়া খাওয়ানর ঘাসের খেতে জল দেওয়া হয়েছে। দুপুরের রোদ্দুরে সেই জমি থেকে ভাপ উঠছে। বাতাসে কমলা লেবু, গন্ধ লেবুর সুবাস। কোথাও একটা ষাঁড় হামলাচ্ছে, কোথাও গাধা ডেকে উঠলো, দূরে কোথাও কাঠ কাটছে কেউ। সবই আগের মত অথচ সব বদলে গেছে।

মাহ্মুবকে পেলুম তার নিজের জমিতে। সারা গায়ে কাদা মাখা, খালি গা, খাটো করে পরা কাপড়টা ঘামে ভিজে গেছে। ও তখন একটা বড় খেজুর গাছের গোড়া খোঁচাতে ব্যস্ত। কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে থাকলুম ওর কাজ, তারপর একটা সিগারেট ধরিয়ে প্যাকেটটা ওর দিকে বাড়িয়ে দিলুম। ও মাথা নেড়ে ফিরিয়ে দিল। কাছের একটা খেজুর গাছের ছায়ায় গিয়ে বসলুম। এখানে সবার কাজ আছে আমি ছাড়া। আমি এদের জগতে বেমানান। আমি কেন তল্পিতল্পা গুটিয়ে চলে যাচ্ছি না? এরা কোন কিছুতেই অবাক হয় না। সব কিছুকেই এরা অনায়াসে মেনে নেয়। মৃত্যুতে এদের দুঃখ নেই, জন্মে আনন্দ নেই। যখন হাসে তখন বলে—'আল্লার কাছে মার্জনা চাইছি।' এইটুকুই আর আমি কি শিখলাম? এরা নদী আর গাছের কাছ থেকে শিখেছে ধৈর্য আর নীরবতা। আর আমি কী শিখলাম? লক্ষ করলাম মাহ্জুব নীচের ঠোঁটটা কামড়াচ্ছে। ও যখন একমনে কোন কাজ করে তখন এরকমই করে। ছোটবেলায় আমি ওকে কুস্তি আর দৌড়ে হারিয়ে দিতাম কিন্তু নদীর এপার ওপার সাঁতার দিতে আর গাছে চড়ায় ওর সঙ্গে পেরে উঠতাম না। কোন খেজুর গাছ ওর কাছে খুব একটা লম্বা নয়। ওর আর আমার মধ্যে এমন একটা সৌহার্দ্য ছিল যেন আমরা মায়ের পেটের ভাই। মাহ্জুব খেজুর গাছের গোড়া নিড়ানো শেষ করে আগাছাগুলো একপাশে জড়ো করে রাখলো শুকোনর জন্যে। তারপর হাত ঝাড়তে ঝাড়তে আমার পাশে এসে বসল পা ছড়িয়ে। পাশে বসে কোন কথাই বলল না, তারপর 'আল্লা আমাকে মার্জনা করুন' বলে হাত বাড়াল আমার দিকে। আমি ওকে একটা সিগারেট দিলাম। আমি যখন গ্রামে আসতাম তখনই শুধু ও সিগারেট খেত। সিগারেটটা ধরিয়ে একটা লম্বা টান মেরে বলল 'আমরা সরকারের পয়সা পোড়াচ্ছি।'

মাহ্জুব সিগারেটটা শেষ না করে ছুঁড়ে ফেলে দিল তারপর আমার দিকে ফিরে বলল—'তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে অসুস্থ। পথের ধকল বোধহয় এখনো কাটে নি। তোমার আসার অবশ্য দরকার ছিল না। আমি যখন তোমাকে টেলিগ্রাম পাঠিয়েছিলাম তখন ভাবতেই পারি নি তুমি সঙ্গে সঙ্গে চলে আসবে।'

আমি ওর দিকে না তাকিয়ে যেন নিজের মনেই বলে উঠলাম—'হোস্‌না ওকে মেরে নিজেকে শেষ করেছে। ওয়াদ্ রাইয়েসকে ও দশবারের বেশি ছোরা মেরেছে আর—' 'খ্রাকী ভয়ঙ্কর।'

'তোমাকে কে বলল।' মাহ্জুবের এবার অবাক হওয়ার পালা।

ওর কথার জবাব না দিয়ে নিজের মনেই আবার বললুম—'ওয়াদ্ রাইয়েস ওর সারা শরীর আঁচড়ে কামড়ে আর কিছু রাখে নি। একটা স্তনের বৃন্ত কামড়ে ছিঁড়ে দিয়েছে। ওফ্, কী ভয়ঙ্কর।'

মাহ্‌জুব বেশ ঝেঁঝে উঠে চেঁচাতে লাগল—'নির্ঘাৎ বিন্ত মাঝুব তোমাকে বলেছে। বুড়িটা মরেও না, একটা কথা যদি পেটে রাখতে পারে। এসব কি বলার মত কথা?'

এবার আমি ওর দিকে ফিরে বললুম—'বলার মত হোক বা না হোক, এটা ঘটেছে। আর ঘটেছে তোমার চোখের সামনে আর তুমি কিছুই করনি। তুমিই না এ গাঁয়ের মাতব্বর, তুমিও কিছু করলে না।'

মাহ্‌জুবের উত্তেজনা বাড়ছে। কিছুটা আমার উপর আর কিছুটা যেন নিজের উপর রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে বলল—'আমরা কী করব? তুমিই বা কিছু করলে না কেন? তুমি ওকে শাদি করলে না কেন? তোমাদের শুধু বড় বড় বাত। ওই মেয়েটা এত বেহায়া যে ওই ওর মনের কথা বলতে এসেছিল। যা দিন কাল পড়েছে—মেয়েরাই ছেলে ধরে বেড়াচ্ছে।'

রাগে দাঁতে দাঁত হিস্‌হিসিয়ে উঠলুম—'হোস্‌না তোমাকে কী বলছিল?'

মাহ্‌জুব আমাকে দেখল মমতাহীন দৃষ্টিতে, তারপর বলে চলল—'ওর বাপ একদিন ওর বাড়িতে গিয়ে খুব গালাগাল করল, দু-একটা চড় থাপ্পড়ও দিয়েছিল। পরদিন সক্কাল বেলা হোস্‌না আমার বাড়ি এসে হাজির। আমাকে বলল যে ও চায় তুমি ওকে ওয়াদ্ রাইয়েস আর পিছনে লেগে থাকা অন্যান্য লোকজনের হাত থেকে বাঁচাও। ও চাইছিল তুমি ওকে আইনত শাদি করো—ব্যস এইটুকুই। ও বলল—"যে অন্তত আমাকে আমার ছেলেদের সঙ্গে শান্তিতে থাকতে দেবে। এর বেশি আমি আর কিছু চাই না ওর কাছে।" আমি ওকে বললুম এসবের মধ্যে তোমাকে যেন না জড়ায় আর ও যেন সব কিছু মেনে নেয়। ওর বাবাই ওর অভিভাবক, তিনি যা ভালো মনে করবেন তাই হবে। আমি আরো বললুম যে ওয়াদ্ রাইয়েস চিরকাল বেঁচে থাকবে না। একটা পাগল মেয়ে আর একটা পাগল লোক—আমাদের কী দোষ এতে? আমরা এখানে কী করতে পারতাম? বেচারা বাপটা সেই বাড়ির থেকে শয্যে নিয়েছে, ঘর থেকেও বার হয় না, কারুর সঙ্গে কথাও বলে না। বিশ্বশুদ্ধু সবার যদি মাথা খারাপ হয়ে যায় তাহলে আমি কেন, কেই বা কী করতে পারে? হোস্‌না বিন্ত মাহ্‌মুদের মত এরকম পাগলামি এই গাঁয়ে আগে কেউ কখনো দেখে নি।'

আমার গলার কাছে কান্না উঠে আসছিল, জল আসছিল চোখ ফেটে। অনেক কষ্টে নিজেকে সম্বরণ করে বললুম—'হোস্‌নার মত সুস্থ মনের মেয়ে এ গাঁয়ে আর একটাও নেই। হোস্‌না পাগল নয়, তোমরাই বদ্ধ উন্মাদ। এরকম সুন্দরী আর সুস্থ মনের মেয়ে এই গাঁয়ে আর একটাও দেখাতে পারবে না। ও আদৌ পাগল নয়।'

এবার মাহ্‌জুব হে হে করে হেসে উঠলো। বিদ্রূপ মেশানো গলায় বলল—'কী তাজ্জব ব্যাপার! নিজেকে শান্ত কর হে। এই বয়েসে আবার প্রেমে পড়লে নাকি? তুমি তো দেখছি ওয়াদ্ রাইয়েসের মত উন্মাদ হয়ে গেলে। ইস্কুল কলেজে পড়ে দেখছি তোমার মনটা একদম নরম তুলতুলে হয়ে গেছে। তুমি তো দেখছি মেয়েদের মত কাঁদতে বসলে। হায় আল্লা, কালে

কালে কত কী যে দেখতে হবে—প্রেম, অসুখ, চোখের জল, আরো কত কী। এরকম মেয়ের মূল্য কানা কড়িও না। নেহাৎ খারাপ দেখায় তাই ওকে আমরা কবর দিলুম। নইলে নদীর জলে টান মেরে ছুঁড়ে ফেলে দিতুম ওর লাশ। আর নাহলে মাঠে ফেলে দিয়ে আসতাম শেয়াল কুকুরের খাওয়ার জন্যে।'

এরপর ঠিক কী হয়েছিল তা আমার ভালো মনে নেই। ভাসা ভাসা এইটুকুই মনে আছে, আমার হাত দুটো ওর গলাটা সাঁড়াশির মত চেপে ধরেছিল, ওর চোখ দুটো ঠিকরে বেরিয়ে আসছে, আমার পেটে একটা তীব্র যন্ত্রণা—'মাহ্‌জুব আমার বুকের উপর চেপে বসেছে। ভাসাভাসা মনে পড়ছে—আমার সামনে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে মাহ্‌জুব আর আমি সমানে ওর পাঁজরায়, পেটে প্রাণপণে লাথি মারছি আর ও চেঁচাচ্ছে—'তুমি পাগল হয়ে গেছ, তুমি একটা উন্মাদ।' শুনতে পাচ্ছিলাম লোকজন চারদিক থেকে দৌড়ে আসছে, আমি ওর গলাটা টিপে ধরেছি সমস্ত শক্তি দিয়ে, ওর গলা দিয়ে একটা ঘড়ঘড়ে আওয়াজ বেরোচ্ছে—' কারুর একটা শক্ত হাত আমাকে টানছে, মাথায় লাগল একটা মোটা লাঠির বাড়ি—তারপর সব অন্ধকার।

দুনিয়ার সব কিছু কেমন যেন ওলোট পালট হয়ে গেল। প্রেম? প্রেম থেকে তো এরকম হয় না। এ তো নিখাদ ঘৃণা। ঘৃণায় আমার মন বিকল, শরীর জ্বলছে প্রতিহিংসায়। শত্রু তো আমার মধ্যেই, এবার তার মোকাবিলা করা দরকার। তা সত্ত্বেও এখনো আমার মধ্যে ছিটেফোঁটা কাণ্ডজ্ঞান অবশিষ্ট রয়ে গেছে—আমি বুঝতে পারছি পরিস্থিতির নির্মম পরিহাস। মুস্তাফা সাঈদ যেখানে ছেড়ে গেছে আমি সেইখান থেকে শুরু করব। তবু ও তো একটা পথ বেছে নিয়েছিল, আমি তো কিছুই বেছে নিই নি। পশ্চিম দিগন্তে সূর্য অস্ত যাওয়ার আগে কিছুক্ষণ স্থির হয়ে রইল তারপরে টুপ করে ডুবে গেল পাহাড়ের আড়ালে। একটু পরেই কোথা থেকে অন্ধকার এসে ঢেকে দিল চরাচর। আমি যদি সত্যি কথাটা অন্তত বলতে পারতাম, ও যা করেছে তা হয়ত করত না। আমি যুদ্ধে হেরে গেলাম কারণ আমি নির্বোধ, আমি কোন পথ নিজে বেছে নিই নি। অনেকক্ষণ লোহার দরজার সামনে দাঁড়িয়ে রইলাম। এখন আমি নিজের ইচ্ছেয় চলছি, আমার পালাবার, লুকোবার কোন জায়গা নেই, কোন পরিত্রাণ নেই। বাইরে আমার জগৎটা ছিল বিশাল, এখন সেই জগৎটা সঙ্কুচিত হয়ে আমার মধ্যে এসে ঢুকে পড়েছে। এখন আমিই আমার জগৎ, আমার বাইরে আর কোন জগৎ নেই। তাই যদি হয় তাহ্‌লে অতীতের হৃদয়ে প্রোথিত শিকড়টা কোথায় গেল? কোথায় গেল জীবন, মৃত্যুর স্মৃতিগুলো? সেই মরুযাত্রির দল, সেই উপজাতি কোথায় হারাল? কোথায় গেল সেই শাদির আসরে মেয়েদের কলরোল, নীল নদের বন্যা, শীত গ্রীষ্মে উত্তর দক্ষিণের বাতাস? প্রেম? প্রেম এমন করে না। এতো নিখাদ ঘৃণা। এই তো আমি দাঁড়িয়ে আছি মুস্তাফা সাঈদের বাড়িতে সেই চৌকো ঘরের লোহার দরজার সামনে। এই সেই ঘর, চালটা যার তিনকোণা, সবুজ জানলা, আমার পকেটে রয়েছে ঘরের চাবি, আর ঘরের মধ্যে আমার প্রতিপক্ষ যার মুখে শয়তানির হাসি। আমিই অভিভাবক, প্রেমিক এবং প্রতিপক্ষ।

চাবি ঘোরালাম, সহজেই দরজাটা খুলে গেল। নাকে লাগল স্যাঁতসেঁতে গন্ধ—পুরোনো স্মৃতির মত। এই গন্ধ আমার চেনা, চন্দন আর ধূপের গন্ধ। দেওয়াল হাতড়াতে হাতড়াতে ঘরে ঢুকলাম, হাতে লাগল জানলার সার্সি। জানলাটা খুলে দিলাম হাট করে। একটা একটা করে আরো দুটো জানলা খুলে দিলাম। একটু আলো আসার বদলে ঘরটা যেন আরো অন্ধকারে ভরে গেল। একটা দেশলাই জ্বালালাম। সেই নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে যেন একটা আলোর বিস্ফোরণ হল আর তার মধ্যে দেখলাম একটা মুখের ভ্রূকুটি। মুখটা খুব চেনা কিন্তু মনে পড়ছে না কোথায় দেখেছি। ওই তো! আমার প্রতিপক্ষ মুস্তাফা সাঈদ। এক বুক ঘৃণা নিয়ে মুখটার দিকে এগিয়ে গেলাম। মুখটা আমার সামনে পরিষ্কার হয়ে উঠলো, একটু একটু করে ছবিটা বড় হতে লাগল, দেখতে পেলুম গলা, ঘাড়, বুক, হাত , পা, শরীর—'তারপর দেখি নিজেরই মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছি। এটা তো মুস্তাফা সাঈদ নয়—আমি নিজেই আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে ভ্রূকুটি করছি। হঠাৎ আমার সামনে থেকে ছবিটা হারিয়ে গেল। তারপর কতক্ষণ সেই অন্ধকারে বসে রইলাম জানি না, বসে বসে শোনার চেষ্টা করছি কিন্তু কিছুই কানে ঢুকছে না। আর একটা দেশলাইয়ের কাঠি জ্বালালাম, আমার সামনে একটা মেয়ে তিক্ত হাসি হেসে উঠলো। এই আলোর মরূদ্যানে দাঁড়িয়ে ঘরটা দেখার চেষ্টা করছি, দেখি টেবিলের উপর আমার হাতের পাশেই একটা ল্যাম্প রয়েছে। নাড়িয়ে দেখি তাতে তেলও রয়েছে। কী কাণ্ড! ল্যাম্পটা জ্বালালাম, দেওয়াল থেকে ছায়াটা সরে গেল, ঘরের চালটা উঠে গেল আরো ওপরে। ল্যাম্প জ্বেলে জানলাগুলো বন্ধ করে দিলাম। গন্ধটা এই ঘরেই আটকা থাকুক। ইঁট, কাঠ, চন্দন, ধূপ—আর বই-এর গন্ধ, আটকে থাকুক এই ঘরেই। হায় আল্লা! ঘরের চার দেওয়ালে তাকের পর তাক ঠাসা অজস্র বই। চারদিকে শুধু বই আর বই। একটা সিগারেট ধরিয়ে টান দিলাম, বুক ভরে গেল ঘরের গন্ধ মেশানো ধোঁয়ার গন্ধে। লোকটা কী বোকা! জীবনের নতুন অধ্যায় যে শুরু করতে চায় তার কাছে এই আচরণ কি আশা করা যায়? আমি এই জায়গাটা ধ্বসিয়ে দেব ওর মাথার উপরে, জ্বালিয়ে দেব ঘরটা। আমার পায়ে নীচের দামী কার্পেটটায় আগুন জ্বালিয়ে দিলুম। দেখলুম চোখের সামনে পুড়ে যাচ্ছে একজন পারস্যের রাজা ঘোড়ায় চড়ে হাতে খোলা তলোয়ার নিয়ে হরিণ শিকার করছে। আলোটা একটু উঁচু করে ধরলাম, দেখি ঘরটা দেওয়াল থেকে দেওয়াল পর্যন্ত কার্পেটে মোড়া। দরজার উল্টো দিকের দেওয়ালের নীচের দিকে দেখি খানিকটা অংশ খালি। আলো হাতে সামনে গিয়ে দেখলাম একটা পুরো দস্তুর ফায়ার প্লেস্, খাঁটি বিলিতি কায়দার। ভাবা যায়! কী হাস্যকর! ফায়ার প্লেসের উপর একটা পেতলের বাটি আর তার পিছনে দেওয়ালের খানিকটা অংশ সবুজ নীল মার্বেল পাথর লাগানো। ফায়ার প্লেসের দুপাশে দুটো চেয়ার ছাপা রেশমের কাপড়ে ঢাকা আর মাঝখানে একটা গোল টেবিল, অনেক বই নোটবুক গাদা করা রয়েছে তার উপরে। একটু আগে দেশলাই জ্বালানোর সময় যে মেয়েটার মুখ দেখেছিলাম, বড় গিল্টি করা ফ্রেমে তার ছবি ফায়ার প্লেসের উপর রাখা। ছবিটার এক কোনায় সই করা এম. সাঈদ। ঘরের মাঝখানে মেঝেয় তখনও আগুন জ্বলছে। গুনে গুনে আঠারো পা এসে সেই আগুন পা দিয়ে নিভিয়ে ফেললাম। আমি প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে চাইলেও

কৌতূহল নিবৃত্ত না করে পারছিলাম না। আগে আমি সব কিছু দেখব, শুনব, তারপর সব জ্বালিয়ে দেব, যেন কিছুই ছিল না। ল্যাম্পের আলোয় দেখলাম বইগুলো বিষয় অনুযায়ী সাজানো। কত বিষয়ের উপর বই—অর্থনীতি, ইতিহাস, সাহিত্য, প্রাণীবিদ্যা, ভূতত্ত্ব, গণিত, জ্যোতির্বিদ্যা। এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা, গিবন, ম্যাকলে, টয়েনবি। বার্নার্ড শ-র রচনাবলী, কিনেস, টউমি, স্মিথ, রবিনসন। 'দি ইকনমিক্স অফ ইমপারফেক্ট্ কমপিটিশন', হবসনের 'ইমপিরিয়ালিজ্ম', রবিনসনের 'অ্যান এসে অন মার্কসিয়ান ইকনমিকস্'। সমাজবিদ্যা, নৃতত্ত্ব, মনস্তত্ত্ব। টমাস হার্ডি, টমাস মান, ই.জি.মুর, টমাস মুর, ভার্জিনিয়া উলফ্, ভিট্‌গেনস্টাইন, আইনস্টাইন, ব্রিয়ারলি, নামিয়ের। কিছু বইয়ের নাম শুনেছি, বাকিগুলোর শুনিনি। গাদা গাদা কবিতার বই যার অধিকাংশ লেখকের নামই শুনি নি। 'দি জার্নাল অফ গর্ডন', 'গ্যালিভারস ট্রাভেলস'। কিপলিং, হাইসম্যান। 'দি হিষ্টরি অফ্ ফ্রেঞ্চ রেভোলিউশন' টমাস কারলাইল, 'লেকচারস অন ফ্রেঞ্চ রেভোলিউশন' লর্ড অ্যাকটন। চামড়া বাঁধানো বই, কাগজে বাঁধানো বই, পুরোন ছেঁড়া ফাটা বই, আনকোরা নতুন বই, বিরাট জাবদা বই, তাসের প্যাকেটের মত ছোট গিল্টি করা বই, সই করা, উৎসর্গ করা বই। চেয়ারের উপর বই-এর গাদা, বাক্স ভর্তি বই, মেঝেতে বই, চারধারে বই। এসব কী নাটুকেপনা? ও কী বোঝাতে চায়? ওয়েন, ফোর্ড, ম্যাডক্স ফোর্ড, স্তেফান ঝোয়াইগ্, ই.জি.ব্রাউনি, ল্যাস্‌কি, হ্যাজ্‌লিট্। 'অ্যালিস ইন ওয়াণ্ডারল্যাণ্ড', রিচার্ডস, 'দি কোরান'—ইংরাজি অনুবাদ 'দি বাইবেল'—ইংরাজি অনুবাদ, গিলবার্ট মারে, প্লাটো। 'দি ইকনমিক্স অফ কলোনিয়ালিজ্ম'—মুস্তাফা সাঈদ, 'কোলোনিয়ালিজম অ্যাণ্ড মনোপলি'—মুস্তাফা সাঈদ, 'দি রেপ অফ আফ্রিকা'—মুস্তাফা সাঈদ, 'দি ক্রশ অ্যাণ্ড গানপাউডার'—মুস্তাফা সাঈদ। 'প্রস্পেরো অ্যাণ্ড ক্যালিবান', 'টোটেম অ্যাণ্ড ট্যাবু', ডাউটি। কিন্তু একটাও আরবি ভাষায় লেখা বই নেই। একটা কবর। একটা সৌধ। একটা উন্মাদ কল্পনা। একটা কয়েদখানা। একটা দারুণ পরিহাস। একটা রত্ন ভাণ্ডার। 'চিচিং ফাঁক, এসো সবাইকে ভাগ করে দিই ধনরত্ন'। ঘরের সিলিং ওক কাঠের মাঝখানটায় একটা খিলান। খিলানের দুই প্রান্তের ভার নিয়েছে দুটো হলদেটে লাল মার্বেল পাথরের থাম, ফলে ঘরটা দুটো ভাগে ভাগ হয়ে গেছে। খিলানের উপর চিত্রিত পোর্সিলেনের টুকরো বসানো। আমি দাঁড়িয়ে আছি একটা লম্বা ডাইনিং টেবিলের শেষে। টেবিলটা কী কাঠের জানিনা কিন্তু উপরটা ভীষণ চকচকে আর কালচে রঙের। টেবিলের দুপাশে চামড়ার গদি আঁটা পাঁচটা চেয়ার। ডানদিকে নীল ভেলভেটে মোড়া একটা সেট, তার উপর মখমলের গদি। ফায়ার প্লেসের দুপাশে আরো অনেক কিছু আমি আগে লক্ষ করি নি। ডান দিকে একটা লম্বাটে টেবিল, তার উপরে একটা রূপোর বাতিদানে দশটা নতুন মোমবাতি ; বাঁদিকেও আর একটা। আমি একটা একটা করে বাতিগুলো জ্বালিয়ে দিলাম। বাতির আলোয় ফায়ার প্লেসের উপরে রাখা ফ্রেমে বাঁধানো ছবিটা ভালো করে দেখলাম। মেয়েটার মুখটা লম্বাটে, ভাসা ভাসা দুই চোখের উপর জোড়া ভুরু, নাকটা লম্বাটে। এতক্ষণ খেয়াল করি নি, ফায়ার প্লেসের দুই ধারের দেওয়ালের কাচের তাকগুলোর নীচের তাকে বই রাখা নেই, তার বদলে সাজানো আছে ওর এবং আরো অনেকের নানা ভঙ্গিতে তোলা ছবি। মুস্তাফা সাঈদ হাসছে, মুস্তাফা সাঈদ সাঁতার

কাটছে, মুস্তাফা সাঈদ নদীতে নৌকো বাইছে, মুস্তাফা সাঁতার কাটছে, মুস্তাফা সাঈদ গ্রামে বেড়াচ্ছে, মুস্তাফা সাঈদ গাউন পরা, মাথায় টুপি, মুস্তাফা সাঈদ নদীতে নৌকো বাইছে, মুস্তাফা সাঈদ মাথায় মুকুট পরে নাটকে অভিনয় করছে 'তিন রাজা' নাটকের একজন রাজার ভূমিকায় যে যিশুখ্রিষ্টের কাছে সুগন্ধি নিয়ে এসেছিল, মুস্তাফা সাঈদ একজন ভদ্রলোক আর ভদ্রমহিলার মাঝখানে দাঁড়িয়ে। ওর জীবনের সবকটা গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তই যেন ধরা আছে উত্তরকালের জন্যে। একটা মেয়ের ফটো ছিল, হাতে নিলাম, দেখি উৎসর্গ করে লেখা রয়েছে—'ভালোবাসা সহ, শিলা।' নিশ্চয়ই শিলা গ্রিণউড। হল সহরের শহরতলির মেয়ে। একে ভ্রষ্ট করেছিল ভুলিয়েছিল। মিষ্টি বুলি, নানা উপহার আর জীবন যে রকম ঠিক সেই রকম দেখবার দৃষ্টি দিয়ে। ধূপের ধোঁয়া চন্দনকাঠের গন্ধে মেয়েটা বিবশ হয়ে গিয়েছিল। মেয়েটার মুখখানা সত্যিই সুন্দর। ছবিতে বেশ হাসি হাসি মুখ, একটা নেকলেস পরে আছে —নিশ্চয়ই হাতির দাঁতের ; হাত দুটো খালি, পূর্ণ সুডৌল স্তন। মেয়েটা দিনের বেলায় একটা রেস্তোঁরায় পরিচারিকার কাজ করত আর রাত্রে পলিটেকনিকে পড়াশুনো করত। মেয়েটা ছিল খুব বুদ্ধিমতী, বিশ্বাস করত যে মানবজাতির ভবিষ্যত খেটে খাওয়া মানুষদেরই হাতে। একদিন সব শ্রেণী ব্যবধান ঘুচে যাবে, সেদিন সবাই সবার ভাই হয়ে যাবে। মেয়েটা ওকে বলত— 'আমার মা যদি জানতে পারে আমি একজন কালো লোকের সঙ্গে প্রেম করছি তাহলে পাগল হয়ে যাবে আর আমার বাবা আমাকে খুন করবে। তবে আমি তার পরোয়া করি না।' 'শিলা উদোম হয়ে শুয়ে আমাকে মারি লয়েচ-এর গান শোনাত।' মুস্তাফা সাঈদ বলেছিল, 'আমি বৃহস্পতিবার সন্ধেটা ক্যামডেন টাউনে ওর ঘরে কাটাতাম। মাঝে মাঝে আমার ফ্ল্যাটেও ও আমার সঙ্গে রাত কাটাত। আমার সারা মুখ জিভ দিয়ে চেটে দিয়ে বলত "তোমার জিভটা ঠিক গরম দেশের সূর্যাস্তের মত গোলাপি।" আমরা দুজনে একে অন্যকে যথেষ্ট পাইনি। ও আমার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকত যেন কিছু আবিষ্কার করছে আর বলত—'তোমার কালো রঙটা কী চমৎকার। এই রঙটা হল জাদু, রহস্য আর অশ্লীলতার রঙ।" মেয়েটা আত্মহত্যা করেছিল। শিলা গ্রিণউড আত্মহত্যা করল কেন মিঃ মুস্তাফা সাঈদ? আমি জানি তুমি কোন ফারাও-এর স্মৃতিসৌধে লুকিয়ে আছ, আমি সেটা জ্বালিয়ে দেব তোমার মাথার উপরে। আমাদের গাঁয়ে যেখানে কেউ কখনো কাউকে খুন করে না সেখানে হোস্না বিন্ত মাহ্মুদ বুড়ো ওয়াদ্ রাইয়েসকে খুন করে আত্মহত্যা করল কেন?

আর একটা ফটো তুলে নিয়ে দেখলাম। বেশ বড়ো বড়ো অক্ষরে লেখা উৎসর্গ— 'তোমাকে আমরণ, ইসাবেলা।' বেচারা ইসাবেলা সেমুর। ইসাবেলা সেমুরের জন্যে আমার বিশেষ দরদ। গোল ছাঁদের ফুলো ফুলো মুখখানা, যে পোশাকটা পরে আছে সেটা ওই যুগের পক্ষেও একটু বেশি খাটো। মুস্তাফা সাঈদ যতটা বলেছিল অর্থাৎ ব্রোঞ্জের স্ট্যাচুর মত দেখতে না হলেও মুখখানা দেখলে মনে হয় বেশ ভালো মানুষের বাঁচা। এই মেয়েটাও হাসে। এও হাসছে। ও বলেছিল মেয়েটা দুই মেয়ে আর এক ছেলের মা, স্বামী সফল শল্য চিকিৎসক। মেয়েটা এগারো বছর বিবাহিত জীবন যাপন করেছে, নিয়মিত প্রতি রবিবার গির্জেয় যেত, আর নানা রকম জনহিতকর কাজে অংশ নিত। এরকম সময় মেয়েটার ওর সঙ্গে আলাপ

হয়। আর তার পরেই আবিষ্কার করল ওর মনের গভীরের অন্ধকার অঞ্চল যা এতদিন ছিল আবৃত, সুপ্ত। সব কিছুর পরেও মেয়েটা ওর জন্যে একটা চিঠি লিখে রেখে গিয়েছিল যাতে ও লিখেছিল, —'যদি স্বর্গে ঈশ্বর বলে কেউ থাকেন তাহলে আমি নিশ্চিত যে তিনি একজন হতভাগ্য নারীর অবিমৃষ্যকারী আচরণ ক্ষমার চোখে দেখবেন। এই নারী তার হৃদয়ে আনন্দের জোয়ার ঠেকিয়ে রাখতে পারে নি, যদিও এজন্য তাকে প্রথাগত জীবন থেকে সরে আসতে হয়েছে আর তার স্বামীর অহংবোধকে আহত করতে হয়েছে। ঈশ্বর আমাকে ক্ষমা করুন এবং তুমি আমাকে যত আনন্দ দিয়েছ, তিনিও যেন তোমাকে ততটাই আনন্দ দেন।' সেদিন রাত্রে ওর গলার স্বরে না ছিল দুঃখ না অনুতাপ, যদি কোন আবেগের লেশমাত্র থাকে তবে তা হোল আনন্দ। 'আমি শুনতে পেলাম ওর অনুনয় মাখানো স্বরে সমর্পণের আকুতি—"আমি তোমাকে ভালোবাসি", আর আমার চৈতন্যের গভীর থেকে উঠে এলো ক্ষীণ কান্না মাখানো স্বর যা আমাকে কেবল নিরস্ত হতে বলছে। কিন্তু ততক্ষণে পাহাড়ের চুড়ো মাত্র কয়েক হাত দূরে এসে গিয়েছে। ওখানে পৌঁছে আমার বিশ্রাম। আমাদের যন্ত্রণার চূড়ান্ত মুহূর্তে আমার মগজে ভেসে এলো বিবর্ণ পুরোন স্মৃতির মেঘ, ঠিক যেমন ভাপ ওঠে মরুভূমির লবনহ্রদ থেকে। ওর স্বামী যখন কাঠগড়ায় উঠলো সাক্ষী দিতে তখন সবার চোখ ওঁর দিকে। ভদ্রলোকের চেহারায়, চাল চলনে আভিজাত্যের ছাপ ; মাথার কাঁচাপাকা চুল চেহারায় এনেছে এক ধরণের মর্যাদা। সব কিছু মিলিয়ে ভদ্রলোক অনায়াসে সবার সমীহ আদায় করতে পারেন। উনি এমন একজন লোক যাঁকে দাড়িপাল্লার একদিকে আর আমাকে যদি অন্যদিকে বসানো যায় তাহলে ওনার দিকটা বেশ খানিকটা ঝুঁকে পড়বে। উনি ফরিয়াদি পক্ষের নয় আসামী পক্ষের সাক্ষী। উনি কথা বলা শুরু করতেই আদালতে নীরবতা নেমে এলো। উনি আদালতকে উদ্দেশ্য করে বললেন—"ন্যায় বিচারের খাতিরে আমাকে বলতেই হবে যে আমার স্ত্রী ইসাবেলা জানতেন তিনি ক্যানসার রোগে ভুগছেন। মৃত্যুর আগে শেষ অবস্থায় তিনি প্রায়শই বিষাদে ডুবে যেতেন। মৃত্যুর কয়েকদিন আগে তিনি আমার কাছে তাঁর সঙ্গে আসামীর প্রেমে পড়েছিলেন এবং তাঁর কিছু করার ছিল না। সারাজীবন তিনি আমার প্রতি সৎ ও বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি একজন আদর্শ স্ত্রী। সবকিছু ঘটে যাওয়ার পরেও আমার মনে কোন তিক্ততা নেই—না তাঁর প্রতি, না আসামীর প্রতি। তাঁকে হারিয়ে শুধু দুঃখই পেয়েছি।"

এই জগতে কোন সুবিচার নেই। আমার মনটা তো ভরে যায় তিক্ততা এবং বিদ্বেষে। এই এতগুলো শিকারের পরেও তার জালে আরো একজন শিকার—হোস্না বিন্ত মাহ্মুদ, একমাত্র মহিলা যাকে আমি ভালোবেসেছি। হোস্না বিন্ত মাহমুদ বেচারা ওয়াদ্ রাইয়েসকে খুন করে নিজে আত্মঘাতী হল শুধুমাত্র মুস্তাফা সাঈদের জন্যে। চামড়ার ফ্রেমে বাঁধানো আর একটা ফটো। এটা অ্যান হ্যামণ্ড হবে, যদিও ছবিতে মেয়েটা আরবি জোব্বা পরেছে। ছবিতে আরবি ভাষায় উৎসর্গ করা—'তোমার ক্রীতদাসীর উপহার—সৌসান।' প্রাণবন্ত মুখখানার প্রাণপ্রাচুর্য ছবিতে আঁটছে না। দুই অধরে টোল, পাতলা নমনীয় ঠোঁট, চোখে কৌতূহলের দীপ্তি। ছবিটা তোলার পর কতদিন হয়ে গেছে তবুও এতটুকু ম্লান হয়নি মেয়েটার রূপ। 'ওর পছন্দ ছিল আমার উল্টো। গরমের দেশের উষ্ণ আবহাওয়া, নিষ্ঠুর সূর্য গোলাপি দিগন্ত—

'এসবের জন্যে ওর অসীম আকুলতা। আমি ছিলাম ওর সব চাওয়ার প্রতীক। আমি দক্ষিণ, আমার আকুলতা উত্তর আর তুষারের জন্যে। ওর ফ্ল্যাটটা ছিল হ্যাম্পস্টেডে, ওখান থেকে 'হিথ' নদীটা দেখা যায়। অক্সফোর্ড থেকে প্রতি সপ্তাহান্তে ও আসত। শনিবার রাতটা আমার ফ্ল্যাটে আর রবিবার রাতটা আমরা ওর ফ্ল্যাটে কাটাতাম। কখনো কখনো ও সোমবার রাত্তিরটাও কাটিয়ে যেত, কখনো বা পুরো হপ্তাটাই। তারপর বিশ্ববিদ্যালয়ে গরহাজির থাকতে শুরু করল, প্রথমদিকে নাগাড়ে একমাস তারপর দুই মাস, শেষে ওকে বহিষ্কৃত হতে হল। ও আমার বগলে মুখ গুঁজে বুক ভরে নিঃশ্বাস নিত—যেন আমাকেই শুষে নিচ্ছে ওর বুকে, অনেকটা ড্রাগের ধোঁয়া টানার মতন। ওর সারা মুখটা তৃপ্তিতে ভরে যেত। মন্দিরে পুজো করার ভাব করে বলত—"তোমার ঘামের গন্ধ আমার দারুণ লাগে। তোমার সমস্ত গন্ধের আঘ্রাণ আমি বুকে টেনে নিতে চাই—আফ্রিকার জঙ্গলের পচা পাতার গন্ধ, আম পেঁপের গন্ধ, প্রাচ্যদেশের মশলার গন্ধ, আরবের মরুভূমির বৃষ্টির গন্ধ—সব গন্ধ।" ও খুব সহজ শিকার। ওর সঙ্গে আমার আলাপ অক্সফোর্ডে। কবি আবু নুওয়াস-এর উপর একটা বক্তৃতার শেষে ওর সঙ্গে আলাপ হল। আমি বক্তৃতায় বললাম ওমর খৈয়াম-এর তুলনায় আবু নুওয়াস অনেক উঁচু দরের কবি। আমি আবু নুওয়াসের মদ সম্পর্কে লেখা কয়েকটা কবিতা বেশ মজা করে আবৃত্তি করে শোনালাম অনেকটা বক্তৃতার ঢঙে। শ্রোতাদের বোঝালাম আব্বাসির যুগে এমনি করেই কবিতা পড়া হত। আবু নুওয়াস ছিলেন একজন সুফি মরমীয়া কবি। ওঁর আধ্যাত্মিক ব্যাকুলতা বোঝাতে, মদের জন্য আকুল হওয়া আসলে পরমেশ্বরে নিজেকে বিলীন করার আকুতি। এসব ডাহা বাজে কথা, এর না আছে কোন ভিত্তি না আছে সত্যতা। সেই সন্ধেয় আমি এত উদ্দীপ্ত হয়ে বলছিলাম যে ডাহা মিথ্যে কথাগুলো সূক্ষ্ম সত্য হয়ে বেরিয়ে আসছিল আমার মুখ দিয়ে। শ্রোতারা মুগ্ধ হয়ে আমার বক্তৃতা শুনছে দেখে আমি মিথ্যের অংশ আরো বাড়িয়ে দিলাম। বক্তৃতার শেষে ওরা ভিড় করে এলো আমার কাছে—অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারি যারা প্রাচ্যে কাজ করেছে, মহিলারা—যাদের স্বামীরা প্রাণ দিয়েছে মিশর, ইরাক, সুদানে, পুরুষেরা, যারা কিচেনার আর অ্যালনবি-র সৈন্যবাহিনীতে লড়াই করেছে, প্রাচ্যবাদীরা, ঔপনিবেশিক অফিসের কর্মচারি, বৈদেশিক অফিসের মধ্য প্রাচ্য বিভাগের কর্মচারী। এই ভিড়ের মধ্যে দেখি একটা আঠারো উনিশ বছরের মেয়ে ভিড় ঠেলে আমার কাছে এগিয়ে এসে কাঁধে হাত রেখে আমাকে চুম্বন করল আর আরবি ভাষায় বলল—"তুমি যে কী সুন্দর তা কেমন করে বোঝাই, আর তোমাকে যে কত ভালোবাসি তাও বোঝাই কেমন করে?" মেয়েটার এই কূল ভাঙা আবেগের উগ্রতায় আমি একটু ভয়ই পেলাম, বললাম—'অশেষে তোমাকে খুঁজে পেলাম সৌসান। তোমাকে কোথায় না খুঁজেছি, শেষে ভাবলাম আর বুঝি তোমাকে পাব না। মনে আছে?" "কী করে ভুলি আল মামুনের যুগে টাইগ্রিস নদীর ধারে বাগদাদের খড়ক-এ আমাদের বাড়িটা?" ওর আবেগের আতিশয্য আমারই সমান। বলল "আমিও যুগ যুগ ধরে তোমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি। আমি জানি একদিন তোমাকে পাবই—এই তো তোমাকে পেয়েছি আমার প্রিয়তম, মুস্তাফা। কোন কিছুই বদলায়নি।" আমরা দুজনে যেন মঞ্চে দাঁড়িয়ে অভিনয় করছি, আমি নায়ক আর ও নায়িকা

পাশে আর সবাই গৌণ চরিত্র। আমাদের দুজনের উপর একটাই মাত্র আলো। আমি জানি আমি মিথ্যে বলছি তবু আমি যা বলছি তাই-ই বোঝাতে চাইছি। আর ওই মেয়েটাও আপাত মিথ্যের মোড়কে আসলে সত্যি কথাই বলছে। এরকম মুহূর্তের জন্যে আমি আমার জীবন পণ করতে পারি। এইরকম মুহূর্তেই চোখের সামনে মিথ্যে হয়ে যায় সত্যি, ইতিহাস নেয় দালালের ভূমিকা, ভাঁড় হয়ে যায় সুলতান। সেই স্বপ্নাবিষ্ট উম্মাদনায় ও আমাকে ওর গাড়িতে করে লণ্ডনে নিয়ে গেলো। লণ্ডনে ফেরার পথে সেদিন ও তীব্রগতিতে গাড়ি চালিয়ে এলো। পথে মাঝে মাঝে ষ্টিয়ারিং ছেড়ে আমার গলা জড়িয়ে ধরে বলছিল "তোমাকে পেয়ে আমি যে কী খুশি হয়েছি তা আর বলার নয়। এখনি যদি আমি মরে যাই তাহলেও আমার কোন খেদ থাকবে না।" পথে আমরা কয়েকবার থামলাম কোন 'পাব'-এ। কখনো খেলাম বিয়ার, কখনো লাল ওয়াইন, কখনো সাদা ওয়াইন, কখনো সিডার, কখনো হুইস্কি, আর প্রতি গেলাসের পানীয়ের সঙ্গে সঙ্গে আমি আবৃত্তি করে চললাম আবু নুওয়াসের কবিতা।

'আমাদের এইভাবেই চলতে থাকল। কবিতা আর মদের মাদকতায় আবিষ্ট হয়ে মিঠে মিঠে মিথ্যের বেসাতি সাজালো আর আমিও ওর জন্যে বুনে চলেছি মিথ্যে আর উদ্ভট কল্পনার জটিল নকশা। মেয়েটা বলত ও নাকি আমার চোখে তপ্ত মরুভূমির মরীচিকা দেখতে পায়, আমার কণ্ঠস্বরে শুনতে পায় জঙ্গলের হিংস্র শ্বাপদের গর্জন, আর আমি বলতাম ওর চোখের নীল রঙে দেখি উত্তরের কূলহীন সমুদ্র। লণ্ডনে ওকে আমার ফ্ল্যাটে এনে তুললাম। মারাত্মক সব মিথ্যের পরে মিথ্যে সাজিয়ে যে আস্তানাটা আমি গড়েছি : চন্দনকাঠ, ধূপ, উটপাখীর পালক, হাতির দাঁত আর আবলুস কাঠের ছোট ছোট মূর্তি ; দেওয়ালে টানানো নানা রকমের ছবি ; নীল নদের তালবন, নদীতে ভেসে যাওয়া পালতোলা নৌকার সারি ; লোহিত সাগরের পাশে পাহাড়চূড়োয় সূর্যাস্ত ; ইয়েমেনের সীমান্তে মরুভূমির বালিয়াড়ির পাশ দিয়ে হেঁটে যাওয়া উটের সারি, করদোফান-এর বাওবান গাছ, ঝাণ্ডি উপজাতির নগ্ন মেয়ে, বিষুবরেখার উপরে কফি আর কলার বাগান, নুবিয়া জেলার পুরোন মন্দির। আরবি বই—সুন্দর চামড়ায় বাঁধানো আর তাতে কুফিক হরফে সোনার জলে লেখা ; পারস্যের কার্পেট, বিরাট আয়না আর তার কোনায় ছোট ছোট রঙীন আলো। মেয়েটা আমার সামনে নতজানু হয়ে আমার পায়ের পাতায় চুম্বন করে বলল —"তুমি মুস্তাফা, আমার প্রভু, আমার মালিক। আমি সৌসান, তোমার ক্রীতদাসী।" তারপর নীরবে আমরা যে যার ভূমিকায় অভিনয় শুরু করলাম, আমি প্রভু আর ও ক্রীতদাসীর ভূমিকায়। মেয়েটা আমাকে গোলাপ জল দিয়ে নাইয়ে দিল। ধূপবাতি জ্বালিয়ে দিল, সিলিং থেকে ঝোলানো পেতলের ধুনুচিটায় চন্দন কাঠ জ্বালিয়ে দিল। ও একটা ফিনফিনে আবা আর মাথায় পরার কাপড় পরে নিল। আমি শুয়ে রইলাম বিছানায় আর মেয়েটা আমার বুক, পা, ঘাড়, গলা মালিশ করতে লাগল। রাজার মত হুকুম করলাম—"এদিকে এসো।" নীচু গলায় উত্তর দিল—"আজ্ঞা শোনা মানেই পালন করা প্রভু।" তখনো ওর নেশা কাটেনি, সেই প্রমত্ত অবস্থায় ওকে আমি গ্রহণ করলাম আর ও সেটা মেনে নিল কারণ যা ঘটার তা ঘটেছে হাজার বছর আগে। ওকে মৃত অবস্থায় পাওয়া গেল ওর হ্যাম্পস্টেডের ফ্ল্যাটে, গ্যাসে নিঃশ্বাসরুদ্ধ হয়ে মারা গিয়েছে। ওর ফ্ল্যাটে একটা চিরকুট পাওয়া

গিয়েছিল যাতে লেখা ছিল—"মিঃ সাঈদ ঈশ্বর যেন তোমাকে নরকে পাঠান।" আমি অ্যান হ্যামণ্ড-এর ফটোটা রেখে দিলাম মুস্তাফা সাঈদের সেই ফটোটার পাশে যেটাতে ও দাঁড়িয়ে আছে রবিনসন দম্পতির মাঝখানে। ওই ছবিটার উৎসর্গে লেখা আছে—'প্রিয় মুজিকে—কায়রো 17/4/1913'। এটা বোঝা যাচ্ছে যে শ্রীমতি রবিনসন ওকে 'মুজি' ডাক নামে ডাকতেন কারণ ওঁর চিঠিতেও উনি 'মুজি' নামটা ব্যবহার করেছেন। ছবিতে ভুরু কুঁচকে থাকলেও ওকে বেশ বাচ্চা বাচ্চা লাগছে। শ্রীমতি রবিনসন ওর বাঁদিকে দাঁড়িয়ে। ওঁর একটা হাত ওর কাঁধে আর মিঃ রবিনসনের হাত দুজনের কাঁধেই। ফটোতে দুজনের বয়স তিরিশের কোঠায়, মুখে পরিতৃপ্ত হাসি। এতসব ঘটে যাওয়া সত্ত্বেও ওর প্রতি শ্রীমতি রবিনসনের স্নেহ অটুট ছিল। উনি মুস্তাফা সাঈদের বিচারের সময় আদালতে হাজির ছিলেন প্রত্যেকদিন আর প্রত্যেকটি কথাই খুব মন দিয়ে শুনেছেন। তা সত্ত্বেও উনি আমাকে চিঠিতে লিখেছিলেন :—

'আমাদের প্রিয় 'মুজি'-র সম্পর্কে আমাকে চিঠি লেখার জন্যে তোমার কাছে আমি যে কী কৃতজ্ঞ তা প্রকাশ করার শক্তি আমার নেই। আমার এবং আমার স্বামীর প্রিয়তম ছিল 'মুজি'। বেচারা 'মুজি'। একজন নির্যাতিত শিশু হওয়া সত্ত্বেও ও আমাদের জীবনে এনেছিল অসীম আনন্দের জোয়ার। ওর এই মর্মান্তিক ঘটনার পরে লণ্ডন ছেড়ে যাবার পর থেকে ওর সঙ্গে আর কোন যোগাযোগ নেই। আমি অনেক চেষ্টা করেছি ওর সঙ্গে আবার যোগাযোগ করতে কিন্তু কোন লাভ হয় নি। বেচারা 'মুজি'। ওকে হারানোর বেদনা কিছুটা লাঘব হয় এটা জেনে যে জীবনের শেষ কটা দিন তোমাদের মধ্যে আনন্দে কাটিয়েছিল আর ওর একটা ভালো বৌ আর দুটো ছেলে হয়েছিল। শ্রীমতি সাঈদকে আমার ভালোবাসা দিও। ওঁকে বোলো আমাকে মা ভাবতে, আর আমি যদি ওদের জন্যে কিছু করতে পারি তাহলে যেন ইতস্তত না করে আমাকে লিখে জানাতে। ওরা যদি সবাই সামনের গ্রীষ্মের ছুটিটা এখানে এসে কাটায় তাহলে আমি খুব খুশি হব। আমি 'আইন অফ ওয়াইট্'-এ একা থাকি। গত জানুয়ারি মাসে কায়রো গিয়েছিলাম, আমার স্বামীর সমাধিতে। রিকির কায়রো ভীষণ ভালো লাগত, নিয়তির এমনই খেলা যে ও যে শহরটাকে পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসত সেই সহরেই ও শায়িত রইল।

'আমাদের জীবন নিয়ে আমি একটা বই লিখছি—রিকি, মুজি আর আমাকে নিয়ে। ওরা দুজনেই মহৎ—নিজেদের মত করে। রিকি অন্যের জীবনে আনন্দ, সুখ এনে দিতে পারে, এটাই ওর মহত্ব। প্রকৃত অর্থেই রিকি ছিল একজন আনন্দময় মানুষ, যে কোন লোকের সাহচর্যেই ও খুশিতে উচ্ছল হয়ে যেত। মুজি ছিল প্রতিভাধর, তবে ভীষণ অস্থির। যে ওর প্রকৃত ভালোবাসার পাত্র নয় তাকে ও সুখী করতে পারত না আর তার সাহচর্যেও সুখী হতে জানত না। আমাদের ও খুব ভ্যালাবাসত আমরাও ওকে ভীষণ ভালোবাসতাম। আমার ভালোবাসা এবং কর্তব্যের তাগিদে দুনিয়াকে আমি এই দুজন মহৎ পুরুষের কথা জানাতে চাই। বইটা আসলে লেখা হবে রিকি এবং মুজি-কে নিয়ে কারণ আমি তো কিছুই বিশেষ করি নি। আমি লিখব রিকির আরব সংস্কৃতির সেবার কথা, যেমন দুষ্প্রাপ্য সব পুঁথি আবিষ্কার করা, তার আলোচনা লেখা এবং সর্বোপরি সেগুলো ছাপানোর তত্ত্বাবধান করা। ঔপনিবেশিক

শাসনে তার দেশবাসীর দুরবস্থার কথা পৃথিবীকে জানানোর কাজে মুজি যে বিরাট ভূমিকা নিয়েছিল সেসব কথা লিখব আর লিখব ওর বিচারের কথা। আমার বইয়ে আমি ওর সব দোষ সন্দেহ মুছে দেব। আমার বই লেখার কাজে আসবে এরকম কোন নথিপত্র যা মুজি রেখে গেছে যদি তোমার সন্ধানে থাকে তাহলে সেটা যদি আমার ঠিকানায় পাঠিয়ে দাও তাহলে আমি কৃতজ্ঞ থাকব। হয়ত মুজি তোমাকে বলেছিল যে ও আমাকে ওর লণ্ডনের সব ব্যাপারের অছি ঠিক করেছিল। ওর লেখা কয়েকটা বই আর অন্য কয়েকটা বই-এর অনুবাদ স্বত্বের রয়ালটি থেকে কিছু টাকা পয়সা জমা হয়েছে। তুমি যদি আমাকে তোমার ঠিকানা জানাও তাহলে সেই ঠিকানায় বা ব্যাঙ্কে আমি টাকাটা পাঠিয়ে দিতে পারি। সবশেষে তোমাকে অশেষ ধন্যবাদ ওর পরিবারের অভিভাবকত্বের দায়িত্ব নেওয়ার জন্য। আমাকে নিয়মিত ওদের কথা লিখে জানিও।

ভবদীয়
এলিজাবেথ।'

চিঠিটা আমার পকেটে রাখলাম। ফায়ার প্লেসের ধারে চেয়ার পেতে বসলাম। সামনের টেবিলে রয়েছে একটা 'দি টাইমস' পত্রিকা, তারিখটা দেখি সোমবার, ২৭শে সেপ্টেম্বর, ১৯২৭। জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ। রেভারেণ্ড ক্যানন সাম্প্সন এম. এ. বিয়েতে পৌরোহিত্য করেছেন। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হবে বুধবার, বেলা দুটোয় স্টস্টনি গির্জায়। ব্যক্তিগত কলম : প্রিয়তমা, আর কত দিন? 'প্রিয়তম'। কেনিয়া কলোনি—শ্রী.... চার্টার্ড সারভেয়র অক্টোবরের ৫ তারিখ নাইরোবি ফিরিবেন। উপনিবেশের সম্পত্তির রিপোর্ট সংক্রান্ত চিঠিপত্র ততদিন .....-র প্রযত্নে তাঁকে পাঠানোর জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। ঘোড়ায় চড়া শেখানোর বিজ্ঞাপন। নীল রঙের পারস্যদেশের বিড়াল বিক্রয়। সদ্বংশজাত মার্জিত বালিকা (১৭) চাকুরি খুঁজিতেছেন। জন্মসূত্রে লেডি (৩০) বিদেশে চাকুরি খুজিতেছেন। ক্রীড়াসংবাদ : ওয়েস্টহিলের নিকট বার্ণহিল পরাজিত। ওয়েস্ট হ্যাম চিংরী। জিন টান্নি-র বিজয়। পঞ্জাবে হিন্দু-মুসলমান বিবাদ সম্পর্কে স্যর চিমনলাল সেতলভাদ-এর দৃষ্টিভঙ্গির যুক্তি খণ্ডন করে লেখা জাফারুল্লা খান-এর চিঠি। আর একটা চিঠিতে বলা হচ্ছে যে জ্যাজ্ সংগীত সূর্যহারা পৃথিবীর এক আনন্দময় সংগীত। গতকাল টিলবেরি ডক থেকে হেঁটে চিড়িয়াখানায় পৌঁছেছে রেঙ্গুন থেকে আসা দুটো হাতী। গবাদিপশু প্রজনন কেন্দ্রে মালিকের ষাঁড়ের গুঁতোয় মৃত্যু। চারটি কলা চুরির অপরাধে একজনের তিন বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড। সাম্রাজ্য সংক্রান্ত ও বৈদেশিক সংবাদ। ফ্রান্সের নিকট রাশিয়ার ঋণ শোধের ব্যাপারে মস্কোর নতুন প্রস্তাব। সুইৎজারল্যাণ্ড-এ বন্যা। ক্যাপটেন স্কট-এর জাহাজ 'দি ডিসকভারি'-র দক্ষিণ সাগর থেকে প্রত্যাবর্তন। গত শনিবার হের স্ট্রেস্‌মান্ নিরস্ত্রীকরণ নিয়ে জেনিভায় বক্তৃতা দিয়েছেন। 'মাতন' পত্রিকায় এক সাক্ষাৎকারে রাষ্ট্রপতি হিনডেনবুর্গের ট্যালেনবার্গে দেওয়া বক্তৃতাকে সমর্থন করে বলেন যে, যুদ্ধ লাগার জন্য জার্মানি আদৌ দায়ী নয়। প্রধান সংবাদ—গ্রেট বৃটেন-এর পক্ষে স্যর গিলবার্ট ক্লেটন এবং রাজা হেজাজ নেজদ্ ও অন্যান্য আশ্রিত রাজ্যের রাজার পক্ষে তাঁর পুত্র যুবরাজ ফৈজল আবদুল-আজিজ আল সৌদ-এর মধ্যে স্বাক্ষরিত 'জেদ্দা চুক্তি'। ইংলণ্ড ও ওয়েলস্-

এর আবহাওয়ার খবর : ঝোড়ো হাওয়া মুখ্যত পশ্চিম এবং উত্তর-পশ্চিম থেকে, খোলা জায়গায় মাঝে মাঝে তীব্র হবে। বজ্রবিদ্যুৎসহ কয়েক পশলা বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা আছে, মাঝে মাঝে হাল্কা বৃষ্টি হবে।

ওই ঘরে এটা ছাড়া আর কোন খবরের কাগজ নেই। এর কি কোন বিশেষ কারণ আছে নাকি নিছক ঘটনাচক্র?

একটা নোট্‌বুক খুলে দেখলুম। প্রথম পাতায় লেখা 'আমার জীবনকাহিনী—মুস্তাফা সাঈদ।' পরের পাতায় উৎসর্গ : 'যারা এক চোখে দেখে, এক মুখে কথা বলে, সব কিছুকে হয় সাদা নয় কালো, হয় প্রাচ্য নয় পাশ্চাত্য দেখে, তাদের জন্য।' পাতা উল্টে দেখি আর একটাও কথা লেখা নেই সারা নোটবইটা জুড়ে, এমন কি একটা শব্দও না। এটাও কি কোন বিশেষ অর্থ আছে, নাকি এটা নেহাৎ কাকতাল? একটা ফাইল খুললুম, নানান রকম কাগজ, ড্রয়িং, স্কেচে ভর্তি। মনে হয় ও ছবি আঁকা বা লেখা মকসো করত। ড্রয়িংগুলো বেশ ভালো, প্রতিভার নিদর্শন আছে। রঙীন ড্রয়িংগুলো ইংলণ্ডের গ্রামের যাতে ওক গাছ, নদীতে ভেসে যাওয়া রাজহাঁসের দল বার বার ফিরে এসেছে। পেন্সিল ড্রয়িংয়ে আমাদের গ্রামের নিসর্গ, মানুষের স্কেচ। ওর স্কেচের হাত-এর প্রশংসা না করে পারা যায় না। বক্‌রি, মাহ্‌জুব, আমার দাদু, হোস্‌না, আমার চাচা আবদুল করিম এবং আরো অনেকের মুখ। মুখগুলো এখন আমার দিকে অন্তর্ভেদী দৃষ্টিতে তাকিয়ে। এই দৃষ্টি আমার চেনা কিন্তু আমি এর অর্থ বুঝি না। মুস্তাফা সাঈদের আঁকা দেখলে বোঝা যায় কী দরদ এবং মমতা-র সঙ্গে মুখগুলো ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। ওয়াদ্‌ রাইয়েসের আটটা বিভিন্ন ভঙ্গির ড্রয়িং—অন্যান্যদের থেকে অনেক বেশি। ও ওয়াদ্‌ রাইয়েস-এর প্রতি এত মনযোগী কেন?

হাতে লেখা কয়েকটা পাতা। একটায় লেখা—'আমরা মানুষকে শিক্ষিত করি যাতে তাদের মনটা মুক্ত হয়, ছাড়া পায় তাদের অন্তরে আবদ্ধ শক্তি। কিন্তু আমরা ফলাফল আগে থেকে অনুমান করতে পারি না। মুক্তি—আমরা তাদের মনটা মুক্ত করে দিই কুসংস্কারের বন্ধন থেকে। আমরা মানুষের হাতে তুলে দিই ভবিষ্যতের চাবি, তাই নিয়ে তারা যাতে যা খুশি করতে পারে।' 'আমি যখন লণ্ডন ছেড়ে চলে গেলাম তখন ইউরোপের দেশগুলো গণ সাজে সাজছে, হচ্ছে বৃহত্তর হিংস্রতার জন্যে।' 'এটা ঘৃণা নয়।' এটা এক ধরণের ভালোবাসা যা নিজেকে প্রকাশ করতে অক্ষম। আমি ওকে ভালোবেসেছিলাম অন্য অর্থে। সেও।' 'বাড়িগুলোর চাল ঝিরঝিরে ভেজা। মাঠে চরছে গরু ভেড়া, সাদা কালো নুড়ির মতন। জুন মাসের হাল্কা বৃষ্টি। মাফ করবেন ম্যাডাম। এই রেলভ্রমণ সত্যিই একঘেয়ে। কেমন আছেন? বার্মিংহাম থেকে আসছেন। লণ্ডনে যাচ্ছেন। নিসর্গটা কীভাবে বর্ণনা করা যায়? গাছপালা আর ঘাস। মাঠের মধ্যে খড়ের গাদা। গাছপালা, ঘাস চারদিকে একইরকম। নগাইয়ো মার্শ-এর লেখা একটা বই। মেয়েটা একটু ইতস্তত করল, হ্যাঁ বা না বলে নি।' ও কি কোন গল্পের খসড়া তৈরী করছিল নাকি সত্যি ঘটনা লিখেছে? 'মাই লর্ড, বাদী পক্ষের সওয়ালের পদ্ধতি অত্যন্ত আপত্তিকর, কারণ উনি এমন একটা দ্বান্দ্বিক কৌশল নিয়েছেন যা আদালতকে ভ্রান্ত পথে চালিত করবে। আসামী যে সব ঘটনার জন্যে দায়ী নয়, সেই ঘটনার দায় তার উপর

চাপানোর চেষ্টা করছেন। ওঁর যুক্তিজালের ভিত্তি হল সেইসব ঘটনা যা ঘটেছে, কিন্তু উনি অনেক কিছুই ধরে নিচ্ছেন সত্যি এবং তার ভিত্তিতে আর এক সত্যকে প্রতিষ্ঠা করতে চাইছেন। আসামী স্বীকার করছে যে সে তার স্ত্রীকে খুন করেছে, কিন্তু সেজন্য গত দশ বছরে বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জে যত মেয়ে আত্মহত্যা করেছে তার দায় তাঁর উপরে বর্তায় না।' 'যে সৎকাজ করে তার জন্য তরুণ বিহঙ্গ আনন্দে উড়ে যায়, আর যে মন্দ কাজ করে তার জন্যে একটা গাছ জন্মায় যার কাঁটাগুলো হল দুঃখ আর ফলটা অনুতাপ। যে ব্যক্তি তার ভুল থেকে চোখ ফিরিয়ে থাকে, মত্ত থাকে সবকিছুর বাইরের চেহারা নিয়ে, আল্লা তাকে ক্ষমা করুন।'

একটা কাগজে দেখলাম ওর হাতে লেখা একটা কবিতা। বোঝা যাচ্ছে ও একটু আধটু কবিতা লেখারও চেষ্টা করত। ওর কাটাকুটি দেখে বুঝতে অসুবিধে হয় না যে আর্টের মুখোমুখি হওয়ার শঙ্কা ও এড়াতে পারে নি।

কাগজ ঘাঁটতে ঘাঁটতে কয়েকটা চিরকুট পেলাম। তাতে লেখা—'তিন ড্রাম তেল।' 'সেচের পাম্প-এর ভিৎটা শক্ত করার প্রশ্ন নিয়ে কমিটি আলোচনা করবে।' 'উদ্বৃত্ত সিমেন্ট এখনই বিক্রি করে দেওয়া যায়।' আর একটা কাগজে লেখা 'আমার নক্ষত্রের সঙ্গে ওর সংঘর্ষটা ছিল অনিবার্য। আর আমি যে দীর্ঘদিন জেলখানায় কাটিয়ে আরো বেশিদিন ওর ভূতকে তাড়া করে এবং তাড়িত হয়ে এই দুনিয়ায় ঘুরে বেড়াব এটাও আমার নিয়তি। আমি মৃত্যুর দেবীকে নিধুবনে পেয়েছি আর তার খোলা চোখের মধ্যে দিয়ে তাকিয়েছি নরকের দিকে এই অনুভব এক লহমায় নিয়ে যায় সবচেয়ে সীমানার বাইরে—এই অনুভূতি কোন মানুষের পক্ষে কল্পনা করা সম্ভব নয়। সেই রাতের আস্বাদ আমার মুখে আজও অন্য কিছুর আস্বাদ নিতে দেয় না।'

এই সব চিরকুট পড়তে পড়তে একঘেয়ে লাগল। আরো এরকম অনেক চিরকুট নিশ্চয়ই ছড়ানো আছে একটা ধাঁধার মত। মুস্তাফা সাঈদ চেয়েছিল আমি এই টুকরোগুলো জুড়ে জুড়ে ওর একটা গ্রহণযোগ্য ভাবমূর্তি গড়ে তুলি। ও আবিষ্কৃত হতে চাইছে কোন মূল্যবান ঐতিহাসিক জিনিসের মত। আর এ ব্যাপারে আমার কোন সন্দেহ নেই বা আমাকে সেই আবিষ্কারের ভূমিকায় সে নির্বাসিত করেছে। এটা কোন কাকতাল নয় যে ও আমার কৌতূহল জাগ্রত করে ও জীবনের গল্প আধখানা শুনিয়েছিল যাতে বাকিটা আমি উদ্‌ঘাটন করি। এটাও কোন কাকতাল নয় যে ও আমার জন্যে গালা দিয়ে সিল করা একটা চিঠি রেখে দিয়েছে আমার কৌতূহল আরো বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য, ওর ছেলেদের অভিভাবক নির্বাচন করেছে যাতে আমি ছেড়ে না যাই আর রেখে গেছে এই মোমের জাদুঘরের চাবি। ওর অহং বোধ আর প্রবঞ্চনা সীমাহীন। সব কিছু সত্ত্বেও ও চেয়েছে ইতিহাস ওকে অমর করুক। এই প্রহসন আর বেশিক্ষণ চালিয়ে যাওয়ার ইচ্ছে বা সময় কোনটাই আমার নেই। এখন রাত দুটো বাজে, ভোর হওয়ার আগেই আমি সব শেষ করতে চাই। ভোরের প্রথম আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে লকলকে আগুনে জ্বলবে সব মিথ্যে।

আর সময় নেই। তড়াক করে উঠে পড়লাম, আলো ধরলাম ফায়ার প্লেসের উপরে রাখা ফ্রেমে বাঁধানো তৈলচিত্রের উপর। ঘরের সব কিছুই পরিপাটি করে সাজানো, সব কিছুই

নিজস্ব জায়গায় রয়েছে—শুধু জিন মরিসের ছবিটা ছাড়া। ও যেন জানত না ছবিটা নিয়ে ঠিক কী করবে। অন্যান্য মেয়েদের ফটোগুলো সাজিয়ে রেখেছে, শুধু জিন মরিসের ছবিটাই তেল রঙে আঁকা। ক্যামেরা নয়, যেমনটা তাকে দেখত। ওই ছবিটার দিকে তাকিয়ে রইলুম খানিক্ষণ মুগ্ধ হয়ে। মেয়েটার মুখটা লম্বাটে, টানা টানা চোখের উপর ভুরু দুটো প্রায় জুড়ে গেছে, নাকটা একটু বড়র দিকেই, মুখটা একটু বড়। মুখের অভিব্যক্তিটা ভাষায় বলা কঠিন, রহস্যময়, উত্তেজক। পাতলা ঠোঁট দুটো জোরে টিপে রয়েছে যেন দাঁত ঘষছে, চোয়ালটা একটু উদ্ধতভাবে সামনে এগোন। চোখের ভাবটা কি রাগের না স্মিত হাসির? মুখখানা থেকে ঝরে পড়ছে বাসনার ঝাঁঝ। এই কি সেই ফিনিক্স পাখি যে পিশাচ নিধন করেছিল। সে রাতে এই মেয়েটার কথা বলার সময় ওর গলাটা যেন আহত, দুঃখী, অনুতপ্ত শোনাচ্ছিল। কেন? তা কি মেয়েটাকে হারিয়ে ফেলেছিল বলে? নাকি মেয়েটা তার অমর্যাদা ওকে গিলতে বাধ্য করেছিল বলে?

'আমি যখনই যে পার্টিতে যাই, সেখানেই ও হাজির আমাকে অপমান করার জন্যেই ও যেন সব জায়গায় হাজির। আমি ওর সঙ্গে নাচতে চাইলে ও প্রত্যাখ্যান করে বলত—"তুমি যদি পৃথিবীর একমাত্র পুরুষ হতে তাহলেও আমি তোমার সঙ্গে নাচতাম না।" আমি ওর গালে যখন চড় মেরেছি তখন আমার পায়ে ও লাথি মেরে-হাত কামড়ে দিয়েছে সিংহীর বিক্রমে। কোথাও কাজকর্ম কিছুই করত না, আমি জানি না ওর চলত কী করে। ওর পরিবারের সবাই লিড্‌স-এ থাকতেন, আমার সঙ্গে অবশ্য কারুর দেখা হয়নি কখনো, তাদের সম্পর্কে ওর কাছেই যা একটু আধটু শুনেছি, তার বেশি আর কিছু আমি জানতাম না। ওর বাবার বোধহয় একটা ব্যবসা ছিল। কিসের তা অবশ্য আমার জানা নেই। ও বলেছিল ওরা পাঁচ ভাই আর ওই একমাত্র বোন। খুব সামান্য ব্যাপারেও মিথ্যে কথা বলত। রোজ বাড়ি ফিরে উদ্ভট উদ্ভট সব গল্প ফাঁদত, আজ এই হয়েছে কাল অমুকের সঙ্গে দেখা হয়েছে—সব মিথ্যে কথা। ওর যদি কোন পরিবার পরিজন নাও থাকত, ও যদি সহরজাদী-র মত ভিখারিনী হত, তাহলেও আমি অবাক হতাম না। তবে ও ছিল খুব বুদ্ধিমতী আর যখন ইচ্ছে করত তখন ওর চালচলন কথাবার্তায় মুগ্ধ করে দিত। যেখানেই যেত সেখানেই ওকে মাছির মত ঘিরে থাকত ভক্তের দল। আমি কিন্তু বুঝতে পারতাম, ওপর ওপর আমাকে অপছন্দ করলেও আমার প্রতি ওর অদম্য কৌতূহল। কোনো জমায়েতে আমরা দুজনেই যদি উপস্থিত থাকতুম তাহলে ও সবসময় চোখের কোণ দিয়ে আমাকে নজরে রাখত, খেয়াল রাখত আমি কী করছি, কী বলছি। যদি কোন মহিলাকে একটু বেশি মনোযোগ দিয়েছি তাহলে সেই মহিলার সঙ্গে অত্যন্ত দুর্ব্যবহার করত। কথায় কাজে ওর বেহায়াপনার অন্ত ছিল না—চুরি, ছ্যাঁচড়ামি, মিথ্যেকথা বলা,লোককে ঠকানো, গুণের আর শেষ নেই। তবু আমি ওর প্রেমে পড়েছিলাম, এবং আমার ইচ্ছের বিরুদ্ধেই ঘটনার স্রোতের উপর আমার আর কোন নিয়ন্ত্রণ ছিল না। ওকে এড়ানোর চেষ্টা করলে আমাকে প্রলুব্ধ করত, পিছনে ধাওয়া করলে পালিয়ে যেত। একবার কিছুদিনের জন্য নিজেকে সংযত করে ওর থেকে পালিয়ে বেড়ানোর চেষ্টা করলাম। যে কোন জায়গায় আমার নেমন্তন্ন থাকলে আমি নিশ্চিত করতাম যাতে ও সেখানে

না থাকে। ও যে সব পরিমণ্ডলে ঘুরে বেড়ায় আমি সেইসব আড্ডা এড়িয়ে থাকলাম। কিন্তু অদ্ভুত ব্যাপার, তাও দেখি আমি যেখানেই যাই, ও ঠিক সেখানে হাজির। এক শনিবার মাঝ রাত্তিরে ও সোজা আমার ফ্ল্যাটে এসে হাজির, ঘরে তখন অ্যান হ্যামণ্ড আর আমি। ঘরে ঢুকেই অ্যান হ্যামণ্ডকে এমন অকথ্য গালিগালাজ করতে লাগল যে আমি ওকে গলাধাক্কা দিয়ে বার করে দেবার চেষ্টা করলাম, কিন্তু কোনো লাভ হল না। ওকে নড়ায় কার সাধ্যি। অ্যান হ্যামণ্ড কাঁদতে কাঁদতে চলে গেল আর ও আমার সামনে এসে দাঁড়াল দানোয় পাওয়া মানুষের মত, চোখের তীব্র অবাধ্য চাউনিতে কোন অজানার হাতছানি। কোন কথা না বলে একটা একটা করে শরীরের সব পোশাক খুলে সম্পূর্ণ উদোম হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। নরকের রৌরব তখন আমার বুকে। সেই আগুন নেভাতে হবে আমার পথজুড়ে থাকা বরফের পাহাড় দিয়ে। আমার সর্বাঙ্গ থর থর করে কাঁপছে, ওর দিকে একটু এগোতেই ও আঙুল তুলে ফায়ার প্লেসের উপরে রাখা একটা খুব দামী ফুলদানী দেখিয়ে বলল, "ওটা আমাকে দাও, তারপর তুমি আমাকে গ্রহণ করতে পার।" সেই মুহূর্তে ও যদি আমার প্রাণটাও চাইত, মূল্য হিসেবে আমি তাও দিতে প্রস্তুত। সম্মতি জানিয়ে মাথা নাড়লাম। ও ফুলদানীটা এক আছাড়ে ভেঙে ফেলে টুকরোগুলো জুতো দিয়ে গুঁড়িয়ে দিল, তারপর টেবিলে রাখা একটা দুষ্প্রাপ্য আরবি পুঁথি দেখিয়ে বলল "ওটাও আমাকে দাও।" তৃষ্ণায় তখন আমার প্রাণ যায় যায়, বরফজলে সেই তেষ্টা মেটাতে হবে। এবারও সম্মতি দিলাম। সেই প্রাচীন পুঁথিটা ও নিমেষে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলল। তারপর সেই ছেঁড়া পাতাগুলো মুখে পুরে চিবিয়ে ফেলে দিল থু থু করে। ও যেন আমার যকৃতটা চিবিয়ে ফেলল। তবুও আমার কিছু এসে যায় না। এইভাবে আমার দামী ইসফাহানি জায়নামাজখানাও চলে গেল ফায়ার প্লেসে। কায়রো ছাড়ার সময় শ্রীমতি রবিনসনের দেওয়া ওই অপূর্ব জায়নামাজটা ফায়ার প্লেসে পুড়তে দেখে আমার মাথায় আগুন ধরে গেল। এই মেয়েটা আমার শিকার, আমি ওকে ধাওয়া করে নরক পর্যন্ত যেতে প্রস্তুত। এগিয়ে এসে ওর কোমর জড়িয়ে ধরে ঠোঁটে ঠোঁট রাখতেই আমার দুই উরুর সঙ্গমে ওর হাঁটুর সজোর আঘাতে আমার শরীরে অনুভব করলাম তীব্র যন্ত্রণা, জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়লাম। পরে যখন জ্ঞান ফিরল দেখি ও চলে গেছে।

এমনি করে ওর পিছনে ধাওয়া করে বেড়ালাম তিন বছর। আমার কাফেলা তৃষ্ণার্ত, বাসনার মরুভূমিতে মরীচিকার ঝিলমিল আমার সামনে।" তুমি একটা জংলী ষাঁড়, তাড়া করে বেড়ানোয় তোমার কোন ক্লান্তি নেই। তোমার কাছ থেকে পালিয়ে বেড়াতে বেড়াতে আমি ক্লান্ত। আমাকে বিয়ে কর। বলল আমাকে একদিন। ফুলহ্যাম-এর একটা রেজিস্ট্রি অফিসে আমাদের বিয়েটা হয়ে গেল, হাজির ছিল শুধু ওর একজন আর আমার একজন বন্ধু। রেজিস্ট্রার-এর সঙ্গে সঙ্গে ও পুনরাবৃত্তি করার সময়—"আমি জিন উইনিফ্রেড মরিস, মুস্তাফা সাঈদ ওঠমান নামের এই ব্যক্তিকে আইনানুসারে বিবাহিত স্বামী হিসাবে গ্রহণ করছি, সুদিনে দুর্দিনে, বৈভবে দারিদ্র্যে সুখ অসুখে...." এইটুকু বলেই ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। ওর এই আবেগমথিত কান্নায় আমি অবাক না হয়ে পারলাম না। রেজিস্ট্রার ভদ্রলোক অনুষ্ঠান থামিয়ে বললেন—"এই তো প্রায় হয়ে গেছে। আপনার অবস্থাটা আমি বুঝতে পারছি। আর একটু

ধৈর্য ধরুন তারপরই সব ঠিক হয়ে যাবে।" রেজিষ্ট্রারের কথায় ওর ফোঁপানো একটু বন্ধ হল, তারপর অনুষ্ঠানটা শেষ হলে আবার ও কান্নায় ভেঙে পড়ল। রেজিষ্ট্রার আমাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন—"আপনার স্ত্রীর এই কান্নাটা আনন্দের। এর আগেও অনেককেই কাঁদতে দেখেছি তবে এত বেশি নয়। আসলে আপনার স্ত্রী আপনাকে ভীষণ ভালোবাসে, আমার স্থির বিশ্বাস আপনারা সুখী হবেন।"রেজিষ্ট্রারের অফিস থেকে বেরোনর পরেই ওর কান্নাটান্না সব থেমে গেল। হঠাৎ হেসে উঠে বলল "কী অদ্ভুত প্রহসন!"

বাকি দিনটা আমাদের মদ খেয়েই কাটল। কোন ভোজসভা নেই, অতিথি নেই—শুধু ও আর আমি আর মদ। রাত্রিবেলায় যখন আমরা শুতে গেলাম, আমি ওকে আপন করে পেতে চাইলাম। উল্টোদিকে পাশ ফিরে বলল, "এখন থাক।" "আমি ক্লান্ত।" দুমাস আমাকে ওর কাছেই ঘেঁষতে দেয় না, প্রতি রাতেই ওই এক কথা—"আমি ক্লান্ত।" কিংবা "আমার শরীর ভালো নেই।" আর সইতে না পেরে একদিন একটা লম্বা ছোরা হাতে নিয়ে ওর সামনে দাঁড়িয়ে বললুম—"তোমাকে খুন করব।" ছুরিটার দিকে আকুল হয়ে তাকালো তারপর ব্লাউজটা একটানে খুলে ফেলে উন্মুক্ত বুক আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল "এই আমার বুক পেতে দিলাম, বিদ্ধ কর তোমার ছোরা।" আমার সামনে ওর খোলা বুক, হাত বাড়ালেই ধরতে পারি কিন্তু অধিকার করতে পারি না। বিছানার প্রান্তে বসে পড়লাম, মাথাটা আমার ঝুলে পড়ল কোন অজানা দুর্বলতায়। আমার চিবুকটা নেড়ে দিয়ে নরম সুরে বলল—"সোনা আমায় তুমি খুন করার মত মানুষ নও।" কলঙ্ক একাকীত্ব আর সব হারানোর বোধ আমার মনটা গ্রাস করল। আমার মার কথা মনে পড়ল। মনের মধ্যে ভেসে উঠলো তাঁর চোখদুটো, শুনতে পেলুম তাঁর গলা—। "তুমি স্বাধীন, জীবনটাকে নিয়ে নিজের খুশি মতন যা ইচ্ছে তাই করতে পার।" আমার মনে পড়ল, নয় মাস আগে আমার মায়ের মৃত্যু সংবাদটা যখন আমার কাছে পৌঁছাল তখন আমি মাতাল অবস্থায় একটা মেয়ের কণ্ঠলগ্ন হয়েছিলাম। মেয়েটা কে তা এখন আর মনে করতে পারি না তবে এটুকু মনে আছে আমার কোন দুঃখ হয়নি—ব্যাপারটার সঙ্গে আমার যেন কোন সম্পর্কই নেই। সেকথা মনে করে এখন আমার কান্না পেল। আমি ঝরঝর করে কেঁদে ফেললাম। হৃদয়ের গভীর থেকে উৎসারিত সেই কান্না আমার থামতেই চায় না। আমার কাঁধে হাত রেখে আমাকে আলিঙ্গন করল জিন মরিস, কিন্তু সেদিকে আমার খেয়াল নেই। কিছু বলার চেষ্টাও করল, কিন্তু তখন ওর কণ্ঠস্বর আমার অসহ্য লাগছে। ধাক্কা দিয়ে ওকে বিছানায় ফেলে দিয়ে চিৎকার করে উঠলাম, "আমি তোমাকে ঘৃণা করি। আমি তোমাকে একদিন খুন করে ফেলব।" ওর চোখের ভাবের বদল আমার চোখ এড়ালো না। সেই ভারাক্রান্ত অবস্থায় লক্ষ করলুম ওর চোখ দুটো কীরকম ঝিকিমিকিয়ে উঠলো আর ওর দৃষ্টিটা কেমন যেন অদ্ভুত! এটা কি বিস্ময়? ভয়? নাকি বাসনা? তারপর দরদ দেখানোর ভান করে নরম গলায় বলল—"আমিও সোনা তোমাকে ঘৃণা করি। আমি আমরণ তোমাকে ঘৃণা করব।"

'আমার কিছুই করার নেই। নিজেই আমি তখন শিকারি থেকে শিকারে রূপান্তরিত। নিদারুণ মনোকষ্টে আমি বাহ্যজ্ঞানশূন্য, অথচ এই যন্ত্রণাক্লিষ্ট অবস্থাতেও আমার রিচমণ্ড

পার্কে গিয়েছিলাম সন্ধের মুখে। এগারো দিন আমার খুব ভালো মনে আছে কারণ এই এগারো দিন ধরে আমি আমার মনোকষ্ট সহ্য করেছি যেমনটা মানুষ সহ্য করে দারুণ গরমে রমজানের রোজা রাখার সময়। পার্কটা অবশ্য তখন পুরোপুরি জনশূন্য নয়, আনে পাশে লোকজনের গলা পাচ্ছি, আলো আঁধারে মানুষগুলো ভূতের মতো দেখাচ্ছে। আমরা একটু আধটু কথা বলছি, ভালোবাসা বা অনুরাগের কোন প্রকাশ নেই। কোন কারণ ছাড়াই ও হঠাৎ আমার গলা জড়িয়ে ঠোঁটে ঠোঁট চেপে চুম্বন করল অনেকক্ষণ ধরে। ওর উষ্ণ নিঃশ্বাস আমার চিবুকে, ওর দুই স্তনের নরম চাপ আমার বুকে। কোমর বেষ্টন করে ওকে কাছে টানলুম। ওর গলা দিয়ে বেরিয়ে এলো কামজর্জর গোঙানি। সেই গোঙানিতে ছিন্ন হল আমার হৃদয়তন্ত্রী, আমি বাহ্যজ্ঞানশূন্য হয়ে পড়লুম। আমার আর বিশেষ কিছু মনে নেই, শুধু মনে আছে একটা বিপর্যয় যা নিয়তির পরিহাসে নারীর আকারে আমার সংলগ্ন হয়েছে। ওই আমার নিয়তি, আমার বিনাশ। তবু তুলনায় সারা পৃথিবীর মূল্য আমার কাছে এক রতিও নয়। আমিই দক্ষিণ থেকে আসা হানাদার, আর এ হল তুষারাবৃত রণাঙ্গন যেখান থেকে আমি আর নিরাপদে ফিরব না। আমিই জলদস্যু আর জিন মরিস ধ্বংসের উপকূল। আমি তাও পরোয়া করি না। আমরা সেই খোলা মাঠেই রমণে প্রবৃত্ত হলাম, কে আমাদের দেখল, কে শুনল তাতে আমাদের কিছুই এসে যায় না। আমার কাছে সেই উন্মাদনার মুহূর্ত আমার জীবনের থেকেও মূল্যবান।'

'সেই বাসনা চরিতার্থতার উন্মাদনা সহজলভ্য নয়। বাকী সময়টা আমাদের কাটত মারামারি ফাটাফাটি করে, যে লড়াইয়ে কেউ এতটুকু জমি ছাড়ত না। যুদ্ধটা সবসময় থামত আমাকে হার মানিয়ে। আমি ওকে চড় মাড়লে ও অনেক চড় মেরেই ক্ষান্ত হত না, নখ বসিয়ে দিত আমার মুখে। ওর মধ্যে হিংস্রতার অগ্ন্যুৎপাত শুরু হয়ে যেত, হাতের কাছে কাপ ডিস যা পেত ভাঙত আছাড় মেরে, ছিঁড়ে ফেলত বই পত্তর খাতা কাগজ। এটাই ছিল ওর সবচেয়ে মারাত্মক অস্ত্র। প্রতিবারই ঝগড়া মারামারির সময় (এটা আমার যুদ্ধ বলেই মনে হত) ও আমার একটা দুর্লভ বই ছিঁড়ে ফেলবে, কোন গবেষণাপত্র যার উপর আমি হয়ত কয়েক হপ্তা কাজ করেছি—সেটা ছুঁড়ে ফেলবে ফায়ার প্লেসে। কখনো কখনো আমি রাগে উন্মাদ হয়ে ওর গলা টিপে ধরতাম আর ও তখনি কেমন শান্ত হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে থাকত একটা রহস্যময় দৃষ্টিতে, সেই চাউনিতে মিশে থাকত ভয়, বিস্ময় আর বাসনা। আমার আঙুলের চাপ আর একটু বাড়ালেই শেষ হয়ে যেত সব যুদ্ধ। কখনো কখনো যুদ্ধটা আমার ঘরের চৌহদ্দি পেরিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসত। একদিন একটা পাব-এ ও হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলো—"ওই জানোয়ারটা আমাকে টিটকিরি দিচ্ছে।" আমি লাফিয়ে গিয়ে সেই লোকটার কলার চেপে ধরেছি তারপর শুরু হয়ে গেল ধস্তাধস্তি কিল, ঘুঁসি, লাথি। আমাদের চারপাশে লোকজন জড়ো হয়ে গেল। হঠাৎ ও পিছন থেকে খিলখিলিয়ে হেসে উঠলো। যারা আমাদের মারামারি ছাড়াতে জড়ো হয়েছিল তাদের একজন আমাকে বলল—"আপনাকে একথা বলতে আমার সংকোচ হচ্ছে, এই মহিলাটি যদি আপনার স্ত্রী হয় তাহলে আপনি একটা খান্‌কি-কে বিয়ে করেছেন। মনে হচ্ছে উনি অকারণে মারামারি লাগিয়ে মজা পান।" লোকটা ওকে একটাও কথা না বলে চলে গেল। আমার সব রাগ গিয়ে পড়ল ওর উপরে। ওর কাছে

গিয়ে ঠাস করে একটা চড় কষালাম, আর ও আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ধারাল নখ দিয়ে আমার মুখ আঁচড়ে দিল। সেদিন অনেক কষ্টে ওকে বাড়িতে ফিরিয়ে এনেছিলাম।'

'ও আমার সঙ্গে বেরোলে রাস্তাঘাটে যার তার সঙ্গে ছেনালি করতে ভালোবাসত রাস্তার লোক, বাসের কন্ডাকটার, রেস্টুরেন্টের ওয়েটার কেউ বাদ থাকত না। কেউ কেউ উত্তর দিত, উৎসাহিত হত, কেউ কেউ অশ্লীল মন্তব্য করত আর আমার সঙ্গে রাস্তার মধ্যে লেগে যেত মারামারি—কখনো অন্যদের সঙ্গে; কখনো ওর সঙ্গে। মাঝে মাঝে নিজেকেই জিজ্ঞেস করতাম আমাদের বন্ধনটা কিসের? কে আমাকে বেঁধেছে ওর সঙ্গে? আমি কেন ওকে ছেড়ে পালাচ্ছি না? আমি জানতাম কোন কারণ নেই তবু আমার আর করার কিছু ছিল না। ট্র্যাজেডিটা ঘটবেই। আমি জানতাম ও অবিশ্বাসী। আনুগত্যহীনতার দুর্গন্ধ সারা বাড়ি ছড়ানো। একদিন ওর কাছে দেখি একটা ছেলেদের রুমাল, সেরকম রুমাল আমি কখনও ব্যবহার করতাম না। ওকে জিজ্ঞেস করায় বলল—"এটা তোমারই।" আমি জবাব দিলুম "না এই রুমালটা আমার নয়।" ঘাড় বেঁকিয়ে ঔদ্ধত্যের সঙ্গে বলল, "আচ্ছা এটা না হয় তোমার নয়, তা তুমি করবেটা কী?" আর একদিন ওর ব্যাগে একটা সিগারেট কেস দেখে বললুম—"তুমি আমার প্রতি বিশ্বস্ত থাকছ না।" ঘাড় বেঁকিয়ে বলল—"না থাকলে তুমি কী করবে?" আমার মাথায় আগুন ধরে গেল, বললুম—"আমি একদিন তোমাকে খুন করব।" ও বলল—"তোমাকে কে আটকাচ্ছে আমাকে খুন করলে? তুমি কিসের অপেক্ষায় রয়েছ? নাকি কবে আমার উপর অন্য একটা লোক চেপেছে সেটা দেখার অপেক্ষায় আছ? আর সেটা দেখলেও যে তুমি কিছু করবে, তাও আমার মনে হয় না। তুমি শুধু বিছানায় বসে কাঁদতেই পার।"

ফেব্রুয়ারি মাসের সেই বিষণ্ণ সন্ধেটায় ভীষণ শীত পড়েছিল, তাপমাত্রা নেমে গিয়েছিল শূন্যের প্রায় দশ ডিগ্রি নীচে। সকাল, সন্ধে, রাত সব সমান অন্ধকার, বিষণ্ণ। প্রায় বাইশ দিন সূর্যের মুখ দেখা যায় নি। সারা সহর যেন একটা বরফ ঢাকা প্রান্তর—রাস্তায়, বাড়ির চালে, সামনের বাগানে বরফের চাদর পাতা। জলের পাইপে জল জমে বরফ, কথা বললে মুখ দিয়ে বাষ্প বেরোচ্ছে। গাছগুলোতে একটাও পাতা নেই, ডালগুলো নুয়ে পড়েছে জমা বরফের ভারে। আর এরকম সময়ে আমার ধমনীতে রক্ত টগবগিয়ে ফুটছে, মাথা জ্বরে পুড়ছে। এই রকম রাত্রেই ঘটে যায় দুনিয়া কাঁপানো সব ঘটনা। এই রাত হিসেব নিকেশের। ট্রেন থেকে নেমে ওভারকোটটা হাতে ঝুলিয়ে বাড়ির দিকে হাঁটছি, কপাল থেকে ফোঁটা ফোঁটা ঘাম ঝরছে, শরীর পুড়ছে তাপে। জুতোর চাপে বরফের টুকরো গুঁড়ো হয়ে যাচ্ছে মুচমুচিয়ে, তবু ঠাণ্ডাটা আমার বেশ ভালোই লাগছে। ঠাণ্ডা কোথায়? দেখলাম ও বিছানায় শুয়ে আছে, শুভ্র উরুদুটো বিসংলগ্ন, সম্পূর্ণ নগ্ন। ওর ঠোঁটদুটো একটু ফাঁক হয়ে হাসির আকার নিলেও সারা মুখে ছড়িয়ে আছে বেদনার আভাস। মনে হল যেন কিছু দেবার আর নেবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে রয়েছে। ওকে দেখে আমার মনটা প্রথমে মমতায় ভরে গেল, হৃদয়ে অনুভব করলাম সেই শয়তানি উষ্ণতা যা আমাকে জানিয়ে দিল পরিস্থিতিটা সম্পূর্ণ আমার নিয়ন্ত্রণে। এই উষ্ণতা এতদিন কোথায় ছিল? "তোমার সঙ্গে কি কেউ ছিল?"ওকে জিজ্ঞেস করলাম সম্পূর্ণ

আত্মবিশ্বাস নিয়ে, আমার যে আত্মবিশ্বাস ভেবেছিলাম হারিয়ে গেছে অনেকদিন। "আমার সঙ্গে কেউ ছিল না।" মনে হল আমার গলার আত্মবিশ্বাস চিড় ধরিয়েছে ওর আত্মবিশ্বাসে। বলল—"এই রাত শুধু তোমার জন্যেই। আমি তোমার অপেক্ষায় রয়েছি অনেকক্ষণ।" মনে হল ও এই প্রথম সত্যিকথা বলছে। এই রাতটাই হবে সত্য আর ট্র্যাজেডির রাত। খাপ থেকে ছোরাটা বের করে বিছানায় ওর পাশে বসে ওর দিকে তাকিয়ে রইলাম। আমার দৃষ্টি যেন ওর মুখে বিদ্ধ হল। আমরা দুজনে দুজনের চোখে চোখ রাখলাম, আমাদের দুজনের দৃষ্টি মিশে গেল যেন দুটো মহাজাগতিক নক্ষত্র একটা অভিশপ্ত মুহূর্তে এক হয়ে গেল। আমার চাউনি সইতে না পেরে ও মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে আমার দিকে পাশ ফিরল। তারপর আবার আমার দিকে চেয়ে রইল। আমি তাকালাম ওর বুকের দিকে, ওর দৃষ্টি আমার দৃষ্টি অনুসরণ করে চলল, যেন ওর নিজের ইচ্ছে অনিচ্ছে বলে আর কিছু নেই, শুধু আমার ইচ্ছেই অনুসরণ করে চলেছে। ওর পেটের দিকে চাইলাম, ওর দৃষ্টিও সেখানে এসে থামল, ওর মুখে যেন বেদনার মৃদু ছায়া। আমার দৃষ্টি থেমে থাকলে ওর দৃষ্টিও থামছে, আমার দৃষ্টি তাড়াতাড়ি সরলে ওরও সরছে। আমার দৃষ্টি গেল ওর শ্বেতশুভ্র উরুর দিকে তারপর পিছলে গিয়ে থামল দুই উরুর মাঝখানে, এই তো সেই গোপন কথার ভাণ্ডার, যেখান থেকে জন্ম নেয় ভালো এবং মন্দ। লক্ষ করলাম ওর মুখখানা রাঙা হয়ে গেল, আনত হল চোখের পাতা, ও যেন নিয়ন্ত্রণ হারিয়েছে। আস্তে আস্তে ছোরাটা তুললাম, ছোরার ফলার উপর ওর দৃষ্টি আটকে রয়েছে ; হঠাৎ চোখের মনিদুটো বড় হয়ে গেল আর বিদ্যুতের মত এক ঝলক আলোয় ওর মুখখানা উদ্ভাসিত হল। ছোরার ফলার দিকে ও তাকিয়েই রইল। ওর দৃষ্টিতে যেন মেশানো রয়েছে বিস্ময়, ভয় আর উদগ্র কামনা। ছোরাটা ধরে চুমু খেল তার তীক্ষ্ণ ফলায়। তারপর হঠাৎ চোখ বন্ধ করে শরীরটা টানটান করে বিছিয়ে দিয়ে বলল—"এস, সোনা আমার! আমি এখন প্রস্তুত। আমার উত্তর না পেয়ে ওর গোঙানি আরও বেড়ে গেল। ও অপেক্ষা করে রইল। কাঁদল। ওর গলার স্বর এত স্তিমিত যে প্রায় শোনাই যায় না—"অনুগ্রহ কর, প্রিয়তমা!"

'এই তো আমার জাহাজ প্রিয়ে, ভেসে চলেছে ধ্বংসের কূলে। ঝুঁকে পড়ে ওর কপাল চুম্বন করলাম। ছোরার ধারাল ফলাটা ওর বুকের মাঝখানে রাখলাম, ও আমার কোমর বেষ্টন করল পা দুটো দিয়ে। আস্তে আস্তে ছোরাটায় চাপ দিলাম। খুব আস্তে। ও চোখ মেলল। কী উন্মাদনা চোখ দুটোয়! দুনিয়ার সব কিছুর থেকেও ওকে সুন্দর মনে হচ্ছিল। "প্রিয়তম", খুব আস্তে আস্তে যন্ত্রণাক্লিষ্ট গলায় বলল—"ভেবেছিলাম তুমি এটা কোনদিন করবে না। আমি প্রায় আশা ছেড়েই দিয়েছিলাম।" আমার বুক দিয়ে চাপ দিলাম ছোরাটার বাঁটে, একটু একটু করে পুরোটা ঢুকে গেল ওর বুকে। চেপে রইলাম সমস্ত শক্তি দিয়ে, ও কাতর হয়ে অনুনয় করল : "আমার সঙ্গে চল, আমার সঙ্গে চল, আমাকে একা যেতে দিও না।"

' "আমি তোমাকে ভালোবাসি।" ও আমাকে বলল, আর আমি সে কথা বিশ্বাস করলাম। " আমি তোমাকে ভালোবাসি।"—আমিও সত্যি কথাটাই বললাম। আমরা দুজনে একটা লেলিহান শিখার মশাল, বিছানার প্রান্তটা রৌরবের লকলকে জিভ। আমার

নাকে ধোঁয়ার গন্ধ, শুনতে পেলাম ও বলছে—"আমি তোমাকে ভালোবাসি প্রিয়।" আমিও বললুম "আমি তোমাকে ভালোবাসি প্রিয়।" জগতের অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ এসে মিশল একটা বিন্দুতে যার আগে আর পরে কিছুই নেই।'

সম্পূর্ণ উদোম হয়ে মানে আমার জন্মদিনের পোশাকে, জলে নেমে পড়লুম। ঠাণ্ডা জল গায়ে লাগতেই শরীরে একটা শিহরণ খেলে গেল, তারপর শিহরণটা চলে গেল সমস্ত অনুভূতিকে জাগ্রত করে। নদীর জল বন্যার সময়ে যেমন ফুলে ওঠে তেমন হলেও গরমের সময় যেমন নেমে যায় তার চাইতে অনেক বেশি। ঘরটা থেকে বেরোনোর সময় বাতি নিভিয়ে দরজায় চাবি দিয়েছি তারপর সদর দরজায় তালা দিয়ে এসেছি। যা ভেবেছিলাম তার কিছুই করি নি। আর একটা অগ্নিকাণ্ডে কারুর কোন উপকার হত না। আমি ওকে ওর গল্প শেষ করতে না দিয়েই বেরিয়ে এসেছি, ও তো এখনো কথা বলে চলেছে। একবার ভাবলুম হোস্‌নার কবরে গিয়ে একটু দাঁড়াই। একবার ভাবলুম চাবিটা ছুঁড়ে ফেলে দিই এমন জায়গায় যেখানে কেউ কোনদিন খুঁজে পাবে না। তারপর আবার ভাবলুম—না, থাক। অর্থহীন আচরণ। কিন্তু আমাকে কিছু করতে হবে। পায়ে পায়ে পৌঁছে গেলুম নদীর ধারে। পূবদিকের আকাশটা তখন সবে ফরসা হতে শুরু করেছে। ভাবলুম আমার রাগ ঠাণ্ডা করব নদীতে সাঁতার কেটে। দুই পারের সব কিছু আধো অন্ধকারে আবছা দেখাচ্ছে, মাঝে মাঝে ভেসে উঠছে আবার হারিয়ে যাচ্ছে, আলো আর আঁধারের লুকোচুরি চলছে। নদীতে শব্দিত হচ্ছে সেই পুরোনো চেনা কণ্ঠস্বর, প্রবহমান অথচ মনে হয় যেন স্থির। নদীর শব্দ আর অল্পদূরের সেচের পাম্পের আওয়াজ ছাড়া আর কোন শব্দ নেই। উত্তর দিকের পাড় লক্ষ করে সাঁতরাতে লাগলুম। সাঁতরাতে সাঁতরাতে একসময় আমার অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলো নদীর সঙ্গে একতালে চলতে থাকল। চিন্তাহীনভাবে নদীর জলে ভাসতে ভাসতে এগিয়ে যাচ্ছি। জলের উপর আমার হাত পায়ের আঘাতের শব্দ, দূরে পাম্পসেটের শব্দ আর নদীর নিজস্ব শব্দ ছাড়া আর কিছুই শুনতে পাচ্ছি না। সাঁতরাতে সাঁতরাতে ঠিক করলাম উত্তরদিকের পাড়ে গিয়ে উঠব. সেটাই আমার লক্ষ। চোখের সামনে নদীর পাড় উঠছে নামছে। শব্দগুলো এই শোনা যাচ্ছে, এই হারিয়ে যাচ্ছে। একটু একটু করে নদীর প্রতিধ্বনি ছাড়া অন্য সব শব্দ হারিয়ে যাচ্ছে। তারপর আমি যেন একটা বিরাট প্রতিধ্বনিময় হলঘরের কেন্দ্রে দাঁড়িয়ে আছি। নদীর পাড় উঠছে আর নামছে। নদীর কলতান শুনতে পাচ্ছি আবার হারিয়ে যাচ্ছে। আমার সামনে সব কিছু দেখছি অর্ধবৃত্তাকার। তারপর কখনো দেখতে পাচ্ছি কখনো সব অন্ধকার, আমার চৈতন্য হারিয়ে যাচ্ছে আবার ফিরে আসছে। আমি কি জাগ্রত না সুসুপ্তিমগ্ন? জীবিত না মৃত? তবুও যেন একটা সরু সুতো কোনরকমে ধরে আছি ; আমার লক্ষ নীচে নয় সামনে, আমাকে সামনে এগোতে হবে নীচে তলিয়ে গেলে চলবে না। সুতোটা এত পাতলা যে প্রায় ছিঁড়ে যায় আর কি, আমার মনে হচ্ছে নদীর গভীর থেকে সমস্ত শক্তি আমাকে টানছে অতলে। হাত পা ক্রমশ অবশ হয়ে আসছে। হলঘরের প্রতিধ্বনি বেড়ে যাচ্ছে। কোথা থেকে হঠাৎ আমার শরীরে বেশ বল পেলাম. নিজেকে আবার জলের উপর ভাসিয়ে তুললাম। আবার নদীর

কলতান, পাম্পসেটের ফট ফট শব্দ সব শুনতে পাচ্ছি। পাড় দুটো আবার দেখতে পাচ্ছি, আমি তখন মাঝ নদীতে পৌঁছে গেছি, উত্তর আর দক্ষিণ—দুদিক থেকেই সমান দূরত্বে। আমি আর এগোতে পারছি না। চিৎ হয়ে হাত পা না নাড়িয়ে ভেসে রইলাম কোনমতে। নদীর বিধ্বংসী শক্তি আমায় নীচে টানছে, স্রোত ঠেলছে দক্ষিণ পাড়ের দিকে। জানি এভাবে আর বেশিক্ষণ থাকতে পারব না, নদীর শক্তি আমাকে টেনে নেবে গভীরে। জীবন আর মৃত্যুর প্রান্তে দুলতে দুলতে দেখলাম এক ঝাঁক বেলে হাঁস উড়ে যাচ্ছে উত্তর দিকে। এখন শীত না গ্রীষ্ম? হাঁসগুলো কি এমনি উড়ছে না দেশান্তরিত হচ্ছে? বুঝতে পারলাম আমার হাত পা ক্রমশ শিথিল হয়ে আসছে, বুঝতে পারছি নদীর বিধ্বংসী শক্তির কাছে নিজেকে ক্রমশ সমর্পণ করছি, নদী আমার শরীরটা নীচে টানছে। সেই মুহূর্তে নদীর কলতান ফেটে পড়ল তীব্র গর্জনে আর বিদ্যুত চমকের মত একটা তীব্র আলোয় ঝলসে গেল আমার চোখ—তারপর সব অন্ধকার। একটু পরে আবার সম্বিত ফিরে পেলুম, আবার আকাশটা কাছে এগিয়ে আসছে, দূরে হারিয়ে যাচ্ছে, নদীর পাড়টা উঠছে নামছে। হঠাৎ একটা সিগারেট খেতে ইচ্ছে হল। এটা ঠিক ইচ্ছে নয়, একটা তীব্র তৃষ্ণা, ক্ষুধা। আর সেই সঙ্গে আমি যেন একটা দুঃস্বপ্ন থেকে জেগে উঠলুম। আকাশটা আবার স্থির হল, নদীর পাড়টাও আর উঠছে নামছে না, কানে আসছে পাম্পসেটের ফট্ ফট্ আওয়াজ, শরীরে আবার অনুভব করছি জলের শৈত্য। মনের উপর থেকে একটা কুয়াশার আস্তরণ সরে গেল, নদীর সঙ্গে আমার সম্পর্কটা নির্ণীত হয়ে গেল। জলে ভেসে রয়েছি অথচ আমি জলের শরিক নই। একটু আগে যদি মরে যেতাম তাহলে আমার জীবনটা শেষ হয়ে যেত ঠিক যেরকমটা হয়ে জন্মেছিলাম সেইরকম অবস্থায়—নিজের খুসিতে বেছে নেওয়া হত না কিছুই। আমি একটা সিদ্ধান্ত নিচ্ছি—আমি বেছে নিলাম জীবন। আমি বেঁচে থাকব কারণ কিছু মানুষ এখনো রয়ে গেছে যাদের সঙ্গে আমি যতদিন সম্ভব থাকতে চাই আর আমার এখনো অনেক কাজ রয়ে গেছে। জীবনের কোন অর্থ আছে কি না সে ব্যাপারে আমার কোন মাথা ব্যথা নেই। আমি যদি ক্ষমা নাও করতে পারি তবে যেন ভুলতে পারি। আমি বেঁচে থাকব জোর আর বুদ্ধি খাটিয়ে। প্রাণপণে হাত পা ছুঁড়ে শরীরটা জলের উপর ভাসিয়ে তুললাম। তখ নো যেটুকু শক্তি অবশিষ্ট ছিল তার সবটুকু উজাড় করে চিৎকার করলাম—'বাঁচাও! বাঁচাও!'

ভাষান্তর : সিন্ধবাদ

নাগুইব মাফুজ
মান্যবরেষু
(Respected Sir)

১

প্রকাণ্ড বড় ওই হলঘরটা আত্মপ্রকাশ করার জন্যই যেন দরজাটা খুলে গেল। যেন সব অর্থ, উপলব্ধি ও উদ্যমের এক বিশাল বিশ্ব, কিন্তু এক জায়গায় জমিয়ে তোলা অনেক খুঁটিনাটি বিবরণের তলায় চাপা পড়া চার দেওয়ালের অস্তিত্ব নয়। দেখেই তার মনে হল, তার আগে যারাই এই ঘরটায় ঢুকেছিল তারা সবাই এর পেটের মধ্যে সেঁধিয়ে গিয়ে, গলে গিয়েছিল। এবং যেহেতু তার চেতনা উদ্ভাসিত হয়ে উঠল, সে হারিয়ে গেল এক মায়াবী জাদুর জগতে। প্রথমে সে বিষয়টিতে মনোনিবেশ করতে পারছিল না সে ভুলেই গেল যে তার আত্মা কি দেখতে চাইছিল—ওই মেঝে, ওই দেওয়াল, ওই ছাদ- —নাকি টেবিলের পেছনে বসে থাকা সেই সর্বশক্তিমান ব্যক্তিকে। এক বিদ্যুতের শিহরণ খেলে গেল তার শরীরে—তার হৃদয় থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল ক্ষমতার উচ্চাসনে থাকা ব্যক্তিদের বর্ণময় জীবনের প্রতি তার উদ্দাম আকর্ষণ। ঠিক সেই মুহূর্তেই ক্ষমতার তীক্ষ্ণ সতর্কবার্তা। আহ্বান তাকে বাধ্য করল হাঁটু মুড়ে বসে আত্মবলিদান দিতে। কিন্তু সে অন্যদের মতই বিনয়, বশ্যতা ও নিরাপত্তার অপেক্ষাকৃত সহজ পন্থা অনুসরণ করল। নিজের ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগের আগে তাকে হয়ত এরকম অনেক শিশুসুলভ অশ্রু মোচন করতে হত। অদম্য এক আকর্ষণে সে টেবিলের ওপাশের ব্যক্তির দিকে ঈঙ্গিত পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকালো, কিন্তু পরমুহূর্তেই নিজের সত্ত্বার সবটুকু বিনয় দিয়ে তার দৃষ্টিকে অবনত করল।

প্রশাসনিক দপ্তরের প্রধান হামজা-অল-সুয়োমার নেতৃত্বে তারা এগিয়ে চলল মিছিল করে।

‘এরা আপনার নতুন কর্মী, মালিক। সে মহানির্দেশককে জানাল।

মহানির্দেশকের চোখ জরিপ করতে লাগল নতুন মুখগুলোকে এমনকি তাকেও দেখলেন তিনি। তার মনে হল যে সে সরকারের ইতিহাসের একটা অংশে পরিণত হয়েছে এবং সে আছে এক স্বর্গীয় উপস্থিতিতে। তার মনে হল যে, সে শুনতে পাচ্ছে এক আশ্চর্য ফিসফিস শব্দ। সম্ভবতঃ সে একাই এই শব্দ শুনতে পাচ্ছিল। সম্ভবতঃ এটা ছিল সেই বিধাতার নির্দেশ যখন মহানির্দেশক তাদের জরিপ করা শেষ করলেন, সে তখন মুখ খুলল। সে খুব ধীরে অথচ মৃদু স্বরে বলল, নিজের সত্ত্বাকে একটুও প্রকাশ না করে বললেন,

‘ওদের কি মাধ্যমিক শিক্ষার শংসাপত্র আছে? তিনি জিজ্ঞেস করলেন।

ওদের মধ্যে দু-জন উচ্চমাধ্যমিকে বাণিজ্য শাখায় উত্তীর্ণ হয়েছে, উত্তর দিলেন আল-সুয়োফি।

'পৃথিবী এগিয়ে চলছে', বেশ উৎসাহের ভাষায়ই বললেন মহানির্দেশক। "সবকিছুই পরিবর্তিত হচ্ছে। যেমন এখানে যোগ্যতামান প্রাথমিক শিক্ষার শংসাপত্র, তার বদলে আমরা পাচ্ছি উচ্চশিক্ষার শংসাপত্রধারীদের।"

এটা নিশ্চয়তার ওপরও বাড়তি কিছু। কিন্তু তারা আরও বিনয়ের আড়ালে এই আনন্দকে ঢেকে রাখতে চাইছিল।

'তোমাদের কাছ থেকে যতটুকু চাই, তোমরা ততটুকুই দাও,' তিনি বলে চললেন। 'সততা এবং কঠোর পরিশ্রমের দ্বারা।'

তিনি নামের তালিকায় তাদের নামগুলো দেখতে দেখতে, হঠাৎ জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের মধ্যে ওথমান বাইয়ুমি কে?'

ওথমানের হৃৎকম্প শুরু হল। এত লোকের মধ্যে থেকে মালিক শুধুমাত্র তার নাম উচ্চারণ করায় তার অন্তস্থল শিহরিত হল। চোখ না তুলেই সে এক পা সামনে এগিয়ে এসে জড়ানো গলায় বলল, মহানুভব, আমি।'

তোমার পরীক্ষার ফল দেখছি খুবই ভাল। তুমি তোমার শিক্ষা সমাপ্ত করলে না কেন?

বিভ্রান্তি কাটিয়ে উঠতে না পেরে সে চুপ করে রইল। সে জানত না যে এই প্রশ্নের কি উত্তর হওয়া উচিত। যদিও উত্তর দেবার সময় সে সচেতন ছিল।

প্রশাসনিক অধিকর্তাই উত্তর দিলেন তার হয়ে। "সম্ভবতঃ পরিস্থিতিই এর জন্য দায়ী, মহানুভব।"

আবার সে শুনতে পেল সেই আশ্চর্য ফিসফিস কথা। যেন তার ভাগ্যের গলার স্বর, তাকে লক্ষ্যে পৌঁছনোর আহ্বান জানিয়ে। আর এই প্রথমবার সে উপলব্ধি করল এক নীল আকাশের অনুভূতি, এবং এক আশ্চর্য কিন্তু মনোরম সৌরভ ছেয়ে ফেলেছে ঘরটাকে। তার পরিস্থিতির উল্লেখ তার কাছে ভীতিপ্রদ মনে হল না। এখন যেহেতু তার ওপর তার প্রভু, মহানির্দেশকের দয়া এবং নজর পড়েছে। তার মনে হল যে সে একাই একটা পুরো সৈন্যদলকে মোকাবিলা করতে পারে। সত্যিই তার এই তুরীয়ানন্দ অনুভূতি তাকে আরও পরে নিয়ে গেল, যতক্ষণ না তার মাথা আকাশে গিয়ে ঠেকছিল এক বন্য উদ্দামতায়। কিন্তু তার প্রভু, মহানির্দেশক, প্রশ্নোত্তর পর্ব শেষ করার ভঙ্গীতে, টেবিলের প্রান্তে দুই হাত রেখে বলল, "সুপ্রভাত, তোমাদেব ধন্যবাদ।"

নীরবে কোরাণের 'মসনদ' সুরা আওড়াতে আওড়াতে ওথমান ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

২

হে পরমেশ্বব, আমি যেন আগুনের লেলিহান শিখার মধ্যে আছি।

আগুনের শিখা আপাদমস্তক তার আত্মাকে গ্রাস করে নিচ্ছিল। তা যেন ওপর দিকে ঠেলে উঠছিল এক কল্পলোকের উদ্দেশ্যে। প্রকাশের এক লহমায় পৃথিবীকে তার

মনে হল এক উজ্জ্বল আলোর চমক। উন্মাদের মতই সে তাকে তার বুকে চেপে ধরল। সে সবসময় স্বপ্ন দেখত, আশা করত ঘোরের মধ্যে থাকত, থাকত হতাশা প্রত্যাশার জগতে। কিন্তু এই সময় সে প্রকৃতই আগুনের মধ্যে বসে ছিল। আর এই পবিত্র আগুনেই তাকে তার জীবনের অর্থ বুঝতে সাহায্য করল।

কিন্তু বাস্তবে এটা ঠিক হয়েছিল যে সে সংগ্রহশালা বিভাগেই যোগদান করবে। কিভাবে সে শুরু করল বা না করল সেটা ব্যাপার নয়। জীবনেরই সৃষ্টি হয়েছিল একটা ছোট্ট শেষ থেকে বা বলা যায় আরও ছোট কিছু থেকেও। সে তার কর্মস্থল মন্ত্রক ভবনের মাটির নীচের কক্ষে এসে ঢুকল। তখনও তার বিস্ময়ের ঘোর কাটেনি। তাকে সেখানে অভ্যর্থনা জানালো ঘরের অন্ধকার ও পুরোনো কাগজের গন্ধ। জানালা দিয়ে বাইরেব দিকে তাকিয়ে দেখল ঘরের উচ্চতা প্রায় তার সমান। ভেতরে তার সামনে ছড়িয়ে আছে একটা বিস্তৃত ঘর। তার দুদিকের দেওয়াল জুড়ে সারি সারি তাক, আবার মাঝখান দিয়ে চলে যাওয়া একসারি লম্বা তাক ঘরটাকে দুভাগে ভাগ করে দিয়েছে। প্রতিটি তাকের সারির মাঝখানে দেখা যাচ্ছে কর্মীদের কাজ করার একটা করে চেয়ার টেবিল। এক কর্মীর পেছনে পেছনে সে হাঁটতে শুরু করল একটা টেবিলের দিকে। ওই টেবিলটা হল সংগ্রহশালা বিভাগের প্রধানের। ওথমান তখনও তার স্বর্গীয় অনুপ্রেরণার উদারতা থেকে মুক্ত হতে পারেনি। এমনকি নিজের দপ্তরের আবহাওয়াও তাকে চেতনার জগতে ফেরাতে পারল না। সে উত্তেজনায় যুগপৎ বিমূঢ় ও আত্মমগ্ন হয়ে করণিকের পেছনে পেছনে হাঁটতে হাঁটতে চলল।

'মানুষের চাহিদা অসীম,' সে নিজের মনে বিড় বিড় করে বলল। করণিক তাকে বিভাগীয় প্রধানের সঙ্গে পরিচিত করিয়ে দিলেন।

'শ্রী ওথমান বাইয়ুমি, আমাদের নতুন করণিক, সে বলল, এবং তার কাছে বিভাগীয় প্রধানের পরিচয় দিল।

'আমাদের বড়কর্তা, শ্রী সাফান বাসয়ুনি।'

সে ভদ্রলোককে দেখে তার মনে হলো যে তিনি যেন তার অত্যন্ত পরিচিত একই পাড়ার লোক, যেন বাস একই গলিতে। বড়বাবুর গাল ও চিবুকের হাড়, কৃষ্ণবর্ণ ও গায়ের কোঁচকানো চামড়া এমনকি মাথার অবিন্যস্ত সাদা চুলকেও ওথমানের পছন্দ হল। যদিও তার সবচেয়ে ভাল লাগল বড়বাবুর বন্ধুত্বপূর্ণও দয়ালু চোখজোড়া যা আপ্রাণ চেষ্টা করেও কর্তৃত্ব ফুটিয়ে তুলতে পারছিল না। একমুখ ফাঁক ফাঁক কালো দাঁত আর কুৎসিৎ দর্শন অবয়ব নিয়ে লোকটি হেসে উঠল।

'সংগ্রহশালা দপ্তরে তোমায় স্বাগতম। এখানে বোসো,' একথা বলে তিনি তার নিযোগ সংক্রান্ত কাগজপত্র।

'জীবন-স্বাগতম! স্বাগতম!' সে নিজের মনে বলতে লাগল, "শুধুমাত্র দুটো শব্দ দিয়ে কি এর ব্যাখ্যা চলে স্বাগত ও বিদায়।' যদিও এখনও পর্যন্ত এটা অসীম, অনন্ত, ওথমান ভাবল। তার চারপাশ দিয়ে বয়ে যাচ্ছিল একটা আশ্চর্য বহস্যময় বাতাস। তাঁ যেন জীবনের সব সম্ভাবনায় পরিপূর্ণ।

এটা অসীম ও অনন্ত, সে আবার ভাবল। আর সেই কারণেই তার চাহিদা ছিল অদম্য ইচ্ছাশক্তির।

এর পর বড়কর্তা একটা রঙচটা, ফাঁকা টেবিলের দিকে নির্দেশ করলেন। এর ওপরের চামড়াটাও ছেঁড়া ও তাতে আবছা কালির ছোপ লেগে রয়েছে।

'তোমার টেবিল,' সে বলল। তবে চেয়ারটা সাবধানে পরীক্ষা করে নিও, কারণ ছোট পেরেকের একটা খোঁচাই তোমার নতুন পোষাকটার ভবলীলা সাঙ্গ করতে পারে।'

আমার পরিচ্ছদটা খুবই পুরোনো, যাই হোক', ওথমান উত্তর দিল।

বড়বাবু সতর্কীকরণের ভঙ্গিমায় বলে উঠলেন, 'আলমারীগুলো খোলার আগে ভগবানকে একবার ডেকে নিও। কারণ বিগত বাইরাম উৎসবের প্রাক্কালে পুরোনো দস্তাবেজের ফাঁক থেকে একটা তিনফুট লম্বা সাপ বেরিয়ে এসে ক্রমাগত ফোঁস ফোঁস করছিল। যদিও সেটা বিষাক্ত ছিল না।"

'কিভাবে বুঝবেন এর বিষ আছে কি নেই?' প্রশ্ন করল উদ্বিগ্ন ওথমান।

'তুমি বিভাগীয় ম্যানেজারকে জিজ্ঞেস করো। ওর বাড়ি সাপের শহর আবু রায়াস-এ।

ওথমান এই সতর্কবার্তাকে মজা মনে করে এড়িয়ে গেল। সে তখনও নিজেকে ভর্ৎসনা করছিল তার প্রভু অর্থাৎ মহানির্দেশকের ঘরের খুঁটিনাটি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে নিরীক্ষণ না করার জন্য আর মনের মধ্যে সবকিছু গেঁথে না নেওয়ার জন্য তার মনের মধ্যে এঁকে নিল ওই ব্যক্তির এক হুবহু প্রতিচ্ছবি। না এঁকে নেওয়ার জন্য ও এক আশ্চর্য জাদু যার প্রভাবে সে সবাইকে দমিয়ে রাখতে পারে না প্রভাবিত করতে পারে ও সবাইকে তার নির্দেশ মানতে বাধ্য করতে পারে তা উন্মুক্ত না করার জন্য। এই ক্ষমতাটা প্রায় পুজো করার মতই। এটা পরমা সৌন্দর্যও বটে। এটা মহাবিশ্বের গোপনীয়তাগুলোর একটা। পৃথিবীতে অসংখ্য স্বর্গীয় গোপনীয়তা আছে, কিন্তু তা তাদের কাছেই উন্মুক্ত যাদের উপলব্ধি করার ক্ষমতা আছে এবং ভাবার মত মন আছে। স্বাগত ও বিদায় এই শব্দ দুটোর অন্তর্বর্তীকালে অত্যন্তই সীমিত। আবার এটা অসীমও বটে। যারা এই সত্য অস্বীকার করে তারা নিপাত যাক। সেখানে আরও অনেকে ছিলেন যারা কখনই বিচলিত হল না। যেমন সাপান বাসয়ুনি। কাজের কিন্তু দুর্দশাগ্রস্ত. জ্ঞানকে সম্মান দেন কিন্তু তার থেকে এরা কোন শিক্ষাই গ্রহণ করেন না। আবার যাদের আত্মা পবিত্র আগুনের স্পর্শ পেয়েছে তাদের মতও নায়। সরকারী চাকুরীর পদোন্নতির অষ্টম স্তর থেকেই সুখের শুরু, আর তার শেষ মহানির্দেশকের পদে। সাধারণ মানুষের কাছে এটাই চরমতম উপযুক্ত পদ। এটাই তাদের কাছে সর্বোচ্চ স্বর্গ, যেখানে স্বর্গীয় করুণা ও মানুষের গর্ব একাকার হয়ে যায়। অষ্টম, সপ্তম, ষষ্ঠ, পঞ্চম, চতুর্থ, তৃতীয় দ্বিতীয় ও অবশেষ প্রথম। মহানির্দেশক, বত্রিশ বছর বয়সেই এই অঘটন ঘটতে পারে। অথবা হয়তো আরও বেশি। অসংখ্য মানুষ রাস্তার ধারে পড়ে আছে এখনও। এখনও পর্যন্ত যথাযথভাবে পালিত হয়নি কোন স্বর্গীয় নির্দেশ, অবশ্যই মানবতার জন্য, ব্যতিক্রম শুধু সরকারী কর্মচারী।

সময় তার হাত আঁকড়ে ধরে আছে শান্ত শিশুর মত। কিন্তু একজনের পক্ষে কখনই অন্যের ভবিষ্যত বলা সম্ভব নয়। সে জ্বলন্ত আগুনের মধ্যে ছিল আর সেটাই সব। যেন নক্ষত্রদের মতই তার বুকে জ্বলছিল আগুন। আমরা সেই রহস্যেরই অংশ যার গূঢ়তা রক্ষিত আছে সবারই মধ্যে।

'প্রথমে তোমাকে এখানে আসা। চিঠিগুলো নাড়াচাড়া করতে শিখতে হবে', বললেন শ্রীবাসয়ুনি। এটা বেশ সহজ। তারপর হাসতে হাসতে বললেন কাজের শুরুতেই সংগ্রহশালার কর্মচারীর জ্যাকেট খুলে রাখা উচিৎ। নাহলে হাতাতে দুটো কাপড়ের টুকরোই যথেষ্ট, যাতে ধুলোবালি বা পিনের খোঁচা না লাগে। সবকিছুই ছিল বেশ সহজ। কিন্তু সত্যিই কঠিন ছিল সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলা।

৩

তাব এক কামবার ফ্ল্যাটেই সে নিজেকে বিশ্লেষণ করতে পারত। সেখানে তার জীবন তার সামনে এক বিশেষ রূপ পরিগ্রহ করত। সে সবসময় তার ইন্দ্রিয়গুলোকে সজাগ রেখে, উচ্চ সচেতনতা নিয়ে থাকত। নিরবচ্ছিন্ন ভাবে নিজেকে তৈরী রাখত সম্ভাব্য সবরকম আক্রমণের মোকাবিলার জন্য। তার ঘরের ছোট্ট জানালা দিয়ে দেখতে পেত তার জন্মস্থান; সেই আল-হুসায়েনী গলি, যেটা তার দেহ ও আত্মার বর্ধিত অংশও বটে। সামনে তীক্ষ্ণ বাঁক নেওয়া এক দীর্ঘ সড়ক, যেটা বিখ্যাত ছিল গোরুর গাড়ি রাখাব জায়গা হিসেবে। গাধার পিঠে জলও বয়ে নিয়ে যাওয়া হত এই রাস্তা দিয়েই। যে বাড়িটায় সে জন্মেছে ও বড় হয়ে উঠেছে তা গুড়িয়ে দেয়া হয়েছিল। জায়গাটা এখন নেহাৎই ছোট, ছোট্ট একটা ফালির মত, রাখা থাকে অগুনতি ঠেলাগাড়ি। এই গলির খুব কম বাসিন্দাই কবরে না গিয়ে গলি ছেড়েছিল। তারা কাজ করতে গিয়েছিল বিভিন্ন চত্বরে; আল-মারয়াদা, আল দররাসা আল সিক্কা ও আল জাদীদা। এরা বাইরেও গিয়েছিল অনেকেই। কিন্তু দিনের শেষে এরা গলিতে ফিরে আসবেই। গলিটার বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে এখানে ফিসফাস-চুপচাপ কোন শব্দ ছিল না। কথাবার্তা হত সবসময় উচ্চগ্রামেই, কখনও রূঢ়। কখনও বা জ্ঞানগর্ভ যখন যে রকম। এদের মধ্যে একজন তার খুব কাছের মানুষ ছিল। কর্কশ ও চড়া স্বরের সেই মানুষটিকে বয়সও দুর্বল করতে পারেনি।—তার বাড়িউলী ওম হুসনি। সত্যিই, অনন্তের স্বপ্ন অত্যন্ত ক্লান্তিকর। কিন্তু গত কাল সে কি ছিল আর আজ কি হয়েছে? অসম্ভব কিছু থেকে নিজেকে গুটিয়ে না নিলে সে নিশ্চয়ই ভালই করবে। নির্দিষ্ট পরিকল্পনা ছাড়া বর্তমান ঘটনাপ্রবাহের কাছে সে নিজেকে সমর্পণ না করলেই ভাল করত। সঠিক পরিকল্পনা। সে কখনও স্বপ্ন দেখে যে সে মূত্রত্যাগ করছে। কিন্তু ঠিক সময়েই জেগে ওঠে সে। এর মানে কি? ওম হুসানি তার মায়ের সহযোগী ছিলেন, বরং আরও বেশি কিছু, সারা জীবনের সঙ্গী ও সহচরী। দুজনেরই বিয়ে হয়েছিল গাড়োয়ানের সঙ্গে এবং দুজনেই দাসীবৃত্তির দ্বারা জীবন যাপন করত। পিঁপড়ে যেমন খাদ্য সংগ্রহের জন্য কষ্ট করে তাবাও সে রকম কষ্ট করত দু-একটি রৌপামুদ্রা অর্জনের জন্য। তাতে তাদেব স্বামীদের সাহায্যও হত আর একান্নবর্তী

পরিবারের দেখভালও চলত। তারা ফেরিওয়ালা, চুল বাধিয়ে, ঘটক ইত্যাদি অনেক পেশাই তারা পরখ করে দেখেছিল। তার মা জীবনের শেষ দিনটি পর্যন্ত কাজ করে গিয়েছিলেন। ওম হুসনি বেশ গর্বের সঙ্গেই বড় বড় জায়গায় দাসীবৃত্তি করত। সে অনেক ভাগ্যবতী ছিল এবং তার মায়ের তুলনায় রোজগারও করত বেশি। ফলে তিনতলা বাড়ির জন্য সঞ্চয় করেছিল অনেক অর্থ। তার একতলায় ছিল একটা কাঠের দোকান আর অন্য তলাগুলির একটাতে ওম হুসনি আর একটাতে ওথমান বাস করত। নিজের ছেলের জন্য হুসনি তার যুদ্ধ ও কষ্টের দিনগুলোতে দূরে একটা জমি কিনে ছেলেকে বসবাসের ব্যবস্থা করে দিয়েছিল। সেখানেই সে বাস করা শুরু করে। পিছনে শুধুমাত্র সে তার নামটাই রেখে গিয়েছিল।

তার কি স্বপ্ন দেখার অধিকার নেই? স্বপ্ন সে দেখেছে। পবিত্র আগুনকে ধন্যবাদ কারণ তা তার হৃদয়কে দগ্ধ করেছে। ধন্যবাদ তার ছোট্ট ঘরটাকেও। বিছানায় শুয়ে শুয়ে সে স্বপ্নরাজ্য চলে যেত। আসন আলমারী মাদুর এবং সেই প্রসঙ্গে তার নিজের গলার স্বরও, তা কখনও ক্ষীণ-ও তীক্ষ্ণ কখনও সুরেলা, তা প্রতিধ্বনিত হত অন্ধকার বা কঠিন দেওয়ালে।

গতকাল সে কি ছিল? তার বাবা তাকে নিজের মত গাড়োয়ান তৈরী করতে চেয়েছিল। কিন্তু স্থানীয় মাদ্রাসার শেখ তাকে বললেনঃ

"আল্লাহ ওপর বিশ্বাস রাখ শ্রীবাইয়ুমি আর সেই সঙ্গে ছেলেটাকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি করে দাও।"

বাবার ঠিক বোধগম্য হল না।

"প্রার্থনা করার মত কুরান কি সে শেখেনি?'—বাবা জানতে চাইল।

"ছেলেটা বুদ্ধিমান ও চটপটে। একদিন সে সরকারী কর্মচারী হতে পারে' শেখ বললেন।

বাইয়ুমি একটা অবিশ্বাসের হাসি হাসল।

"অথবা কোনও খয়রাতী-র স্কুলে চেষ্টা কর, তারা বিনা বেতনেই তাকে ভর্তি করে নেবে," শেখ বললেন।

বাইয়ুমি কয়েক মুহূর্ত ইতস্ততঃ করতে লাগলেন। কিন্তু ঘটনাক্রমে একটা অদ্ভুত ব্যাপার ঘটল। প্রাথমিক শিক্ষার শংসাপত্র পাওয়া অবধি ওথমান বিদ্যালয়ে আশ্চর্যজনক সাফল্য পেল। গালিতে বসবাসকারী তার খালি পায়ের খেলার সাথীদের থেকে সে বেশ এগিয়ে ছিল এবং তার কম্পমান ও উদবেলিত হৃদয় থেকে আসা প্রথম পবিত্র চমকে সে সঠিকভাবে সচেতন হল। সে নিশ্চিত যে তার চলার পথে ভগবানের আশীর্ব্বাদ আছে। আর সেই কারণেই তার সামনে অনন্ত দীর্ঘ পথ উন্মুক্ত। সে আবার একটা বিনা বেতনের মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হল এবং এখানেও সে চূড়ান্ত সাফল্য পেল। কিন্তু এটা তার প্রতিবেশীরা বিশ্বাস করতে পারেনি যখন সে দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র তখন তার বাবার একটা কালান্তক অসুখ হলো। ছেলের মতিগতি দেখে তার বাবাও খুব হতাশ হয়ে পড়লেন

"তোমাকে অসহায় ছাত্র হিসেবে রেখেই আমাকে চলে যেতে হচ্ছে, সে তার ছেলেকে বলল। 'ঠেলাটাই বা কি চালাবে আর পরিবারটাকেই বা কে দেখবে?"

এক দুঃখী মানুষ হিসেবে তার বাবা মারা যান। কিন্তু তার মা দ্বিগুণ পরিশ্রম করতে লাগলেন কারণ তাঁর বিশ্বাস ভগবান একদিন তার ছেলেকে এক মহান মানুষ তৈরী করবে। ভগবান কি সর্বশক্তিমান নন? তার মায়ের অকালমৃত্যু না হলে ওথমান হয়তো তার উচ্চশিক্ষা শেষ করতে পারত। তার ইচ্ছা ছিল আকাশচুম্বী এবং আর বেশি কারণ আকাঙ্ক্ষা সম্পর্কে তার উচ্চ-সচেতনতা, এবং পবিত্র উচ্চাশা তার হৃদয়ে আলোড়ন সৃষ্টি করত। তার পিতামাতার স্মৃতিও তার কাছে খুব পবিত্র ছিল। প্রতিটি ধর্মীয় অনুষ্ঠানেই সে তাদের কবরে গিয়ে শ্রদ্ধা জানাত, দুই নিঃস্ব মানুষের উন্মুক্ত কবর, পড়ে আছে একফালি জমিতে একঝাঁক বিস্মৃত লোকের মাঝখানে। এখন সে একা। গাছের একটা কেটে ফেলা শাখার মত। তার বড় ভাই ছিল এক পুলিশকর্মী। এক বিক্ষোভ সামাল দিতে গিয়ে মৃত্যু হয় তার। টাইফয়েডে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালের অলিন্দে মৃত্যু হয় তার বোনের। অন্য ভাই মারা যায় কারাগারে। তার পারিবারিক স্মৃতি তার কাছে বেদনাদায়ক। কত দুঃখেই না সে তার মা বাবাকে স্মরণ করে। শ্রদ্ধা ও ঘৃণা মিশ্রিত এক দুরন্ত নাটকের মধ্যে সে এই ঘটনাগুলোর মেলবন্ধন ঘটিয়েছে! ইচ্ছাশক্তির সংঘাতের মাধ্যমে এবং অজানা শক্তির প্রভাবে ওই গালিতেই নির্ধারিত হচ্ছে ভাগ্য এবং তারপর, তারপর তা বিলীন হয়ে যাচ্ছে অনন্তে। এইটুকু সম্বল করেই তার নিজের সম্পর্কে বিশ্বাস ছিল অসীম এবং শেষ পর্যন্ত তার ভরসাস্থল ছিলেন সর্বশক্তিমান ঈশ্বর। সেই একই কারণে কখনও সে প্রার্থনা বাদ দিত না। প্রতি শুক্রবার সে আল হুসোনি মসজিদে নামাজ পড়তে যেত। তার গলির অন্যান্যদের মত সে জীবন ও ধর্মের মধ্যে কোন ফারাক দেখত না। ধর্ম জীবনের জন্য ও জীবন ধর্মের জন্য। এক উজ্জ্বল রত্ন মহানির্দেশকের পদের মত যেন স্বর্গীয় পথের দিকে এক অপরূপ বিশ্রামস্থল। সে উজ্জ্বলও অনুভূতি প্রবণ হয়েই তার সহকর্মীদের মধ্যে থাকত। যে ধারণাগুলো সে তৈরী করত সেগুলো ছিল তার কাছে খুবই প্রয়োজনীয়। এর পরে সে নিজেকে নিয়োজিত করত ভবিষ্যত পরিকল্পনার জন্য। এগুলোকে সে কাজে রূপান্তরিত করত এবং প্রতিদিন সকালে কাজে যাওয়ার আগে এগুলো ঝালিয়ে নিত।

কাজ ও জীবন ধারণের পরিকল্পনা

(১) যত্ন এবং সততার সঙ্গে কর্তব্য সমাধান।

(২) পবিত্র পুঁথির মত করে টাকাপয়সার হিসেব গুলো দেখা।

(৩) বহিরাগত ছাত্রের মত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি পাওয়া।

(৪) ইংরাজী ফরাসী ও আরবী ভালভাবে পড়া।

(৫) সাধারণ জ্ঞানের ভাণ্ডার বাড়ানো, বিশেষত যেগুলো সরকারী কাজে লাগে।

(৬) দয়া ও করুণার সঙ্গে সঙ্গে কঠোর পরিশ্রম প্রদর্শন করা।

(৭) কর্ম কুশলতা প্রদর্শন করে উর্ধ্বতনদের কাছে থেকে নিশ্চয়তা ও বন্ধুত্ব পূর্ণ সম্পর্ক অর্জন।

(৮) আত্মমর্যাদা বিসর্জন না দিয়ে প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধে অর্জন। উদাহরণ স্বরূপ, ক্ষমতা প্রয়োগ করে কাউকে সাহায্য করা প্রয়োজনীয় বন্ধুত্ব স্থাপন, সামাজিক মর্যাদার জন্য বিবাহ্ করা।

সে মাঝে মাঝেই একটা ছোট আয়নার দিয়ে তাকিয়ে থাকত। সেটা জানলা ও আলনার মাঝের দেওয়ালে পেরেক দিয়ে আটকানো ছিল। নিজের উপস্থিতি পরীক্ষা করে আশ্বস্ত হওয়ার জন্য সে এখানে দাঁড়াত। অবশ্যই তার উপস্থিতি কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারে না। তার গালির বাসিন্দাদের মত সেও স্বাস্থ্যবান ছিল। তার মুখটা ছিল কালো ও লম্বা, ছিল চওড়া কপাল আর সুন্দর করে আঁচড়ানো চুল। সব দিক থেকেই চেহারাটা যেকোনো পদের উপযোগী। তা প্রয়োজন সে যাই হোক না কেন।

সে অন্তরের অন্তস্থল থেকে এক শক্তি অর্জন করে ভাবল,

"শুরুটা মন্দ হয় নি—পথ অনন্ত'।

৪

পতিত জমির প্রান্তভাগের সংযোগকারী অংশটিও ছিল পবিত্র। সে উদ্বেল হৃদয়ে সেই দিকে গেল। তার এমন আনন্দ হচ্ছিল যে মনে হচ্ছিল তার জীবন অনেকটাই ভারমুক্ত। মরুভূমির প্রান্তে ছিল একটি প্রাচীন, পরিত্যক্ত ঝর্ণা, যার সিঁড়িতে অপরাহ্নের অসীম সময়ের কোলে তারা পাশাপাশি বসতে পারত। তাদের সামনে থেকে শুরু করে পাহাড়ের পাদদেশ পর্যন্ত, বিস্তীর্ণ ছিল মরুভূমি। এবং নীরবতা মূর্চ্ছনা তুলছে এক অজানা ভাষায়। তার গাঢ় বাদামী গাত্রবর্ণ ছিল অনেকটা উত্তেজক সন্ধ্যার মত- যা উত্তরাধিকার সূত্রে মিশরীয় মাও ন্যুবিয় বাবার কাছ থেকে পাওয়া। ছ'বছর বয়সেই তাঁর তাকে ছেড়ে পরলোকে পাড়ি দেন। তাদের সেই প্রাচীন যোগসূত্র ঐ গলিতে সুদূর অতীতের উদ্দেশ্য পাড়ি দিল এবং তারপরই মিলিয়ে গেল জীবনের উৎপত্তিস্থলে। যখন সে তার বড় বড় আয়ত চোখের দিকে দেখল, তার বিস্ফারিত চোখ দেখল তার প্রাণচঞ্চল্যে ভরপুর ছোট্ট সুঠাম দেহ্লীকে—সে বুঝল যে সে কোন এক বিশেষ আদর্শে উদ্ভাসিত আর এই ভাবনাতেই উত্তেজিত হয়ে উঠল তার সমস্ত সত্ত্বা এক বিনীত প্রত্যাশায় পরিপূর্ণ করে তুলল তাকে। সে ছিল তার ছোটবেলার বন্ধু গলি ও ছাদে খেলার সঙ্গী। যদিও সে মেরেকেটে ষোড়শী কিন্তু গৃহবধূ হিসেবে তাকে বেশ ভালই মানাত। আসলে, তার অন্য সাত বোনের বিবাহের পর সেই ছিল তার মায়ের সমস্ত কাজেব একমাত্র সহযোগী।

সৈয়দা হাসল। তার মুখে সারাক্ষণই হাসি লেগে আছে, চোখদুটো উজ্জ্বল. অক্লান্তভাবে তার হাত দুটো খেলা করত শূন্যে। শুকনো হাওয়ায় তার একঢাল কালো চুল এমনভাবে দোল খেত যে মনে হয়, যেন পাহাড় থেকে ঝরণা নেমে আসছে। নীরবতা ছিল মধুর। নীরবতা ভেঙে সে বলল,

'তুমি সবকারী চাকুরী পাওয়ায় আমার মা খুব খুশি...'

'আর তুমি' সে দুষ্টুমি করে বলল।

মেয়েটি যেন হাসিতে ফেটে পড়ল, কিন্তু কোন উত্তর সে দিল না। ছেলেটি তার হাত দিয়ে মেয়েটির গলা জড়িয়ে ধরল, দুটো ঠোঁট একসঙ্গে মিশে গেল ছেলেটির ঠোঁটের প্রান্তসীমায় হারিয়ে গেল মেয়েটার ঠোঁট। তবে ভালবাসার কোন কথাই উচ্চারিত হয়নি তাদের মধ্যে। কিন্তু যখনই তারা দুজনে একসঙ্গে আলাদাভাবে থাকত তখন তারা চুম্বন ও আলিঙ্গনের মাধ্যমেই নিজেদের পরস্পরের কাছে প্রকাশ কবত। তার মন তুচ্ছ সুখ দুঃখে খুশি ছিল বলে মেয়েটিও খুব আনন্দে ছিল। সে তাকে নিজের মন দিয়েই ভালো বেসেছিল। সে সর্বদাই তার গুণেব প্রশংসায় পঞ্চমুখ ছিল, তার দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধ ইত্যাদি ছাড়াও তার মনে হত মেয়েটি তাকে ভবিষ্যতে সুখী করতে পারবে।

'তুমি এখন একজন সরকারী কর্মী...' তার কণ্ঠস্বরে শ্রদ্ধা প্রকাশ পেল। ছেলেটি আবারও তাকে চুম্বন কবল। আমাদের গলি থেকে আর কেউ এই সম্মান অর্জন করতে পারেনি।

তার সব বন্ধুরাই বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন কায়িক শ্রমের সঙ্গে যুক্ত। তারা সবাই তাকে কাজে যেতে দেখতে পায় এবং যখনই দেখে হয় শ্রদ্ধার সঙ্গে বা ঈর্ষার সঙ্গে। এটা তাকে খুশি করতে পারত নিশ্চয়ই কিন্তু সে প্রকৃতভাবে ও তিক্ততার সঙ্গে সচেতন ছিল যে তার সামনে পড়ে এক আছে এক দুরূহ পথ।

'তুমি একমাত্র উচ্চপদস্থ কর্মচারী'।

'আমাদের গলির বাইরে এর কোনই মূল্য নেই,' সে শান্তভাবে বলল।

'বাইরেটা কোনও ব্যাপার নয়। আমাদের গালিটা ঠেলাগাড়ির আস্তানা বই তো নয়।'

সে তৃতীয় বাব তাকে চুম্বন করে বলল, 'ঠেলাগাড়িকে অশ্রদ্ধা করো না।'

'দারুণ বলেছ। সত্যিই তোমার তুলনা নেই...'

তার ভাই—এর মত বাবাও বিক্ষোভ প্রদর্শনের সময় গ্রেপ্তার হন। জেলে থাকাকালীন আঘাতজনিত কারণে তার মৃত্যু হয়। যাই হোক এই ঘটনা খুবই বীরের মর্যাদা দিয়েছিল তাঁকে এবং তাদের গলিটাও রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে উঠেছিল। কিন্তু সৈয়দার মনে স্বাভাবিকভাবেই একটা জিনিস দানা বেঁধেছিল সেটাকে কোনভাবেই উপেক্ষা কবা সম্ভব ছিল না। সেখান থেকেই সে প্রশ্ন কবেছিল :

'আর তারপর?'

ওথমান তার প্রত্যাশা সম্পর্কে সম্পূর্ণভাবে সচেতন ছিল। সে জানত যে তার একটা কথাই সৈয়দার হৃদয়াবেগ শান্ত করে তাকে আপ্লুত করতে সক্ষম। সে আরও জানত যে তার খুশি কখনও তার প্রণয়িনীর আনন্দকে ছাপিয়ে যেতে পারবে না। তার পরিমাণ অনন্তও হতে পারে। তাদের একে অপরের প্রতি ভালবাসা ছিল একই রকম এবং কেউ কেউকে ছাড়া চলতে পারত না। কিন্তু তা সত্ত্বেও সে ভয় পেত। যদিও হাজারবার সে ভেবেছে এই কথা। তাকে তার সেই অসহ্য কর্মতালিকার দোহাই দিতে হয়েছে। কিন্তু আবারও তার নিজের জীবনের দিকে ফিরে তাকাতে হয়েছে—যা তাকে একই সঙ্গে অভিবাদনও জানিয়েছে আবার দ্বন্দ্বযুদ্ধের অবতীর্ণ হওয়ার ডাক দিয়েছে।

'তুমি কি বলতে চাও সৈয়দা?'

'কিছু না।' সে সরল ভাবে বললেও, তার ভেতরে ভেতরে একটা জেদের লক্ষণ ফুটে উঠেছিল।

'ভুললে চলবে না আমরা এখনও তরুণ...'

'আমি?' সে হালকা প্রতিবাদ করল। যা খুব মধুরভাবে তার অন্তর্নহিত নারীত্বের যন্ত্রণাকে প্রকট করে তুলল। 'একটা গোঁফ রাখ—এখন ওটাই তোমার প্রয়োজন।'

সে সৈয়দার ঠাট্টাকে বেশ তলিয়ে ভাবতে শুরু করল আর ভাল যে লড়াইয়ে এটাই হবে তার একমাত্র হাতিয়ার। গোঁফ ছাড়া কোন উচ্চপদস্থ কর্মীকে কি ভারিক্কি লাগে?

'সৈয়দা, আমি কিন্তু আমার পড়াশুনো চালিয়ে যাব।'—সে শান্তভাবে বলল।

'একটা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপ দরকার।'

'কিসের জন্য?'

পদোন্নতির জন্য খুবই জরুরী।'

তোমার কতদিন লাগবে তাহলে?'

'কম করে আর চার বছর তো বটেই।'

সৈয়দার দিকে একঝলক তাকিয়েই ওথমান বুঝতে পারল যে, সে যতই হিমশীতল দৃষ্টান্ত তার দিকে তাকাক না কেন এক চাপা যন্ত্রণায় তার হৃদয় ছারখার হয়ে যাচ্ছিল। —হয়ত বা সে চাউনিতে কিছুটা লজ্জা ও রাগও মিশ্রিত ছিল।

'তোমার আর পদোন্নতির প্রয়োজন কিসের?'

ওথমান মিষ্টি হেসে সৈয়দার চুলে চুম্বন করল, কিন্তু সাহস করে আর বেশি এগোতে পারল না। তার চুলের সুগন্ধ ওথমানকে তার ছোটবেলার স্মৃতির সরনিতে ফিরিয়ে দিল। অতীত যেন একধাক্কায় ফিরে এল মনে পড়ল সেই দিনগুলোর কথা যখন তারা দুজনে বিয়ে বিয়ে খেলত। ঠিক তখনই পাহাড়ের চূড়ায় সন্ধ্যা নেমে এল। দূর থেকে ভেসে এল কলের গান।

হঠাৎ নিস্তব্ধতা দেখে ভেঙে ভেসে এল সৈয়দার গলা—তাহলে পদোন্নীতির ব্যাপারটা আমি যতটা ভেবেছিলাম তার চেয়েও বেশি জরুরী... .

ওথমান তার হাত দুটো নিজের হাতে নিয়ে অস্ফুটে বলল ঃ

'আমি তোমায় চিরদিনই ভালোবাসব...'

সে যা বলেছিল সত্যিই বলেছিল যদিও তার সঙ্গে মিশেছিল এক বিষণ্নতা ও দুঃখের বোধ..., সে নিজেকেই ঘৃণা করতে শুরু করেছিল। সে নিজের মনে বলল জীবনটা এক বিশাল ও বিচিত্র অভিজ্ঞতায় পূর্ণ। কিন্তু কিছুটা ক্লান্তিকরও বটে।

৫

অগুনতি কবরের ভীড়ে প্রায় হারিয়ে যাওয়া তার মা-বাবার কবরের সামনে এসে দাঁড়াল ওথমান। শ্রদ্ধা জানল কোরাণ থেকে সূরা আবৃত্তি করে। তার পর ঈশ্বরের কাছ থেকে দোয়া প্রার্থনা করল তাদের জন্য।

তারপর কৃতজ্ঞচিত্তে ফিসফিস করে কথা বলতে লাগল।

'ওথমান এখন একজন দায়িত্বশীল সরকারী কর্মচারী সে অবিচলভাবে এগিয়ে চলেছে এক কঠিন লক্ষ্যের দিকে সে এর শেষ দেখেই ছাড়বে। সে মাথা ঝুঁকিয়ে বিনয়ের সঙ্গে বলল।

'আমি যা কিছু ভালো কাজ করেছি তা ভগবান ও তোমাদের জন্যই।'

এক অন্ধ বালক কোরাণের কয়েকটি সূরা আবৃত্তি করছিল ঠিক গোরস্থানের প্রবেশদ্বারটির সামনে দাঁড়িয়ে। ওথমান তাকে আধ-রৌপ্যমুদ্রা দিল। যদিও তুচ্ছ কিন্তু সে যখনই কাউকে কিছু টাকাপয়সা দেয় তখনই তার মনে বিরক্তির ভাব জেগে ওঠে। বালকটি চলে যেতেই সে আবার তার মা-বাবার সমাধি ক্ষেত্রে-র দিকে ফিরল,

'ভগবানের নামে আমি শপথ করে বলছি যে তিনি যখন উপযুক্ত সময় দেবেন তখন আমি আপনাদের জন্য একটা সুন্দর নতুন সমাধিক্ষেত্র তৈরী করব।'

যদিও তার কোন ধারণাই ছিল এতদিন বাদে তার পিতামাতার দেহাবশেষের কতটাই বা অবশিষ্ট আছে। তার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, কিছু না কিছু, নিশ্চয়ই টিঁকে আছে। তাকে চমকে দিয়ে তার চিন্তাসূত্র সৈয়দার মধ্যেও প্রতিফলিত হল। আর তার চোখের সামনে সৈয়দার এক হাস্যোজ্জ্বল মূর্তি ফুটে উঠল। এটা তার মনে হল সে যেন ব্যঙ্গভরে তীক্ষ্ণ মন্তব্য করতে চলেছে। সমস্ত হৃদয়টা তার যন্ত্রণায় কুঁকড়ে গেল, সে ফিসফিসিয়ে বলল,

'হে ঈশ্বর, আমার সোজা পথ দেখাও, আমি তো যা কিছু করি সবই তোমার অনুপ্রেরণায়।'

সে আবার ফিরে গেল তার বাবার শেষ দিনগুলিতে, একে এড়ানোর কোন উপায়ই তার হাতে ছিল না। অসুস্থতা ও বার্ধক্য জনিত অসুস্থতা তাঁকে প্রায় পঙ্গু করে দিয়েছিল। তার একমাত্র বিনোদন ছিল বাড়িব সামনে ভেড়ার চামড়ার আসনে বসে থাকা। শ্রবণ ও দৃষ্টি ছিল না বললেই চলে। অসহায়তায় মাঝে মাঝে সে চীৎকার করে বলত,

'ভগবান দয়া কর।'

বয়সকালে সে ছিল ওই গলির সবচেয়ে সমর্থ পুরুষ। সাবা জীবন ধরে সে তার বাহুবলও পেশীশক্তির ওপরই নির্ভর করে এসেছে। এক ফোঁটা বিশ্রাম না নিয়ে চূড়ান্ত উদ্যমের সঙ্গে দারিদ্র্য সত্ত্বেও কাজ করে গেছে। আর এই দারিদ্র্যের কারণেই সে ক্রমশঃ হীনবল হয়ে পড়ছিল, আর তা বুঝতে পেরেই সে যেন মাঝে মাঝেই অকারণে অট্টহাস্যে ফেটে পড়ত। একদিন সন্ধ্যেবেলায় তাঁর মৃতদেহ পাওয়া গেল ঠিক সেখানে, যেখানে সে ভেড়ার চামড়ার ওপর বসে থাকত। কেউই জানতে পারল না মৃত্যু কিভাবে তার কাছে এসেছিল বা সে কিভাবে মৃত্যুর দেখা পেয়েছিল। তার মায়ের মৃত্যুটা তার কাছে আরও বেদনাদায়ক। একদিন কাপড় কাচার সময় তার সমস্ত শরীরটা হঠাৎ বেঁকে যায়। তীব্র কাঁপতে থাকে সারা শরীর। একটা অ্যাম্বুলেন্সে করে তাঁকে কাসর-আল-আইনি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। আর ঠিক তার পরেই অ্যাপেণ্ডিসাইটিস অস্ত্রোপচারের সময় তিনি মারা যান।

মৃত্যু একে একে হানা দেয় তার পরিবারের অন্য সদস্যদের ওপর। হয়তো এই কারণেই তার অন্তরাত্মা তাকে বলছিল যে সে দীর্ঘজীবি হবে। একটা কষ্টের ঢেউ তার ওপর দিয়ে বয়ে গেল। প্রতিটি মৃত্যুই তার ভাই-এর মৃত্যুর সঙ্গে তুলনীয়। তার পুলিসকর্মী ভাইএর চেহারাটা ছিল এক পূর্ণবয়স্ক ষাঁড়ের মত। কর্তব্যরত অবস্থায় বিক্ষোভকারীদের ছোঁড়া ইটের আঘাতে তার মৃত্যু হয়। আহা কি অদ্ভুত মৃত্যু সে জানল না কেই বা তার হত্যাকারী আর ঘাতকও জানল না কাকে হত্যা করল সে। ওথমানের মনে হত ঘটনাটা যেন এক হতবাক প্রত্যক্ষদর্শীর বয়ানমাত্র। ঘটনার আকস্মিকতা তাকে প্রায় চেতনাহীন করে তুলেছিল। সত্য; ইতিহাসের ঘটনা প্রবাহ থেকে সে শিখল অনেক কিছুই। প্রধানতঃ প্রাচীন ইতিবৃত্ত থেকে শুরু করে যুদ্ধের প্রাক্কালের অনেক ইতিহাসও সে জানল। আরও জানতে পারল বিপ্লব সম্বন্ধে যদিও সেই সময়ে সে জন্ময়ানি বা অংশগ্রহণও করেনি। সে বিভিন্ন ঘটনা দেখত বা শুনত কিন্তু পুরোপুরি উদাসীনভাবে। সে ওই ঘটনাগুলির প্রতি আকর্ষিত হলেও যুদ্ধক্ষেত্রে তাকে আকর্ষণ করত না। রাজনৈতিক নেতারা যে দলাদলি হানাহানি করতেন তা দেখে তার বাকশক্তি রুদ্ধ হয়ে যেত। সারাটা জীবনই তার কেটেছে দারিদ্র্য ও ক্ষুধার সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে। বাইরের জগত সম্বন্ধে চিন্তা করার অবকাশ হয়নি তার। এই গলিতেই সে আবদ্ধ ছিল, কেউ জানত না তার কোন খবর, বন্য, হিংস্র ও অনন্ত। আজ সে তার লক্ষ্য সম্পর্কেই শুধু সচেতন। যা একই সঙ্গে পবিত্র ও কলুষিত কিন্তু সে নিরুপায়, কারণ তার দৃষ্টিপথে অদ্ভুত অদ্ভুত ঘটনা ঘটছে রাজনীতিতে। সে নিজেকে বোঝাল অন্তর্নিহিত সত্ত্বাটাই মানুষের আসল জীবন। যা তার প্রতি হৃদসম্পদনকে নিয়ন্ত্রণ করছে, আর তাকে করে তুলছে পরিশ্রমী কর্তব্যপরায়ণ ও উদ্যমী। এর কিছুটা পবিত্র কিছুটা ধর্মীয় আর এর মাধ্যমেই সে হবে এক স্বয়ংসম্পূর্ণ মানুষ যার রাষ্ট্র বা সরকার নামক এক পবিত্র যন্ত্রের উপকারে লাগাবে। এর মাধ্যমেই মানুষের যশ প্রতিষ্ঠা হয় পৃথিবীতে আর তার মাধ্যমেই মানুষের আশাআকাঙ্ক্ষা উন্নীত হয় আরও উচ্চমার্গে। মানুষ প্রশংসা করেছিল আবার উল্টো কথাও বলেছিল। কিন্তু লোকগুলো ছিল বোকা। সে মহানির্দেশকের ঘর নিরীক্ষণ না করার ব্যাপারে নিজেকে কিছুতেই ক্ষমা করতে পারছিল না।—আর মহানির্দেশকের ব্যক্তিগত সত্ত্বা যা পর্দার পেছন থেকে গোটা দপ্তরটাকে চালাচ্ছিল তা লক্ষ্য না করার জন্য সে পাগল হয়ে উঠছিল। ওই ক্ষমতা ছিল সংক্ষিপ্ত ও সুশৃঙ্খল, যা তাকে মনে করাত মহাবিশ্বের নগণ্য তারাগুলিকে। সে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলল। সে ফাতিহা আবৃত্তি শুরু করল আবার আর বিদায় নেবার ভঙ্গীতে বলল "বাবা আমার জন্য দোয়া প্রার্থনা করুন। সমাধিক্ষেত্রটা ঘুরে সে আরেকটি সমাধি ফলকের সামনে দাঁড়াল, যার দুটো প্রস্তরখণ্ড ভেঙে গিযেছিল আর কোণটাও ভেঙে গিয়েছিল আর বলল, 'মা, আমার জন্য দোয়া প্রার্থনা করুন।

৬

বছরের আবর্তনটা কি সুন্দব। সারা বছর ধরেই সে একনাগাড়ে কাজ করছিল। এই গলিতে শীত তীব্র হলেও মধুর কারণ এসময় মানুষ কাজে উৎসাহিত হয়। বসন্ত আসে

তীব্র বালির ঝড় সঙ্গে নিয়ে একে তারা বলে খামসিন। তবে গ্রীষ্ম তাদের কাছে নরক যন্ত্রণার মত। তবে শরৎ কিন্তু রহস্যময়ী, একটা ইঙ্গিতপূর্ণহাসি হেসে তিনি চলে যান। সে দৃঢ় চিত্তে কাজ শুরু করল কিন্তু ক্রমেই কাজের প্রতি বাড়ছিল তার তীব্র আকর্ষণ। তার আইনের বইপত্রগুলো পড়ে রইল বিছানার তলায় আর জানালার তাকে। তার রাতের ঘুমও কমে গেল। সে ধারণাগুলো আকড়ে ধরল আর লড়াই করতে লাগল দুর্বোধ্য বিষয়বস্তুগুলোর সঙ্গে। শুধুমাত্র সাফল্যে তার আনন্দ হত না। শুক্রবার দিনটা মূলতঃ তার কাটত পরিচালক বা ওই পদমর্যাদার লোকেদের সম্বন্ধে জ্ঞানপূর্ণ তথ্য সংগ্রহে। সে আন্তরিকভাবে দীর্ঘ সময় পার করতে লাগল কবিতা পাঠের পেছনে। কয়েকটা কবিতা লেখারও চেষ্টা করেছিল কিন্তু সফল হতে পারেনি। সে নিজের মনে বলল, নিজেকে উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টিগোচর করতে কবিতাই একমাত্র মাধ্যম তা শ্রেষ্ঠও বটে আবার আমাদের বিশেষ অনুষ্ঠানগুলোতেও বেশ কেতাদুরস্ত ভাবে চলা যাবে। তাই কবিতা লিখতে না পারাটা ছিল তার কাছে একটা বিরাট ধাক্কা। তাই যেকোন ভাবে এটা শিখতে পারাটাই সাহিত্যিকের উন্নতির সোপান। জনসংযোগকারী হিসেবে কাজ করাটাও তার কাছে শঠতা লেখার সাফল্যের চেয়ে খুব একটা কম গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। সেখানে বক্তব্য রাখাটাই আসল ব্যাপার, তার মনও তাতে সায় দিয়েছিল। এমনকি যেমনটা হয় বিদেশী ভাষার ক্ষেত্রে জ্ঞানের সবকটা শাখাই তার কাছে ছিল গুরুত্বপূর্ণ। হঠাৎ হঠাৎ অফিসে প্রয়োজন পড়লেই টের পাওয়া যায় এর মূল্য কত। একজন সামান্য সরকারী কর্মচারীর ক্ষেত্রে একার পক্ষে এই অর্থনৈতিক টানাপোড়েন সামাল দেওয়া সম্ভব নয়। তাকে এই যুদ্ধে অবশ্যই প্রয়োজনীয় উপকরণ দিয়ে নিজেকে সাজিয়ে নিতে হবে। কেই বা জানে কি ঘটতে চলেছে। সে নিজের মনে মনে ভাবল, যে তার জীবন একটা স্রোতস্বীণী নদীর মতো এগিয়ে চলেছে জ্ঞান এবং আলোর উৎসের দিকে। এর প্রতি প্রকোষ্ঠে ভরা রয়েছে অমূল্য সব সম্পদ আর জ্ঞানের বিভিন্ন শাখা এসে এর সঙ্গে মিলে একে আরো উর্বরা করেছে। নদীটা বয়ে চলেছে বিশ্বাসের তীব্রতার ওপর ভিত্তি করে। মহত্ত্ব ও গর্বে সেই বিশাল জলরাশি পেরিয়ে পৌঁছতে পারে স্বর্গের দোর গোড়ায়।

একমাত্র প্রাচীন ঝর্ণার কোলেই সে শান্তির আশ্রয় লাভ করত, শান্তি সে পেত এক তীব্র মদির ভালবাসার কোলে সুন্দরী ও একান্ত আপন মেয়েটির বাহুডোরে ও তার উষ্ণ কুমারী যৌবন কুসুমে। তবে কোনরকম বাগদানেই সে রাজী হয় নি। যদিও মেয়েটির কাছে সে ছিল নিজের প্রাণের চেয়েও অনেক বেশি। সে ভাবল, সাধারণ সুখ আর ভালবাসাতেই কি জীবনের পরিপূর্ণতা? তার নীরবতা ধৈর্য্যের বাঁধ ভেঙে দিল সৈয়দার। সে তার আবেগ প্রকাশে এক মুহূর্তও দেরী করল না। দ্বিধাবোধ করল না প্রতীক্ষার ব্যাকুলতা প্রকাশ করতেও। এরকমই একদিন মেয়েটি তার কাছে পরিপূর্ণভাবে নিজেকে উজাড় করে দিল।

'আমি তোমাকে ছাড়া বাঁচব না।'

তার ঠোঁটের ইঙ্গিতের চেয়ে কথাগুলোর মাদকতা ছিল অনেক বেশি। আরেকদিন সে তার কণ্ঠলগ্ন হয়ে বলেছিল,

'তুমিই আমার সব, আমার অতীত ও ভবিষ্যৎ তার বাদামী চোখগুলো চকচক করে উঠল নির্ভরতার আশায়। এক আবেগঘন মুহূর্তে সে গুনগুনিয়ে উঠল :

"আমাদের কি কিছুর অভাব আছে...

দীর্ঘনিঃশ্বাসের সুরে যেন ছন্দপতন ঘটল।

"আমাদের পরিপূর্ণ ভালবাসায় অভাব নেই কিছুরই নির্বোধ ও স্বার্থপরের মত উত্তর এল ওথমানের কাছ থেকে। মেয়েটি প্রতিবাদের ভঙ্গীতে কাঁধ ঝাঁকাল, তা সত্ত্বেও চেষ্টা করল ওথমানকে অপ্রতিভ না করার। সৈয়দার মনে হল ধৈর্য্য ধরে থাকাটাই এখন সবচেয়ে প্রয়োজনীয়।

ওথমান বুঝল যেন একটা ভয় তাকে ক্রমশ চেপে ধরছে এবং ঘটনাবশত তা তাকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে এক অচেনা জগতের দিকে। এভাবেই সে একদিন তার সহকর্মীদের প্ররোচনায় তাকে টেনে নিয়ে গেল নিষিদ্ধ পল্লীতে। আল-হুসায়েনি গলির এক বাসিন্দা হিসেবে এর জন্য প্রয়োজনীয় সাহসের অভাব তার ছিল না। দুটো টিমটিমে গ্যাসবাতির আলোয় আলোকিত গলির দিকে সে এগিয়ে চলল। ধুলোমলিন গ্যাসবাতি দুটোর দৈন্যতা যেন অন্ধকারকে আরও ভয়াল করে তুলেছিল। অভীষ্ট লক্ষের সন্ধানে সে ইতিউতি চাইছিল। এরকম সব অভিমানের পরেই সে আপ্রাণ চেষ্টা করত ক্ষমা চাওয়ার ছুতো খোঁজার। তার পরেই শ্রদ্ধা ভক্তি উথলে উঠত তার, প্রতিবারই সে এই কাজ করত ঠিক যে যেমন করত অন্তরের কোন গোপন অভিলাষ সৈয়দার থেকে গোপন করতে। ফলে ধারাবাহিক কঠিন শ্রমের পর তার বিবেকের তাড়নায় সে আরও বেশি কষ্ট পেত। তার দীর্ঘ ক্লান্তিকর রাত্রি নিঃশেষিত হত প্রচণ্ড মানসিক বিষাদে। কখনও কখনও নিজের অজান্তেই তার চোখ ফেটে জল বেরিয়ে আসত।

সংগ্রহশালার প্রধান সাফান বাসয়ুনি তার চার্জগুলো ভালবাসা ও ক্ষমার চোখেই দেখছিলেন। তিনি তার আচার আচরণ ও কর্ম দক্ষতাকে প্রশংসা করলেন। কিন্তু সে তার মাধ্যমিকের শংসাপত্র নিয়ে খুবই অস্বস্তিতে ছিল। তার মনে হচ্ছিল যে এই শিক্ষাগত যোগ্যতার জন্যই সে এই দপ্তর থেকেও আলাদা। তবে তার পরবর্তী উচ্চশিক্ষার আকাঙ্ক্ষায় তাকে হয়ত আরও দূরে সরিয়ে দিত। তা কিন্তু বেড়েই, যাচ্ছিল। ওথমান এটা খুব দ্রুত বুঝতে পারল কিন্তু মানুষের ভাল ব্যবহারের ওপরই সে ভরসা করছিল। সে তার দক্ষতাকে দ্বিগুণেরও বেশি বাড়িয়ে তুলেছিল তার দপ্তর অধিকর্তার প্রতি কৃতজ্ঞতায়। সে সবসময় তাদের তালে তাল মিলিয়ে চলছিল, যতক্ষণ না সাফান তাকে পুরোপুরি বিশ্বাস করে কোন এক দুষ্প্রাপ্য মুহূর্তে নিজের হৃদয়কে তার কাছে উন্মুক্ত করে দিচ্ছে। এভাবে নিজের কাজের অবসরে তিনি ক্রমেই ওথমানের ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠলেন এবং খোলা মনে কথাবার্তা বলা শুরু করলেন। এমন কি রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও তিনি তার মতামত ও দর্শন ব্যক্ত করা শুরু করলেন তার কাছে। কিন্তু লোকটি এতই ঈর্ষাপরায়ণ ছিল যে, ওথমান তাঁর স্বার্থকে অবহেলা করতে বা নিজের নিরপেক্ষতা জারি করতে-রীতিমত আতঙ্কিত হত।

'সত্যিটা হচ্ছে," সে হয়ত ইতস্তত: করে বলত।

"আমরা একই ভাবনার শরিক।"

এই কথা যে মানুষকে এত খুশি কবতে পারে তা ওথমানের স্বপ্নেরও অগোচর ছিল। এই সব ব্যাপারে তাঁর জড়িয়ে পড়াটা তার বেশ আশ্চর্যই লেগেছিল। আরও আশ্চর্য ছিল তার অধম সহকর্মীদের আত্মনিয়োগ। তাদের মধ্যে আকর্ষণ করার মত কি ক্ষমতা ছিল? তাদের মনে কি কোন উদ্বিগ্ন হওয়ার মত কোন ঘটনা ছিল না? কিন্তু সে নিজের মনে নিজেকে শাসন করে বলত যে তাদের জীবনের কোন নির্দ্দিষ্ট লক্ষ নেই। তাদের ধর্মবিশ্বাস লোক দেখানো এবং সেই কারণেই জীবনের অর্থ খোঁজাটা তাদের কাছে কোনো গুরুতর ব্যাপার নয়। এমনকি সৃষ্টির উদ্দেশ্য নিয়েও মাথা ঘামাত না তারা। আর এটাই ছিল তাদের জীবনদর্শন, তারা তাদের জীবনটা নষ্ট করত ফাঁকা আমোদ প্রমোদ ও বিলাস ব্যসনো তাদের সবরকম সম্ভাবনারই অঙ্কুরে বিনাশ ঘটচ্ছিল। বিভ্রম তাদের বোকা বানাত এবং, তারা সময়ে কিনারে অলসভাবে দাঁড়িয়ে থাকত।

৭

একদিন তার কাছ থেকে বহিরাগত চিঠিপত্র গ্রহণ করার পর সাফান বাসয়ুনি বলল, "একদিন সন্ধ্যেবেলা আমার বাড়িতে চলে এস, বেশ মজা করা যাবে।" সে কিছুটা সন্দেহ ও আশ্চর্য হলেও না বলতে পারল না। লোকটা বলতে লাগল, "আমার পাশের বাড়িতে একটা বিয়ের উৎসব আছে। আমরা সবাই মিলে বারান্দায় বসে গান শুনব ও ষাঁড়ের মাথা সহযোগে নৈশভোজ সারব।

সে আল-বাহর ব্লকের তিনতলায় একটা ফ্ল্যাটে থাকত। ওটা ছিল বাব-অল সুরাইয়ার চত্বরের খুব কাছেই। ওথমান আবিষ্কার করল যে সেই একমাত্র নিমন্ত্রিত অতিথি আর সেই সম্মান পাওয়ায় খুব আহ্লাদিতও হল। তারা দুজন একসঙ্গে এক দারুণ নৈশভোজ খেল। খাদ্যতালিকায় ছিল, ষাঁড়ের জিব, ঘিলু, গাল, চোখ, আর ছিল সসেজ, গোমাংসের সুরুয়া, এছাড়াও ছিল ভাজা পেঁয়াজ গাজর, লঙ্কা ও চাটনি। শেষ পাতে ছিল তরমুজ। সে দারুণ দারুণ খাবার দিয়ে মনপ্রাণ ভরে নৈশভোজ সারল। তারপর তারা ধীরেসুস্থে গিয়ে বসল বারান্দায় বিয়ের আসর দেখতে। অন্য বাড়ির উঠোনটা ঝলমল করছিল বিভিন্ন দামী আলোতে। ভেতরে সারি সারি চেয়ার ও সোফা ভর্তি অতিথি। গলিটার দখল নিয়েছিল বালক ও কিশোররা আর বাকিরা বাইরে বাইরে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। বাড়ির ভেতরটাও ছিল অনুরূপ আর সুন্দরী মহিলারা যাওয়া আসা করছিলেন। সমস্ত জায়গাটা গম্‌গম করছে তাদের কথায় ও হাসিতে। পুনর্মিলনের আনন্দ, হাসি, কান্না সবকিছুই বাতাসে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। বিবাহবাসরের উচ্ছ্বলতায় মাতোয়ারা হয়ে উঠেছিল ওথমান। তার হৃদয় উদ্বেল হয়ে উঠেছিল যৌনতা ও ভালবাসার টানাপোড়েনে। যখন বাজনা বেজে উঠল, সে বুঝতে পারল যে তার হৃদয় আশাতীতভাবে উদ্বেল হয়ে উঠেছে, মোটের ওপর যন্ত্রসঙ্গীত সে পছন্দ করত না, কিন্তু সেখানে তার ভালই লাগছিল। যাই হোক যন্ত্রসঙ্গীত সবসময় ভালো লাগে না কিন্তু মাঝেমধ্যে বেশ আরামপ্রদই বটে। বাজনাটা বেশ ভালই বাজছিল, আর যেন এক সান্ত্বনার সুরও ছিল তাতে। বিয়েটা একটা

অবর্ণনীয় সম্পর্ক, আনন্দ, আবার ধর্মীয় কর্তব্যও বটে। এক অভাবনীয় দুঃখ তাকে আচ্ছন্ন করে তুলল।

"হয়ত তোমার এখন মজা করার দরকার। এতক্ষণ আমি সেটাই ভাবছিলাম... সাফান তার দিকে তাকিয়ে বলল, আলো আঁধারির মায়ায় তার মুখটা একটু অন্যরকম লাগছিল।

"কাজ আর পড়া নিয়েই তো বেশ কাটিয়ে দিলে হে, কিন্তু সবকিছুর বাইরেও কিন্তু জীবনের চাহিদা অনেক বেশি।"

ভেতরে ভেতরে ভীষণ বিরক্তি সত্ত্বেও সে মন দিয়ে শোনার ভান করছিল। সে কোনরকম নীতিকথাই পছন্দ করত না কারণ সে মনে করত এগুলো মানুষের জীবনকে নিষ্ক্রিয় করে দেয় এবং ঈশ্বরের বিরুদ্ধাচরণে উৎসাহী করে। এই সময়ই তার চিন্তা বাঁক নিল সৈয়দার দিকে, তার করণীয় ও পালনীয় কর্তব্য ও দায়িত্বগুলো চোখের সামনে ভাস্বর হয়ে উঠল। সে তার মুখের ওপর এক অর্থহীন হাসি অনুভব করল। সাফান আবার আলোচনায় ফিরে এলো।

"তুমি অত্যন্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষী, কিন্তু জান, মানসিক শান্তিটাই হল সবচেয়ে দুর্লভ সামগ্রী।"

"আপনি অনেক কিছু জানেন দেখছি।" সে তীর্যক ভঙ্গীতে বলল।

বারান্দার দরজার কাছে একটা ছায়া দেখা গেল। দেখা গেল একটি ছোট মেয়ে একটা বড় ট্রে-তে করে ধূমায়িত চায়ের কাপ নিয়ে আসছে। বিবাহবাসরের আলোয় তার মুখটা উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল। পিছনদিকটা অন্ধকার থাকা ওই আলোতে আঁধারিতে শরীরের বিভঙ্গ স্পষ্ট হয়ে উঠছিল। যদিও তার মুখটা আপাতদৃষ্টিতে ছিল নিস্প্রাণ ও গোলাকার কিন্তু একটা আকর্ষণ ছিল ভেতরে আর সেটা একটা রহস্যের অবগুণ্ঠনে আবৃত ছিল। সে বিমূঢ় ভাবে তাকিয়ে রইল। ঝুঁকে পড়ে চা নিতে গিয়ে তার নজর গেল মেয়েটির উন্মুক্ত বাহুর দিকে তার মনে হল সেই সুগন্ধীর উৎপত্তিস্থল চা-এর পেয়ালা নয়, তার বাহু। অন্ধকারে মিলিয়ে যাওয়ার আগে মেয়েটা হয়ত অল্প কয়েক মুহূর্তই সেখানে ছিল। একমুহূর্তে লাজুক লাজুক হাসি হেসে সে মিলিয়ে গেল। নির্জনতা চেপে বসল অপরাধবোধের মত। এক চক্রান্তের গন্ধে পরিস্থিতিটা আমূল বদলে গেল। আর তারই সঙ্গে বেড়ে গেল তার বিমূঢ় ভাব।

"আমার মেয়ে।" সাফান বলল। ওথমান সম্ভ্রমের সঙ্গে মাথা নোয়াল।

"ও প্রাথমিক শিক্ষা সম্পূর্ণ করেছে।"

ওথমান একটু আনন্দেই মাথা নাড়ল। সমবেত সঙ্গীতের মূর্চ্ছনা তাদের কাছে ভেসে আসছিল। "গৃহকোণ মেয়েদের সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষাঙ্গন।" ওথমান কোন উত্তর দিল না। সে হতবাক হয়ে গেল। পাশাপাশি নিজের নীরবতায় সে নিজেই বিরক্ত হয়ে উঠল। "এ ব্যাপারে তোমার অভিমত কি?"

"আমি এ বিষয়ে সহমত পোষণ করছি।" তা সত্ত্বেও তার মায়ের তিক্ত জীবন সংগ্রাম তার মনে পড়ল। তার মনে হল কে যেন তাকে ফাঁদে ফেলছে। এক গায়িকা মিষ্টি গলায় সঙ্গীত পরিবেশন আরম্ভ করলেন। সাফান অস্ফুটে বলল,

"তওবা, তওবা।"

"সত্যি।"

"জীবনটাও সুন্দর অবশ্যই।"

"এ ব্যাপারে দ্বিমত থাকতে পারে না।"

"অপর্যাপ্ত জ্ঞানই পারে মানুষের জীবনকে সুন্দরতর করে তুলতে।"

"এই জ্ঞান আহরণ করা কি সহজ?"

"না। এটা দৈব অনুগ্রহ।"

ফোকটে জীবনটা উপভোগ করার জন্য ভগবান আমাদের সৃষ্টি করেন নি। সব মানুষই তাঁর কাছে হত্যে দিয়ে পড়ে আছে প্রাপ্তির আশায় কিন্তু তিনি ছেলের হাতে মোয়া তুলে দিতে রাজী নন। তাহলে সে কিভাবে নিজের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ন রেখে তার নিয়োগকর্তার কৃপাধন্য হবে? তখন তার গানের দিকে আর মন ছিল না। কিন্তু সাফান সুরে মোহিত হয়ে রইলেন। মাঝে মাঝেই তিনি হাত পা নেড়ে তাল দিতে লাগলেন আর অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাতে লাগলেন। শেষপর্যন্ত তার মনে হল যে সে আত্মরক্ষার মাধ্যমেই আরও উদারতার সঙ্গে এই আমন্ত্রণের যোগ্য জবাব দিতে হবে। এই ধরনের চিন্তা তার মনে বিন্দুমাত্র যন্ত্রণার উপলব্ধি ঘটাল না। সে নিষ্প্রয়োজনে একটা পয়সাও খরচ করে নি। প্রথম মাসের মাইনে পেয়েই ডাকঘরে গেল জমা খাতা খুলতে। কখনও তার বাসা বদলের বা খাদ্যাভ্যাস বদলের চিন্তার উদয় হয় নি। সে বিশ্বাস করত যে এই দীর্ঘ লড়াইয়ে পরিশ্রমই হল প্রধান হাতিয়ার আবার ধর্মীয় কর্তব্যও বটে। ভয়ঙ্কর পৃথিবীর বিভিন্ন আক্রমণ থেকে রক্ষা করতে এটিই একমাত্র রক্ষাকবচ। তাহলে যেটা হবার তা হবেই। আরও জমকালোভাবে তাকে পাল্টা অভ্যর্থনা জানাতে হবে।

৮

মাস শেষ হবার আগেই সে লোকটিকে নৈশভোজে আমন্ত্রণ জানালো অল-কাস্তি রেস্তোঁরাতে। তারা খুব ভালো ভালো মাছ, ফলমূল ইত্যাদি খেল। বৃদ্ধ লোকটি এতে এতই খুশি হলেন যে, তাঁকে দেখে মনে হল তিনি স্বর্গ থেকে নেমে আসা এক দেবদূতের জন্য অপেক্ষা করছিলেন।

"ফিসাউই-র কামোডে বাকি সন্ধ্যেটা কাটালে কেমন হয়?" সে ঠিক করল। তাঁর বক্তব্যে মনে যে আকণ্ঠ গিলেও তাঁর পেট ভরেনি। ওথমান ব্যথিত হল, কিন্তু তা সত্ত্বেও তার হাত ধরে বলল, "বাহ্ দারুণ পরিকল্পনা।"

রেস্তোঁরায় বসে ওথমানের মনে পড়ল অতীতের বায়রাম উৎসবের কথা। সেইবার যেবার তার নতুন জোব্বাটা ছিঁড়ে গিয়েছিল তাদের আল হুসেনি গালির মুখে হাতাহাতি

করতে গিয়ে। এরজন্য তার বাবা তাকে আচ্ছা সে কয়েক ঘা দিয়েছিলেন। তার মা তাতে তালি দিয়ে দেবার পর তাকে বাকি বছরটা ওই জোব্বাতেই চালাতে হয়েছিল। কিন্তু বৃদ্ধের ওই হাসিখুশি আচরণ তার বিরক্তির উদ্রেক করছিল। সে নিশ্চিতভাবেই একটা ভালো খবরের আশায় ছিল। সে তার নিষ্প্রাণ চোখে কোন কিছু পাবার আশায় বসেছিল। খুব ভালো না লাগলেও নিজেকে সে যথাসম্ভব খুশি রাখার চেষ্টা করছিল।

"তুমি কি তোমার দপ্তরের সহকর্মীদের আচরণে খুশি?" সে বলল।

"হ্যাঁ! আমি বিশ্বাস করি আমি খুশি।"

"তারা খুবই গরীব, কিন্তু আচার আচরণে তুলনাহীন।"

"হ্যাঁ, অবশ্যই।"

"এই যেমন তুমি, ছেলে হিসেবে তোমার কোন তুলনাই হয় না। পড়াশুনো ঠিকঠাক করলে তুমি কি বিচারপতি হতে?"

"না। আমি আশা করি আমার অবশ্য ভালো করতে পারব।"

"খুব ভালো সিদ্ধান্ত। আমি তোমার উচ্চাশাকে সাধুবাদ জানাই।"

ওথমান তার ইতস্ততঃ ভাব ত্যাগ করল। সে সেখান থেকে বেরিয়ে আসার সিদ্ধান্তে অনড় রইল, যদিও ঘটনাটা তার কারুর আশায় জল ঢেলে দেওয়ার মত। "আমার দেখভালের ক্ষমতা তোমার ভাবনা-চিন্তার উর্ধ্বে।"—সে বলল।

লোকটা তার অভিব্যক্তি অনুধাবন করাব চেষ্টা করল—বলল, "ঈশ্বর আমাদের সহায় হোন। ব্যাপারটা কি?"

"উচ্চাশা ইত্যাদির পেছনে দৌড়নোর মত সময় আমার হাতে নেই। আমি খুব সাধারণ ব্যাপার নিয়ে থাকতেই ভালবাসি।"

"সত্যি?"

"যদি পরিস্থিতিটা প্রতিকূল না হত, তাহলে বিয়ের মত সহজ সরল জিনিস আর কিছুই হত না।"

বৃদ্ধ লোকটি হতাশা ঢাকতে ব্যর্থ হয়ে প্রশ্ন করলেন, "যদি জিজ্ঞেস করি, কি ধরনের পরিস্থিতি?"

"বিশাল দায়িত্ব।" ওথমান নিঃশ্বাস ফেলে বলল। আমার মত লোকেরা, সারা দারিদ্র্যের মধ্যে বড় হয়েছে, তারা এর শিকল কাটতে পারে না।"

সে নতমস্তকে বিষণ্ন স্বরে বলল, "আমি ভেবেছিলাম..."

সে যেন আবেগে আপ্লুত হয়েই চুপ করে গেল। বৃদ্ধ মানুষটি আলোর বৃত্তের বাইরে বেরিয়ে গেলেন পেছনে দীর্ঘ ছায়া ফেলে রেখে। ওথমান কি বলতে চাইছিল সেটা শেষ করতে পারল না। কিন্তু ওই মানুষটার সঙ্গে তার বন্ধুত্ব যতটা ভালভাবে পারা যায় রাখতে সে সচেষ্ট হল। মানুষটার কণ্ঠস্বর যেন ছায়ার মধ্যে থেকে ভেসে এল, "বলি, তুমি আর কবে স্বাবলম্বী হবে?"

"আমাকে বিধবা ও ছোট বাচ্চাদের প্রতিপালন করতে হয়"—সে হতাশার স্বরে বলল।" আমার অবস্থা কলুর বলদের মত।"

চারদিকটা থমথমে হয়ে গেল। এমনকি পেছনদিকের বাজনাগুলো তখন আর কানে এসে পৌঁছচ্ছিল না। সে বিড়বিড় করে উঠলো, "আমি ভেবেছিলাম..."

বৃদ্ধ লোকটি নিরুত্তর রইলেন। তিনি রেস্তোঁরায় খাবারের দাম মেটাতে গেলে ওথমান তাকে বাধা দিল। সে নিজের থেকে দাম মিটিযে খুব বিপর্যয় হয়ে পড়ল। অনুষ্ঠানের সব আনন্দই ফুরিয়ে গেল, অনেক ভান করেও এটাকে ফিরিয়ে আনা গেল না। তারা কাফে ছেড়ে বেরিয়ে বাব-আল সারিরিয়া চত্বরে এসে উপস্থিত হল। সেখানে বৃদ্ধ মানুষটি বিদায় নিয়ে বাড়ির দিকে চলল।

ওথমান উদ্বেগে বিচলিত হয়ে পড়ল। একটা উন্মাদনা তাকে আবৃত করল। যা তাকে তাড়িয়ে নিয়ে চলল আত্মহননের দিকে।

সাতপাঁচ না ভেবে সে এগিয়ে চলল নিষিদ্ধ পল্লীব দিকে, যেখানে সে তার উদ্বেগ ও দুঃখ মোচন করতে পারে।

"এমনকি মানুষকে তার পাপক্ষালন করতে হয়।" সে বিপর্যস্ত ভাবে বলল।

৯

সে নীচে নামার সময় ওম হুসনি তাকে থামালেন। কোন উপযুক্ত কারণ ছাড়া সে ওই কাজ করত না। ওথমান তার দিকে তাকালো, বয়সের ছাপ তার মুখে পড়েছে, মাথার চুলগুলো হেনা করা, বয়স হওয়া সত্ত্বেও শরীরের বাঁধুনি বেশ চমৎকার। এটা তাকে তার মায়ের কথা মনে পড়ালো, সে হাসিমুখে তার সঙ্গে করমর্দন করল।

"আমি খবরটা পেয়েছি।" তিনি বললেন।

"আমার মনে হয় এটা ভালো খবর।"

তিনি এক চোখ ছোট করে বললেন (অন্যটা গলিতে মারামারির সময় নষ্ট হয়েছিল, "এমন কিছু ভালো নয়।

সে ইচ্ছাকৃতভাবে তাঁর দিকে তাকালো।

"একজন পাণিপ্রার্থী। তোমার একজন প্রতিদ্বন্দ্বী হল।"

অ্যাঁ।'

"কেউ সঈদাকে প্রেম নিবেদন করেছে।"

দুঃখ ও ব্যর্থতার ঢেউ তার গলা পর্যন্ত বন্ধ করে দিল। এটা এমন একটা খবর যা সে প্রত্যাশাও করেন নি। সে অন্ধের মত কথা খুঁজতে লাগল।

"একজন দর্জি।"

সে জানতো এটা অবশ্যম্ভাবী। সে তা আটকাতে চাইল না, অবশ্য সে তার আশাও করে না। এটা প্রায় মৃত্যুর সমান। ভদ্রমহিলা তাকে হাত ধরে নিজের ঘরে নিয়ে গেলেন তারপর একটা চেয়ারে নিজের পাশে বসালেন।

"তুমি পরোয়া করোনা?"

মনের গভীরে তার এক তীব্র যন্ত্রণার উপলব্ধি হল। যেন গোটা পৃথিবীটাই তার চোখের সামনে থেকে আবছা হয়ে যাচ্ছে। সে রাগতভাবে বলল,

"অনর্থক প্রশ্ন করোনা।"

"শান্ত হও।"

"তার চেয়ে বরং আমি চলেই যাই।"

"কিন্তু তার সঙ্গে তোমার দেখা হবে না।"

পৃথিবীটা আবছা, আরো আবছা হয়ে চলল।

ভদ্রমহিলা বললেন, "তোমার নিজের থেকে এটা বোঝা উচিত।"

"তুমি কি বলতে চাও?"

"তার মা তার ওপর কড়া নজর রেখেছে। বিভ্রমের চেয়ে একজন প্রকৃত মানুষ ভালো।

"বিভ্রমের চেয়ে প্রকৃত মানুষ ভালো," সে বোকার মত বিড়বিড় করতে লাগল।

"তুমি ওকে ভালবাসো, তাই না?

"আমি ওকে ভালোবাসি।" সে অন্যমনস্কভাবে বলল।

"আমাদের গলির এখন একটা জমাটি গল্প।"

"কিন্তু এটা সত্যি।"

"দারুণ। তাহলে তোমরা প্রশ্নটা তোলনি কেন?"

"আমি পারব না।" সে অন্যমনস্কভাবে বলল।

"শোনো মেয়েটা আমাকে অনুরোধ করেছে তোমাকে বলার জন্য।"

ছেলেটা পুরোপুরি হতাশায় নিমজ্জিত হল।

"হয় এক্ষুনি গিয়ে মেয়েটির কাছে নিজেকে সমর্পণ কর, কিংবা আমাকে বলার সুযোগ দাও।" মহিলা বললেন।

সে অজানা ভাষায় বিড়বিড় করে উঠল। ভদ্রমহিলা হতবাক হয়ে গেলেন। সে স্বগতোক্তি করতে লাগল।

"আর ভগবানও আমাকে ক্ষমা করবেন না।"

"ভগবান না করুন। তুমি কি মনে কর তোমার মত এক সরকারী চাকুরের সে উপযুক্ত নয়?"

"ওম হুসনি, তুমি আমাকে দিয়ে কিছু বলো না।"

"তোমার মনের কথা আমায় বল। আমি তোমার মায়ের মত।"

"আমার পক্ষে বিয়ে করা সম্ভব নয়।"

"মেয়েটা তাহলে তোমার জন্য আজীবন প্রতীক্ষা করুক।"

"প্রতীক্ষাটা তাহলে দীর্ঘমেয়াদী হবে।"

"তুমি তাকে যদি কথা দাও তাই যথেষ্ট।"

"না। আমি স্বার্থপর নই। তার খুশির জন্য আমি অবশ্যই না বলব।

মহিলা কিছু বলে ওঠার আগেই সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। ধীরে সুস্থে হাঁটতে শুরু করল সরু গলিটা দিয়ে। তার শ্রদ্ধা ছিল খুবই গভীর আর দেখা না হওয়াটা সে খুব দুঃখের সঙ্গেই স্বীকার করল। তার এত রাগ সত্ত্বেও সে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল, শুধু স্বস্তি নয়, শান্তিপূর্ণ কিন্তু রহস্যময়। সে যদি সত্যিই নিশ্চিন্ত হয়, তাহলে সে বুঝতে পারল যে তার নরকবাস অবধারিত। সে মেয়েটিকে ভালোবাসত, তার সেই ভালোবাসার ফাঁক কেউ ভরাট করতে পারবে না। তার ভালোবাসা সহজে নষ্ট হবে না। এটা তাকে শিক্ষা দেবে কিভাবে নিজেকে ও তার উচ্চাশাকে ঘৃণা করতে হয়। তার সঞ্চিত দুঃখ দুর্দশাকে আঁকড়ে ধরে রাখতে সে বদ্ধ পরিকর। সে পাগল, কিন্তু তা এক অদ্ভুত উন্মাদনা যা তার খুশির দরজাটাকে গর্ব ও ঔদ্ধাত্যের সঙ্গে বন্ধ করে দিল—যা তাকে অনিবার্যভাবে টেনে নিয়ে গেল মহান লক্ষ্যের দিকে বন্ধুর ও দুর্গম রাস্তায়। খুশি তাকে কখনও কখনও আত্মহত্যার দিকে আকর্ষণ/প্রলুব্ধ করতে পারে। কিন্তু দারিদ্র্য তাকে সবসময় তাড়িয়ে দিয়ে যাচ্ছে জীবনকে সম্মান জানাতেও তার প্রকৃত মূল্য দিতে। "কিন্তু, ওফ্, সৈয়দা, তাকে না পাওয়াটা আমার যে কতবড় ক্ষতি...।"

১০

সে প্রতিটি ক্ষেত্রেই উন্নতি করছিল কিন্তু তাতেও তার যন্ত্রণা কমছিল না। সে নিজেকে দক্ষতার সঙ্গে নিজের দপ্তরে প্রতিষ্ঠা করেছিল। কিন্তু তার কর্মদক্ষতা, আচার-আচরণ দেখে সাফান বাসয়ুনির অভিজ্ঞতা হল যে তিনি তার সম্বন্ধে যা ধারণা করেছিলেন তার পুরোটাই ভ্রান্ত। তিনি মাঝে মাঝে তার সম্বন্ধে বলতেন।

"সে দপ্তরে সবার প্রথমে আসে এবং সবার শেষে যায়। আর প্রার্থনা করার সময় সমস্ত কর্মচারীদের নেতৃত্ব দিয়ে নিয়ে যেত মন্ত্রকের প্রার্থনাকক্ষে।"

প্রায়ই সে নিজের কাজ শেষ করার পরে সহকর্মীদের ফেলে রাখা কাজগুলোও করে দিত। লোকে এটা তার সহৃদয়তা ভাবত, যা তার কর্মদক্ষতার চেয়ে কোন অংশেই কম ছিল না। পড়াশুনোয় চূড়ান্ত সফলতার মূলে ছিল তার প্রচণ্ড উদ্যম। সে তার আইনের বইপত্র ছাড়াও অবসর সময় জাতীয় গ্রন্থাগারে গিয়ে জ্ঞানার্জনের জন্য পাগলের মত অন্যান্য বইপত্র পড়ত। অল হুসায়েন মসজিদে জুম্মার সমাজে ক্রমশ সে এক পরিচিত মুখ হয়ে উঠল। এইভাবে সে তার এলাকায় বিখ্যাত হয়ে উঠল তার দয়া ও মহানুভবতার জন্য। এতদসত্ত্বেও তার যন্ত্রণা কিন্তু কম ছিল না। সৈয়দার চিন্তাই তাকে আচ্ছন্ন করে রইল।

"সে আমার জীবনের দুর্মূল্য সম্পদ। সে মনে মনে বলল।

হঠাৎ তার সেই দিনগুলোর কথা মনে পড়ত, যখন তারা সেই প্রাচীন পানীয় জলের ঝরণার সিঁড়িতে বসে কথোপকথন করত। এ সবই তাকে স্মৃতিমেদুর করে তুলত। কোন কিছুকে মনে গেঁথে ফেলতে না পারা অবধি সে তার মধ্যেই ডুবে থাকত। মাঝে মাঝে তার ইচ্ছে হত সৈয়দার পায়ের আওয়াজ শুনতে।

"সে যেন ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে আমার কাছে। কতদিন দেখা হয় নি, তবুও দেখ মুখটা কত আনন্দে উজ্জ্বল। ও কেমন শান্তভাবে হেঁটে আসছে। আমাদের দীর্ঘ প্রেমালাপ, সেই পাগলের মত আদর আর শরীরের প্রিয় জায়গাগুলোতে ঠোঁট দিয়ে ছবি আঁকা—জানো, এই স্মৃতিগুলো আমাকে পাগল করে দেয়। কিন্তু বাস্তবে তো তা অসম্ভব। সে তো ভুলে গেছে আমাকেই। আমি তো তোমার কাছে বিস্মৃত ইতিহাস মাত্র। যদি কোনওদিন তোমার মনের মণিকোঠায় আমার ছবি ভেসে ওঠে, হয়ত বর্তমান পরিস্থিতির দায় একে অপরের ঘাড়ে চাপিয়ে কটুক্তি করবে। তাঁদের বাড়িব রাস্তার দিকের জানালাটায় একটা জলের কলসী বসানো থাকত যাতে বাতাসে জল ঠাণ্ডা তাকে। একদিন বিকেলে যাবার সময় কলসীর আড়ালে হঠাৎ যেন তাকে একঝলক দেখতে পেলাম। হয়ত তা ছিল আমার মনের ভুল অথবা আমায় দেখে ঘৃণায় মুখ ঘরিয়ে নিয়েছিল। জানি যন্ত্রণার দ্বারাই মানুষ বৃহত্তর জীবনে উন্নীত হয়। এও জানি কর্ম ও ধর্মের মধ্যে কোন ফারাক নেই।

শুক্রবার সকালে তার সঙ্গে সৈয়দার মুখোমুখি দেখা হল অল খিয়মিয়াতে, তার মায়ের কর্মস্থলে। এক লহমার জন্য দুজনের চোখাচুখি হল কিন্তু সৈয়দা তখনই নির্লিপ্তভাবে তার দৃষ্টি ফিরিয়ে নিল। তারপরে সে আর ঘুরেও দেখল না। ওথমানের মনে মৃত্যুর এক অর্থ উপলব্ধি হল। এডেন থেকে আসা তার পূর্বসূরীদের ধর্মীয় যাত্রার মত। ঠিক তার নিজের প্রগাঢ় অন্তর্দহনের মতো। এই মানসিক বিপর্যয়ের ধাক্কায় সে নিয়মিতভাবে নিষিদ্ধ পল্লী যাওয়া শুরু করল। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে কাদ্রিয়া নামে একটি সমবয়সী মেয়ের সঙ্গে তার সম্পর্ক গড়ে উঠল। তার গাঢ় বাদামী গাত্রবর্ণ তাকে সৈয়দার কথা মনে পড়িয়ে দিত। তাই হয়ত আকর্ষণটা বেড়ে চলেছিল। মেয়েটি পৃথুলা হলেও চলনসই গোছের। দীর্ঘদিন ধরে তারা একসঙ্গে থাকার ফলে তাকে অন্য কোথাও দেখা যেত না। মেয়েটার ঘরটাই তার ঘর হয়ে উঠল। তা সত্ত্বেও খালি মেঝের জন্য ঘরটা পুরোনো লাগত। তার ওঠানো বিছানা, একটা আয়না, একটা চেয়ার যা বসা ও জামা কাপড় ঝোলানোর কাজ হত, গামলা, মগ সবই ছিল প্রাচীন গন্ধমাখা। এই কারণেই সে শীতের রাত্রে গরমের পোষাক খুলে শুতে পারত না। বছরের পর বছর আসা যাওয়ার মধ্যে শুভেচ্ছা বিনিময় ছাড়া তাদেব মধ্যে অন্য কোন কথা হত না। অত্যন্ত ধর্মপ্রাণ হওয়া সত্ত্বেও মেয়েটি তাকে অল্প পানীয়ে আসক্ত হতে শেখাল। একপাত্র কড়া সালসালা তার উন্মাদনা আনার পক্ষে যথেষ্ট ছিল, আর তার দামও ছিল কম, আধ রৌপ্যমুদ্রা মাত্র। অবস্থা এমনই হল যে এক আবেগঘন মুহূর্তে ছেলেটা মেয়েটাকে বলল, "তুমিই পৃথিবীব পালনকর্ত্রী।"

সে চিন্তা করত সেই নির্জন শয়নকক্ষটার কথা। সেই ধূপের গন্ধ, ঘরের পোকামাকড়, লুকোনো বোগজীবাণু, আর নিজেকে প্রশ্ন করতে পাবে যে ওই প্রত্যন্ত ও অভিশপ্ত কোনটা, যাতে প্রজ্বলিত হয়েছে বরফের আস্তর তা কি আল্লাহ রসুলের রাজত্বেব অংশ নয়?

এরকম এক ঘটনাবশতঃ এক ঝড়ের দিনে সে ওই ফাঁকা ঘরটায় একা দাঁড়িয়ে ছিল, সামনেই ধূ ধূ করছিল নিঃশব্দ গলিটা, চারদিকটা ক্রমশ অন্ধকার হয়ে আসছিল। কাদ্রিয়া শুয়ে ছিল বিছানায় আর সে বসেছিল একটা বাঁশের চেয়ারে। একটা মোমবাতির আলোয় আলোকিত ছিল ঘরটা। সময়টা অন্তহীন মনে হওয়ায় জামার পকেট থেকে একটা নোটবুক বের করল, যাতে বিভিন্ন ভাষণের অংশ সযত্নে লেখা ছিল। সে তার স্বভাবমত উচ্চস্বরেই পড়তে শুরু করল।

"কি পড়ছ? কুরাণ?" কাদ্রিয়া জিজ্ঞেস করল।

সে হেসে মাথা নাড়ল।

"বান্ধবীদের সঙ্গে দেখা করার তারিখ?"

"শিক্ষকদের ভাষণ।"

"তার মানে তুমি একজন ছাত্র? তাহলে আবার গোঁফদাড়ি কেন?"

"আমি সরকারী চাকুরে। সান্ধ্য কলেজে পড়াশুনো করি।"

সে দীর্ণ হৃদয়ে সৈয়দার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠল। হঠাৎ তার মাথায় একটা বুদ্ধি এল আর তাতে সে অনেকটা সান্ত্বনাও পেল। হালকা বৃষ্টি তখন গলিটা পরিষ্কার করার সঙ্গে সঙ্গে মুখটাও ধুয়ে দিচ্ছিল।

একদিন সে আবার সেই গলিটায় ফিরে গেল। সেখানে সে সৈয়দার বাড়ির সামনের মাঠটা খুঁজতে লাগল, তার দুপাশে দুটো পতাকা উড়ছিল। তার হৃদয়ের চূড়ান্ত স্পন্দন শুরু হল। সে সিঁড়ি বেয়ে ওম হুসনির ঘরে এল তাকে দেখে মনে হল সে যেন ওথমানের অপেক্ষায়ই বসে ছিল। সে তাকে অভিবাদন করে চলে গেল। তাকে পেছন থেকে ডেকে বলল, "তুমি যা চাও ভগবান তোমায় তাই দিন আর তোমাকে সুখী করুন।"

ছেলেটা তার পড়াশোনায় মন দিতে পারছিল না। তার ছোট্ট ঘরটা উপচে পড়ছিল শব্দে—মহিলাদের উল্লাসধ্বনিতে আর শিশুদের আনন্দে ও বিয়েব বাজনার শব্দে। হ্যাঁ এই ভাবেই সৈয়দা প্রবেশ করল অন্য এক পুরুষের রাজত্বে। তার জীবনের একটা অংশ অতীতও পাথরচাপা হয়ে গেল।

সে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে বেরিয়ে পড়ল। সে নিজেকে বলল যে তার আকাঙ্ক্ষার চেয়েও জীবনটা কিছু বড়। ওমর অল খৈয়ামের জ্ঞান অল মারির চেয়েও অনেক সুন্দর ছিল এবং এই একটা মানুষের হৃদয় ছিল তার একমাত্র পথপ্রদর্শক। সে ঝড়ের মত সেই বিবাহবাসরে প্রবেশ করল, লোকে বলল যে তার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। সে সৈয়দার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বলল, "সিদ্ধান্তটা তোমার ওপরেই নির্ভর করছে।" কান্না ও চীৎকারের মধ্যেই সে তার আবেদনে সাড়া দিল। কারণ মৃত্যুর আগের সেই সঙ্কট মুহূর্তে সত্য তার আবরণ উন্মোচন করে সামনে এসে দাঁড়ায় আর মৃত্যুভয় চলে যায়। উচ্ছল আনন্দে তারা দুজনে ছুটতে ছুটতে পালিয়ে গেল তিন রাস্তার মোড় পর্যন্ত। তারপব বাব-অল-নাসির পার হয়ে তারা পৌঁছল মৃত্যুর শহরে।

ভোর পর্যন্ত দীর্ঘায়িত হল শব্দ, গান ও হাসির উচ্ছ্বাস। ফ্যালফ্যাল করে সে তার লেখাগুলোর দিকে তাকিয়ে রইল। সমস্তক্ষণটাই সে একাকীত্বে ভুগতে লাগল। যেন এক শব্দহীন, আশাহীন জগতে রয়েছে সে। সে বারবার মনে করছিল জাতের লড়াই, জীবাণুর লড়াই, স্বাস্থ্য ও শক্তির দ্বন্দ্ব। সে চীৎকার করে উঠল—

"ঈশ্বর মহিমান্বিত।"

১১

মহামান্য মহানির্দেশক,

মহাশয়,

আমি আপনাকে সম্মানের সঙ্গে জানাইতেছি যে একজন বহিরাগত ছাত্র হিসেবে এই বৎসর আমি আইন বিভাগে স্নাতক হইয়াছি। যাহা আমার জ্ঞানের পরিধি বাড়াতে সাহায্য করেছে এবং সরকারী কর্মচারী হিসেবে কাজের উন্নতিসাধনে সহায়ক হয়েছে। আপনার মহত্ত্বই আমার অনুপ্রেরণা, তিনি নিরাপত্তা দিয়েছেন মহামান্য সম্রাটের ছত্রছায়ায়। ভগবান তাকে রক্ষা করুন।

দয়া করে বিষয়টি লিবিবদ্ধ করবেন এবং সঙ্গে দেওয়া শংসাপত্রটি আমার কর্মসংক্রান্ত কাগজপত্রের সঙ্গে তালিকাভুক্ত করার প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেবেন।

আপনাকে সর্বোচ্চ সম্মানসহ

আপনার অনুগত কর্মী

ওথমান বাইয়ুমি

সংরক্ষণশালার করণিক

(আন্তঃ বিভাগীয় পত্র)

বহিরাগত ছাত্রদের মধ্যে তার ফলাফলই ছিল সবচেয়ে ভাল। মহানির্দেশককে পাঠানো তার ছোট বক্তব্য এক বিরাট প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করল। তার জগতে তার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল। চিঠিটি প্রথমে পৌঁছবে তার বড়কর্তা সাফান বাসয়ুনির কাছে, তিনি এটা অনুমোদন করে পাঠিয়ে দেবেন সাংগঠনিক পরিচালক হামজা অল সুয়েফি-র কাছে। অর্থাৎ এটি প্রথমে তালিকাভুক্ত হবে সংগ্রহশালার তালিকাখাতায় বহির্গমন পত্র হিসেবে আবার তালিকাভুক্ত হবে দপ্তরের খাতায় বহিরাগত পত্র হিসেবে। এর পরে এটিকে নিয়ে যাওয়া হবে হামজা অল সুয়েফির কাছে অনুমোদন করে মহামান্য মহানির্দেশকের কাছে পাঠানোর জন্য। তারপর এটি তালিকাভুক্ত হবে বিভাগীয় খাতায় প্রেরিত পত্র হিসেবে। তারপর মহানির্দেশকের দপ্তরে নথিভুক্ত হবে বহিরাগত পত্র হিসেবে। তারপর মহামান্য মহানির্দেশক ওই চিঠিটিতে চোখ বোলাবেন। তিনি এটিকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়বেন, অনুধাবন করার চেষ্টা করবেন হয়ত এটা তাঁকে নাড়া দেবে। তারপর এটিকে হয়ত স্বাক্ষর করে হয়ত পাঠিয়ে দেবেন নির্দিষ্ট দপ্তরে। সেখানে হয়ত চিঠিটা মহানির্দেশকের দপ্তরের খাতায় নথিভুক্ত হতে পারে প্রেরিত পত্র হিসেবে। এরপর সেটি সংশ্লিষ্ট বিভাগে নথিভুক্ত

হবে আগতবার্তা হিসেবে। এভাবেই ব্যবস্থা নেওয়া হবে এবং তার একটা প্রতিলিপি পাঠানো হবে সংগ্রহশালার দপ্তরে, যেখান থেকে চিঠিটা তার যাত্রা শুরু করেছিল, তার কর্মসংক্রান্ত কাজের নথিভুক্তির জন্য। এইভাবেই পরিসমাপ্তি ঘটবে এক মহাজাগতিক কক্ষপথের, তারা জানবে যারা জানে না।

সে একদিনের জন্য খুশিতে মাতাল ছিল। কিন্তু দিন চলে যাচ্ছিল। তারপর কি? সবকিছুই কি নীরবতার গর্ভে বিলীন হয়ে যাবে? কিছুই ঘটল না। শুধু পবিত্র আগুন তার হৃদয়কে দগ্ধ করল। আল-হুসায়েনের কবরটাই ছিল তার দীর্ঘ প্রার্থনার সাক্ষী, সামনে বিস্তীর্ণ রাস্তা কিন্তু কোথাও এক বিন্দু আলোর চিহ্ন নেই, নিরন্ধ্র অন্ধকার সেখানে বিরাজমান। সে তার পাঠক্রম শেষ করল কিন্তু বন্ধ হল না সংস্কৃতির সন্ধান। এটা তার জ্ঞানপিপাসাকে পরিতৃপ্ত করেছে পরিশীলিত করেছে তার আধ্যাত্মিক যোগ্যতাকে। ভগবানের দয়ায় একদা সে সেখানে ছিল সেখানেই পরিপূর্ণতা লাভ করছিল। তাকে সমৃদ্ধ করছিল উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের ভীড়ে, তার দীর্ঘ তিক্ত জীবনযুদ্ধে, যেখানে সে সবাইয়ের জন্য প্রাণ দিতে অঙ্গীকারবদ্ধ। হঠাৎ নবাব হয়ে ওঠার পন্থা তার জানা ছিল না। কোন বিখ্যাত লোকের দেওয়া সুবিধে ভোগের চেষ্টাও সে করত না।

তার পেছনে কোন দলের সমর্থন ছিলনা। সে কখনও ভাঁড়, চাকর বা বেশ্যার দালালের চরিত্রে অবতীর্ণ হয় নি। সে সেই বিপর্যস্ত লোকগুলির অন্যতম, যে লভ্য অস্ত্রের সাহায্যে নিজেকে সুসজ্জিত করতে পারত, প্রতিটি সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে পারত, ভগবানের ওপর বিশ্বাস রেখে চিরন্তন জ্ঞানকে খুঁজতে চাইত। সে বিশ্বাস করত যে মানুষ মাটিতে পড়ে যায় আবার উঠে দাঁড়ানোর জন্য, ঘাম রক্ত ঝরিয়ে স্বর্গে থাকার জন্য।

সময় অতিক্রান্ত হতে হতে সংরক্ষণ বিভাগের সপ্তম স্তরে একটা পদ খালি হয়। ওই কর্মীটি বদলি হয়ে চলে যান অন্য মন্ত্রকে। সাফান বাসয়ুনি তাকে বললেন, "ওই পদে আমি তোমার নাম সুপারিশ করেছি। ওই কাজে তোমার চেয়ে বেশি দক্ষতার এই সংরক্ষণ বিভাগে কারুর নেই।

সে কৃতজ্ঞচিত্তে তার করমর্দন করল। তার ইচ্ছা করছিল ওই বৃদ্ধ মানুষটিকে তার চুম্বন করতে। তিনি আবার বললেন, "তুমি গত সাত বছর ধরে অষ্টম স্তরে কাজ করেছ। ওই সময়ের মধ্যে তুমি আইনের স্নাতক হয়েছে এবং সন্দেহাতীত দক্ষতা দেখিয়েছ।' লোকটা কুৎসিত দাঁত বার করে হেসে উঠে বলল, "ওটা তোমার বরাদ্দ তো নিশ্চয়ই। সাপ ও কীটপতঙ্গের সঙ্গে সহাবস্থানের পদে কোন লোকই আগ্রহী হয় না।"

দীর্ঘ প্রতীক্ষায় দিন ক্রমশ কেটে যাচ্ছিল। সে নিজের মনে বলল, একই পদে তো সাত বছর কাটিয়ে দিলাম। এভাবে চললে আমার অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে ৬৪ বছর লাগাবে। সে মহানির্দেশককে দেখেনি, সে নিজের হৃদয়ে পবিত্র শিখাটিকে দু হাত দিয়ে আগলে রেখেছিল। সেই সেদিন—যেদিন থেকে সে নতুন কর্মচারীদেব ভিড়ে দাঁড়িয়ে ছিল দর্শক হিসেবে। মহানির্দেশকের মন্ত্রক থেকে অবসর গ্রহণের দিনে তাঁর সম্মানে আয়োজিত জাঁকজমকপূর্ণ শোভাযাত্রাটি অফিস চত্বরের এককোণে দাঁড়িয়ে

দেখাটা তার কাছে সবচেয়ে উপভোগ্য ছিল। ওটাই ছিল তার লক্ষ্য, জীবনের অর্থ ও উচ্চাশা।

বার্ষিক ব্যয় বরাদ্দের ঠিক আগে আগেই দপ্তরে কাজের চাপ খুব বেড়ে গিয়েছিল। পরিচালন বিভাগের মহানির্দেশক তাঁর অধীনস্থ দপ্তর থেকে আরো কিছু আধিকারিককে তলব করলেন। সংরক্ষণ দপ্তর থেকে ওথমানের নাম পাঠানো হল। এতে বেশ খুশিই হল সে। ভাবল, এবার বোধহয় ঈশ্বর মুখ তুলে চাইলেন। সে বেশ আগ্রহের সঙ্গে নিজেকে ওই কাজের জন্য উপযোগী করে তুলল। সে হিসাবরক্ষক ও সহপরিচালকের সঙ্গে কাজ করছিল। সে ব্যক্তিগত উদ্যোগে প্রতিটি সভার পরিচালকদের সঙ্গে যোগদান করছিল। ঠিক একটা আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের মত।—যেন সে এই পরিবর্তনের জন্যই অপেক্ষা করছিল যেন এক তার হৃদয় সেই উচ্চাশার আগুনকে নিজের বুকের মধ্যে পুষে রেখেছে। সে তার পূর্বসূরীদের মতই সকাল থেকে মধ্য রাত্রি পর্যন্ত নিজেকে কাজে নিয়োগ করে রাখল। এই সব জটিল ও সঙ্কটমুহূর্তে তার দপ্তর যোগ্যতা ছাড়া বাকী সব কিছুতেই চোখ বন্ধ করে থাকত। বার্ষিক ব্যয়বরাদ্দ ব্যাপারটা ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ এতে যুক্ত ছিলেন মহানির্দেশক, রাজ্যের সচিব ও মন্ত্রী, রাজ্যসভা লোকসভা ও গণমাধ্যমের প্রতিনিধিরা। এইসব উদ্বেগ ও দায়িত্বপূর্ণ কাজে নিজেদের অকর্মণ্য তাঁবেদার লোকেদের কোনও সুযোগ ছিল না। স্বাভাবিক বাছাই ছিল এর প্রধান অঙ্গ, যেখানে ব্যক্তিগত যোগ্যতাই ছিল একমাত্র হাতিয়ার। কারণ কঠিন প্রতিযোগিতার মোকাবিলা করতে হত তাদের। যদিও পুরস্কারের ব্যাপার থাকত। ওথমান সহকর্মীদের আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠল, পুরোপুরি আত্মনির্ভরতা অর্জন করল। তার অভাবনীয় কর্মদক্ষতাই ছিল তার প্রমাণ, তার সেরকম জ্ঞান ছিল আইন ও বিধিব্যবস্থায়। যদিও সে যথেষ্ট সফলতা পায়নি, অনেকটা স্বেচ্ছায় নিজেকে নিয়োগ করল বার্ষিক ব্যয় বরাদ্দের বক্তব্য তৈরী করতে সেটার দায়িত্ব সাধারণতঃ মহানির্দেশকের ওপরেই থাকত। ঘটনাবশতঃ একদিন নির্দেশককে কিছু কাজ করতে দেখে তার মধ্যে একটা পরিবর্তন এল। কাগজপত্রগুলো দেখতে গিয়ে সে বিনীত ভাবে বলল, "নির্দেশক মহোদয়, কাজের সময় করে রাখা কয়েকটা ছোটখাট জিনিস আমি আপনাকে দেখাতে চাই। বার্ষিক ব্যয়বরাদ্দ ঠিক করার সময় সেগুলো কাজে লাগতে পারে।

হামজা-আল-সুয়োফি এই ব্যাপারটাকে খুব একটা গুরুত্ব দিলেন না। দয়াপরবশ হয়ে বললেন,

"সবাই বলে তুমি খুবই যোগ্য..."

"আমি এই প্রশংসার উপযুক্ত নই...।"

"যাই হোক, তোমায় অভিনন্দন। আজই তোমার সপ্তম পদের পদোন্নতির অনুমোদন হয়েছে।"

এটা ছিল ওথমানের জয়ের মুহূর্ত।

"আপনাকে ও আপনার সাহায্যের জন্য ধন্যবাদ।" সে কৃতজ্ঞচিত্তে বলল।

"আবার অভিনন্দন।" নির্দেশক হেসে বললেন।

"কিন্তু বার্ষিক ব্যয়বরাদ্দের বক্তব্যের ব্যাপারটা আলাদা।"

"আমাকে মাপ করুন স্যর, "ওথমান ক্ষমা প্রার্থনার সুরে বলল। "বার্ষিক ব্যয়বরাদ্দেব বক্তব্য নিয়ে কাজ করতে আমি ভয় পাই না।

এগুলো শুধু কাজের সময় লেখা টীকা মাত্র। আইন ও অর্থনীতি পড়া এক ছাত্রের কঠোর পরিশ্রমের ফল এটি। আপনার চূড়ান্ত বক্তব্য তৈরীর সময় এগুলো কাজে লাগতে পারে।

লোকটি সেই লেখাগুলো পড়তে শুরু করল আর ওথমান তাকে নিরীক্ষণ করতে লাগল। তাঁব মনে হল কাজগুলো বেশ চিত্তাকর্ষক। সেটা খুব স্বাভাবিক ছিল অবশ্য। শেষে একটা ছদ্ম গাম্ভীর্যে বলল,

"তোমার লেখার ধরনটা বেশ ভাল।"

"ধন্যবাদ।"

"মনে হয় তুমি একজন দারুণ পাঠক।"

"আমারও তাই ধারণা, মহাশয়।"

"তুমি কি পড়?

"সাহিত্য, মহাপুরুষদের আত্মজীবনী, ইংরেজি ও ফরাসী।"

"তুমি কি অনুবাদ করতে পার?"

"আমি অবসর সময়ে শব্দকোষ নাড়াচাড়া করি।"

হামজা আল সুয়েফি হেসে বলল—

"দারুণ। সৌভাগ্য তোমার সহায় হোক।

তিনি তাকে ওই টিকাগুলো নিয়ে যাওয়ার অনুমতি দিলেন। ওথমান আনন্দে আত্মহারা হয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। তার নিশ্চিত বিশ্বাস হল যে সেই আত্মবিশ্বাসই নির্দেশকের আস্থা অর্জন করেছে। যা সপ্তম স্তরের পদের চেয়েও বেশি মূল্যবান ছিল।

যখন খসড়া বার্ষিক ব্যয়বরাদ্দ ছাপা হল কয়েক মাস বাদে ওথমান উদ্বিগ্নভাবে সেটা পড়তে লাগল— সেখানের একটা অনুচ্ছেদ তার নিজের লেখা, নেই কোন পরিবর্তন তা হুবহু এক। সে চমকে উঠল, নিজের ভবিষ্যতের ওপর আশায় তার বুক ভরে উঠল। যদিও বুদ্ধিমানের মত সে এই গুপ্ত আনন্দের খবর কারুর কাছে ভাঙল না।

সংরক্ষণ থেকে বাজেট বিভাগে বদলি হয়ে আসতে তার খুব একটা সময় লাগল না। সে রাত্রে ঘরেব জানালায় দাঁড়িয়ে সে অন্ধকারে ডুবে যাওয়া গলির দিকে তাকিয়ে ছিল। চোখ তুলে দেখল আকাশে জেগে আছে অসংখ্য তারা। তাদের স্থির বলে মনে হচ্ছিল। কিন্তু পৃথিবীতে স্থির নয় কোন কিছুই। তার হঠাৎ মনে হল ওপবে তাকিয়ে দেখার জন্যই তারাদের সৃষ্টি করেছেন ঈশ্বর। কিন্তু দুঃখের ব্যাপাব হল এই যে, ওরা একদিন নীচে তাকিয়ে কিছুই দেখতে পারবে না। ঘামরক্ত ঝরিয়ে পৃথিবীতে গড়ে তোলা এই অস্তিত্ব চরম মূল্যহীন।

১২

"সংরক্ষণ বিভাগ থেকে তোমার বিদায়ে আমি দুঃখিত, আবার আনন্দিত তোমার এই যোগ্যতা অর্জনে।" সাফান বাসয়ুনি বললেন। আবেগময় পরিবেশে ওথমানের হৃদয় বিগলিত হত। নিজেকে হঠাৎ কর্তব্যসচেতন মনে হল তার। তার চোখে জল এসে গেল। সে বিড়বিড় করে বলল, "শ্রী বাসয়ুনি আপনাকে কখনও ভুলব না, সংরক্ষণ বিভাগে আমার দিনগুলোও আমার চিরদিন মনে থাকবে।"

"তুমি ছিলে বলে আমি খুশী ছিলাম।" ওথমান নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "আনন্দ খুব ক্ষণস্থায়ী।"

সাফান তার মন্তব্যের অর্থ না বুঝলেও ওথমান তার মধ্যেই ছিল। সে সময়কে তার পেছনে নিয়ে চলছিল আর প্রতি মুহূর্তে বেশ কষ্টও পাচ্ছিল। সে দ্রুত ভুলে গেল যে ব্যয়বরাদ্দ বিভাগে সপ্তম স্তরে সে উন্নীত হয়েছে। সে মন্ত্রকে কাজ করত ভূতে পাওয়া মানুষের মত আর তার সেই ছোট্ট ঘরেই চলত তার জ্ঞান আহরণের পালা। ঘটনাচক্রে একদিন সে নিজেকে বলল, জীবন যৌবন বহিয়া যায়। নদীর স্রোতের প্রায়-–থেমে থাকে না কিছুই।

তখনও সে তার লক্ষ্যের শুরুতে দাঁড়িয়ে। সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে তার ছটফটানি বেড়েই চলছিল। আর ততই দৃঢ় হচ্ছিল বাড়ির সঙ্গে তার টান। অর্থ যে নিরাপত্তা দেয় তাও সে বুঝতে পারল। হয়ত তার স্বপ্নের বধূর জন্য বরপণ হবে সেটা। তার স্বপ্নের বধূ খুলে দেবে বন্ধ দরজা আর ভবিষ্যতের গুপ্তধন বের করে আনবে গোপন জায়গা থেকে। কর্তাব্যক্তিরা এ ব্যাপারে উচ্চস্বরে প্রবাদ আওড়াবে বধূকে হতে হবে গর্বের বা সম্মানের পুরস্কার তা ছাড়া লাভ হবে না কিছুই। লক্ষ্যটা দীর্ঘ ও কষ্টকর, সেখানে সে চায় জয়ের আস্বাদ। রাজনীতিবিদ্‌দের সঙ্গে পরিবারের ভাল সম্পর্ক থাকায় ওই মহানির্দেশক অল্প বয়সেই এই উচ্চপদ লাভ করেন। গুজবটা ছড়াল ভালই ফলে উচ্চ বংশজাত এক সুন্দরী কন্যাকে বিবাহ করেন তিনি।

এইসঙ্গে এ গুজবটাও ছড়াল যে প্রথম সহনির্দেশকের উন্নতির মূলেও ছিলেন তাঁর স্ত্রী/বা বলা ভাল তাঁর শ্বশুরবাড়ীর পরিবার।

ওথমান সম্ভাব্য সব অস্ত্রেই নিজেকে সুসজ্জিত করে রেখেছিল। সে যদি কোন উচ্চ বংশজাত বধূর সহায়তা চায় তাহলে তাকে দোষারোপ করার কেউ নেই। এ ছাড়া নিষ্ঠুর সময়ের বিরুদ্ধে লড়াই সে করবেই-বা কিভাবে? সে তার আয় ও সঞ্চয় বাড়ানোর জন্য পত্র-পত্রিকায় অনুবাদের কাজ শুরু করল। এই কাজটা তার বিফলে যায়নি, কিন্তু তার দৈনন্দিন কষ্ট ঘোচাতে সে এক পয়সাও বেশি খরচ করত না। পৃথিবীতে মজা বলতে সে একটাই জানত—তা হল কাদ্রিয়ার কাছে সাপ্তাহিক সাক্ষাৎকার অর্ধ রৌপ্যমুদ্রার বিনিময়ে একপাত্র মদ। একদিন মেয়েটি বলল : তুমি এই পোষাকটা পাল্টাও না কেন। গত গ্রীষ্ম থেকে শীত অবধি এটাই পরে আছ। তোমার সঙ্গে পরিচয়ের প্রথম দিন থেকে আজ অবধি তোমাকে একই পোষাকে দেখছি।"

সে রেগে গেল কিন্তু কথা বলল না।

"রাগ করো না। আমি তোমাকে হাসিখুশী দেখতে চাই।"

"গত এক বছর ধরে তোমার পেছনে কত পয়সা উড়িয়েছি জান?" সে শান্তভাবে জিজ্ঞেস করল।

"একসময় একজনের জন্য আমি পাগল ছিলাম। সে আমার দুহাজার টাকা চুরি করে পালায়। তুমি জান সেটা কত টাকা?" সে তীর্যকভাবে বলল।

এই ধরনের বিপর্যয়ের সম্মুখীন হলে সে সবসময়ই ভগবানের কাছে মুক্তির উপায় প্রার্থনা করে।

"আর তুমি কি করেছিলে?" ওথমান জিজ্ঞেস করল।

"কিছু না। ভগবান আমাদের সুস্থ রেখেছেন সেটাই যথেষ্ট।

ছেলেটা নিজের মনে বলল, মেয়েটা যে হদ্দ পাগল সে বিষয়ে কোন সন্দেহই নেই। আর সেই কারণেই হয়ত সে রূপোজীবনী। কিন্তু মেয়েটাই ছিল তার দুঃসহ জীবনের একমাত্র বিনোদন। কারণ সেই দিতে পারত স্বস্তি। কখনও কখনও সে ভালোবাসাও তার মহিমা হাতড়ে বেড়াত। যেটা তার জীবনে অন্য মাত্রা এনে দিয়েছিল। সৈয়দার কথাও তার মনে পড়ত, আর মনে পড়ত সেই ঝরনার ধার ও মরুভূমিটা। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ভাগ্যের নির্মম পরিহাসের কাছে সে আত্মসমর্পণ করত। নিজের মনের যন্ত্রণাকে ঢাকা দিয়ে সে নিজের বিশ্বাসের জোরে অভীষ্ট লক্ষ্যের সন্ধানে এগিয়ে চলল, ঈশ্বর নির্দেশিত কঠিন পথ ধরে। একরাত্রে কাদ্রিয়া তাকে বলল,

"চল না শুক্রবার আমরা বনভোজনে যাই।"

ছেলেটা অবাক হয়ে বলল,

"আমি তো অন্ধকারে লুকিয়ে চোরের মত তোমার কাছে আসি..."

"তোমার ভয় কিসের?"

তার আর কিই-বা বলার ছিল। মেয়েটি কিছু বুঝল না। "কেউ আমাকে দেখে ফেললে সেটা ঠিক হবে না।" ছেলেটা ক্ষমার স্বরে বলল।

"তুমি কি অপরাধী?"

"লোকে..."

"শিং দিয়ে পৃথিবীবহন করা বলদ হচ্ছ তুমি..." মেয়েটি ব্যঙ্গ করে বলল।

ছেলেটা বেশ ভালোমানুষই ছিল, আর দায়দায়িত্ব নিতে পারত ভালই।

"তুমি সারারাত্রিই আমাকে ধরে রাখতে পার।" মেয়েটা লাস্যময়ী ভঙ্গীতে বলল। "আমরা একটা চুক্তিও করতে পারি।"

"আর তার খরচ?" ছেলেটা ক্লান্তস্বরে বলল। "পঞ্চাশ টাকা।"

সে উদ্বেগের সঙ্গে ব্যাপারটা মেনে নিল। ভয়ঙ্কর অর্থব্যয় হওয়া সত্ত্বেও এটা তাকে শান্তি এনে দেবে আর সেটাই তার অভিপ্রেত।

"দারুণ চিন্তা।" সে বলল। "প্রতি মাসে যদি এরকম একবার করে।"

"প্রতিমাসে একবারে তোমার সাধ মিটবে?"

"আমি বারবার আসতে পারি কিন্তু স্বাভাবিক ভাবে।"

ছেলেটা বুঝল যে সে মেয়েটাকে ছাড়া থাকতে পারবে না। তার সমবয়সী হওয়া সত্ত্বেও তাকে সময়ের প্রতি উদাসীন মনে হত। সে যেন ভালোবাসার মাধুর্য ছাড়াই বেঁচেছিল, যেন রাগ করেই সে মিলিত হয়েছিল এক শয়তানের সঙ্গে। সেটা যে তাকে কিভাবে নাড়া দিয়েছিল সেকথা সে একদিন স্বীকার করেছিল তার কাছে।

"একটা প্রদর্শনী?" সে রাগে চীৎকার করে উঠল।

"তাতে কি হয়েছে, হ্যাঁ একটা প্রদর্শনী—পেছনের রাস্তাটাকেও দেশহিতৈষী মনে হয়েছিল..."

সে মনে মনে বলল যে পাগলামি তার ভাবনার চেয়েও বেশি বিস্তৃত। রাজনৈতিক স্বার্থ তাকে চমৎকৃত করত। যদিও সে সেদিকে মনোযোগ না দেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। সে বিশ্বাস করত যে মানুষের পথ একটাই যার সঙ্গে সে একা তাল মেলাতে সক্ষম, আর যেটা সম্ভব রাজনৈতিকভাবে জড়িয়ে না পড়ে। এটা শুধুমাত্র ভগবান সম্পর্কে সচেতন একক ব্যক্তির পক্ষেই সম্ভব। তাঁর চাওয়াতেই পূর্ণতা পায় মানুষের মহত্ত্ব। মৃত্যুর আগের মুহূর্ত পর্যন্ত ভালো খারাপের পার্থক্যের মধ্যেই তা প্রতীয়মান হবে।

১৩

একদিন ওথমান কতকগুলো আকর্ষণীয় বিজ্ঞাপনের ওপর চোখ বোলাচ্ছিল। বিজ্ঞাপনটা ছিল এক ইংরেজি ও ফরাসী জানা অনুবাদকের সন্ধানে। এই পদের মাসিক বেতন ৩৫৮০ টাকা, সেটা আবার তার মন্ত্রক থেকেই দেওয়া হয়েছিল। একটা প্রতিযোগিতার দিনও নির্দ্দিষ্ট করা ছিল। সে দ্বিতীয় কোন চিন্তাভাবনা না করেই প্রতিযোগিতায় যোগ দিল। ফলে হল কি, সে জয়লাভও করল। আর তাতে তার আত্মনির্ভরতাও অনেকগুণ বেড়ে গেল, গর্ব বাড়ল তার জ্ঞান সম্বন্ধে। তাকে হামজা অল সুয়েফির সঙ্গে দেখা করতে বলা হল (কারণ এই স্বনিযুক্তিটা সম্পূর্ণভাবেই তার হাতে ছিল)

"তোমার সাফল্যকে অভিবাদন," তিনি বললেন। "তোমার প্রতিভা যে বহুমুখী এটাই তার প্রমাণ।"

ওথমান বিনীতভাবে তাকে ধন্যবাদ জানাল।

"কিন্তু ওই পদের বেতন কিন্তু নির্দ্দিষ্ট।" ভদ্রলোক মনে করিয়ে দিলেন। "তুমি যদি এটা গ্রহণ কর তাহলে সাধারণ পদোন্নতির তালিকা থেকে তুমি কিন্তু বাদ পড়বে। তুমি কি এ ব্যাপারে কিছু ভেবেছ?"

সে এটা এতদিন তলিয়ে দেখে নি, কিন্তু বোঝার পরেই উচ্চ বেতনের চাকুরী সম্পর্কে তার যেন মোহভঙ্গ হল।

"সত্যি বলতে কি আমি নিজেকে সাধারণ বেতনক্রম থেকে বাদ দিতে চাই না..." সে বলল।

"তাহলে আমরা পরবর্তী কর্মপ্রার্থীকে নিয়োগ করছি।"

ওথমান মুহূর্তের মধ্যে দক্ষ খেলোয়াড়ের মত পরিস্থিতিটা নিজের অনুকূলে নিয়ে নিল—তারপর উত্তর দিল—

"আমাকে কি ষষ্ঠ স্তরে উন্নীত করা যায় না আর সেই সঙ্গে অনুবাদকের কাজটা? তাহলে মন্ত্রকের টাকাও তো কিছুটা বাঁচবে।"

পরিচালন বিভাগের মহানির্দেশক দীর্ঘক্ষণ চিন্তা করে বললেন,

"ব্যাপারটা অভ্যন্তরীণ বিভাগ ও আইনমন্ত্রকের অনুধাবনযোগ্য।"

"ঠিক আছে মহাশয়।"

"তুমি উচ্চাকাঙ্ক্ষী হলেও জ্ঞানীও বটে, আমাব আশা তোমার প্রস্তাব বিবেচিত হবে।"

মাসিক আড়াই হাজার টাকা বেতনে তার ষষ্ঠ স্তরে পদোন্নতি ঘটল। প্রায় একশ টাকা মাসান্তে কম পেলেও এটা আরও একটা ধাপ পেরোনো হল, যেটা সে গত কয়েকমাস ধরে পারছিল না। এসব কিছু ছাড়াও এই দুটো চাকরির জন্য তার গুরুত্বও বেড়েছিল। তার আনন্দ হয়ে উঠেছিল বাঁধনছেঁড়া হঠাৎ মুক্তির আনন্দের মত। সে ফেলে আসা দীর্ঘ পথ পরিমাপ করতে শুরু করল আর তার অসীমতায় নিজেই ক্রুদ্ধ হয়ে উঠল। স্তরের প্রয়োজনীয়তা সে বুঝতে পারল যৌবনের শেষপ্রান্তে এসে। জীবনের নতুন এক অধ্যায়ে প্রবেশের সময়। সাফান বাসয়ুনি তাকে আলিঙ্গন করে বলল,

"তুমি একটা দারুণ দৌড় দিয়েছ, বাবা..."

"কিন্তু দিনগুলো চিন্তার চেয়েও বেশী দ্রুতগামী," সে ব্যঙ্গের স্বরে বলল।

"তারা তো দ্রুতগামী ঠিকই।" ঈশ্বর তোমাকে স্বর্গ থেকে রক্ষা করুন।"

"ওথমান তাঁর কোঁচকানো মুখের দিকে তাকিয়ে বলল," তোমার যৌবনকালের উচ্চাশা সম্পর্কে বল।"

"আমি? সবই ঈশ্বরের দয়া। সংরক্ষণ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত আধিকারিকের পদ ছিল আমার কাছে স্বপ্নাতীত।"

"আপনি কি কখনও মহানির্দেশক হবার চেষ্টা করেছিলেন?"

বৃদ্ধ লোকটির হাসতে হাসতে চোখের জল বেরিয়ে এল।

"আমার মত সাধারণ লোকেরা বিভাগীয় প্রধানের পদ ছাড়া কোন কিছুকেই লক্ষ্যবস্তু করতে পারে না।" তিনি বললেন।

সে ভুল করেছিল। মন্ত্রকে বা সচিব পর্যায়ের দপ্তরে পৌঁছবার ক্ষেত্রে তার কথাটাই যথার্থ। কিন্তু সাধারণের পক্ষে মহানির্দেশকের পদ অধিকার করা অসম্ভব ব্যাপার ছিল না। এটাই ছিল তাদের চূড়ান্ত আকাঙ্ক্ষা। বিশেষত যারা নিজেদের এই চূড়ান্ত লক্ষ্যের জন্য প্রস্তুত করে। কিন্তু দিনগুলো চুপিচুপি গুটিগুটি পায়ে চলে যাচ্ছিল। বেশ অনেকদিন ধরে আঁকড়ে রেখে এই পদটি উপভোগ করা না গেলে এর গুরুত্ব থাকে না বললেই

চলে। এর ছত্রছায়া ভালই উপভোগ্য হবে জীবনটা, কিন্তু চাকুরীজীবনের চূড়ান্ত যান্ত্রিক পরিষেবা দিতে হবে সরকারকেই।

কখনই বা সে তার ভাগ্যের চাহিদা মেটাতে যাবে? তার জীবনের লক্ষ্যপূরণের আগে না পরে? তার নিশ্চয়ই একটা পরিবার থাকতে হবে, পিতা হতে হবে—না হলে, তো সে অভিশপ্ত হয়ে থাকবে সারা জীবন। হয় বিবাহ মানুষকে এগিয়ে নিয়ে যাবে মহত্তর জীবনের লক্ষ্যে যা আকর্ষণ করবে এক অপরূপা বধূকে। ক্রোধের তীব্রতায় কখনও কখনও সে ঝুঁকবে শান্তি ও অবসরের দিকে যেমন সে জীবনের মাঝে খুঁজে পেয়েছিল কঠোর শ্রম ও পবিত্র মন্ত্রণার মাধ্যমে। একদিন সে শুনতে পেল যে পরিচালন বিভাগের মহানির্দেশক তারস্বরে অভিযোগ জানাচ্ছেন কি, না তাঁর ছেলে স্কুলে কোন বিদেশী ভাষায় পিছিয়ে পড়েছে। ওথমান সাহায্যের জন্য এগিয়ে গেল। হামজা ইতস্তত করে বলেন : আমি বরং ওর জন্য একজন গৃহশিক্ষক রেখে দিই। আমি চাই না তুমি ওর পেছনে সময় নষ্ট কর। ওথমান তার স্বাভাবিক সৌজন্য দেখিয়ে উত্তর দিল, "বড়বাবু, আপনার কথাটা আমি মানতে পারলাম না।"

তারপর থেকেই সে নিয়মিত মহানির্দেশকের বাড়িতে আসা-যাওয়া করতে লাগল। আর ছেলেটার সঙ্গে তার সমস্যাগুলো ভাগ করে নিল। ফলে ছেলেটা পরীক্ষায় বেশ ভালই ফল করল। তার বড়কর্তা তাকে পুরস্কৃত করতে গেলে সে ছেঁকা খাওয়ার মত গুটিয়ে গেল।

"আমি আপনার কাছে এরকম কিছু প্রত্যাশা করিনা..." সে নিজের জায়গায় দাঁড়িয়ে রইল যতক্ষণ না হামজা সেটা মেনে নেন। তারপর দৃঢ় গলায় বলল—

"আপনার দয়া ও উৎসাহে আমি অনেক কিছু লাভ করেছি।

তবে তার হৃদয়ের যন্ত্রণাবোধও তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল। ঠিক যেমন হয়েছিল চাকরির অতিরিক্ত পারিশ্রমিক না নেওয়ার জন্য। কিন্তু হামজার বাড়িতে কষ্ট পাবার জন্য ওটাই একমাত্র হতাশা ছিল না। তাই সে সেখানে একটি সুন্দর, সুসজ্জিতা বধূর স্বপ্ন দেখত। কে বলতে পারে যে সেটা হবে না? হয়ত একদিন হামজা অল সুয়েফির মতই তার পদোন্নতি হবে কিংবা তিনি হয়ত তার বংশ মর্যাদা/ঠিকুজীর দিকে না তাকিয়েই তাকে এক উচ্চ শ্রেণীতে প্রবেশাধিকার দেবেন, যেটা তার জীবনের উন্নতির সহায়ক হবে।

কিন্তু তার স্বপ্ন সত্যি হল না। যাদের সঙ্গে তার আলাপ পরিচয় হল তারা সবাই পুরুষ। সাফান বাসয়ুনি কোনদিনই তার বংশমর্যাদার দিকে তাকান নি। আর তাদের দুজনের বংশমর্যাদা প্রায় এক রকমই ছিল। সুতরাং তাঁর কন্যাকে বিয়ে করলে তার লাভটা কি হবে? সন্তান, সান্নিধ্য ও সম্পদহীনতা ছাড়া আর কি জুটবে? এমনকি ভালোবাসাও নয়। সে ভালোবেসেছিল একমাত্র সৈয়দাকেই আর তাকে ছেড়ে আসা পর্যন্ত হৃদয় শুষ্ক মরুভূমি। কিন্তু যারা আধ্যাত্মিক পথের লক্ষ্যে চলে তারা পার্থিব সুখের সঙ্গে নিজেদের যুক্ত করে না।

সময় নিজের নিয়মে বয়ে যেতে থাকে। গ্রীষ্মের দাবদাহের দিনগুলো, শরতের স্বপ্নের দিন, নিষ্ঠুর শীতের দিন ও বসন্তের সুরভিত দিন সবই পেরিয়ে যায়। সে ধৈর্য্যসহকারে উচ্চাকাঙ্ক্ষা পোষণ করত, যদিও তাতে মিশে থাকত হৃদয়বেদনার তিক্ততা ও অতৃপ্ত ইচ্ছা।

১৪

ওম হুসনি একদিন তাকে দেখতে এল নিজের থেকেই। হুসনি তাকে এক গ্রাম লেবু লঙ্কার আচার ভর্তি একটা কৌটো উপহার দিল তাকে। আর বসে পড়ে তাকে গভীর মনোযোগ সহকারে দেখতে লাগল। ওথমানের কাছেও ব্যাপারটা খুব অদ্ভুত লাগছিল। আচমকা সে হাঁটুতে চাপড় মেরে বলল,

"হুসেনের নামে শপথ করে বলছি তোমার একাকীত্ব আমার অসহ্য ঠেকছে।"

সে নিরুত্তরে হাসল।

"তুমি কি তোমার বয়সের দিকে দেখছ না?"

"হুসনি, ব্যাপারটা...।"

"বছর কেটে যাওয়ার মত ভয়ঙ্কর কি কিছু আছে?"

"ঠিকই ধরেছ।"

"তোমাকে সঙ্গ দেবার মত ছেলেমেয়ে কোথায়?"

"তারা এখনও ভবিষ্যতের গর্ভে," সে একটুখানি চুপ করে থেকে হাসতে হাসতে বলল, "তোমার হাবভাবটা ঘটকের মত লাগছে।

হুসনি একটু হেসে বলল

"শোনো, আমি বিশেষ একটা কিছুর সন্ধান পেয়েছি।"

তার রহস্যে মোড়া কথাবার্তা তাকে আকর্ষণ করল।

"তুমি সবসময়ই বিশেষ কিছু পাও।"

"এক সুন্দরী মধ্যবয়সী বিধবা", সে আশ্বাম্বিতা হয়ে উঠল। সচেতন এবং চত্বরের প্রয়াত শেখের জন্য

"আহ্?"

"তার একটা চোদ্দ বছরের মেয়ে আছে।"

"তাহলে একের বদলে দুই নারী..."

"তুমি এ ব্যাপারে নিশ্চিন্ত থাকতে পার, সে তার কাকার বাড়িতেই থাকবে।"

"দারুণ।"

"তোমার ভাবীবউ একটা বাড়ির মালিক।"

"সত্যি?"

"বিরজয়ানে তাদের একটা বিশাল ফলের বাগানও আছে।" সে আগ্রহের দৃষ্টিতে তার প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করতে লাগল। ছেলেটার মনে রঙ ধরেছে ভেবে সে আবার বলল,

"তুমি নিজেই সব দেখেশুনে এস।"

হুসনি তাকে অল সিক্কা অল জাদীদার দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করল। তার গায়ে ছিল শুধু একটা কোট। কিন্তু তার হাঁটা দেখলেই বোঝা যায় যে সেটা আলখাল্লা পরা লম্বা নেটিভদের কাছ থেকে শেখা। মেয়েটা ছিল বেঁটে, মোটা, গোলগাল মুখ ও একরাশ কালো চুলের অধিকারী। ঠিক কাদ্রিয়ার মতই তাকে দেখে আদিম বাসনা উদগ্র হয়ে উঠল। সে ফিটফাট হলেও সমস্যা ছিল খুবই বেশি। ওম হুসনির জন্য তার বেশ দুঃখই হল কারণ, এত দিনের পরিচিত সত্ত্বেও সে কত অল্প জানে তার ব্যাপারে। একজন সাধারণ করণিক বা অনুবাদকের কাছে এর মানে সে কিইবা বুঝবে? মানুষের জন্ম মাটিতে, পরে হয়ত তার জায়গা হবে তারামণ্ডলে আর এটাই তার করুণ পরিণতি।

'কি ভাবছ?' হুসনি জিজ্ঞেস করল।

"ভদ্রমহিলা দারুণ", সে হাসতে হাসতে বলল, "আর তুমি একজন পাক্কা খেলোয়াড়।"

"আমি কি কথা বলব?"

'না', সে শান্তভাবে বলল।

"তুমি বললে না যে সে বেশ সুন্দরী?"

"কিন্তু সে আমার স্ত্রী হওয়ার উপযুক্ত নয়।

"কিন্তু বৃদ্ধা বেশ জেদী ছিলেন। এক দুপুরে তিনি আবার এসে বললেন,

"কি দারুণ যোগাযোগ, মাদাম সানিয়া আমার বাড়িতে এসেছেন।"

তার মধ্যে সেই আদিম কামনা জেগে উঠল। সে তাতে আত্মসমর্পণ করল। ওম হুসনি আবার জোর দিয়ে বলল,

"সে আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে।"

"কোনদিন হয়ত আমার সঙ্গেও দেখা করতে আসবে," সে দুষ্টুমি করে বলল।

"তোমার ইচ্ছে হলে আসতে পারো..." চলে যাবার ভান করল।

সে দ্বিধা না করে নীচে গেল। নিস্তব্ধতার মধ্যে ওম হুসনি একটানা কথা বলে যেতে লাগল। ওথমানের মনে পড়ল সৈয়দা ছাড়া কারুর সঙ্গেই সে গম্ভীরভাবে কথা বলেনি।

"এটা একটা সম্মান..." সে কৃতজ্ঞতার সঙ্গে বলল।

"ধন্যবাদ", মেয়েটি অস্ফুটে বলল।

"বেশ ঠাণ্ডা পড়েছে।"

"হ্যাঁ"।

ওম হুসনি জিজ্ঞেস করল :

"বাড়ি সাজানো শেষ হয়েছে?"

মেয়েটি মাথা নাড়ল।

হুসনি চেষ্টা করল ওথমানের পদমর্যাদা নিয়ে আলোচনা করতে, কিন্তু সেটা জমল না। সে কামনার আশাহীন আগুনে দগ্ধ হচ্ছিল। সানিয়া উঠে পড়তেই সেও উঠে দাঁড়াল। কিন্তু তার ঘরে যাবার বদলে নীচে গিয়ে ঠাণ্ডা মাথায় একটা মতলব ভাঁজতে লাগল। সে মেয়েটির পদ শব্দ সিঁড়িতে শুনতে পেল। মেয়েটি তাকে দেখে রীতিমত চমকে গেল। সে চমকে যাবার ভান করে বলল, "তোমার সঙ্গে দেখা করে ভাল লাগল।"

তাকে যাবার রাস্তা ছেড়ে দিয়ে ফিসফিস করে বলল,

"চা খাবে না?"

"না, ধন্যবাদ", সে দমবন্ধ করে বলল।

"দয়া করে চলো, আমার কিছু বলার আছে।"

'না', সে প্রতিবাদ জানাল।

সে প্রায় দৌড়েই চলে গেল। তার মনে হচ্ছিল উত্তেজনায় তার পা কাঁপছে। সে কিভাবে গ্রহণ কববে বলে ওথমান ভেবেছি? যৌন আবেদন, ইচ্ছা ইত্যাদি নিয়ে সে কি করবে? সে রাগে লজ্জায় সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগল। সে কিশোর হয়েই থাকবে। নিজেকে বোঝাল যতক্ষণ সে না একটা সম্ভ্রান্ত পরিবারের সঙ্গে যুক্ত হতে পারছে।

১৫

ধারাবাহিকভাবেই তার উন্নতি হচ্ছিল। বাড়ছিল তার মাহিনা, সখের অনুবাদক হিসেবে তার আয়টাও ভালই হচ্ছিল। বেহিসেবি জীবনযাপন না করার জন্য ডাকঘরে তার সঞ্চয়ের অঙ্কটাও বেড়ে চলছিল। কাজের প্রতি ভালবাসা তার কখনও শিথিল হয় নি। এই কারণে তার বড় কর্ত্তার সঙ্গে তার সম্পর্কটা ছিল খুবই নিবিড় প্রায় বন্ধুর মত। একদিন হামজা তাকে বললেন, "মহানুভব মহানির্দেশক তোমার এই অনুবাদের ধরনে খুব খুশি।"

এক অনাবিল আনন্দে তার মন ভরে গেল। সে নিশ্চিতভাবে বুঝতে পারল যে রাতে তার এক ঘণ্টাও ঘুম হবে না। বাস্তবিক মহানির্দেশক ব্যক্তিগতভাবে তাকে চিনতেন না কিন্তু সে তার কাছে পরিচিত ছিল একটা বিমূর্ত নাম হিসেবে। পরিচালন দপ্তরের পরিচালক বলতে লাগলেন, "মহানুভব মহানির্দেশক নিজেও একজন বড় অনুবাদক।

তিনি নিজে অনেক গুরুত্বপূর্ণ বইয়ের অনুবাদ করেছেন। তিনি তোমার কাজের প্রশংসা অবশ্যই জেনে বুঝেই করেছেন। এ ব্যাপারে তিনি যথেষ্টই ওয়াকিবহাল।

সে গদ্‌গদ্ স্বরে বলল, "আমি আপনার মাধ্যমেই মহানুভবের স্বীকৃতি পেলাম।"

পরিচালক হাসতে হাসতে বললেন, "সরকারী কর্মী সভা আমাকে ভাষণ দেবার জন্য আহ্বান জানিয়েছে। বিষয়টা আমি মোটামুটি ঠিক করে নিয়েছি। কেমন হবে বলো তো, যদি আমি তোমার লেখার ধারাটা অনুকরণ করি?"

সে প্রচণ্ড উৎসাহের সঙ্গে বলল, "দা-রু-ণ হবে।"

সে প্রতিদিনই একইরকম কাজ আশা করছিল। প্রত্যেকেই বিভাগে তার কাজকর্মের প্রশংসায় পঞ্চমুখ ছিল। কিন্তু তার নিজের মনে হচ্ছিল যে সেটা যথেষ্ট নয়। সে তার অসীম দক্ষতা, কর্মকুশলতা ও প্রয়োজনীয়তা বোঝানোর জন্য সে তার দপ্তরের প্রবীণদের কাজগুলো করা শুরু করেছিল। এটাকে সে তার উচ্চাশার ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশ হিসেবে গণ্য করত। তার অভীষ্ট লক্ষ্যের পথে এটা হয়ত তাকে কিছুটা আরাম বা শান্তি দেবে। রাত্রে সে এক অব্যক্ত যন্ত্রণায় চীৎকার করে কেঁদে উঠল।

"কি পাগলামো। কিভাবে আমি আমার অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছনোর আশা করি?"

ক্ষমতার সর্ব্বোচ্চ বিন্দুতে পৌঁছনোর জন্য কতকগুলো পদ বেরুতে হবে সে তাই গুণতে লাগল। পঞ্চম পদ, চতুর্থ, তৃতীয়, দ্বিতীয়, প্রথম। সে পদগুলো গুণতে লাগল আর গুণতে লাগল জীবনের কতকগুলো বছর অতিবাহিত হবে ওই পদগুলোর জন্য। সে বেশ হতাশই হয়ে পড়ল এবং এক গভীর দুঃখের অনুভূতি ছেয়ে গেল তার মনে। সে নিজের মনে বলল, বিরাট একটা কিছু ঘটবেই, তার জীবন বৃথা যাবে না। যেহেতু একটা চায়ের দোকানে সাফান বাসয়ুনির সঙ্গে তার দেখা করার কথা ছিল সে পোষাক পাল্টে বেরিয়ে পড়ল। সিঁড়ির নীচে সে ওম হুসনিকে তার জন্য অপেক্ষারত দেখতে পেল।

"বাড়িতে কয়েকজন অতিথি এসেছেন, তুমি তাদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করে যাও। সৈইদা ও তার মা এসেছেন।"

সে ঘরে ঢুকে তাদের অভিবাদন জানালো। প্রথমে তার একটু আশঙ্কা হয়েছিল কিন্তু সে খুব দ্রুত উপলব্ধি করল যে পুরো ব্যাপারটাই তো অতীত, সবটাই কবর চাপা পড়ে গেছে। ঘৃণা বা করুণার দৃষ্টিতে নয়, কিন্তু সে এমনভাবে তাদের দিকে তাকাল যে কস্মিনকালেও যেন তাদের চেনে না। সে নিশ্চিত হল এই ভেবে যে কালের গহ্বরে সবকিছু চিরবিলীন হয়ে গেছে, ইতিহাস নিজেই ইতিহাস হয়ে গেছে। তবে তার গভীর সচেতনতাকে যা নাড়া দিল তা হল তার এককালের সম্ভাব্য ভাবী শাশুড়ীর উষ্ণ অভ্যর্থনা। সে দেখতে পেল মৃত্যু তার চিরন্তন মানসী প্রিয়ার প্রতিমূর্তিকে গ্রাস করে নিচ্ছে। আর সবকিছুই একটা দূরতম স্মৃতিতে পর্যবসিত যার বাস্তব অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া কঠিন। অনেকটা স্বর্গের উদ্যানের আদম-এর মতই। সেখানে সৈয়দা বসে ছিল হোঁৎকা ও নির্বোধের মত। সে তাকে কাদ্রিয়ার কথা মনে পড়িয়ে দিল আর ক্ষোভ বাড়িয়ে দিল। তার ওড়নাটা মাথা থেকে কাঁধের ওপরে পড়ে গেল। ফলে তার মাথা ও কাঁধ হয়ে পড়েছিল। সুতোর কাজ করা রুমালটা নেমে গিয়ে তার চকচকে কপালও অনাবৃত করে দিয়েছিল। তার চোখের যে মদিরতার টানে সে ছুটে আসত সেটা ক্রমশই ফুরিয়ে যাচ্ছিল। সাক্ষাৎকারটা নেহাৎই প্রাণহীন ছিল আর একটা আন্তরিক দূরত্ববোধ তাকে পীড়িত করছিল। সে বৃথাই তার পুরু ঠোঁটদুটিতে তার চুম্বনের স্মৃতি খোঁজার চেষ্টা করছিল। সৌজন্য প্রকাশের জন্যই সে খানিকক্ষণ বসল, সে যখন উঠতে গেল তখনই তার হৃদয়ে স্পন্দন শুরু হল। একটা অজানা অদ্ভুত ব্যাপার অনুভব করল যা

একাধারে কোমল ও নিষ্ঠুর। সে তার আগেকার বড়কর্তার সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছিল কয়েকদিন বাদেই যাঁর অবসর নেবার কথা। তিনি একটা মধুর সন্ধ্যাও তার সঙ্গে কাটিয়েছিলেন। বৃদ্ধ লোকটি শীর্ণকায়, বিরলকেশ, যতটা না বার্ধক্যের জন্য তার চেয়েও বেশি পেটের রোগে। কিন্তু তখনও সমান দয়ালু আন্তরিক ঠিক যেমন আগে ছিলেন। যদিও চাকরি জীবনের শেষ দিনগুলিতে তিনি খুবই মানসিক অবসাদের সম্মুখীন হয়েছিলেন। ওথমান তাকে আনন্দ দেবার চেষ্টা করছিল, "আশা করি অবসর জীবন আপনার সুখের হবে।"

"আমি ভাবতে পারছি না যে জীবনটা আমার সংগ্রহশালার বাইরে থাকবে।" বৃদ্ধের মুখে অকারণ হাসি দেখা গেল।" আর আমাকে ব্যস্ত রাখার মত কোন শখও নেই। আর ওটাই আমায় সবচেয়ে হতাশ করেছে। তিনি নিঃশ্বাস ফেলে বললেন।

"কিন্তু আপনি খুবই জনপ্রিয়, সবাই তো খুবই ভালবাসে আপনাকে।"

"সত্যি, কিন্তু আমার কোনো পারিবারিক দায় নেই। কিন্তু তবুও আমার ভয় হয়।

তারা চায়ে চুমুক দিল আর সেই ফাঁকে ওথমান তারদিকে করুণার দৃষ্টিতে দেখল। তিনি বলে চললেন,

"আমি এখনও সরকারী দপ্তরে আমার নিয়োগের প্রথম দিনটা মনে করতে পারি। যেন ঠিক কালকের মত। এটা একটা অবিস্মরণীয় মুহূর্তে একটা বিয়ের রাতের মত। এর প্রতিটি ঘটনাই আমার কাছে পরিচিত। জীবন যে কিভাবে এত দ্রুত শেষ হয়?

"হ্যাঁ", ওথমান যন্ত্রণা বিদ্ধ হৃদয়ে বলল। আর অন্য পাঁচটা ব্যাপারের মত। লোকটা তার দিকে তাকিয়ে হাসল যেন মন পাল্টানোর মত করে বলল—।

"তোমার পারিবারিক দায়ের ব্যাপারে বল।" তার মিথ্যা দাবী মনে পড়ল আর সে উত্তর দিল,

"দায়টা এখনও দুর্বহ।"

"তোমায় যখন আমি প্রথম কাজে নিই তখন তুমি সদ্য যুবক," সে আবেগমথিত কণ্ঠে বলল। আর এখন তুমি এক পূর্ণবয়স্ক পুরুষ, আর খুব শিগগিরিই...যাই হোক একটা ব্যাপারে তুমি নিশ্চিত থাকতে পার, সময় তোমায় ঠকাবে না। খুব সতর্ক থেক।"

"সুন্দর! তা দিয়ে আর কি হবে?"

"যত যাই হোক, জীবনটা তুমি বয়ে যেতে দিয়ো না।"

"তুমি কি বিয়ের কথা বলছো?"

"সব ব্যাপারেই। আপনাকে দেখে মনে হয় আপনি আমার খেয়াল রাখছেন। কিন্তু কেন? আর কদ্দিন অবধি?"

"কিন্তু জীবনটা ওইরকমই।"

লোকটি প্রতিবাদের ঢঙে হাত নেড়ে বলল।

"আমরা সবাই জীবন সম্পর্কে এমন নিশ্চিতভাবে কথা বলি যেন আমরা এর সত্যতা সম্বন্ধে জানি।"

"কিন্তু আমাদের পক্ষে এর বেশি কিইবা করা সম্ভব?"

"ভগবানের উপস্থিতিহীন জীবনটা একটা হেরে যাওয়া খেলার মত, যার কোনো মানে নেই।"

"আমাদের ভাগ্য ভাল যে তিনি বিরাজমান, এবং তিনি ভালোভাবেই জানেন যে তিনি আমাদের চেয়ে ভাল করে সব করতে পারেন।"

"ভগবানকে তার জন্য ধন্যবাদ।" বৃদ্ধ লোকটি অনুভূতির সঙ্গে বললেন।

কিছুক্ষণ চুপ থেকে আবার তারা কথা শুরু করল, আবার থামল, আবার শুরু করল, এইভাবে চলতে লাগল যতক্ষণ না বিদায় নেবার সময় আসে। ওথমানের মনে হল সে আর কখনও তাঁর সঙ্গে দেখা করবে না। তাদের মধ্যে কোন সম্পর্কই ছিল না। তার দিক থেকে পুরোনো বন্ধুত্ব সুলভ ভাব ও কর্তব্যবোধ ছাড়া। তা সত্ত্বেও সে তাঁর কথা ভাবে কোনো কোনো মুহূর্তে এবং ভাবে আবেগহীনভাবে। করমর্দনের সময় বৃদ্ধ বললেন,

"আমার বিশ্বাস যে তুমি আমায় ভুলবে না।"

"ঈশ্বর না করুন", সে আবেগের সঙ্গে বলল।

"বিস্মৃতির অর্থ মৃত্যু," সাফান অনুনয়ের ভঙ্গীতে বললেন।

"ভগবান তোমায় দীর্ঘজীবি করুন।"

তাঁর সঙ্গে আবার দেখা করার কোন ইচ্ছে ওথমানের ছিল না। শুধু মাত্র আবেগতাড়িত হয়ে সে তাকে বিদায় জানাতে আসেনি। অকৃতজ্ঞতার ভয়েই তার সেখানে আসা। এই কারণেই সে বিবেকের দংশনে কাতর হচ্ছিল, আর তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল তার ভগবানভীতি। সে চারদিকের কোন ব্যাপারে দৃকপাত না করেই চলে গেল। নিজেকে ছাড়া তার চিন্তা সীমাবদ্ধ ছিল পঞ্চম স্তরের একটা পদের দিকে যা কয়েকদিনের মধ্যেই শূন্য হওয়ার কথা।

পরিচালন দপ্তরের বড়বাবুর সঙ্গে তার বোঝাপড়াটা তখন দারুণ, কোন অবস্থাতেই তার সামনে কোন বাধা ছিল না।

ফলে আর কয়েকমাস বাদেই সে পঞ্চম পদে উন্নীত হল আর ওই দপ্তরের প্রধান হল।

১৬

সবুরে মেওয়া ফলে। ওথমানের পরবর্তী পদক্ষেপ বেশ তাৎপর্যপূর্ণ ছিল। এর ফলে তার সুবিধা হয়েছিল যে সে সরাসরি বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ চিঠিপত্র ও তার মতামত সম্বলিত নথি সরাসবি পাঠাতে পারত সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষের কাছে। সেগুলো যাতে যথাযথভাবে পালিত হয় সে ব্যাপারে দৃষ্টি দেওয়ার আবেদন রাখত। ভগবান শেষ পর্যন্ত তার প্রতি সদয় হওয়ায় এক স্বর্গের দরজা যেন তার সামনে খুলে গিয়েছিল। এটা তাকে নম্রভাবে পরিচালন ব্যবস্থার কাছে উপস্থিত করল। তার নিজের সমস্ত অভিজ্ঞতা, সংস্কৃতি, স্বচ্ছতা

ও কর্তব্য সচেতনতা প্রকাশের সুবর্ণ সুযোগ ছিল এটিই। এই সেই ঘর, দেখতে অনেকটা চত্বরের মত। যেখানে সে একদিন শাসন করার স্বপ্ন দেখত। স্বপ্নটা ছিল বাস্তব হওয়ার মতই, এর বিনিময়ে যে কি প্রতিদান দেওয়া হল সেটা কোনও ব্যাপারই নয়। একটা স্বপ্ন যাতে হাত দেবার অধিকার কারুর নেই, এটি সেই বুদ্ধিমানদের স্বার্থ দেখে যারা একে সস্তা ও তুচ্ছ আনন্দের বিনিময়ে কেনে।

সে সেই প্রশস্ত ঘরটা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পর্যবেক্ষণ করল। মসৃণ সাদা ছাদ, স্ফটিকে খোদিত থাম, পরিচ্ছন্নভাবে সজ্জিত দেওয়াল, ভেতরে ঢোকানো ফায়ারপ্লেস, নীল গালিচা, যার সৌন্দর্য কল্পনাতীত। সবুজ বনাতে মোড়া আলোচনার টেবিল, সুন্দর কারুকার্যকরা মজবুত খোদাই করা পায়াওয়ালা কাঠের টেবিল যার ওপর সাজানো আছে একাধিক রূপোর মূর্তি। কলমদান, কালিরপাত্র কলম, ঘড়ি, শেষাকাগজ, ছাইদান এমনকি একটি খান অল খালিলির কাঠের সিগারেট কেসও রাখা ছিল সেখানে।

বড় চেয়ারটায় বসার পর সে প্রচুর সময় পেল তার মহানির্দেশক কি করেন তা দেখার। তীক্ষ্ণ কালো চোখ, নিখুঁত কামানো মুখ, গাঢ় লাল রঙের ফেজ টুপি, সারা গা দিয়ে বেরুচ্ছে একটা সুমিষ্ট গন্ধ মাঝারি চওড়া গোঁফ, সারা দেহ প্রাণ প্রাচুর্যে ভবপুর। তাব স্ফীতোদরের জন্য প্রকৃত উচ্চতা বোঝা যায় না। সর্বোপরি তাকে ঘিরে এক অনমণীয় কাঠিন্য ও গাম্ভীর্যের বাতাবরণ বন্ধুত্বের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছিল। সেখানে ওথমান দাঁড়িয়ে আছে দর্শকাসনে, মহানির্দেশকের নিঃশ্বাস প্রশ্বাস এমনকি সুরভীর সঙ্গে ওয়াকিবহাল অথচ সচেতন হয়ে। সে তাঁর নাড়ীর স্পন্দন শুনতে পারছিল এমনকি বুঝতে পারছিল তিনি কি ভাবছেন। সে দাঁড়িয়েছিল মহানির্দেশকের ইচ্ছেগুলো পড়ে নিয়ে তামিল করতে, প্রায় উচ্চারিত হওয়ার আগেই। তাঁর হাসির ছটায় সে নিজের ভাগ্যটা পড়ে নিল এবং তার প্রিয় স্বপ্ন হল যে একদিন সে ওই পদে আসীন হবে।

নির্দ্দিষ্ট দূরত্ব বজায় রেখে সে বিনম্রভাবে অভিবাদন জানিয়ে বলল, "সুপ্রভাত, মহানুভব।"

লোকটি মুখ তুলে দেখে একই ধরনের উত্তর দিলেন।

"ওথমান বাসয়ুনি, সংরক্ষণ বিভাগের প্রধান," এইভাবেই সে নিজেকে উপস্থাপিত করল। ওথমান তাঁর কোঁচকানো ভুরুতে হাসির আভাস দেখতে পেল, যদিও তার ঠোঁটে হাসির চিহ্নমাত্র ছিল না।

"নতুন কর্মচারী স্যার," সে বলল।

"আর অনুবাদক। তাই না?"

"হ্যাঁ মহানুভব", সে উত্তর দিল, তার হৃৎস্পন্দন ক্রমশ বাড়ছিল।

"তোমার ধরনটা ভাল," তিনি বেশ নীচু স্ববে বললেন।

"আপনার উৎসাহ প্রদানটাই আমার কাছে সর্বোচ্চ সম্মানের।"

"কোন জরুরী চিঠি আছে কি?"

সে উৎসাহের সঙ্গে খামটা খুলতে শুরু করল। সে মহানির্দেশককে সূচীগুলো দেখানোর সঙ্গে সঙ্গে দ্রুততার সঙ্গে নির্দেশগুলো লিখে নিচ্ছিল। সে মাথা ঝুঁকিয়ে অভিবাদন জানিয়ে আনন্দে আত্মহারা হয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। দপ্তরে ফেরার পথে সে ভাবতে লাগল হামজা অল সুয়েফি কিভাবে আলোকবৃত্ত থেকে ছায়াবৃত্তে সরে গেলেন। যতক্ষণ না এই আঁধার তাঁকে গ্রাস করছে যা বাসয়ুনিকেও গ্রাস করেছিল, আর কিভাবে এই মুহূর্ত থেকে তার ভবিষ্যত (ঈশ্বরের পরেই) নির্ধারিত হচ্ছিল মহানির্দেশকের হাতে।

"শ্লথ উন্নতির থেকে সাবধান, ওথমান," সে নিজেকে বলল। "দু এক ধাপ এগিয়ে যাওয়াই খুব জরুরী।

"সাফান বাসয়ুনি অবসরের আগের ছমাস একই পদে ছিল," সে আবার নিজেকে বলল।

সে ভালভাবেই জানত যে তাদের দপ্তরে দুজন সহপরিচালক আছেন। সুতরাং একধাপ এগোতে হলে হামজা-অল-সুয়েফির সাহায্য ছাড়া সম্ভব নয়। নতুবা তাঁর পদোন্নতি, অবসর... বা মৃত্যু। এই চিন্তা তাকে লজ্জায় ফেলল। যেহেতু মাঝে মাঝেই তার মনে এরকম চিন্তা আসে, তাই সে ভগবানের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করল।

"ভগবান কেন তাদের এরকম দুর্নীতিগ্রস্ত রূপ দিয়েছেন?" সে ভাবল।

সে নিজের চরিত্রের ব্যাপারে বেশ খুশি ছিল, কিন্তু নিজেকে সে পূর্বাবস্থায় ফিরে পেতে চাইত। সে বিশ্বাস করত যে তার পবিত্র লক্ষ্য পথের উভয় দিকে ভাল ও মন্দের একটা সংঘাত চলছে নিরন্তর কিন্তু এর কোন প্রভাব তার ওপর পড়বে না শুধুমাত্র একটু দুর্বলতা, চিত্তবৈকল্য আত্মতৃপ্তি, ছোটখাট খুশীকে প্রাধান্য দেওয়া ও দিবাস্বপ্ন ছাড়া। সে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করল, "হে সর্বশক্তিমান ঈশ্বর আমায় ক্ষমা কর। আমার একটাই অপরাধ, হল উচ্চাকাঙ্ক্ষা যা তুমিই আমার মধ্যে আরোপ করেছ।"

"তোমার উপযোগিতা তুমি কিভাবে তোমার মহানির্দেশককে বোঝাবে?" সেটাই প্রশ্ন।" সে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে নিজেকে বলল।

কখনই বা সে লজ্জা বা দুর্নীতিমুক্ত ভাবে কাজগুলো করার সুযোগ পাবে, অধমর্ণ হিসেবে নয়, উত্তমর্ণ হিসেবে। যেভাবে সে ব্যবহার করেছিল হামজা অল সুয়েফির সঙ্গে, গর্ব ও সম্মানের সীমাবদ্ধতার মধ্যে, দপ্তরের রীতিনীতি মেনেই প্রচলিত তীর্যক ভঙ্গীতে। "আমার পরিশ্রম খুব সাধু," সে মনে মনে বলল। "আমার ভাবনা চিন্তা অনুযায়ী এটা ঈশ্বরের এক্তিয়ারভুক্ত।"

তার বিশ্বাস ভগবান মানুষ সৃষ্টি করেছে শক্তি ও মহিমার জন্য। শক্তিই জীবন, টিকে থাকাটাই শক্ত। সংরক্ষণ হল শক্তি। স্বর্গে ঈশ্বরের সঙ্গে মিলিত হওয়ার একমাত্র উপায় শক্তি ও সংগ্রাম।

তার মহানুভব মহানির্দেশক বাহজাতথুরকে 'অর্ডার অব দ্য নাইল' সম্মানে ভূষিত করার সময় তার সামনে একটা বড় সুযোগ এল। যেখানে সে অনুবাদ করত সেই খবরের

কাগজে সে একটা শুভেচ্ছা বার্তা লিখে পাঠিয়েও দিল। সে লোকটির সব পার্থিব গুণ যেমন দৃঢ়তা, ঋজুতা, সচ্চরিত্র, পরিচালন দক্ষতা তাঁর ধারণা, তাঁর বিশ্বাসের প্রকৃত প্রশংসা করল ও তাঁকে শ্রেষ্ঠ মিশরীয় পরিচালকের সম্মানেও ভূষিত করল। এমনকি যারা ইংরেজদের সরিয়ে ক্ষমতার দখল নেবার যোগ্য।

সে যখন ওই চিঠিটি নিয়ে সেই বিশাল ঘরটিতে ঢুকল, সেই প্রথম মহানির্দেশক তার দিকে তাকিয়ে হেসে বললেন—

"তোমায় ধন্যবাদ, বাইয়ুমি।"

"ভগবানকে ধন্যবাদ দিন।" সে অভিবাদন জানিয়ে বলল।

"তোমার কায়দাটা ঈর্ষণীয় বটে।"

সে বিশ্বাস করল যে শুধুমাত্র কড়া সুরাই মানুষকে মাতাল করে না। কিন্তু মাদকতা দীর্ঘস্থায়ী হয় না, আবার কখনও কখনও খোয়ারি থাকে। সে আরও ভাবল যে সময়ের রথ অত্যন্ত দ্রুত চলছে। সে খালি মনে করতে পারল যে দীর্ঘ অতীতে তার সময় সম্পর্কে কোন ধারণাই ছিল না—অল হুসায়েনি গলিটা শুধুমাত্র বিস্তীর্ণ এলাকাই ছিল। একজন মধ্যবয়স্ক মানুষের কাছে পঞ্চম পদটা এমন কিছু আশাপ্রদ নয়। যে মানুষটা ক্রমাগত তাকিয়ে আছে ধ্রুবতারার দিকে, যে নিজেকে বই ঠাসা ছোট্ট ঘরে খুঁজে পায়, যার প্রিয় খাদ্য ষাঁড়ের গাল, উৎসবের দিনে কাবাব, যার জীবনের একমাত্র আনন্দ কড়া মদ ও ফাঁকা ঘরে কৃষ্ণকায়া কাদ্রিয়ার সান্নিধ্য।

সে প্রকৃত মানবিক উষ্ণতার অভিলাষী। চায় এক স্ত্রী ও পরিবার, দীর্ঘ একাকীত্বের জ্বালা তার পক্ষে আর সহ্য করা সম্ভব নয়।

বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ভীড়ে সে যে কিভাবে এক সঙ্গীর খোঁজ করেছে...।

১৭

সে একদিন ওম হুসনিকে নিমন্ত্রণ জানাল। তার ছোট্ট স্টোভে তাকে এক পেয়ালা কফি করে দিল। হুসনি বুঝল সে উত্তেজনা ও প্রতীক্ষার পরে কিছু একটা বলার জন্য তৈরী হয়েছে। সে প্রত্যাশামত বলল, "আমার মন বলছে তুমি আমাকে জরুরী কিছু জানাতে চাও। ঈশ্বর সাক্ষী আমি গত রাতে স্বপ্ন দেখেছি..."

"স্বপ্ন ভুলে যাও ওম হুসনি," সে বাধা দিয়ে বলল। "আমার একটা বউ চাই।"

তার মুখ আনন্দে ভরে গেল, সে চীৎকার করে বলল :

"বাহ্, কি আনন্দের দিন।"

"একটা জুতসই বউ।"

"তুমি নিজেই দেখেশুনে নাও।"

"ওম হুসনি তুমি আমায় বোঝার চেষ্টা কর, আমার কিছু বাধ্যবাধকতা আছে।

"আমার কাছে, কুমারী, বিধবা, বিবাহবিচ্ছিন্না সবাইয়ের খবর আছে।"

"আমাদের এলাকা বা গলি ছাড়া একটু বাইরে বেরোও।" সে দৃঢ় সিদ্ধান্তের সুরে বলল।

"তুমি কি বলছ?" সে বিহ্বলভাবে বলল।

"আমি সম্ভ্রান্ত পরিবারের মেয়েকে চাই।"

"হাসুনা সাহেবের মেয়েটা কেমন? ওই যে, রুটি কারখানার মালিক।

"আমাদের এলাকার কথা ছাড়। ভাল পরিবার চাই, ব্যস।"

সে বিরক্ত হয়ে বলে উঠল।

"তুমি বলতে চাও..."

"বিখ্যাত লোক...উচ্চপদস্থ কর্মী...ক্ষমতাশালী লোক..."

মহিলাটি বোবা হয়ে গেল, সে যেন কোন ভিন গ্রহের জীবের কথা শুনছে।

"এ ব্যাপারে তোমাকে দিয়ে কোন কাজ হবে না।"

"তোমার ধারণাগুলো তো বেশ অদ্ভুত," সে বেপরোয়াভাবে জানাল।

"তাহলে?"

"তোমার মতে, আমি উপযুক্ত নই, কিন্তু আল-হিলমিয়াতে ওম জায়নাব বলে এক ঘটককে আমি চিনি।

"চেষ্টা করে দেখ, যদি সে কিছু করতে পারে। তুমি পারলে আমি পুরস্কার দেব।"

"বাইয়ুমি, তুমি বলতে চাও..." সে হাসতে হাসতে বলল।

"ওটা এমনি বলেছি, আমি তোমায় কথা দিচ্ছি।"

"আমি সর্বাত্মক চেষ্টা করব।"

"সে বিবাহিত হলেও আমার কিছু এসে যায় না। বা বিধবা, বিবাহ-বিচ্ছিন্না, কুমারী যতক্ষণ সে গ্রহণযোগ্য হবে ততক্ষণ রূপটা কোন ব্যাপার নয়। তরুণী বা সম্পদশালী না হলেও চলবে।"

মহিলা বিহ্বলভাবে মাথা নাড়লেন, সে বলে চলল—"আমার তরফ থেকে তুমি বলতে পার যে আমার বাবা একজন ব্যবসায়ী। এটা কি তারা জানতে চাইবে?"

"হ্যাঁ তারা করবে। ভগবান তোমার মা-বাবার আত্মাকে শান্তি দিন।

"যাই হোক। শুধু চেষ্টা করে দেখ।"

দিনগুলো একঘেয়েভাবে কেটে যাচ্ছিল। আর সে প্রতিদিনই ওম হুসনির কাছে যেত আর সে তাকে অপেক্ষা করতে বলত। দেরী হওয়ার জন্য তার কল্পনা দৌড়োদৌড়ি করছিল। আবার তাব মন হতাশায় নিমজ্জিত হচ্ছিল। সে অল হুসায়েনের সমাধিতে ঘনঘন যাতায়াত শুরু করল।

এসময় একটা ঘটনা ঘটল। পরিচালন দপ্তরের নির্দেশক হামজা অল সুয়েফি উচ্চরক্তচাপের কারণে শয্যাশায়ী হয়ে পড়লেন। দপ্তরের অবস্থা সঙ্গীন হয়ে উঠল, কারণ নতুন বছরের ব্যয়বরাদ্দের খসড়া শুরু হতে চলেছিল। ওথমান রোগশয্যায় তাঁর সঙ্গে

দেখা করতে গেল এবং দীর্ঘক্ষণ কথা বলল। সে এমন দুঃখ ও সহানুভূতি দেখাল যে মানুষটি তার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠল। তিনি ভগবানের কাছে প্রার্থনা করল 'মন্দ' থেকে রক্ষা করার জন্য। সেখানে বসে থাকতে থাকতে ওথমান মনে করল সে কতদিন সাফান বাসয়ুনিকে মৃত ভেবেই দেখতে যায়নি। সে হামজা অল সুয়েফিকে বলল, "আপনি সম্পূর্ণ সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত বিশ্রাম নিন। কাজ সম্পর্কে ভাবতে হবে না। আমি ও আমার সহকর্মীরা সব করে নেব।"

লোকটি তাকে ধন্যবাদ দিয়ে আমতা আমতা করে বলল, "আর খসড়া ব্যয়বরাদ্দটা...।"

"ওটা হয়ে যাবে," সে বেশ জোব দিয়েই বলল। "ওবা সবাই আপনার ছাত্র, আপনার কাছেই কাজ করেছে ওদেরই এ ব্যাপারে শিখিয়ে দিন।"

মন্ত্রকে ওই অসুস্থ মানুষ ও তার অসুস্থতা নিয়ে গুজব ছড়িয়ে পড়ল। এটাও বলা শুরু হল উচ্চ রক্তচাপ খুবই খারাপ রোগের ইঙ্গিত ও তা দূরারোগ্যও বটে। আবও আলোচনা হল যে হয় অল সুয়েফিকে অবসর দেওয়া হোক নয় তাব পদ থেকে অপসৃত করা হোক। ওথমান আগ্রহসহকারে এগুলো শুনলো, তার হৃদয় গোপন আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে উঠল। এই অনুভূতিকে সে সঙ্গোপনে ও সযত্নে নিজের মনে লুক্কায়িত রাখল। কিন্তু এটা তার স্বপ্ন ও উচ্চাশাকে উজ্জীবিত করল। মহানির্দেশক হঠাৎই একটি কার্যনির্বাহী সমিতি তৈরী করলেন, যার সভাপতির দায়িত্ব দেওয়া হল তাকে, বার্ষিক ব্যয়বরাদ্দের খসড়া তৈরীর জন্য। তার কাজের ব্যাখ্যা সবার কাছেই পরিষ্কার। সত্যিই, তার দক্ষতা নিয়ে কোন প্রশ্ন ওঠেনি, বা এই সিদ্ধান্তের যৌক্তিকতা নিয়ে। কিন্তু একটা কথা উঠেছিল যে যদি পরিচালন দপ্তরের সহপরিচালককে এই দায়িত্ব দেওয়া হলে কি আরও ভাল হত না? তাহলে লৌকিকতাও তো মানা হত। যাই হোক, খসড়া প্রস্তাবের পেছনে সে তার সর্বশক্তি নিয়োগ করল যাতে সেটা নির্ভুল হয়। সে সব তথ্য ও পরিসংখ্যান সংগ্রহের জন্য তার পূর্ণ দক্ষতা প্রয়োগ করল। বিভিন্ন দপ্তরেব মধ্যে সংযোগসাধন করে প্রয়োজনীয় তথ্যও যোগাড করল। সে মূল্য ব্যয়বরাদ্দও চূডান্ত হিসেবের দায়িত্ব নিজের ঘাড়েই নিল। এর জন্য তাকে সরাসরি মহানির্দেশকের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে হচ্ছিল। প্রতিদিন এক/দুঘণ্টা তাদের কথাবার্তা বলতে বসতেই হচ্ছিল যতক্ষণ না তাদের মতৈক্য হচ্ছে। একদিন সভা চার ঘণ্টা চলার মধ্যে মহানির্দেশক তাকে কফি ও সিগারেট দিতে চান, কিন্তু বিনীতভাবে প্রত্যাখ্যান করে কারণ সে ধূমাপায়ী ছিল না। দিনগুলো তার হৃদয়কে আনন্দ ও গর্বে ভরিয়ে তুলত। লোকটি তার কাজে খুশি ছিল তার মনে হল ভগবানও খুশি ও ভাগ্য সুপ্রসন্ন। সে ব্যয়বরাদ্দের একটা খসড়া প্রতিরূপ তৈরী করল। পরিচালকেরও পছন্দ হল তা। সে নিজেকে ক্ষমতার চূড়ায় মনে করল।

হামজা অল সুয়েফি সুস্থ হয়ে সমিতির কাজের শেষ দিন যোগদান করল। ওথমান উৎসাহ দেখিয়ে তাঁর দীর্ঘজীবন কামনা করল।

"আপনাকে ছাড়া আমরা দুর্বল হয়ে পড়েছিলাম। আপনার আরোগ্যের জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ।"—সে বলল।

"খসড়াটার অবস্থা কি?"—তিনি জিজ্ঞেস করলেন।

"ওটা হয়ে গেছে, সমস্যাগুলো লেখা আছে আর মহানুভবের কাছে গেছে তাঁর অনুমোদনের জন্য। আপনি কাল পরশু দেখে নেবেন। এখন বলুন কেমন আছেন?"

"ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, ভালই।" ওরা খাওয়া দাওয়ায় কিছু বিধিনিষেধ আরোপ করেছে। এখন সব ভগবানের হাতে।"

"ভয় পাবেন না। সব কিছুই মেঘের মত চলমান।"

তার দীর্ঘকর্মজীবনে সে দ্বিধাবিভক্ত ব্যক্তিত্ব ও নৈতিক দ্বন্দ্বে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল। হতাশাও ছিল সেখানে, সেটা প্রত্যাশিতও ছিল। একটা অবসাদবোধ, প্রায় বিষণ্নতা তার আত্মাকে পীড়িত করত। যখন আইনবিভাগে চতুর্থ পদটা খালি হল সে আন্তরিকভাবে কিছু বলতে চাইল, যা আগে কখনও করে নি। কারণ এর আগে তার কাজকর্মই তার কথা বলত। তার মহানুভব মহানির্দেশকের সঙ্গে কাজের জন্য স্বাভাবিক পরিস্থিতিকে ধন্যবাদ। সে বলতে পেরেছিল,

"যদি মহানুভব এত দয়ালু হন, তবে আমার আইন দপ্তরের অভিজ্ঞতাকে তিনি কাজে লাগাতে পারেন।"

"না। কানুন দপ্তরটা একচেটিয়া সুবিধাভোগীদেরই অধিকারে।"—সে দৃঢ়তার সঙ্গে বলল।

ওফ্, সেই একই গল্প, যে স্ত্রীর জন্য সে প্রতীক্ষা করছে।

বিরক্ত হয়েও বলল,

"আপনার ইচ্ছাই শিরোধার্য, মহানুভব।"

সে দরজার দিকে হেঁটে যাওয়ার সময় থমকে দাঁড়াল তার গলার স্বরে।"

"আমি নতুন ব্যয়বরাদ্দে প্রস্তাব রেখেছি যে সংরক্ষণ বিভাগের প্রধানকে চতুর্থ স্তরে উন্নীত করা হোক।"

সে ঘুরে দাঁড়াল, একটা বড় পা ফেলে এগিয়ে মাথা নোয়াল যতক্ষণ না মাথা টেবিলে ঠেকে।

১৮

উন্নতির পথে নিশ্চিতভাবেই একধাপ অগ্রগতি। ভাগ্য যদি তার প্রতি ধারাবাহিকভাবে সদয় হয়েই চলে, তাহলে আগামী বারো থেকে পনেরো বছরের মধ্যেই সে অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে পারবে। তাহলেও আর মাত্র কয়েক বছর বাকী থাকবে তার মহানুভবের মত দায়িত্বশীল পদমর্যাদায় পৌঁছতে। কিন্তু ওম জনাবের অভিযানটা যে ব্যর্থ হয়েছিল সেটা বলার অপেক্ষা রাখে না। ওটা সাধারণভাবে গ্রহণযোগ্য নয়, সংগ্রহশালার প্রধান হিসেবে সে ভাবত। পরিচালন দপ্তরের পরিচালক হিসেবে হয়ত

তা গ্রহণীয়, কিন্তু মহানির্দেশকের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। এমনকি সে যদি একটা গোবেচারা লোক হয়—তাও নয়।

বিয়ের পেছনে একাধিক কারণ ছিল। বিয়েটা হল মনের একাকীত্বের একটা সান্ত্বনা- —সান্ত্বনা একাকীত্বের যন্ত্রণারও। অন্তরের ধর্মীয় বাসনাকে তুষ্ট করতেও এই অনুষ্ঠানের প্রয়োজন। যা দিয়ে আবার ব্রহ্মচর্যের পাপস্খলন করা যায়। কাদ্রিয়ার ব্যবহার তার জীবনের উত্তেজনার উপশম ঘটাচ্ছিল। কিন্তু ভালোবাসার কোন অনুভূতি প্রকাশিত হত না তার ব্যবহারে, অথবা সৃষ্টি হত না কোন আবেগঘন মুহূর্ত। মানবিক সম্পর্কের পেলবতা বা তার পারস্পরিক বোঝাপড়া একমাত্র বিবাহের মাধ্যমেই লাভ করা সম্ভব ছিল। মেয়েটি যে তার অপরাধবোধ বাড়িয়ে তুলছে তার উল্লেখমাত্র না করেই। তার একমাত্র শান্তি ছিল তার কাজে আর জ্ঞান আহরণের মাধ্যমে নিজের উন্নতিসাধনে। মাঝে মাঝে সব ব্যাপারে কার্পণ্য দেখে সে উষ্মাভরে বলত, "প্রবীণ গোঁড়া খলিফাগুলো যে কিভাবে বাঁচে...।"

একদিন সংগ্রহশালায় কাজ করতে করতে হঠাৎ সাফান বাসয়ুনিকে সে সামনে দেখে হতভম্ব হয়ে গেল। জরাজীর্ণ, কৃশকায় ব্যক্তিটি যেন ভূতের মত দাঁড়িয়ে জীবনকে শেষ বিদায় জানাচ্ছেন। সে উঠে দাঁড়িয়ে তাকে অভ্যর্থনা জানাল এবং তার দীর্ঘ অবহেলার জন্য তাঁর কাছে যারপরনাই লজ্জিত হল। সে তাঁকে পাশে বসিয়ে বিনয় ও আনুগত্যের সঙ্গে বলল,

"আপনাকে আমাদের মাঝে পেয়ে কিযে ভাল লাগছে...।"

বৃদ্ধ লোকটি অনেক চেষ্টায় আত্মসংবরণ করে বিড়বিড় করে বললেন, "তোমার অনুপস্থিতি যে আমাকে কি পীড়া দিয়েছে...।"

"চুলোয় যাক কাজ," অনুশোচনায় ওথমান হাহাকার করে উঠল। "চুলোয় যাক সব ঘরদোর বন্ধু আমি আপনার জন্য যারপরনাই ব্যথিত।" বৃদ্ধ লোকটি কাতর কণ্ঠে বললেন, "ওথমান আমি খুব অসুস্থ।"

"চিন্তা করবেন না, ভাল হয়ে যাবেন...কফি চলবে?"

"একদম কিচ্ছুটি না। আমার সবকিছুই বারণ।"

"ঈশ্বর তোমার হৃতস্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার করুন।"

সে খুব বিহ্বল ও অপ্রস্তুত হয়ে পড়ল কিন্তু কিছুতেই কোন দিশা খুঁজে পেল না এই নির্মম সাক্ষাৎকারের পরিসমাপ্তি ঘটানোর। কিছুক্ষণ চুপ থেকে সাফান বাসয়ুনি অপরাধী সুলভ স্বরে বলল :

"চিকিৎসার জন্য তিনশো টাকা আমার ভীষণ দরকার। হবে?" বলতে বলতে তাঁর স্বর আবেগরুদ্ধ হয়ে এল। সেই অবস্থাতেই তিনি বলে চললেন।

ওথমান শিহরিত হল। সে এখন উভয় সঙ্কটে দয়া দেখানোর বিপদ সে মর্মে মর্মে উপলব্ধি করছিল। সে পাগলের মত চীৎকার করে উঠল, যেন তাকে কেউ তাড়া করেছে—

"কি নিষ্ঠুর ব্যাপার। আমি স্বপ্নেও ভাবিনি যে আপনাকে ফিরিয়ে দিতে হবে। বিশেষতঃ এই অনুরোধ। যা আপনাকে ফিরিয়ে দেওয়ার চেয়ে চুরি করতে যাওয়া ভাল ছিল।

বৃদ্ধ লোকটির কষ্ট হল কথাগুলো হজম করতে, তবু কাতর স্বরে বললেন,

"একশ টাকাও হবে না?"

"আপনি কি আমায় বিশ্বাস করতে পারছেন না?" হে ভগবান। আমি যদি শুধু আপনাকে বলতে পারতাম। শুধু আমি...

বৃদ্ধ লোকটিকে সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত লাগল। যেন কোন এক অজানা আতঙ্কে ভীত তিনি। পা দুটো যেন বিবশ হয়ে গেছে তাঁর। অনেক কষ্টে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "আমি তোমায় বিশ্বাস করি। ঈশ্বর তোমার সহায় হোন! তিনি আমাদের প্রত্যেকের প্রতি সদয় হোন এই প্রার্থনা করি।"

ওথমান অশ্রুসজল নয়নে তাকে বিদায় সম্ভাষণ জানাল। এ সময় তার অন্তর্দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত হৃদয় থেকে এক প্রতিক্রিয়াহীন অশ্রু তাকে বাষ্পাচ্ছন্ন করে তুলল। ধাক্কা দিল তার অন্তরকে—তার গভীরতম অঞ্চলে। সে তার কাছে যেতে গিয়েও ফিরে এল নিজের টেবিলে, নিজের মনে মনে বলল, "হে ঈশ্বর।"

সে নিজের মনে বলল, "জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে গেলে নিজেকে পাথর বা লোহার মত কঠিন হতে হবে।" সে আরও বলল, "লক্ষ্য সুদুর, আমার একমাত্র সান্ত্বনা হল, আমি ঈশ্বর প্রদত্ত জীবনটাকে পবিত্র ও গম্ভীরভাবে ধরে রাখতে পেরেছি।"

সেই সপ্তাহ নাগাদ সে সাফান বাসয়ুনির মৃত্যু সংবাদ পেল। ঘটনাটা যদিও অপ্রত্যাশিত ছিল না তবে সে অত্যন্ত মর্মাহত হল। যাতনার তীব্রতায় তার অন্তস্থল থেকে তীব্র চীৎকার ধ্বনিত হল, "কষ্ট পেয়ো না। তুমি আশাতীত যন্ত্রণা পেয়েছ। সে আরও বলল, "আমার সুখে লোকে হিংসা করে, কিন্তু আমি কি সত্যিই সুখী?" তারপরেই প্রশ্ন করল, "সুখ কাকে বলে?"

"আমাদের কাছে সুখের অর্থ হল ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস রাখা। আমরা বাঁচি বা মরি সেটা বড় কথা নয়। তিনি আছেন এটাই সব।"

১৯

সময়ের ঘোড়াটা বড় বেয়াড়া। ঠিকমতো লাগাম দিতে না পারলে ও তোমায় ফেলে দেবে। সে সময়ের ওপর কর্তৃত্ব করছে তখন। কিন্তু এর ছোবল থেকে সে কি বাঁচতে পারবে? কয়েকদিন আগে নবনিযুক্ত এক কর্মী ব্যক্তিগতভাবে তার সঙ্গে কথা বলতে এল। সে একটা ব্যক্তিগত বিষয়ে তার মতামত জানতে চাইল।

সে শুরু করল এইভাবে, "আমার এই ব্যাপারে কথা বলতে বাধোবাধো ঠেকছে। কিন্তু আমি আপনার কাছে এসেছি বাবা বা বড়দার মত।"

কথাগুলো শুনতে এত অদ্ভুত লাগছিল যে ওথমানের মনে হল যে ছোকরা যেন তার সঙ্গে ব্যঙ্গ করছে। বাবার মত? তার তো সত্যিই এই বয়সের একটা ছেলে থাকতে পারত। আর তা নেই-ই বা কেন? এখনও সে সময়ের ওপর কর্তৃত্ব করার কায়দা রপ্ত করতে পারেনি।

একদিন ওম হুসনি তাকে বলল, "এবারে এক প্রধানশিক্ষিকার খবর আছে।"

সে অনাস্বাদিত আনন্দে নেচে উঠল। কিন্তু যদিও একজন প্রধান শিক্ষিকা ভাল স্ত্রী হতে পারেন কিন্তু সে এমন কাউকে চেয়েছিল যে তাকে সামাজিক প্রতিষ্ঠা দিতে পারে। আর কিই বা করার আছে। তাব ঔৎসুক্য দমন করতে না পেরে সে জিজ্ঞেস করল,

"তিনি কি বয়স্কা?"

"নারীত্বের শিখরে। মোটামুটি পঁয়ত্রিশ বছর।"

"বিধবা না বিবাহবিচ্ছিন্না?"

"কুমারী, অনাঘ্রাত ফুলেব মত। তুমি তো জান যে আগেকার দিনে প্রধান শিক্ষয়িত্রীদের এত কাঁচা বয়সে বিয়ে হত না।"

ওথমান ভাবতে পারছিল না তার সঙ্গে দেখা করাটা তার পক্ষে উচিত হবে কি না। সে দেখা করেছিল অল-সৈয়দা চত্বরে। সে তার উপস্থিতি পছন্দ করে, তার চেহারাটাও সুন্দর সোনিয়ার ব্যাপারেই তার উপলব্ধি বৃদ্ধি পেয়েছিল। সে তাকে দেখল ও বুঝতে পারল দেখাশোনার ব্যাপারটা পারস্পরিক ঘটছে।

পরে ওম হুসনি তাকে বলল :

"তোমাকে ওর জন্য এক পয়সাও খরচ করতে হবে না।"

সে উপলব্ধি করল মহিলা তাকে পছন্দ করেছে। কারণ সে একটা বাড়ি ঠিক করতে ও বিয়ের জিনিস দিতে প্রস্তুত। তাকে ছোটখাট ব্যাপারগুলো দেখভাল করতে হবে। বৃদ্ধা বলে চললেন,

"শুধু আঙটি, উপহার সামগ্রী ও ফলমূল।

আমি কি তাহলে তোমায় ধন্যবাদ জানাতে পারি?"

"একটু ধৈর্য ধরা ভাল নয় কি?"

"তার একটাই শর্ত বিবাহবিচ্ছেদের ক্ষতিপূরণ হতে হবে দেড় হাজার টাকা।"

প্রতিটি ঘটনাই সুন্দর তাল ও ছন্দমাফিক চলছিল। তার সতর্ক চরিত্রের জন্য। সে কি শুধুমাত্র তার ধর্মীয় বোধকে খুশি করার জন্যই বিয়ে করছিল? এর চেয়ে ভাল কি হবে? তার উচ্চাশার কি হবে? সে চিন্তার ঘূর্ণিতে ডুবে গেল, কারণ সে বুঝতে পারছিল যে তার বয়স হচ্ছে। গোপনীয়তা উন্মোচনের কারণে অজানা জগত তার কাছে অজানাই ছিল। তার ব্যঙ্গাত্মক। শ্লেষাত্মক নিষ্ঠুর চালচলনের জন্য, গোলাপে গন্ধ না দেওয়ায ও গানের প্রতিধ্বনি না শোনায়। জীবনের বাধাবিঘ্ন ও বঞ্চনার কারণে। তাসত্ত্বেও সে মনে মনে বলল, "কিসের দ্বিধাদ্বন্দ্ব ও পিছু টান? যত্তসব। সব ফালতু। এত দিনের

অপেক্ষার পর লোক হাসানোর কোন মানে হয় না।"

সে একটা সম্পর্ক গড়ার আশা করল। একটা অপবিত্র সম্পর্ক। কিন্তু সে তো প্রত্যাখ্যাতও হতে পারে, সানিয়ার চেয়েও রূঢ়ভাবে। সে রাজী হলেও তা খুব একটা আনন্দের হবে না। হয়ত তাকে অন্য কোথাও বাড়ি ভাড়া নিয়ে সাজাতে হবে। সে সবকিছু উপলব্ধি করে শেষে ওম হুসনিকে বলল,

"নাহ্।"

"একটু ভাল করে ভাব।" বৃদ্ধা চেঁচিয়ে বললেন

"আমি বলছি না।"

"তুমি একটা গোলকধাঁধা, তোমায় বোঝা মুস্কিল।"

সে নির্দয়ভাবে হাসল।

"তুমি কি চাও? নারীদেহ তোমার ভাল লাগে না?"

সে আবার হাসল।

"ঈশ্বর তোমায় ক্ষমা করুন।"

"আমি দুঃখী, বাবা," তিনি বললেন। ওথমান নিজের মনে বলল, "দুঃখই মানুষকে নিষ্কলুষ করে আর স্বর্গীয় আনন্দ উপভোগের পথ দেখায়।"

২০

ওথমান যখন এক অদ্ভুত বিষণ্নতা ও অবসাদে নিমজ্জিত হয়ে পড়েছিল, ঠিক সেই সময়ই তার জীবনে এসে পৌঁছল ওমসিয়া রামদান। এরকম মানসিক যন্ত্রণা তার কাছে অভূতপূর্ব ছিল। সে নিজেকে বলল, সে হারিয়ে গিয়েছিল রুক্ষ আতপ্ত মরু প্রান্তরে, সেখান থেকে কোন উপলব্ধি হয়নি তার, তার উচ্চাশা ছিল সময়সাপেক্ষ, যদিও সে জানে সে তার জীবন ক্ষণস্থায়ী ও অতীত ঘৃণ্য। তার প্রকৃত চিহ্ন ছিল এক খয়রাতি কবরখানা ও জেলখানা। নিপীড়ন ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে লড়াই করতে গিয়ে তার পরিবারের একজন শহীদ হয়েছিলেন। সে ছিল নির্বান্ধবে। তার সঙ্গে তার শিশুকালের সাথীদের সম্পর্কও চড়ায় এসে ঠেকেছিল। দপ্তরে তার সহকর্মীরা কেউ তাকে সম্মান দিত, কেউ হিংসা করত। তবু সে ছিল বান্ধববর্জিত। শুধু একটা লোকের কাছেই সে নিজেকে উজাড় করে দিতে পারত। অদ্ভুতভাবে সে হল অল-হুসেনি মসজিদের এক চাকর। আর তার জীবনে একটাই মাধুর্যের পরশ ছিল, তা হল একটা ফাঁকা ঘর ও এক রূপোজীবিন, সে ছিল কাফ্রী। এই জীবনের আর অর্থ কি?"

যদিও সে সত্যিই নিজেকে উৎসর্গ করেছিল ঈশ্বরের অভীষ্ট লক্ষ্যে। কিন্তু সে ক্রমশই পাপের পঙ্কে নিমজ্জিত হচ্ছিল। প্রতি মুহূর্তেই সম্পর্ক দূষণ তার জীবনকে দুঃসহ করে তুলছিল। সে বুঝতে পারছিল যে প্রাণপণ প্রচেষ্টা সত্ত্বেও সে মৃত্যুকে রোধ করতে পারবে না। "তার কাছে এটা অনেকটা পরাজিত খেলার মত।"

মানসিক নরকযন্ত্রণার আগুনে দগ্ধ হতে হতে সে একটা মৃদু হাওয়া সুগন্ধ ছড়িয়ে দিল সংরক্ষণ বিভাগে। এই ঘটনা শুধুমাত্র সংরক্ষণ বিভাগে প্রথম নয় পরিচালন বিভাগের পক্ষেও নতুন বটে। এবং নতুন বলতে কি সম্পূর্ণ অর্থেই নতুন। পরিচালন দপ্তর তথা সংরক্ষণ বিভাগে এক মহিলা কর্মীর নিয়োগ। একটা সুন্দর, ছিপছিপে শ্যামলা মেয়ে, সাধারণ বেশভূষায় যখন সে তার টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে আত্মপরিচয় দিল তার ভাবভঙ্গীতে ওথমান যুগপৎ বিভ্রান্ত ও অবাক হল। একটু বিচলিতও হল। সে যখন মেয়েটিকে বসতে বলল, তখন সে পেছন দিকে একঝলক তাকিয়ে দেখল সারিসারি তাকে ফাঁক দিয়ে অগুণতি গোল গোল চোখ তাদের গোগ্রাসে গিলতে আসছে। কারণ তারা মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল আর যা দেখছিল তা তাদের কাছে অবিশ্বাস্য ছিল।

"স্বাগতম।"

"ধন্যবাদ, আমি ওমসিয়া রামাদান।"

"তোমার সঙ্গে পরিচিত হতে পেরে বেশ ভালো লাগল। তোমাকে খুব অল্পবয়সী লাগছে।"

"না মশাই, আমি অষ্টাদশী।"

"দারুণ...দারুণ। আর শিক্ষাগত যোগ্যতা?"

"আমি বিজ্ঞান শাখার ছাত্রী।"

"অসাধারণ। কিন্তু তুমি আরও পড়াশুনো করলে না কেন?" প্রশ্নটা করে ফেলেই সে বিষণ্ণ হয়ে গেল। মনে পড়ে গেল তার চাকুরীর প্রথম দিনে মহানির্দেশকের ঘরে একই প্রশ্নের মুখোমুখি হওয়ার স্মৃতি।

সেদিন ওথমান পারেনি, কিন্তু আজ মেয়েটা উত্তর দিল, "পরিস্থিতির চাপ..."

ওথমান মনে মনে সেই পরিস্থিতিকে অভিশাপ দিলেও বাইরে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। সে শুধু একাই নয়, আরো আছে।

"তুমি আমার অতীতটা ফিরিয়ে আনলে। কিন্তু একটা কথা বলছি শোনো। উদ্যমই কিন্তু সাফল্যের চাবিকাঠি। আমি কিন্তু কাজের ফাঁকে ফাঁকে লেখাপড়া চালিয়ে এতদূর উঠে এসেছি।

ওথমানের উৎসাহটা রামাদানকে ভরসা যোগাতে পারল না। সে ভুরু কুঁচকে বলল,

"কিন্তু আমরা যে নিষ্ঠুর, নির্মম সমাজের অধিবাসী।" ওথমান বুঝল তার অজানা বিপ্লবের ধারণা যা সে ইচ্ছাকৃতভাবেই এড়িয়ে চলত সেগুলো আজ তার দিকেই উদ্যত। সে নিশ্চিতভাবে বলল, "সমাজকে আক্রমণ করার চেয়ে আত্মবিশ্বাস মঙ্গলজনক। ঈশ্বরের পাপ-পুণ্যের হিসাব ব্যক্তিবিশেষের ওপর নির্ভরশীল, ঠিক তাঁর বাণীর মতই। সমাজের দোরে দোরে করুণা ভিক্ষা করার চেয়ে বাঁচার জন্য সংগ্রাম করাটাই শ্রেয়। মনে হচ্ছে তুমি রাজনীতিতে বেশ আগ্রহী, তাদের ভাষায় এটা সামাজিক চিন্তাভাবনা।"

"আমি এতে বিশ্বাস করি।"

"তার মানে তোমার মধ্যে আত্মবিশ্বাসের অভাব। যেমন ধর, আমি চিরকালই ইচ্ছাশক্তি ও ঈশ্বরের অজানা জ্ঞানে বিশ্বাসী।"

মেয়েটি কোন কথা না বলে মিষ্টি হাসল। ওথমানও হেসে বলল, "আমি তোমাকে বহিরাগত চিঠিপত্র দেখভালের দায়িত্ব দিচ্ছি। নতুন কর্মীদের ক্ষেত্রে সবচেয়ে ভাল কাজ হল এটাই।"

"ধন্যবাদ।"

"আমি আশা করি তোমার কাজ আমায় নির্ভরতা দেবে।"

"হ্যা আশাকরি হতাশাজনক কিছু আমি করব না।"

"তোমার সহকর্মীদের কাছ থেকে যদি কোন ধরনের অসহযোগিতা পাও নির্ভয়ে জানিও।"

"মনে হয় না তেমন কিছু ঘটবে।"

অতঃপর সে একজন করণিককে বলল মেয়েটিকে তার কাজ বুঝিয়ে দিতে। সে তীর্যকভাবে প্রশ্ন করল, "বহিরাগত ডাক সংক্রান্ত...।"

ওথমান অনুভব করল যে সংরক্ষণ বিভাগ উজ্জ্বল জীবনের দিকে আরো একধাপ এগিয়ে গেল। মন ও বোধের উত্তেজনার রসদও তাতে কম ছিল না। বিষণ্ন স্মৃতি মেদুর মেঘ একটু একটু করে সরে গেল তার মনের ওপর থেকে, সৈইদা, সানিয়া, আসলিয়া, কাদ্রিয়ারা একে একে আবার ফিরে আসতে লাগল তার মানসপটে। সে নিজেকে বলল, নারীর পৃথিবী বৈচিত্র্যময়, সুন্দরী তবে বেদনাদায়কও বটে। সে বিভ্রান্ত হয়ে নিজেকে জিজ্ঞেস করল—

এর অর্থ কি আর শেষই বা কোথায় ; পরিসমাপ্তি কি নারীত্বে না সামাজিক প্রতিষ্ঠায়?"

আরো প্রশ্ন করল, "বহু মানুষ তো ক্ষমতা ছাড়াই বাঁচে, কিন্তু নারীবর্জিত জীবনযাপন করে কজন?"

তার বয়সে মানুষ দুবার ভাবে। সে পড়াশুনো ও কাজের চাপে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। জাঁকজমকও বঞ্চনা দুটোই তার কাছে অসহ্য। কিন্তু অতীতের নিষ্করুণ তাড়না তাকে সদা সজাগ রেখেছিল। তার বয়সী মানুষদের একাকীত্ব ও বিচ্ছিন্নতাবোধটা খুবই গভীর। তার সঙ্গে বাড়ে অনিশ্চিত মহত্ত্বের জন্য উদ্বেগ। আগের দিন হামজা অল সুয়েফি তাকে হাসতে হাসতে বলেছিল "দেখ তোমার আর্থিক উন্নতির লক্ষণ হিসেবে মাথায় একটা পাকা চুল দেখা যাচ্ছে।

ওথমান চমকে উঠল যেন চুরির দায়ে ধরা পড়েছে। "আপনার চোখ নিশ্চয়ই আপনাকে ধোঁকা দিয়েছে।"

"বিশ্বাস না হয় বাড়ি গিয়ে আয়নাতে দেখো।"

"ঘটনাটা খুব দ্রুত ঘটে গেল।" সে হতাশ ভঙ্গীতে বলল।

পরিচালন দপ্তরের পরিচালক হাসতে হাসতে বলল, "বরং দেরিতেই হয়েছে। তোমার চেয়েও দশ বছর আগে আমার চুল পেকে গিয়েছিল।" তিনি বেশ খানিকক্ষণ

হেসে নিয়ে বললেন, "গতকাল তোমাকে নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল আমার সহকর্মীদের সঙ্গে। সবায়েরই একটা বক্তব্য তুমি একা একা কিভাবে সময় কাটাও। কেউ তোমাকে নিমন্ত্রণ বাড়িতে, সান্ধ্য মজলিসে, চায়ের আড্ডায় দেখেছি। সাধারণ মানুষ যেসব বিষয়ে আকর্ষণ অনুভব করে তার মধ্যেও তুমি নেই। তোমার পরিবারও নেই। তাহলে জীবনে আনন্দের উৎসটা কি বলো তো?"

ওথমান হেসে বলল, "আমি তো আপনাকে ঝামেলায় ফেললাম।"

"তুমি একজন সমর্থ ও সম্মানীয় মানুষ হয়েও রহস্যময়। পার্থিব কোন বস্তুই কি তোমার কাজে লাগে না?"

ওথমানের হৃদস্পন্দন যেন হঠাৎ বেড়ে গেল। কারণ প্রশ্নটা যে তাকেই ঘিরে।

"সুয়েফি সাহেব, এতে আশ্চর্যের কিছু নেই। আমি সেই ধরনেরই মানুষ যে কর্তব্য সম্পাদন ছাড়া কিছুই বোঝে না, এবং ঈশ্বরের উপাসনায় আমার মানসিক শান্তি।"

"দারুণ বলেছ। মনে হয় না তোমায় কষ্ট দিলাম। নিজেকে শান্তিতে রাখাটাই বড় কাজ।

কিন্তু কোথায় পাব তারে? কোথায়? চুল ক্রমশ রুপোলী হচ্ছে। জীবনের ঘটনাবহুলতাগুলো, ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ঘটনার মত আজ প্রায় পরিসমাপ্তির পথে। সময় ফুরোতে আর কতই বা বাকী?

২১

একদিন ওথমান যখন হামজা অল সুয়েফির সঙ্গে তাদের দৈনন্দিন কাজকর্ম সারছিল তখন তিনি কথাচ্ছলে বললেন, "সুখই মানুষের জীবনের লক্ষ্য।"

"তাই যদি হয়," ওথমান শ্লেষাত্মক ভঙ্গীতে বলল,

"তাহলে ভগবান আমাদের পূর্বপুরুষকে স্বর্গ থেকে নির্বাসন দিতেন না।"

"তোমার মতে জীবনের উদ্দেশ্য কি?"

"পবিত্র পথ।" সে গর্বের সঙ্গে বলল।

"পবিত্র পথটাই বা কি?"

"একটা মহত্ত্বের রাস্তা। পৃথিবীতে স্বর্গীয় উপলব্ধি।"

"তুমি কি পৃথিবী শাসনের কথা বিশ্বাস করো?"

হামজা অবাক বিস্ময়ে প্রশ্ন করল।

"তা ঠিক নয়। কিন্তু প্রতি ক্ষেত্রেই এক স্বর্গীয় উপাদান আছে।"

লোকটা তার দিকে এমন এক অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকাল যে ওথমান তার কথার জন্য দুঃখিত হয়ে উঠল। "উনি নিশ্চয়ই ভাবছেন আমি পাগল," সে মনে মনে বলল।

দপ্তরে একটা গুঞ্জন শোনা গেল যে তার মহানুভব বাহজাত মুর মস্তকের অন্য দপ্তরে বদলি হচ্ছেন সংবাদে তার হৃৎপিণ্ডটা যেন তার বুক ছিঁড়ে বেরিয়ে আসতে চাইল। ওই মানুষটার নির্ভরতা আদায় করতে সে অসাধ্য সাধন করেছে। তাঁর অপরিচিত

উত্তরসূরীদের কাছ থেকে সেটা আদায় করতে আরও কতদিন লাগবে কে জানে। কিন্তু গুজবটা মিথ্যে প্রমাণিত হল। একদিন বাহ্জাত মূর বিরাট এক বাণ্ডিল কাগজ তার হাতে দিয়ে বললেন, "এটা খেদাইড ইসলামির ওপর লেখা একটা বই-এর অনুবাদ। প্রায় ছমাস লেগেছে কাজটা করতে।"

ওথমান আগ্রহের সঙ্গে কাগজগুলোর দিকে তাকাল।

"আমার ইচ্ছে এই লেখাটা তুমি দেখ। কারণ অনুবাদে তোমার সমকক্ষ কেউ নেই।"

সে উৎফুল্লচিত্তে কাজটা গ্রহণ করল। তবে সে নিজের ভাগ্যকে নিজেই ঈর্ষা করতে লাগল আর সতর্কতা ও উদ্যমের সঙ্গে কাজটা শুরু করল। একমাসের মধ্যেই পাণ্ডুলিপিটা ফেরত দিল মহানুভবকে, এভাবেই সে নিজেকে তাদের কাজের উপযোগী করে তুলল। মহানুভব এখন তার কাছে কৃতজ্ঞ। তার পারদর্শীতাই তার মূলধন। প্রতিটি সভাতেই তিনি তাকে হাসিমুখে সম্ভাষণ জানাতেন, যা তাদের সর্বোচ্চ সুবিধাভোগীদের কপালেও জুটত না।

এসব ছাড়া, তার আত্মা এখনও পীড়িত হচ্ছিল আকাঙ্ক্ষার দ্বারা। সে দেখল সময় তাকে অতিক্রম করে যাচ্ছে যতক্ষণ না তা তাকে পেছনে ফেলে মিলিয়ে যাচ্ছে দিগন্তে। তার পবিত্র আকাঙ্ক্ষাকে সারাক্ষণ ধরে ঘিরে রইল এক নির্জনতা। তার উদ্বেগ তাকে টেনে আনল অল তৌফিকিয়াতে এক ভবিষ্যতদ্রষ্টার কাছে, যে এক পেয়ালা কফিতে ভবিষ্যৎ গণনা করেন। মহিলাটি আধা মিশরী, আধা ইংরেজ। সে একদৃষ্টে কফির পেয়ালার সঙ্গে মেয়েটাকেও দেখছিল। এরকম কুসংস্কারের বশবর্তী হওয়ায় সে বেশ উত্তেজিত ও লজ্জিতও হয়ে পড়ল।

মেয়েটি বলল, "তোমার স্বাস্থ্য বেশ কমজোরি।" তাঁর শারীরিক অবস্থা ছিল প্রশ্নাতীত ভাল কিন্তু মানসিক স্বাস্থ্যটা ঠিক ছিল না। হয়ত সে ঠিকই বলেছিল...

"তোমার অনেক টাকা হবে, কিন্তু অনেক বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করতে হবে তার জন্য..."

ওথমান প্রতিটি পয়সাই হিসেব করে খরচ করত। আর সে টাকার পেছনেও ছুটত না। হয়ত মহিলা তার বেতনবৃদ্ধির ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। বা হতে পারে অজানা জগতে পদোন্নতি।

"তোমার শত্রুবা তোমার ধারেকাছে থাকতে পারবে না।"

শত্রুরা তো মহান। তারা তো থাকে মিষ্টি হাসি ও চিনি মাখানো কথার আড়ালে। ওথমানের লক্ষপথে তিনজন আছে, তৃতীয় পদে এক সহ-পরিচালক, অন্য একজন দ্বিতীয় পদে আর মন্ত্রকের মহানির্দেশক প্রথম পদে। তারা একাধারে বন্ধু আবার শত্রুও। যেহেতু জীবনটা সঠিক উদ্দেশ্য ও নিষ্ঠুর চাহিদা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

"তোমার দু-দুবার বিয়ে হবে।"

হুঁ। এখনও পর্যন্ত সে একজনকেও খুঁজে পায় নি। কিন্তু ওই ব্যাপারটা ছিল একটা সাজার মত, তাদের কাছে, যারা তাদের ঠেলে দিয়েছিল কুসংস্কারের দিকে। বাড়ি যাবার পথে তার মনে পড়ল ওনসিয়া রামদানকে। ক্রমশই তার নারীসুলভ সৌন্দর্য বাড়ছে। একটা ভাল চাকুরীর প্রভাব প্রতিফলিত হচ্ছিল তার চোখেমুখে। সে মেয়েটার কাছে দয়ালু কর্তার মত ছিল। একটা নাম না জানা মানবিক সম্পর্কে তারা আবদ্ধ ছিল। যে কোন মূল্যেই সংরক্ষণ বিভাগে তার গরহাজিরি কল্পনা করা সম্ভব হচ্ছিল না।

ঘরে ফেরার পর ওম হুসনি হন্তদন্ত হয়ে তার কাছে এল। তার ভাব দেখে ওথমানের হাসি পেল।

"আসিলাবানু আমার ঘরে বসে আছেন, তিনি..."

"সেই দিদিমণি?"

"হ্যাঁ সে তার কিছু ব্যক্তিগত ব্যাপারে তোমার সাহায্য চায়।"

সে একমুহূর্তেই বুঝতে পারল যে সে তার সৌন্দর্য ভাঙিয়ে তাকে কব্জা করতে এসেছে। তার স্বাভাবিক প্রত্যাশা তাকে টেনে নিয়ে গেল এক নতুন অভিযানের দিকে। এই প্রথম সে আসিলার হাত ধরল। তার উজ্জ্বল নীল রঙের পোষাকটা তার পীনোন্নত পয়োধর ও বাহুর উৎকর্ষতা বৃদ্ধি করছিল। আর বাড়াচ্ছিল তার আদিম আকর্ষণ। সেখানেই সে নিজেকে তার কাছে উৎসর্গ করছিল কোন কথাটা ঠিক, কোনটা ভুল সেটা কোন ব্যাপারই ছিল না। সানিয়া ও কাদ্রিয়ার মতোই সে তাকে উত্তেজিত করছিল। তারা ছিল একই ধরনের, কামুক ও উত্তেজক কিন্তু স্ত্রীপদবাক্য নয়। ওম হুসনি বলল,

"আমি যাই, কফি করে আনি।"

সেই পুরোনো কৌশল। বৃদ্ধ মহিলার আন্তরিক কামনা তাদের আইনগতভাবে বিবাহিত দেখার। তারা একই সোফায় একটা তাকিয়া মাঝখানে রেখে বসে ছিল। ওথমান গোঁফ চুমরোনোর ভান করে মাথা নামিয়ে মেয়েটিকে এক ঝলক দেখে নিল।

সুন্দর সুডৌল পা দুটো, ছেলেদের মত অল্প গোড়ালিতোলা চটিতে আসীন।

"সাহেবা আমি সম্মানিত বোধ করছি।"

"তাতে আমি সম্মানিত জনাব।

সে তার হাত দুটো জড়ো করে দৃঢ়ভাবে বলল, তাতে তার পরিস্থিতি সামলানোর দক্ষতাও প্রকাশ করল।

"আপনাকে একটা প্রশ্ন করতে পারি?"

"বলুন?"

"আমার একটুকরো জমি ছিল যা এখন সরকারের কবলে। ব্যাপারটা আপনি বুঝছেন নিশ্চয়ই।"

"অবশ্যই।"

"নতুন রাস্তাটা জমির অধিকাংশটাই দখল করে নিচ্ছে। বাকী টুকরোটা কোনো কাজেই আসবে না। "আমার বিশ্বাস বার্ষিক মূল্যায়নে একটা ছাড় দেওয়া হবে।" কিন্তু

আপনি তো জানেন পন্থাটা জটিল।"

"আপনি আমার ওপর আস্থা রাখতে পারেন।"

একই মাপকাঠিতে তার ব্যক্তিত্বের পরিমাপ করায় সে তাকে উত্তেজিত করতে বিফল হল। মেয়েটা তাকে বিয়ে করতেই এসেছিল। আর কোন উদ্দেশ্য তার ছিল না। সুতরাং এক্ষেত্রে একটা অবৈধ সম্পর্কে জড়িয়ে পড়াটা অসম্ভবই ছিল। ওম হুসনি ফিরে এল তারা নিঃশব্দে কফি খেতে লাগল। যদিও স্ত্রী হিসেবে সে ছিল শ্রেষ্ঠা, কিন্তু তার মনের মত নয়। হঠাৎ তার মনে হল ওনসিয়া রামদানকে, তাদের দুজনের মাঝখানে সে পূর্ণ নারীত্বের শক্তি নিয়ে সে এসে দাঁড়াল। সেই প্রাচীন ঝরনার দিন থেকেই তার হৃদয় উদ্বেলিত হয় না, যেমনটি হয়েছিল তার ক্ষেত্রে। তার পরিশ্রান্ত স্নায়ুগুলো প্রশমিত হল, মন স্থির হল, আর কল্পনার জগৎ থেকে আসা একঝলক তাজা বাতাস তার মানবিক বোধগুলো জাগ্রত করছিল। মহিলাটি চলে যেতে, ওম হুসনি উদ্বিগ্নভাবে তার দিকে তাকাল, বোঝার চেষ্টা করল ব্যাপারটা উতরেছে কিনা। নিজের জীবনে এর জন্য সে শ্রমদান করেনি, কারণ সেটা ছিল তার ভাগ্যেরই একটা অংশ। বৃদ্ধা বিবাহ সন্তান, সংসার উৎসব ইত্যাদিকে শ্রদ্ধাই জানিয়েছেন চিরকাল। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাত 'ভালোবাসা'র সৃষ্টির জন্য। তাকে চুপ থাকতে দেখে তিনি আশান্বিত হয়ে বললেন,

"হয়ত তুমি মত বদলেছ।"

"কেন?"

"দেখছ না মেয়েটি কি সুন্দরী?" সে চুপ করে রইল, অনড় হয়ে রইল প্রত্যাখ্যানে, যে আন্তরিকতায় মেয়েটি তার দিকে হাত বাড়িয়েছিল। হতাশ হয়ে বৃদ্ধা বললেন,

"একটা প্রচলিত কথা আছে..."

তার আগেই ওথমান ঘর ছেড়ে পালালো। কি করুণা, যতক্ষণ না একটা মূল্যবান বিবাহ তার উদ্ধারে আসে তার বেদনা ও আশা বিফলে যাবে। তার জীবন এখন অজস্র প্রশ্ন ও সমালোচনার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে দাঁড়িয়েছে। মানুষ অবাক হয়ে ভাবছে কেন সে অবিবাহিত, সন্তানহীন ও নির্বান্ধব। আরো ভাবছে কিভাবে একাকী জীবনযাপন করে চলেছে, তাকে ঘিরে থাকা জাতীয় ঘটনাগুলো থেকে মুখ ফিরিয়ে যেগুলো তাকে ও তার সহকর্মীদের উত্তেজিত করছে, আবার আত্মত্যাগ করতেও শেখাচ্ছে। কি কারণ তাদের অধিকার কবেছিল আগের থেকে, তাদের হৃদয়কে দখল করেছিল, বক্তব্যের ওপর ঝুলিয়ে রাখতে ও কাজ নষ্ট করতে। তারা দীর্ঘক্ষণ কথা বলছিল সন্তান, অসুস্থতা, খাওয়া-দাওয়া, সরকার, শ্রেণী সংঘাত, রাজনৈতিক দল ইত্যাদি ব্যাপারে। প্রবচন বলছিল ধাঁধা, হাস্যকৌতুক ইত্যাদিতে মেতে ছিল। তারা ঠিকমত বাঁচছিল না চলে যাচ্ছিল পবিত্র লক্ষ্যের অনেকদূরে। তারা জীবনের সেই ভয়ঙ্কর ইঁদুর দৌড়ে মহত্ত্ব ও মৃত্যুকে মোকাবিলা করার ভয়ে পিছিয়ে পড়ছিল। ঈশ্বরের আদেশ পূরণ তাদের অসহায়তায় সম্ভব হয়নি।

২২

বহিরাগত চিঠিপত্রের মাসিক বিবরণী জমা দেবার জন্য ওনসিয়া রামাদান এল। সেটা এক শরতের ঝকঝকে সকাল, এক মিষ্টি হিমেল হাওয়া মধুর পরশ পরিবেশটা পাল্টে দিল। তার চোখ পড়ল কাগজগুলোর দিকে, সেখান থেকে টেবিলের শেষ প্রান্তে তার আঙুলগুলোর দিকে। মনে হল সে হাতে কিছু নিয়ে নাড়াচাড়া করছে। এটা এমন এক মধুর ছন্দ সৃষ্টি করেছিল যে মনে হচ্ছিল কোন গোপন বার্তা পৌঁছে দিচ্ছে। সেটা ছিল একটা ছোট্ট বাক্স। ওথমান সেটা দেখেছে সেটা নিশ্চিত হওয়ার পর সে সেটা ঢুকিয়ে দিল দোয়াতদানের তলায়।

"ওটা কি?" খুব চাপা স্বরে জিজ্ঞেস করল ওথমান, যাতে সঙ্গে সঙ্গেই গোপনীয়তার পরিবেশ সৃষ্টি করল, যা মেয়েটির আচরণেও প্রকাশ পাচ্ছিল। সে দোয়াতদানটা তুলে খুঁজে পেল হাতের তালুর অর্ধেক মাপের একটা বাক্স।

"এটা কি?" সে আবার জিজ্ঞেস করল।

"একটা ছোট উপহার।" সে ফিসফিস করে আরক্ত মুখে বলল।

"উপহার?" সে আশ্চর্য হওয়ার ভান করল।

"আজ আপনার জন্মদিন।"

এক নিদারুণ আনন্দে তার হৃদয় উদ্বেল হয়ে উঠল। আজ তার জন্মদিন বটেই, আবার ভালো করে বললে, জন্মদিনের সঙ্গে দিনটা মিলে গেছে। কিংবা হয়ত অন্য কোনদিন। হয়ত আগে এসেছে বা চলে গেছে, বা নির্দিষ্ট দিনটা হতে পারে। কিন্তু তাতে কিছু এসে যায় না। শুধু যদি না ওটা তার ভবিষ্যতের আকাঙ্ক্ষাকে বাড়াতে সচেষ্ট হয়। সে কখনও ওই অনুষ্ঠান পালন করেনি। ওই ঐতিহ্য সে বা তার গলির লোকেদের কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত। কিন্তু ঘটনাক্রমে ওনসিয়া এক নতুন ঐতিহ্য ঘোষণা করে দিল। তার নিষ্পাপ উদ্যোগটা বেশ নতুন ছিল, নতুনত্ব ছিল অনুরাগ প্রকাশেও। তার দারুণ ক্ষমতা ছিল বন্ধ দরজা খোলায়। "আসলে আমি এটার ব্যাপারে ভাবিই নি।"

"বেশ অদ্ভুত তো?"

"তোমায় ঝঞ্ঝাট না পোহালেই ভাল ছিল।"

"ওটা বেশ সাধারণ ব্যাপার।"

"আমি সত্যিই জানি না কিভাবে তোমাকে ধন্যবাদ দেব।"

"আমায় ধন্যবাদ দেবার কোন প্রয়োজন নেই।"

"তুমি কি দারুণ! কিন্তু আমার জন্মদিন জানলে কি করে? সে হেসে বলল, "আহ! ভুলেই গেছি...তুমি আমার নথিপত্র থেকেই জেনেছ। আর বয়সটাও জেনেছ।"

"যুগটা যুক্তিবাদ ও পরিপূর্ণতার।"

সে তার হাত বাড়িয়ে মেয়েটির সঙ্গে করমর্দন করল। তার রেশম কোমল হাঁতে চাপ দিল, একটা মিষ্টি চিন্তা তার মনকে আচ্ছন্ন করে দিল।

ওর জন্মদিনে আরও ভাল কিছু দিতে হবে। আবার ঘাঁটতে হবে নথি। তার খুশির বিচ্ছুরণ সত্ত্বেও সে ভেবেছিল মেয়েটি অন্য কোন অর্থ সম্পর্কহীন পন্থা বেছে নেবে তার ভাব প্রকাশের জন্য। কারণ টাকা খরচটা তাকে ভবিষ্যতের কথা ভেবে ধাক্কা দিত। কিন্তু এই অবস্থাকে সে দীর্ঘদিন চলতে দিতে পারে না। সে একটা খাদে পড়ে যাচ্ছিল, বা উড়ে যাচ্ছিল অজানার দিকে। তার হৃদয় ছাপিয়ে উঠছিল উচ্ছ্বাস ও প্রতীক্ষায়। সে যখন তার হাতটা চেপে ধরেছিল সে তা সচেতনভাবেই গ্রহণ করেছিল। তার ইঙ্গিতপূর্ণ হাসি তাকে উৎসাহ যোগাল।

কিন্তু এরপর কি? তার এক ও একমাত্র লক্ষ্যের ছন্দে কি এটা থাকবে। সে একটা বড় কিছু ভাবছিল যার আপেক্ষিক মুহূর্তগুলো উত্তেজনার গরমে উত্তপ্ত ছিল। সে অজানার সামনা করছিল। তা ছিল তারই ভাগ্য। সে একটা দরজায় কড়া নাড়ছিল যার পেছনে সময় থমকে দাঁড়িয়েছিল। বা তৈরী হচ্ছিল পিছু ফিরতে। 'ফিরে এসো নাহলে ধ্বংস হও' একটা ডাক প্রতিধ্বনিত হল। কিন্তু কোন কান শুনতে পেল না বা কোন হৃদয় সাড়া দিল না।

পরদিন মেয়েটি তার সামনে দাঁড়িয়ে চোখাচুখি করল, সে দৃষ্টিতে ছিল আত্মসমর্পণ ও মিষ্টতা। ওথমানের মাথায় আগুন ধরে গেল তার গলা জ্বলছিল। ওথমানের আঙুলগুলো তার দিকে এগিয়ে গিয়ে তার শরীর স্পর্শ করল। সন্ত্রস্ত ভাবে এদিক ওদিক তাকিয়ে সে কিছু অর্থহীন নির্দেশ দিল। ওথমান নীচু হয়ে তার ওষ্ঠ চুম্বন করল, আবার ফিরে গেল নিজের আসনে ভয়ঙ্কর, জ্বলন্ত জীবন দেখে বা অজানায় ভয়ে।

২৩

কয়েকদিন পরের এক শুক্রবার দুপুরেই তারা মিলিত হল। একে অপরকে পাবার ব্যাকুলতা থেকেই এই অভিযান। তবে আশা ছিল শেষে এসে মিলতে পারে মুক্তি। ওথমানের কাছে এটা খানিকটা সম্মানহানি হলেও তা তাকে আনন্দ দিয়েছিল। প্রেমিক-প্রেমিকারা কোথায় মিলিত হয় সে সম্পর্কে তার কোন ধারণা ছিল না। মেয়েটাই পরামর্শ দিল অল আজবাকিয়াবাগে যেতে। জায়গাটা নিরাপত্তাবিহীন ও খোলামেলা এই অজুহাত দেখিয়ে ওথমান সেটা বাতিল করল। তার চেয়ে বরং চিড়িয়াখানা শহরের কোলাহল থেকে দূরে আর নির্জনও বটে, আর কারুর দেখে ফেলার সম্ভাবনা নেই। আর ট্রামে করে ফাঁকা জমির ওপর দিয়ে যাওয়া যাবে। পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে বেশ কয়েক ঘণ্টা ধরেই তারা জীবনটাকে উপভোগ করল। ওথমান বলল, "সেই স্কুল থেকে কবে একবার চিড়িয়াখানায় এসেছিলাম।" সদ্য পরিচিত একটা মেয়ের সঙ্গে কথা বলার ধরন তার জানা ছিল না। তাই সে কিন্তু কিন্তু করছিল। মনের আনন্দে শান্তভাবে দুজনে ঘুরপাক খেতে লাগল। কিন্তু কিছু বলতে না পারার অস্বস্তিটাই ওথমানকে পীড়া দিচ্ছিল সবচেয়ে বেশি। তাব ভেতর থেকে কে যেন তাকে ইন্দ্রিয়পরবশ হতে বারণ করছিল। এটা ঘটতে বা বাড়তে দেওয়া উচিত হবে না। তার মনের বিভ্রান্তি ও হতাশা কাটাতে সে গাছপালা,

পুকুর, প্রাণী প্রভৃতির ওপরে অত্যধিক মনোযোগী হয়ে পড়ল। পরিস্থিতির উপযোগী কোন কথা বলতে না পারার অস্বস্তিটা সে আবার অনুভব করতে লাগল। এর থেকে সে নিষ্কৃতি পেতে চাইছিল। কারণ ইতিমধ্যেই অনেকটা দেরী হয়ে গেছে। পাশে হাঁটা ওনসিয়ার দিকে তাকিয়ে তার মনে হল যেন তার চোখ দিয়ে ঝরে পড়ছে স্বপ্নময়, বিজয়ীর দৃষ্টি। বিজয়ীনীর গর্বে মাথা উঁচু করে সে হেঁটে যাচ্ছিল। চোখমুখের হাবভাবের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পাচ্ছিল অনেক দিনের চাপা বাসনা। আর তার শ্বাস-প্রশ্বাসের মাধ্যমে ওথমান অনুভব করল যে সে পৃথিবীর সবচেয়ে রহস্যময় সৌন্দর্যকে আত্মসাৎ করেছে। দুই চোখ এক হল, তার উজ্জ্বল দৃষ্টিতে ছিল খাঁটি সরলতা, দুষ্টু মিষ্টি হাসির ঝিলিক ও এক গোপন আকাঙ্ক্ষা। মেয়েটা প্রতিবাদের ঢঙে বলল, "জান, চাকরি পাওয়া সত্ত্বেও আমি যখন তখন বাড়ি থেকে বেরুতে পারি না।"

ওথমান অভিভাবকের ঢঙে বলল, "ব্যাপারটাকে প্রাধান্য না দিলেই হয়।"

"কিন্তু এটা বেশ অস্বাভাবিক আবার অপমানজনকও বটে।"

"সব বাবা-মা-ই এরকম করেন।"

"আমার মনে হয় না ব্যাপারটা তুমি বিশ্বাস কর।"

"সত্যি?"

সে হাসল, এক নিশ্চিন্ত নির্ভরশীলতার হাসি। তারপর বলল, "মা যদি জানতে পারেন যে আমি তোমার সঙ্গে ঘুরতে এসেছি। মনে হয় না কিছু ভাববেন।"

"কিন্তু তিনি তো জানেন না?" ওথমান উদ্বিগ্নভাবে বলল।

মেয়েটি হেসে উঠে মুহূর্তের মধ্যে চুপ করে গেল। যতক্ষণ না তার গলা শুকিয়ে যায়। তারপর বলল, "চুক্তি অনুযায়ী সাক্ষাৎকারটা কিন্তু গোপন থাকবে।"

"অবশ্যই সোনা।"

"সত্যিই বলতে কি আমি এতে খুশি নই।"

সে খোলামেলাভাবেই মিশতে চাইছিল, কারণটাও বেশ পরিষ্কাব। মেয়েটা কি তখন থেকেই তাকে ক্ষমার চোখে দেখছিল? সে কি পরিকল্পনাবিহীন কিছু গ্রহণ করতে বাধ্য হবে? ধ্বংসের শক্তি কি তার মনের গভীরের বাসনা কি তার স্বপ্নকে ভেঙে চুরমার করে দেবে? তার ভয়ার্ত মন প্রতিদ্বন্দ্বীতায় আহ্বান করল অজানাকে এবং তাকে হত্যার ভয় দেখাল। যদিও শেষ পর্যন্ত নিজের চিন্তায় নিজেই লজ্জিত হল সে। ওথমানের নজরে পড়ল হরিণীসমা এক আবছা অবয়ব তার চারপাশে ঘুরপাক খাচ্ছে। তার হাতে তখন মেয়েটির হাত। আর মেঘেরা ঘুরে বেড়াচ্ছিল বাগিচার ওপর দিয়ে আর তার মনে হচ্ছিল যেন ওটা তার প্রিয়তমার আনন্দেরই প্রতিফলন। সে দ্রুত চেতনার জগতে ফিরে এল আর কবরস্থ করল হতাশার অলীক বাসনাকে। সন্ধি করল তার সস্তা উচ্চাশার সঙ্গে যাতে সে তাকে গলিয়ে ফেলতে পারে তার উত্তেজনার আগুনে। আর হজম করতে পারে তার অন্তর্দহনকে। মেয়েটার ছন্দোময় শরীরের অনুভূতি হঠাৎ সে তার কনুই-এ অনুভব করল। আর এই অজানা অনুভূতির যাদুর পরশে তাব সামনে এক নতুন দিগন্ত খুলে

গেল। সে খুব সাবধানে অপরাধীর মত এদিক ওদিক তাকাচ্ছিল, তারপর মায়াবী জাদুর পরশে মোহগ্রস্তের মত মেয়েটির গালে ও কাঁধে ঘুরে বেড়াতে লাগল তার ওষ্ঠাধর। গোলাপ পাপড়িগুলি মিলেমিশে একাকার হয়ে গেল। নিজের গলার স্বর নিজের কাছেই অচেনা ঠেকল ওথমানের। সম্মোহিতের মত বলল, "ওনসিয়া, তুমিই আমার লায়লী ভালবাসার নূর।

সে আবেগমথিত কিন্তু লাজুক হাসি হাসল। সে গুনগুন করে বলে উঠল, "আমি তো তাই চাই...তাই চাই...যদি পারতাম..." ঠিক তখন ওথমান চুপ করে জোরে জোরে শ্বাস নিতে লাগল। যেন তার হৃৎস্পন্দনই কথা বলছিল।

"হ্যাঁ।" মেয়েটি বলল।

"জান আমার মনে হচ্ছে তোমায় যেন কত কাল ধরে চিনি।" মেয়েটার হাসি তাকে ভরসা দিল, যদিও তার উজ্জ্বল চোখের কোণায় আরও অনেক প্রত্যাশা ছিল।

"জায়গাটা কি দারুণ না! অবর্ণনীয়।"

ওথমান বলল।

"তুমি প্রকৃতি প্রেমিক।"

কথাটা তাকে বেশ বিব্রত করল। কারণ সে তো জানে তার জীবনের বাস্তবটা কত অন্যরকম।

"সুন্দরের চোখে সবকিছুই সুন্দর হয়।"

"এই এটা কিন্তু বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে। আমি একটা কথা বলব, তুমি কিছু মনে করবে না তো?"

"মোটেই না।"

"তোমায় অন্যমনস্ক লাগছে কেন বলো তো?"

"সত্যি। তোমার কি তাই মনে হচ্ছে?"

"যাও তো, আমি জানি না। তোমাকে মাঝে মাঝে দুর্বোধ্য ঠেকে। কিন্তু তোমাকে আমার বেশ ভাল লাগে।"

"ছাড়ো তো ওসব কথা! একটাই বলার মতো কথা আছে, তা হল তুমি না...সত্যিই সুন্দরী।"

"তাতে কি?"

"আমাদের মধ্যে চিরন্তন কি থাকবে অন্তত ভবিষ্যতে?"

"ভবিষ্যতে?"

"কেন আমার চাকরির কাগজপত্রে গণ্ডগোলের কিছু আছে নাকি?"

"সে কি, না তো।"

"তুমি আমার জীবনের সবচেয়ে মহার্ঘ উপহার।"

মেয়েটা আবেগমথিত কণ্ঠে বলল, "তুমিও আমার তাই।"

ওথমান ওনসিয়ার কথার পুরস্কার দিল তার ঠোঁটে আর তার হাত নিয়ে দুষ্টুমি করতে লাগল।

"আমি কি চাই আর কি করতে পারব সেই ভুলভুলাইয়াতেই ঘুরে বেড়াচ্ছি।"

"সেরকম কিছু আছে নাকি?"

"জীবনটা হল এক ঝাঁক অতৃপ্ত ইচ্ছার...।"

"আমাকে নিয়ে কি ভাবছ বল।"

সে ঠিকই বলেছিল। তার ঠোঁটে এখনও ওনসিয়ার গোলাপ পাপড়ির আবেশ। তার হাতটা এখনও জড়িয়ে আছে ওনসিয়ার শরীর, এভাবে হাতিটার দিকে যেতেই সে শুঁড় তুলে তাদের অভিবাদন জানাল।

"আমাদের সম্পর্ক আপাতত গোপন থাকুক।"

"কেন?"

"যাতে কেউ না আমাদের বাজে ভাবে।"

"কেন ভাববে?"

"লোকে পারে।"

"আমাদের মধ্যে তো কোন বাজে ব্যাপার নেই।"

"সোনা, ওটাই তো লোকে চায়।"

সে খিলখিল করে হেসে জিজ্ঞেস করল, "তুমি কি আমাকে এসব জ্ঞান দেবার জন্য ডেকে পাঠিয়েছিলে?"

"আমার আসতে বলার কারণ হল আমরা একে অপরকে জানতে চাই। আমি নিশ্চিত হতে চেয়েছিলাম যে আমার মন ঠিকই বলেছে।"

"তা জনাব, পেলে কি কিছু?" মন যে সেরা পথপ্রদর্শক সে ব্যাপারে আমি নিশ্চিত।

এত কিছুর পরেও সে অবাক হয়েছিল এই ভেবে যে কেন সে তাকে সরাসরি প্রেম নিবেদন করতে পারল না। কেন তার পাণিপ্রার্থনা করল না। যেন তার জীবন ওলট পালট হয়ে গেছে আর নতুন দিক নির্দেশ করছে। ওনাসিয়া কি ধ্রুবতারার চেয়েও বেশি সফল হবে না তাকে খুশি রাখতে।"

২৪

প্রধান শিক্ষয়িত্রী আসিলা হিজাজি উৎসাহবশত আবার এলেন কাজকর্ম এগিয়েছে কিনা জানার জন্য। অন্ততঃ ওম হুসনি তাকে আমন্ত্রণ করার সময় সেই কথাই বলল। ওথমান তখন ত্রিমুখী অন্তর্দ্বন্দ্বে দীর্ণ। একদিকে ওম হুসনির তাকে আসিলার সঙ্গে বিবাহিত দেখার ইচ্ছে, তাকে ভাঙিয়ে আসিলার আখের গুছোনোর ইচ্ছে আর তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল তার নতুন ভালোবাসা। এই তিনের দ্বন্দ্ব তাকে প্রায় পাগল করে তুলছিল। সে আসিলার আগমনকে প্রশ্রয় দিয়েছিল—কারণ হয়ত তা তাকে তার মানসিক চাপ থেকে মুক্তি দিতে পারে। তাতে তার কোন ভুল হলে সে নাচার। আসলে সে একটা মুক্তির রাস্তা

খুঁজছিল, আর কাদ্রিয়াকেও তো রোজ কাছে পাওয়া যায় না। তাই সে আসলিয়াকে সাদর অভ্যর্থনা জানাল," আপনার সমস্যাটা দ্রুত সমাধানের দিকে এগোচ্ছে।"

ইতিমধ্যে তার শরীরের আকর্ষণ দ্রুত বেড়ে গেছে। তার ফুল আঁকা পোষাক যেন নরকের গান শুরু করেছে। সে আগ্রহসহকারে জিজ্ঞেস করল,

"আমার ব্যাপারটা মিটতে কি অনেকদিন লাগবে?" ঠিক তখনই ওম হুসনি বাইরে গেল কফি আনতে। একটা ভাবনা তাকে মরীয়া করে তুলেছে—সে তাৎক্ষণিক ফয়সালা চায়, তাই ফলাফলের কথা না ভেবেই এক চূড়ান্ত আঘাত হানল।

"না, বেশিদিন লাগাবে না।"

"আমি যে কি বলে আপনাকে কৃতজ্ঞতা জানাব।"

"পুরোটাই আপনার মানসিক জোরের ওপর নির্ভরশীল।"

"অপেক্ষার ঘড়ি কি আরও বড় হবে নাকি?"

সে পরিস্থিতির চাপ কাটানোর জন্য বলল,

"আমায় শ্রদ্ধা প্রদর্শনের একটা সুযোগ দাও।"

দিদিমণি লজ্জায় অধোবদন হলেন।

"আমি সত্যিই আপনাকে শ্রদ্ধা করি, ঠিক এক পুরুষের চোখে নারী যতটা শ্রদ্ধা পায়। তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ আমি কি বলছি।"

সে একটাও কথা বলল না। তবে তাকে খুব সুখী দেখাচ্ছিল। যেন সে স্বর্গে প্রবেশ করতে চলেছে।

"আমাদের কিন্তু সতর্ক থাকতে হবে। হয়ত আমার পরের কথাগুলো তোমার পছন্দ হবে না।"

তার দৃষ্টিতে ছিল প্রশ্ন।

"বিয়েটা এখানে প্রশ্নাতীত। মুহূর্তে মেয়েটা ফ্যাকাশে হয়ে গেল। সে আরও কঠোর ও নির্মমভাবে বলল, "আমি রহস্যেমোড়া সহস্রাধিক জীবন ও ঘটনা দেখেছি।"

"ওকথা আমায় শুনিয়ে কি হবে? সে দুর্বল স্বরে প্রশ্ন করল।

সে তীর্যক স্বরে বলল, "আমরা প্রাপ্তবয়স্ক বলেই শুধু নয়। প্রাপ্তবয়েসের মতই কথাবার্তা হোক। দায়িত্ববোধের কর্তব্য পরায়ণতার সুখ, খুশীর।

"কি যে বলছ বুঝছি না।"

"আচ্ছা আমি তোমাকে শ্রদ্ধা করি, কিন্তু জান তো আমি চিরকুমার।"

"কেন একথা বলছ?"

"হয়ত অসমাপ্ত অধ্যায়টা শেষ করতে চাইছি।"

"তুমি আমায় অমানবিক অপমান করলে।"—সে বিরক্ত হয়ে বলল।

"আমায় ক্ষমা কোর। আমি গভীর যন্ত্রণা থেকে বলছি।

"সে রেগে গিয়েও চুপ করে গেল।

"ছোট্ট একটা সাহসেই আমরা খুশী হতে পারি।"

"কি বলতে চাও?"

"তুমি কি কিছু বুঝতে পারছ না?"

"আমার মনে হয় না আমি তোমাকে বুঝতে পেরেছি।"

"আমাদের নির্জনে সাক্ষাৎ হওয়া দরকার," তার অদ্ভুত স্বরে নিজেই সে চমকে উঠল।

"জনাব বাইয়ুমি। সে চেঁচিয়ে উঠল।

"দুই প্রাপ্তবয়স্কের ভালোবাসা ও সখ্যতার সান্ত্বনা হবে।" সে নিরুত্তাপ ভাবে বলল। মেয়েটা রেগে দাঁড়িয়ে উঠল," হয় তুমি যাও নয় আমি যাব।"

"আমিই যাচ্ছি, কিন্তু ঠাণ্ডা মাথায় ব্যাপারটা ভেবে দেখো। ভুলো না আমি খুবই দরিদ্র।"

২৫

এখন আর তার মাথার পাকা চুল খোঁজাটা কষ্টকব নয়। এটাই তাকে হাড় হিম করা ভয় দেখাচ্ছে জীবনেব ছন্দ পরিবর্তনের। জীবনটাই বা কি? একটা সময় কাটানোর খেলা ছাড়া। ভাগ্যের মুখোমুখি নিজেকে চূড়ান্তভাবে খুঁজে না পাওয়া পর্যন্ত মানুষ যা কিছু খেলে তা অনিচ্ছা সত্ত্বেই। সে তখন জীবনের দিকে তাকিয়ে দেখবে তার সফলতার চুক্তির মূল্যায়ন করবে। পরবর্তী কষ্টের জন্য সে নিজেকে তৈরী করবে ও পরাজয় বরণ করবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পরাজয়কে ফেলবে ঘটনাবলীর সামনে যেখান থেকে কোন উন্নতি সম্ভবপর নয় পরবর্তী লক্ষ্য সাধনে। আর্থিক সঞ্চয়ের সঙ্গে বাড়ছিল তার স্নায়বিক উত্তেজনা আর বাড়ছিল সাংসারিক প্রচেষ্টা। সম্পর্ক প্রগাঢ়তর হচ্ছিল ওনসিয়ার সঙ্গে, ধীরে কিন্তু নিশ্চিতভাবে। কাদ্রিয়া তাকে সারাজীবনের সম্পর্ক স্থাপনের আশ্বাস দিয়েছিল। প্রার্থনা শেষে খুদাতাল্লাকে নিশ্চয়ই বলবে

"তুমি ছাড়া জীবনে কি আছে?"

কিন্তু তুলনামূলকভাবে তার সহ্যক্ষমতা অন্যদের চেয়ে কম ছিল। একদিন তার টেলিফোন বেজে উঠল। ফোনটা ছিল আসলিয়ার।

"আপনার সফল চেষ্টার জন্য ধন্যবাদ।"

"ওটা বলার মত নয় বানু।"

"কেমন আছেন?"

"খোদাতাল্লার আশীর্বাদে ভালই, ধন্যবাদ।"

"শুনে ভাল লাগছে।"

"ধন্যবাদ।"

"আপনার সাহায্যের জন্য আমি কৃতজ্ঞ।"

"আপনি খুব ভাল।"

কয়েক মুহূর্তের নীরবতা—

"একটা ব্যাপারে তোমায় প্রয়োজন।"

"খোদা না করুন।"

"আগেরবার আমি রাগ করে বেরিয়ে গিয়েছিলাম। মনে আছে।"

"আমি দুঃখিত, কিন্তু রাগ করার মত কিছু ছিল না।"

"তোমার তাই মনে হয়?"

"হ্যাঁ।"

"কই, হে তুমি তো আমার সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে চাওনি?"

"আমি দুঃখিত আপনার ফোনে নং জানতাম না।"

"কিন্তু আমি তো তোমারটা যোগাড় করেছি।"

"আবার দুঃখিত।"

"আশা করি এটা ঠাণ্ডা মাথায় মিটিয়ে নেবে।"

"আমি ব্যগ্র হয়ে উঠেছি।"

"সত্যি?"

"অবশ্যই।"

"কিভাবে?"

"ঐকান্তিকভাবে। একটা সান্ধ্য হোক।"

"আপনি কি এখনও গরীব?"

"ওটা কোন কাজে লাগবে না।"

"আমাদের সৌভাগ্য আমি অর্থবান।"

"আল্লা আপনাকে আরও সম্পদ দিন।"

"আর কিছু শুনতে চাও?"

"ঢের হয়েছে।"

"তোবা তোবা। তবে আমরা নিজেদের কাজ করি।"

ওটা আত্মসমর্পণ ছিল না। আক্ষরিক অর্থেই ছিল ভেঙে পড়া—সে হয়ত কারণগুলো বুঝতে পেরেছিল। মেয়েটি মাঝবয়সী। যৌবন এগোচ্ছে ক্ষয়ের দিকে। একাকীত্বে কম্পিত হচ্ছে সে। যৌবন নয়, সৌন্দর্যও নয় তার মনে উদয় হল আশাতীত এক দ্বন্দ্ব। সে সাক্ষী হল দুঃখজনক ঘটনাসমূহের।

কি করবে সে? সে ওনসিয়াকে ভয় পেত কিন্তু আসিলাকে কামনা করতে পারে নি। হতাশার মুহূর্তে ভাবত হয়ত অতৃপ্ত কামনা নিয়েই তার হৃদয়ের মৃত্যু হবে। সে বেখেয়ালে এগোতে চায় পরবর্তী লক্ষ্যের দিকে। আর ব্যথিত হৃদয়ে নিজেকে নিজে বলে মেহের আলির মত, "সব ঝুট হ্যায়।" যারা আমাকে পাগল বলে তারা দোষী নয়।"

২৬

বাড়ি সাজানোর সময়টা তার হবে কখন? সে অলসভাবে দিনগুলো চলে যেতে দিচ্ছিল। সব কিছুই তার মাথা থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিল যেদিন না সে হঠাৎ দেখল আসিলা তার টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে। সে মনে মনে তাকে অজস্র অভিশাপ দিয়েও হাসিমুখে অভ্যর্থনা জানালো। "আমার সাহস ক্ষমা করবেন," সে বলল। ওথমান কোনো মন্তব্য না করে হাসল।

"আপনার সঙ্গে টেলিফোনের কথোপকথনের কোন অর্থ আমি খুঁজে পাইনি।"

"আমি ভীষণ ব্যস্ত ছিলাম, দপ্তরের গাম্ভীর্য বজায় রেখে সে উত্তর দিল।

"কি ব্যবস্থা করলেন?"

"কিছু না।"

"একদম কিছু না?"

"বিশ্বাস করুন আমি এক মুহূর্তের জন্যও অবসর পাইনি।"

"আমি আশা করেছিলাম যে আপনাকে বেশ উদ্বিগ্ন দেখব।"—সে বেশ জোরের সঙ্গে বলল। তার বলার ভঙ্গীতে একটা মরীয়া ভাব ফুটে উঠেছিল। যেন তার ধৈর্য্য কমে আসার সঙ্গে সঙ্গে ভয় বাড়ছিল।

"আমি সত্যিই উৎসাহী ছিলাম, কিন্তু সময় পাচ্ছিলাম না।"

"রাওয়াদ-অল-ফারাজে একটা বাসা খালি আছে... হাত থেকে একটা কাগজ বের করতে করতে সে বলে চলল।" আর এই হচ্ছে ঠিকানাটা। নিজে গিয়ে দেখে আসুন আর যদি পছন্দ হয়, তবে না হয় সাজিয়ে নেবেন।" তারপর বেশ প্রলুব্ধ করার মত করে বলল, "সম্ভবতঃ পছন্দ হবেই। কে জানে হয়ত এটাই আমাদের খুশী আনবে।" ওথমানের মনে হল চারদিকে যেন আতসবাজির রোশনাই উঠছে। মেয়েটা চলে যাওয়ার পর ওথমান দীর্ঘ রাত্রির কথা ভাবতে লাগল। যেগুলো শুধুই তুলনীয় আরব্য রজনীর অবিস্মরণীয় রাত্রিগুলির সঙ্গে। অথবা সেই রাত্রিগুলো যখন সে পড়াশোনা ও অনুবাদ একসঙ্গে চালিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। বা তার বিভাগীয় প্রধানের কাজগুলো করে দিত। মহান যাত্রাপথে আত্মত্যাগের রাত্রি। যে রাস্তাটা প্রথমদিন থেকে সে পছন্দ করেছিল তার লক্ষ্য হিসেবে সেটা তার অনন্তের সন্ধানকে উজ্জীবিত করতে সাহায্য করেছিল। নারীর প্রতি তার আকাঙ্ক্ষা ক্রমশ কমে আসছিল, অধিকাংশের চিন্তাহীন সুলভতা দেখে। আর যেভাবে তাবা নির্দ্বিধায় নিজেদের তুলে দিচ্ছিল তা দেখে। কাদ্রিয়ার বিকল্প হিসেবে সে খুব খারাপ হতো না। কিন্তু তার ক্ষেত্রে সে উপভোগ করছিল একটা আগুন লাগার আওয়াজ—যা তাকে গিলে ফেলতে উদ্যত হয়েছে তাকে ও তার পবিত্র আশাগুলোকে। যেগুলো যুক্ত আছে ঈশ্বরের রহস্যজনক বাণীতে। পার্থিব শক্তির হাতে নিজেকে সে ধ্বংসের জন্য তুলে দিতে পারে না। জগৎসংসারে ঈশ্বরের আর এক রহস্য হল মৃত্যু৷ তাঁর নিজের উৎসাহব্যঞ্জক মহিমার মত। আর মূল্যবান সময় সে যে নারীর পেছনে

ব্যয় করেছিল তার কাছে যখন সে সমাদৃত হল না তখন একেবারে হাল ছেড়ে দিয়ে বিধবা বা পতিতাদের কাছে মাথা নীচু করা ভুলই হবে তার।

একদিন রাত্রে দরজায় কড়া নাড়ার আওয়াজ পেল সে। দরজা খুলে অবাক বিস্ময়ে দেখল আসিলা দাঁড়িয়ে আছে নতমস্তকে, যেন পৃথিবীর সব অপমান গায়ে মেখে।

সে অপ্রস্তুত হয়ে বলল, "আমি আসব বলেই প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, আর যদি কেউ আমায় দেখে ফেলে তবে আমি এমন ভাব করতাম যেন আমি ওম হুসনির কাছে এসেছি আর এটা তার ঘর মনে করেই আমি কড়া নেড়েছি।"

ওথমান তাকে আশ্বস্ত করার জন্য বলল, "খুব ভালো করেছ।"

"আমি আসাতে কি তুমি কিছু মনে করেছ?" জীবন যেন তার শরীরের ভেতর থেকে মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। এক অদ্ভুত শিহরণ খেলে গেল তার শরীর জুড়ে।

"মোটেই না, তুমি ভাবতেই পারবে না যে আমি কতটা খুশি।"

"ওম হুসনি আর একটু পরেই শুয়ে পড়বে। আর সে যদি কিছু সন্দেহ করেও তাতে কি কেউ কিছু মনে করবে?"

"একদম নয়।"

তারা একে অপরের দিকে অপলকে তাকিয়ে রইল। যেন বয়ে চলেছে এক অন্তহীন গভীর স্রোত! কিন্তু তার তলার মানুষটির মধ্যে আছে প্রতিরোধহীন, গর্বহীন এক নারীর ভালোবাসা।

"তুমি কি করেছ?"—সে কোমল আশায় জিজ্ঞেস করল।

ওথমান বিস্ময়ের ঘোর কাটিয়ে বাস্তবে ফিরে এল। তার কোনো কথাই বলতে ইচ্ছে করছিল না কিন্তু সে বুঝতে পারছিল যে এটা একপ্রকার শরীরী আবেদন। যা ফুটে উঠেছিল ওই মহিলার মধ্যে।—যে নিজেকে তৈরী করছিল সমর্পণের জন্য।

ওথমান তার নরম হাতদুটো ধরল। হাতদুটো খুবই শীতল মনে হল। ওথমানের হৃদয়যন্ত্র সঙ্কুচিত হয়ে তার রক্তসঞ্চালন স্তব্ধ হয়ে গেল। সে মেয়েটির হাত দুটো এমনই নিষ্পেষণ করছিল যেন সে কোন পবিত্র বার্তা পাঠাচ্ছে। মেয়েটি হয়ত তার এধরনের আচরণ আশা করেনি, তাই হয়ত সে অস্বস্তিবোধ করছিল আর চেষ্টা করছিল হাত ছাড়িয়ে নিতে। কিন্তু ওথমান সেটা হতে দিল না। অতঃপর সে প্রশ্ন করল, "তুমি কি করতে চাও?" ওথমানের নির্লিপ্ত উত্তর এল, "ও পরে আলোচনা করা যাবে।"

ওথমান মেয়েটার দিকে ঝুঁকে পড়ে তাকে চুম্বন করে, "তুমি কিন্তু আমার সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করোনি।"—মেয়েটি বলল।

"পরে হবে," বলল ওথমান।

"কিন্তু আমি কি এই করতেই এসেছি?" "তোমার প্রাপ্য তুমি পাবেই..." মেয়েটি কিছু বলার জন্য মুখ খুলতেই ওথমানের প্রগাঢ় চুম্বনে তার কথা ঢাকা পড়ে গেল। তীব্র আবেগমাখা কণ্ঠে বলল, পরে।

একটা অত্যাশ্চর্য ঘটনা হল প্রকৃতি যেন মেয়েটার ওপর একটা সুরের মায়াজাল বিস্তার করেছিল। কিন্তু সুরটা দ্রুত মরে গিয়ে পেছনে ফেলে গেল এক সন্দেহজনক নীরবতা, আর এক দীর্ঘ মেয়াদী এক ব্যথাতুর অনুভূতি। ওথমান বিছানায় শুয়ে পড়ল। কিন্তু মেয়েটা নিজের জায়গাতেই বসে রইল। মেয়েটার পোষাকের ফাঁক দিয়ে তার অন্তর্বাস দেখা যাচ্ছিল। বিজলী বাতির ছটায় তার তন্দ্রালু ভাব, ঘাড়ে কপালে জমে ওঠা বিন্দু বিন্দু ঘাম সব মিলিয়ে মিশিয়ে তাকে বেশ মোহময় করে তুলেছিল।

সে এমন তন্ময় হয়ে বসেছিল যে ঠিক মনে হচ্ছিল যেন এক প্রস্তরমূর্তি। কিছুই দেখছিল না কিছুই চাইছিল না, বুঝতে পারছিল না পৃথিবীতে তার কি প্রয়োজন। ওথমানের অপলক দৃষ্টি যখন মেয়েটাকে বিদ্ধ করল তখন মনে হল সে যেন সম্পূর্ণ অপরিচিতা যেন একেবারে সম্পর্কহীন। যেন রাতের গর্ভ থেকে বেরিয়ে আসা এক অজানা বস্তু। কিন্তু সেই উদ্দীপক ব্যক্তিটিও নয় সেই তার মধ্যে আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছিল এটি একটি বোবা বিষয়। যার না আছে অতীত না ভবিষ্যৎ। সে নিজেকে বলল যে এই টানাপোড়েনের খেলাটা মৃত্যু ও পুনর্জন্মের অনুশীলনের চেয়ে বেশি কিছু নয়। আর একটা অবশ্যম্ভাবী বিয়োগান্তক জীবননাট্যের আগাম পূর্বাভাস। এর বিশালতার সঙ্গে একমাত্র তুলনীয় হল, বৈচিত্র্যময় অজানায় দ্রুত উন্মেষ। মহানির্দেশকের অবস্থানটাও ছিল অনেকটা এরকম উন্মেষ। শুধুমাত্র ইচ্ছার প্রচণ্ডতাকে মূলধন করে এটা উত্তরে পর্যবসিত হতে পারে। যতই আকর্ষণীয় হোক না কেন, পরে ফিরে দেখার কোনো লাভ নেই। ভগবানকে ধন্যবাদ যে সে অকৃতকার্যতার পেছনে বেড়া দিতে পেরেছিল। যদিও তা প্রাণান্তকর। এখানে দ্বিধা ও লজ্জা নিয়ে আশাবাদী হয়ে বসে আছে মহিলাটি। অথচ আপ্রাণ চেষ্টা করছেন নিজের প্রয়োজনীয় প্রশ্নটা করার জন্য। মেয়েটি আশাবাদী ছিল যে ছেলেটিই প্রথম শুরু করবে। কিন্তু তাকে নিরুৎসাহ দেখে কটাক্ষ হেনে বলল,

"তাহলে?"

মেয়েটির এই অপরিচিত কণ্ঠস্বর তাকে বিমূঢ় করে দিল। সে যেন ওথমানের নিঃসঙ্গতায় এক বর্গির উপদ্রব। তার প্রতি এক তীব্র বিতৃষ্ণা জন্মাল ওথমানের। সে বড়জোর পাথরের পর পাথর গেঁথে গড়ে তোলা সৌধটা ভেঙে ফেলতে পারে।

"তুমি কি ভাবছ!' মেয়েটি জিজ্ঞেস করল।

"কিছু না।"

তার বলার ধরনে ফুটে উঠল তার মধ্যে সুপ্ত থাকা বদমেজাজটা, যেটা তার গলির বৈশিষ্টও বটে।

"তুমি নিশ্চয়ই কিছু করেছ।"

"একদমই না।"

"বাসাটাও কি তুমি দেখবে না?"

"না"।

তার মুখটা হতাশার অন্ধকারে ঢেকে গেল। "কিছু মনে করো না...আমি কি...আমি কি তোমার হাতে টাকাটা দিয়ে যাব?"

"না"।

"খোলাখুলি বলছি। তুমি কিন্তু আমার কাছে এখনও এক দুর্ভেদ্য প্রহেলিকা।'

"আমি সবকিছুই বলেছি।"

"তার মানে? দয়া করে আমাকে উত্যক্ত করো না।"

"আমি কিছুই করতে চাই না।"

"সম্ভবত তুমি রাজী হয়েছিলে আর শপথ করেছিলে, সে কম্পিত কণ্ঠে বলল।

"আমি তো বললাম, আমার দ্বারা হবে না।"

"তোমার যদি এখন সময় না থাকে তো..."

"এখনও নেই, আর হবেও না।"

আসিলা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভাঙ্গা গলায় বলল,

"সম্ভবতঃ তুমি অন্য কিছু ভেবেছিলে।"

"আমার মধ্যে ভাল কিছু নেই, আর সেটাই মূল কথা।" ওথমান স্বীকার করল।

সে ছুরিকাহতের মত সরে গেল। তাড়াতাড়ি অবিন্যস্ত পোশাকআশাক ঠিক করে নিল, কিন্তু তখনই সে অবসাদে ভেঙে পড়ল। সে নিজের হাতে মাথা রেখে, চোখ বুজে বসে রইল। তার মনে হচ্ছিল সে যেন মূর্চ্ছা যাবে। ওথমানের হৃৎস্পন্দন বেড়ে গেল, তার নির্দয়তা তাকে তাড়িয়ে নিয়ে গেল। যদি অভাবনীয় কিছু ঘটে সে অসাধারণ দৃঢ়তার সঙ্গে সে দুর্নামের মোকাবিলা করতে পারবে। তার সম্মানের তুলনায় লক্ষ্যটা ছিল যথেষ্ট কঠিন ও নির্মম। কি হবে যদি সে হঠাৎই দুর্নামের জন্য খবরের কাগজের শিরোনাম হয়? সে প্রায় তার স্বভাব পরিবর্তন করেছে বা মিথ্যা ঝুঁকির আশ্রয় নিয়েছে। কিন্তু সেই মুহূর্তেই মেয়েটি নড়েচড়ে উঠল। সে বেশ কষ্ট করে উঠে দাঁড়াল, নিজের রাস্তা খুঁজে নিয়ে বিধ্বস্ত অবস্থায় দরজা দিয়ে তার দৃষ্টির বাইরে চলে গেল। ছেলেটা উঠে দাঁড়িয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে ধীরে ধীরে এগিয়ে গেল জানালার দিকে। ওথমান তাকিয়ে রইল গলিটার দিকে। যতক্ষণ-না প্রায় অন্ধকার ওই রাস্তা দিয়ে আসিলার অশরীরী অবয়বটা দ্রুত মিলিয়ে যায় সদর দরজার দিকে। আসিলা ওই পথ ধরে এগিয়ে যেতে লাগল অল-জামালিয়ার দিকে আর তারপর দ্রুত হারিয়ে গেল অন্ধকারে।

ওথমান নিজের মনে বলল, কেউই অজানাকে জানে না, আর তাই এটা এড়ানো অসম্ভব। কোন কাজের ওপর নির্ভর করেই কোন সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। তবু এখনও মানুষকে এক সঠিক লক্ষ্য সন্ধানের জন্য অন্ধকারে এক পথপ্রদর্শকের হাতে নিজেকে সমর্পণ করতে হয় ভাগ্যের ও ঘটনার মার এড়াতে। ওটা একটা রূপরেখার উদাহরণ মাত্র। যা প্রকৃতি তার অনন্ত যাত্রাপথে গ্রহণ করেছে।

২৭

সে ওনসিয়া রামদানকে ভালোবাসত আর এটা সে ঈশ্বর ও নিজের বিবেকের সামনেও স্বীকার করত। সেই প্রাচীন পানীয় জলের ঝরণার সামনে ঘটা ওই ঘটনার পর থেকেই তার হৃদয়ে আর মধুর সুর জাগল না। আর সেই কারণেই সে পৃথিবীর অন্য কোনো মেয়ের তুলনায় তার ব্যাপারে বেশি শঙ্কিত ছিল। ব্যাপারটা আরও খারাপ দিকে মোড় নিয়েছিল মেয়েটা তাকে ভালবাসতে। পৃথিবীর অধিকাংশ মেয়েরাই তাদের স্বামীদের অগ্রগতির পথে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। সে দ্বিধাহীনভাবে তাকে বিবাহ করতে পারে কিন্তু যদি সেখানে একধাপ ফারাক থাকে তার আর মহানির্দেশকের পদের মধ্যে। কিন্তু ব্যাপারটা যেমন তেমনই ছিল বিয়ে করে কি হবে, সমস্যা লাঘব হবে কি? সেই পরিচর্যা কি বৃদ্ধি পাবে যা মানুষের উৎসাহকে সৃষ্টির কাজে লাগাবে? রোজকার মতই একদিন হুসেন জামিল একটা চিঠি নিয়ে তার কাছে এল। ওথমান তার ওপরে নির্দেশনামা লিখে স্বাক্ষর করে দিল। হুসেন কিন্তু দাঁড়িয়েই রইল। সে ছিল সংগ্রহশালার এক তরুণ কর্মী যে বিগত পাঁচ বছর ধরে ওথমানের তত্ত্বাবধানে কাজ করছে। ধৈর্য্য ও ভাল ব্যবহারের জন্য দপ্তরে সে বেশ নাম কিনেছিল।

"কি হয়েছে, কিছু বলবে নাকি হুসেন?"

হুসেনকে কিছুটা বিভ্রান্ত লাগছিল। কিছু একটা বলার চেষ্টা সে করছে আপ্রাণ। কিন্তু সেটা কি?

"কি হয়েছে কি? কাজের ব্যাপারে কি কিছু...?"

ছেলেটা তার কাছে এগিয়ে এল যাতে অন্য কেউ তার কথা শুনতে না পায়।

"মহাশয়, একটা ব্যাপারে আমি খুব শঙ্কিত।"

"ওরে বাবা, কি সেটা?"

"আমি সত্যিই দুঃখিত, কিন্তু বলতে তো হবেই।"

"বলে ফেল, আমি শুনছি।"

এক মুহূর্ত সময় নিয়ে সে নিজেকে গুছিয়ে নিল।

"ওটা কুমারী ওনসিয়া রামদানের ব্যাপারে...

পরে ওথমান নিজেকে বলেছিল সম্ভবত তখন সে নামটা শোনেনি বা শুনে থাকলেও তার বোধগম্য হয় নি।

"হুঁ?" সে হতভম্ব হয়ে বলল।

"ওনসিয়া রামদান।"

"তোমার সহকর্মী না? কি হয়েছে তার?"

সে অস্ফুটে বলল, "সত্যি বলতে কি... আমি না... ওর... প্রেমেই পড়েছি।"

বিস্ময়ে ওথমানের হৃদয় যেন মুহূর্তে স্তব্ধ হয়ে গেল।

সে বেশ রেগেমেগে বলল, "তার সঙ্গে আমার সম্পর্ক কি?"

"আমি ওকে এ ব্যাপারটা জানাতে চাই।"

"দারুণ। কি এখানে আমার কি ভূমিকা পালন করতে হবে?"

হুসেন মাথা নীচু করে আমতা আমতা করে বলল, "কিন্তু মহানুভব..."

ওথমানের পাদুটো কেঁপে উঠল। ওথমানের চোখের রূঢ় ভাষায় ছেলেটা আত্মসমর্পণে বাধ্য হল।

"হ্যাঁ?"

"আপনি সবই তো জানেন।"

"তা তুমি ব্যাপারটা বুঝলে কি করে?

"সত্যি বলতে কি, আপনি যদি এর মধ্যে না থাকতেন, তাহলে তাকে আমি প্রেম নিবেদন করতাম।"

ওথমান নিশ্চিত হল এখন তারই হাতে সব কিছু। তাহলে কোনকিছুরই কি দীর্ঘমেয়াদী মূল্য নেই। এমনকি জীবনেরও নয়?

"যদি এটা আমার বেলায় না ঘটত।"

"আমি সবকিছুই দেখেছি... এখানে আর বাইরে," হুসেন বেপরোয়াভাবে উত্তর দিল।

দুঃখের শক্তিতে ওথমান নিজেকে শেষপর্যন্ত অটুট বাখার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগল। সে তার হারানো প্রেমের জন্য খুব বেশি দুঃখিত হলো না। শুধু তার ভয় হচ্ছিল তার দপ্তরে এর প্রতিক্রিয়া নিয়ে।

"তোমার মন তো খুব নীচু ছোকরা। এতে কি এমন নোংরামো দেখলে তুমি? এটা ঠিকই প্রেমে এটাই ঘটে। আমি তাকে সর্বদা নিজের মেয়ের মত দেখতাম। একটা নির্দোষ সম্পর্ক। "কিন্তু আমার আশঙ্কা যে তুমি না জেনেশুনে তাব বদনাম রটাবে।"

"আমি জানি আমার ভালবাসার জনের মুখ চেয়ে কখন কিভাবে আমার দুঃখগুলোকে সংবরণ করতে হবে, আর তার সম্ভ্রম রক্ষা করতে হবে।" তার সরল কিন্তু কঠিন উত্তরে একটা বনেদীয়ানা ছিল।

"বেশ...বেশ," ওথমান ঘাড় নেড়ে বলল। একটা দুঃখের তরঙ্গ তার ওপর দিয়ে বয়ে গেল। "তুমি মনুষ্যচিত ব্যবহারই করেছ।" প্রারম্ভিক আঘাত ও স্বস্তির ধাক্কায় সে যেন মুক্তির আলো দেখলো। তবে সেই অনাকাঙ্খিত মুক্তির আঘাতে সে অসুস্থ হয়ে পড়ল। "তোমার মত লোকেরাই তাদের প্রিয়জনদের নিয়ে খুশী থাকবে।"

ওথমান উৎপাতহীন জীবনে দুঃখকে সম্বল করে একাই পড়ে রইলো। দুঃখ যেন তার ভাগ্যের মত গভীর ও বিশাল। এটা তার পুরোনো দিনের স্মৃতি জাগিয়ে তুললো। সে মনে মনে ভাবলো, জীবনকে যদি তার আনন্দের অংশ দিয়ে পরিমাপ করা যায়, তাহলে হয়ত নিশ্চিতভাবেই তার ভাগ্যটা বাতিল আবর্জনার মত দেখাবে। মহান লক্ষ্যের পথ এত দুঃখদীর্ণ কেন?

২৮

শুক্রবার সকালে মরুভূমিতে পিরামিডের সামনে ওথমান ওনসিয়াকে দেখা করতে বলল। এবারের অভিযানে সে অন্যবারের চেয়ে বেশি সতর্কতা অবলম্বন করেছিল। ওনসিয়ার হাতে সে এক টুকরো কাগজ গুঁজে দিয়েছিল অদ্ভুত চুক্তিটা লেখা ছিল। তা হল তারা আলাদাভাবে দুটো রাস্তা দিয়ে হেঁটে আসবে। দিনটা আর পাঁচটা শীতের দিনের মত শীতল ও শুষ্ক ছিল। যদিও ভেতরে ভেতরে তাদের উদ্দীপ্ত করে তুলছিল সূর্যের মধুর তাপ। ওথমান সারাক্ষণই এক চাপা রাগে ওনসিয়াকে দেখে গেল। যদিও সে তার নিষ্ঠুর ভূমিকার ব্যাপারে পুরোপুরি সচেতন ছিল। মেয়েটা কিন্তু প্রথম থেকেই খুব উদ্বিগ্ন ছিল।

"তোমার লেখাটা পড়ে আমি হতবাক হয়ে গিয়েছিলাম," সে বলল "আমার অন্তরটা যেন কেঁপে উঠেছিল।"

ওথমান নিজের মনে ভাবল, মেয়েরা কত সহজেই নিজেদের অনুভূতি দিয়ে প্রিয়জনের সবকিছু বুঝতে পারে। তাতে কোন বুদ্ধি দরকার হয় না। যদি সমগ্র মানবসমাজের এই জ্ঞান থাকত তবে কোন অজানাই অজানা থাকত না।

দুঃখের সাগরে নিমজ্জিত হয়ে সে বলল, "সত্যি হচ্ছে যে, আমাদের এই ব্যাপারে ভাবতে হবে।"

"কোন ব্যাপারে?"

"আমাদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের ব্যাপারে।

"তাতে দোষের কি আছে?"

"আমার নীরবতায় তুমি নিশ্চয়ই অবাক হচ্ছ। তাছাড়া সবচেয়ে প্রয়োজনীয় বিষয়টা ছাড়া আর সব বিষয়ই আমরা আলোচনা করেছি। আর স্বাভাবিকভাবেই তাই তুমি কখনও উপলব্ধি করতে পারনি যে আমি দিনরাত্রি কি নরকযন্ত্রণা ভোগ করছি।

মেয়েটা উদ্বিগ্নভাবে তার হাত ধরল।

"তুমি দেখছি আমার ভয় আরও বাড়িয়ে তুললে।"

"আমি স্বার্থপর তা আমি স্বীকার করছি।"

"তুমি মোটেই স্বার্থপর নও, সে দৃঢ়তার সঙ্গে প্রতিবাদ জানালো।

"হ্যাঁ, পৃথিবীর যেকোন অর্থেই আমি স্বার্থপর। আর তার কারণ হচ্ছে আমি তোমাকে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে চালিত করেছি ভুল পথে। আমি তোমার ক্ষমার যোগ্য নয়।"

"কিন্তু সত্যিই তুমি অতুলনীয়।"

"আমার দোষ ঢাকার চেষ্টা করোনা। তুমি অবশ্যই অবাক হয়ে ভাবছিলে, "কখন সে কি বলবে? সে আমার কাছে কি চায়? আমরা এভাবে কতদিন দেখা করব? শুধুই কি ও আমাকে নিয়ে খেলা করছে?

"আমি কখনও তোমায় খারাপ ভাবিনি।

"ঘটনাটা হল, ওই প্রশ্নগুলো আমি নিজেকে বহুবার করেছি। কিন্তু আনন্দের বিভ্রমে আমি নিজের ভালোটাকেই দেখে এসেছি। আমি তখনই বাস্তবের মুখোমুখি হয়েছি যখন

না সবকিছু আমার হাতের বাইরে চলে গেছে। আমি বহুবার স্থির করেছি তোমাকে সত্যি কথাটা বলার, কিন্তু আমার দুর্বলতা ও দ্বিধা আমাকে সে সুযোগ দেয় নি।"

"কোন সত্যি?" মেয়েটা হতাশভাবে প্রশ্ন করল।

"মানে...এই কেন আমি তোমাকে বিয়ের প্রস্তাবটা দিলাম না..."

মনের কথাটা শুনে আবেশে মেয়েটার চোখ বুজে এল। সে উদ্বিগ্নভাবে তার দিকে তাকিয়েই মুখটা ঘুরিয়ে নিল। সে অজানার দিকে তাকিয়ে রইল যেন ধ্বংসের জন্য অপেক্ষা করছে। "তুমিও নিশ্চয়ই নিজেকে ওই একই প্রশ্ন করেছ। এছাড়া জীবনের মূল্য কি?

খারাপটাই আশা করে সে মাটির দিকেই তার নজরটা রেখেছিল, কিন্তু আর কিছু জানার ইচ্ছে তার ছিল না।

"আমি অসুস্থ," সে জবাব দিল।

"না," মেয়েটা ভয়ার্তভাবে বলল।

"আমি বিয়ের উপযুক্ত নই।"

সে নির্বাক হয়ে তাকিয়ে রইল।

"আমার চেহারা দেখে প্রতারিত হয়ো না... আমার অসুখটা গুরুতর নয়, কিন্তু এটাই আমার বিয়ের প্রতিবন্ধক।

বিপর্যস্তভাবে সে মাথা নামিয়ে নিল। এক তীব্র হতাশার ধ্বনি তার হৃদয়ে বিদ্ধ হল। সে তার উচ্চাকাঙ্ক্ষা বিসর্জনে রাজী ছিল। নিজেকে ভূপাতিত করে মেয়েটার পদচুম্বন করে তার পতিত্ব প্রার্থনা করত। কিন্তু একটা বিপরীত শক্তি তাকে অবশ করে দিল।

"আমি কোন কিছুই বাদ রাখিনি। একাধিক ডাক্তারকে দেখিয়েছি আমি। আমি হাল ছাড়িনি, নাহলে আগেই বলতাম। কিন্তু কিছু করার নেই। আমি আমার স্বার্থপরতা শেষ করতে চাই। নাহলে ওটা তোমার ভবিষ্যত চিরতরে নষ্ট করে দেবে।"

"কিন্তু আমি তোমায় ছাড়া বাঁচব কি করে?"

"তুমি এখনও তরুণী। আর তারুণ্যের ক্ষত দ্রুত নিরাময় হয়।"

"আমি বিশ্বাস করি না, নিশ্চয়ই আমি কোন দুঃস্বপ্ন দেখছি।"

"আমি সম্পর্ক আর দীর্ঘায়িত করতে চাইনা।

"আমার বিশ্বাস হচ্ছে না।"

"আচমকা বিপর্যয় চিরকালই বিশ্বাস করা কঠিন। কিন্তু জীবনে কখনও ধারাবাহিকভাবেই বিপর্যয় আসে। আসলে দেরী হওয়ার আগেই রাস্তা খোঁজা উচিত।

"তুমি কি করতে চাও?"—ক্ষোভে তার গলা বুজে এল।

"আমাদের সম্পর্কের চিরসমাপ্তি হোক।"

"আমি পারব না।"

"কিন্তু এটা করতেই হবে। নাহলে সেটা পাগলামিরই নামান্তর হবে।

সে মেয়েটার চোখ এড়িয়ে গিল। কারণ সে বুঝতে পারল তাব পরিকল্পনা চূড়ান্ত সফলতা প্রাপ্তির পথে। কিন্তু সফলতা বড়ই নির্মম। আর সে নিজেকে খুঁজে পেল একাকী অরণ্যে। যুক্ত হয়েছে ক্রোধ আর লজ্জা, সেখানে না আছে বিশ্বাস, না আছে আশ্রয়। নিজের মনে বলল, এবার পাগল হওয়া ছাড়া উপায় নেই। একমাত্র পাগলামিতেই বিশ্বাস-অবিশ্বাস, সুখ-দুঃখ লজ্জা-ঘৃণা, ভালবাসা প্রত্যাখ্যান, সত্যি-মিথ্যে মিলেমিশে এক হয়ে যায়। কিন্তু বাস্তব একে সহ্য করবে কিভাবে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হয়ে সে কি করে তারা দেখবে? তার সমস্ত রাত্রি অতিবাহিত হল অব্যক্ত যন্ত্রণার মধ্যে।

২৯

মনে হচ্ছিল যেন এক উজ্জ্বল আলো বেরিয়ে আসছে অন্ধকার মেঘ ফুঁড়ে। ওথমান শুনলো যে ওনাসিয়া রামদান ও হুসেন জামিল বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হতে চলেছে। এই অভাবনীয় পরিবর্তনে সে আনন্দিত হল, মানসিক সুরক্ষা পেল, আর নিজের মনে বললো,

"এখন আমি ঠাণ্ডা মাথায় আমার হারানো ভালোবাসার জন্য অনুশোচনা করতে পারি। এছাড়া পরোয়া করার মতো আমার আর কিছু নেই। এক চুমুকে ক্রোধের কূপের সমস্ত জলটুকু নিঃশেষ করে দিয়ে সব ক্রোধের শেষ করতে পারব। আমি এখন মুক্ত, আর এ ব্যাপারে আমি খুব দক্ষ।"

সারাজীবন ধরে সে এমন কোন নারীর সন্ধান পেলো না যে তাকে সুখী করতে পারে। এমনকি সৈয়দার মতও নয়। সে ছিল সুন্দরী, বুদ্ধিমতী ও নিষ্পাপ। আর একটা সময় সে সত্যিই তাকে ভালোবাসত। তার মত কাউকে খুঁজতে বেরুনো আর তার পক্ষে অসম্ভব। তা সে যতই ভাগ্যবান হোক না কেন। তাহলে সেটা হবে একটা শাস্তির নামান্তর।

সময়ের সারণী বেয়ে উপস্থিত হল নতুন এক ঘটনাপ্রবাহ। প্রশাসনিক প্রধান হামজা-অল-সুয়েফি একদিন দপ্তরে এলেন না। শোনা গেল যে তার রক্তের চাপ হঠাৎ বেড়ে যাওয়ায় অনেক জটিলতা দেখা দিয়েছে। ওথমান তার সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎকার করতে গেল। তাকে দেখে মনে হল সে বিধ্বস্ত এবং জীবনের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েছে। তার নির্লিপ্ত চোখে যেন অন্য কোন জগতের ছায়া পড়েছে। তার হাবভাব ওথমানকে স্পর্শ করল। এর মধ্যে সে একটা করুণ অবস্থা খুঁজে পেল। তা যে কোন মর্যাদারই লোক হোক না কেন জীবনের শেষবেলার সবাইকেই এই চূড়ান্ত অবস্থার মুখোমুখি হতে হয়।

"আরে মশাই আপনি তো বেশ ঠিকই আছেন," সে বলল। এই দুঃসহ, নিঃসঙ্গ অবস্থায় ওথমানের সান্ত্বনা বাক্যে তাঁকে তার প্রতি কৃতজ্ঞ করে তুলল।

"ধন্যবাদ, তুমি খুব ভালো ছেলে। ঠিক যেমন দক্ষ তুমি দপ্তরের কাজে।"

"এটা চলমান মেঘের মত। আপনি খুব তাড়াতাড়িই দপ্তরে ফিরে আসবেন।"

কান্না চাপার চেষ্টায় মানুষটার মুখটা যন্ত্রণায় কুঁকড়ে গেল।

"আমি ফিরছি না।"

"আহ্, ভুলে যান ওসব।"

"কিন্তু এটাই সত্যি, ভাই বাই উমি।"

"আপনি সর্বদাই বেশি চিন্তাভাবনা করেন।"

"কিন্তু ডাক্তার তো এ কথাই বলেছেন। তিনি আমাকে খোলাখুলিই বললেন যে আমি তাঁর নির্দেশাবলী মেনে চললে তবেই উঠে দাঁড়াতে পারব। তবে তার আগে আমাকে চাকরি থেকে অবসর নিতে হবে।

ওথমানের মধ্যে একটা মিশ্র প্রতিক্রিয়া হল। কিন্তু সব কিছু ছাপিয়ে উঠল করুণা।

"ঈশ্বরের ওপর বিশ্বাস রাখুন, তাঁর করুণা অসীম," ওথমান বলল।

"কাজকর্ম আমার কাছে আর তেমন জরুরী নয়। আমার মেয়েদের বিয়ে দিয়ে দিয়েছি। আমার ছেলে কৃষিবিদ্যায় চূড়ান্ত বর্ষের ছাত্র। কর্তব্যকর্ম মোটামুটি শেষ। এখন শুধু শান্তি চাই।"

"ঈশ্বর তোমার প্রার্থনা পূর্ণ করুন।"

ক্লান্তি সত্ত্বেও লোকটা গর্বের সঙ্গে বলে চলল।

"ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, আমি আমার পরিবার ও দপ্তরের সব কাজের দায়িত্বও ঠিকভাবে পালন করেছি। আমার কখনো কোন চাহিদা ছিল না, কিন্তু সবসময়ই ভালো সঙ্গ লাভ করেছিলাম। মানুষ এর চেয়ে বেশি আর কি আশা করে?"

"আপনার মতো শ্রদ্ধেয় ব্যক্তির আরো অনেক বেশি কিছু প্রাপ্য। ওথমান বলল।

"একের পর এক মূল্যবান রত্নগুলি আমরা আমাদের দপ্তর থেকে হারিয়ে ফেলছি। মনে পড়ছে প্রয়াত সাফান বাসয়ুনি কে? মানুষ চলে যায় কিন্তু তার কাজগুলোই তাকে অবিস্মরণীয় করে রাখে।"

"সত্যি।"

অসুস্থ লোকটা ওথমানের দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলল, "ঈশ্বর যেন তোমায় সুখের পথ দেখান।"

অনেকদিন পর লোকটার আন্তরিকতা ওথমানকে স্পর্শ করল। ঘটনাটি তার হৃদয়ে এমনই নাড়া দিল যে তার মনে হল সে যেন তার প্রিয় বন্ধুকে সমাধিস্থ করে ফিরছে। কিন্তু ঠিক সময়ে তার সত্ত্বা জাগ্রত হল। সে নিজের মনে বলল, "বিশ্বের সমস্ত দুঃখ বেঁচে আছে আমাদের প্রত্যাশাকে ক্ষুরধার করতে, তাকে ভোঁতা করতে নয়।

তার চিন্তাস্রোত এমন জায়গায় আটকালো যেটা খুব তাড়াতাড়ি ফাঁকা হয়ে গেল। সাধারণভাবে সে একজন সমর্থ, ভদ্র ও দৃঢ়চেতা লোক ছিল। সত্যি বলতে কি এসম্বন্ধে কারুরই কোনো দ্বিমত ছিল না। যে দুই সহ পরিচালকের চেয়ে তার দক্ষতা বেশী। তাদের মধ্যে একজন দ্বিতীয় অন্যজন তৃতীয় পদে আসীন। সে কিভাবে একলাফে চতুর্থ পদ থেকে প্রথম পদে পৌঁছবে?

হামজা-অল-সুয়েফি স্বেচ্ছা অবসর নিলেন এবং স্বাভাবিকভাবেই পদের হেরফের শুরু হল গোটা অফিস জুড়ে। ইসমাইল ফাই পরিচালক হলেন, সহ-পরিচালক হিসেবে

দেখা মিলল ওথমানের। এইভাবে একজনের উচ্চ রক্তচাপ ভাগ্যের চাকা ঘুরিয়ে দিল। কেউ সুখের মুখ দেখল কারুর বা ঘাড়ে পড়ল দুর্ভাগ্যের কোপ।

৩০

সময়ের গতিপথে নিজের হাজার চেষ্টা সত্ত্বেও বয়স ওম হুসনির চেহারায় একটা স্থায়ী ছাপ ফেলেছিল। তার দৃষ্টিশক্তি প্রায় উধাও হয়ে গিয়েছিল আর চলতে এত অসুবিধা হতো যে লাঠি ছাড়া পথে বের হওয়াই ছিল তার দায়। ইত্যবসরে ওথমান তার ঘটক ওম জেনাবের ওপর পুরোপুরিই হতাশ হয়ে পড়েছিল। তার কথা মনে পড়লেই সে বিরক্তিভরে বলত, যে যারা শ্রেণীদ্বন্দ্বের কথা বলে তারা ঠিকই বলে।

কোন ভদ্রজনোচিত কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়া আর ওম হুসনির সামর্থে কুলোল না। তার বিচারবুদ্ধির ওপরেও আস্থা রাখা কঠিন হয়ে দাঁড়াচ্ছিল কারণ, সে এমন মেয়েদের নাম বলত যারা দোজখে বিশ্রাম নিচ্ছে।

শুক্রবার দুপুরে মসজিদের নামাজের পর ওথমান একটা মিশরীর কফির রেস্তোঁরায় বসেছিল। হঠাৎ দেখল সামনে দিয়ে চলে যাচ্ছে আসিলা। সঙ্গে অন্য এক মহিলা। তাকে সঙ্গে সঙ্গে চিনতে পারলেও ওথমান লক্ষ্য করল যে তার মধ্যে এক ভয়ঙ্কর পরিবর্তন এসেছে। তাকে দেখে রীতিমত চমকেই উঠল সে। তাকে একটা ফুটো বলের মত চুপসানো ও বিবর্ণ মনে হচ্ছিল। নারীত্বের সব মাধুর্যই তার মুখ থেকে অন্তর্হিত প্রায়। তবে তার মুখে এমন একটা ছায়া ফেলে গেছে সেটা পুরুষত্বের না নারীত্বের তা বুঝে ওঠা কঠিন। তার হাঁটাচলাতেও আগের মত সেই সপ্রতিভতা ছিল না। ঠিক যেন একটা ধ্বংসের প্রতিমূর্তি। কে যেন তাকে ভেতর থেকে বলল, মৃত্যু তার পেছু নিয়েছে। কিন্তু মৃত্যু কি ওথমানেরও পেছু নেয়নি? যে সময়টা তার মনে হচ্ছিল অনন্তের অতলে নিমজ্জিত হয়েছে তা এখন আর মিষ্টি মায়াবী বিভ্রমের আড়ালে সুরক্ষিত নেই। গর্ব আর চিরন্তন সত্যগুলো এখন তাদের সব নিষ্ঠুরতা নিয়ে তার সামনে বর্তমান।

আসিলা কি এখনও তাকে মনে রেখেছে? আজও। তার পক্ষে ওথমানকে ভোলা সম্ভবই নয়। কারণ সে তো তার অন্তরের গভীরে প্রবেশ করেছিল, তার প্রতারণা ও সমস্ত অহংকারবোধকে সম্বল করে। আসিলার হাতে আছে শুধু ঘৃণা আর অভিশাপের ক্ষমতা।

তার ছোটবেলার বন্ধুরা সব টুকিটাকি কাজকর্ম করত। তবে একটা কাজে পারদর্শীতা ছিল তাদের। তা হল শিশুদের জন্ম দেওয়া আর অর্থহীন চীৎকারে আকাশ বাতাস পরিপূর্ণ করে তোলা। তাদের শিশুবেলার নির্দোষ আনন্দ ও লম্বা-চওড়া কল্পনার দৌড়গুলো হারিয়ে গেছে ওম হুসনি গলির পুরু ধুলোর আস্তরণের মধ্যে একসময় যা তাদের গায়ের রঙও পাল্টে দিত। পুরোনো বড় বড় বাড়িগুলোর স্থান দখল করেছে আধুনিক ধরনের ছোট ছোট বাড়ি। এখন যেখানে মসজিদ সেখানটা একসময় ছিল গাধা রাখার এক বিশাল খোঁয়াড়। পুরোনো অনেক অধিবাসীই এই গলি ছেড়ে অল-মাধবাহতে গিয়ে নতুন করে

বাসা বেঁধেছে। অনেক পরিবর্তন এসেছে। এখন বাড়ি বাড়ি বৈদ্যুতিক আলো, নলবাহিত পরিশ্রুত পানীয় জল। দিনরাত বেজে চলেছে রেডিও, যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে মেয়েরাও ত্যাগ করেছে তাদের প্রথামত অঙ্গাবরণ—ওড়না। এমনকি ভাল মন্দের মূল্যায়ণটাও হচ্ছে নতুনভাবে। তৈরী হয়েছে এক নতুন মূল্যবোধ।

এই সমস্ত ঘটনাগুলো যখন ঘটেছিল তখন সে ছিল তৃতীয় পদে আসীন। এমনকি বয়সটাও বেশ হয়েছিল। তার মাত্রাতিরিক্ত দক্ষতা ও আত্মত্যাগের এই কি ছিল পুরস্কার? তার তত্ত্বগত ও প্রযুক্তিগত দক্ষতার পরাকাষ্ঠা হিসেবে তারা কি তাকে চিনতে পারেনি? তার দপ্তরের বিভিন্ন প্রয়োজনীয় বিষয়বস্তু, দপ্তর সংক্রান্ত নিয়মাবলী, ব্যয়বরাদ্দের বিশ্লেষণ, তার উপলব্ধি, তার ভবিষ্যৎবাণী, বিভাগীয় বস্তুর ক্রয় ও মজুত তালিকার ক্রমপঞ্জীগুলি যেভাবে সে বাঁধিয়ে বই-এর আকারে দপ্তরে রেখে দিয়েছে তা দিয়ে সরকারী দপ্তরের কাজের উপযোগী একটা বিশ্বকোষ তৈরী করা যায়। এই ধরনেরই একটা উজ্জ্বল প্রতিভা হেলায় পড়ে আছে দ্বিতীয় সহপরিচালকের অধস্তন হিসেবে। ঠিক যেমন অনেক অজপাড়া গেঁয়ে মসজিদের স্নানাগারে ঝলমলে বৈদ্যুতিক বাতি দেখা যায়।

সে নিজের মনে মনে বলল, সরকারী আধিকারিক ব্যাপারটা সম্পর্কে মানুষের ধারণা এখনও ঠিক স্বচ্ছ নয়। যদিও মিশরের ইতিহাসে এই পেশাটা ছিল ঠিক ধর্মের মতই পবিত্র। সভ্যতার ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যাবে এই ফ্যারাওদের আমল থেকেই এই পদটার অস্তিত্ব আছে। অন্যান্য জাতিতে যেমন প্রকৃত নাগরিক বলতে বোঝায় যোদ্ধা, রাজনীতিবিদ, ব্যবসায়ী শিল্পী অথবা নাবিককে, কিন্তু মিশরীয়রা এই সম্মান দিয়ে আসছে সরকারী আধিকারিকদের। আর সেই প্রারম্ভিক মূল্যবোধের নির্দেশ যা লিপিবদ্ধ আছে ইতিহাসের প্রতিটি পাতায় এক পরিশ্রান্ত, অবসরপ্রাপ্ত সরকারী আধিকারিকের তার ছেলের প্রতি উপদেশ হিসেবে। এমনকি, তার এও মনে হত, স্বর্গের ঈশ্বররা ফ্যারাওদের নিয়োগ করেছিল, নীলনদের উপত্যকাকে শাসন করতে ধর্মীয় ও জাতিগতভাবে ও সেইসঙ্গে প্রশাসনিক, অর্থনৈতিক ও সাংগঠনিক ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করতে। আমাদের উপত্যকায় ছিল ভাল লোকেদের বাস। তারা পৃথিবীর যেকোনো ভাল জিনিসের কাছেই মাথা নত করত। কিন্তু সরকারী আধিকারিকদের মাথা গর্বে সবসময়ই উঁচু থাকত। আর তাদের নজরটা থাকত সেই কাঙ্ক্ষিত সিঁড়ির দিকে যা স্বর্গের দোর গোড়ায় গিয়ে পৌঁছেছে। একজন আধিকারিকের দায়িত্ব জনগণকে পরিষেবা দেওয়া। একজন যোগ্য মানুষের অধিকার, সচেতন মানুষের কর্তব্য পরায়ণতা, মানুষের আত্মার গর্ব—আর আমাদের শ্রদ্ধানিবেদন সেই ভগবানের কাছে যিনি এই গুণগুলো সৃষ্টি করেছেন।

সংরক্ষণ বিভাগেরই একটা পর্যবেক্ষণের কাজে গিয়ে দেখা হয়ে গেল ওনসিয়ার সঙ্গে। এখন তার নারীত্ব পূর্ণমাত্রায় প্রস্ফুটিত হয়েছে, আর তার স্বামী শিক্ষামন্ত্রকে বদলি হয়েছে সম্প্রতি। এখন সে সেখানকারই পরিদর্শক। করমর্দন করতে যাওয়ার সময় কথাটাকে না বলে পারল না। অ-নে-ক দিন বাদে।”

সে লাজুকভাবে ঘাড় নেড়ে মুচকি হাসল।

"তুমি কি সুখী?" সে জানতে চাইল।

"সব ঠিকই আছে।"

ভুলতে পারার ক্ষমতা ভাগ্যের একটা আশীর্বাদ সে নিজেকে সংবরণ না করতে পেরে বলল।

"কিছুই ভুলিনি, আবার কিছুই টিঁকে নেই," সে বন্ধুত্বসুলভ চটুলতায় বলল।

অনেকক্ষণ লাগল ওথমানের কথাটা বুঝতে। এমনকি সংরক্ষণ বিভাগ থেকে বেরুনোর সময় বলল, "তোমায় এখনও ভালোবাসি যেমন তখনও ভালোবাসতাম। আর বাস...।"

ওথমান অফিসে ফিরে জনসংযোগ দপ্তর থেকে পাঠানো একটা নির্দেশনামা পেল। সে লেফাফাটার চেহারা দেখেই অনুমান করতে পারল ভেতরে কি আছে—নির্ঘাৎ কোনো কর্মীর মৃত্যুর খবর বা সেই সংক্রান্ত কিছু। ঘোষণাপত্রে লেখা ছিল "আজ সকালে প্রশাসনিক দপ্তরের প্রধান ইসমাইল ফায়িকের ইন্তেকাল হয়েছে। তাঁর অন্ত্যেষ্টি হবে...।"

সে চিঠিটা আবার পড়ল, নামটা বারবার পড়ল, তারপরে বলল অসম্ভব। গতকালও লোকটা সুস্থ শরীরে কাজ করেছে। তার দপ্তরে বসে কফি খেল ওথমান। লোকটা আবার তার স্বভাবসিদ্ধ উদ্বিগ্ন স্বরে একটা কথাও বলেছিল, "দেশটা বিতর্কিত মতামতে ভরে গেছে। ওথমান কোনো মন্তব্য না করে হেসেছিল।

"সবাই", ইসমাইল বলেছিলেন, "মনে করে তারা ঈশ্বব প্রেরিত। দেবদূত।" তার পর মাথা নাড়তে নাড়তে বলেছিলেন, "তা, বার্ষিক হিসেব-পত্তরটা কিভাবে করবে কিছু কি ভেবেছ?" 'আমার মত একজন', ওথমান ব্যাঙ্গাত্মক ভাবে বলল।

লোকটা অট্টহাস্য করে উঠেছিল। সে কখনও তার সহকারীর দক্ষতার প্রশ্ন তোলে নি। আর বলেওনি সরকারী দপ্তরে তার শক্ত খুঁটি আছে। আল্লাহ্ জানে লোকটা কিভাবে যে মারা গেল?

ওথমান তার এক সহকারীকে জিজ্ঞেস করল, "তুমি কি এ বিষয়ে কিছু জান?"

প্রথম সহ-পরিচালক বললেন, "ফায়িক প্রাতরাশের টেবিলেই অসুস্থ বোধ করায় সোফায় শুয়ে পড়েন। স্ত্রী তাকে দেখতে আসতে গিয়ে দেখেন যে তিনি নেই।"

ওথমান নিজেকে তুলনামূলক সুরক্ষিত মনে করল। কারণ সে জানে মৃত্যু তো অবশ্যম্ভাবী। যদিও তা বিতর্ক ও উপসংহারের ওপর নির্ভরশীল। কখনও কখনও সে অতর্কিতেও হানা দেয়, অনেকটা ভূমিকম্পের মত। ফায়িক তো শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সুস্বাস্থ্যের অধিকারী ছিলেন। আর তাঁর ক্ষেত্রে যেটা ঘটেছিল সেটা তো যেকোন কারুর ক্ষেত্রেই স্বাভাবিক তাই না? স্বাস্থ্যের না আছে কোন নিশ্চয়তা, না অভিজ্ঞতা। আতঙ্ক তাকে বেশ গভীরভাবে নাড়া দিল। সে বিড়বিড় করে বলল, "জীবনের শ্রেষ্ঠ উপমা হল যে এটা কিছুই নয়...।'

কিন্তু মৃত্যু কি তাহলে খুবই অপরিচিত? নিশ্চয়ই তা নয়, আবার দেখা ও শোনা দুটো তো সমার্থক নয়...। তবে তার এই ভীতি নিশ্চিতভাবেই আরও দু-একদিন থাকবে। তবে এই সময় চাওয়া-পাওয়ার হিসেব নিকেশ করাটাও অনর্থক।

"সারা জীবনের এই প্রাণপাত পরিশ্রমের অর্থ কি?" সে নিজেকে জিজ্ঞেস করল।

ফায়িককে কবর দেওয়ার সময়ও তার মধ্যে এই অপরাধবোধটা কাজ করছিল। এমনকি সহকর্মীদের হাজার কথাবার্তাও তাকে বিচলিত করতে পারল না। তাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য সে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিল। "প্রকৃত বীরত্বের অর্থ কি? সব কিছু প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও শুধুমাত্র অদম্য ইচ্ছায় ভর করেই কাজ করতে হবে?"

পরিচালন দপ্তরের পরিচালক হওয়ার ভাবনাচিন্তা তার মাথা থেকে অন্য সব ভাবনাকে দূর করে দিল। ফায়িকের শূন্য পদের জন্য মনোনীত হল আইন-বিভাগের এক কর্মচারী। এতেই তার পদন্নোতির রাস্তাটা পরিষ্কার হয়ে গেল। টানা এক বছর ধরে কাজ করার পর এখন সে কিছুটা আশার আলো দেখতে পাচ্ছে।

কিন্তু একদিন তাকে হতাশ করে তার কাঙ্খিত পদে নিয়োগ করা হল পরিবহন মন্ত্রকের এক আধিকারিককে।

৩১

না...না...না...

এটা কখনই তার চিন্তাকে অতিক্রম করে নি। সে তার আধিকারিক বাহজাত মূরকে ঘৃণা করত, তাকে হাজার অভিশাপও দিয়েছে। বাহজাত মূরের উচিৎ ছিল তার পক্ষ নেওয়া। জাহান্নমে যাক। তারা ভাবেটা কি? সে সারা জীবন ধরে অন্যের সুবিধের জন্যই কাজ করে যাবে? কে এই নতুন পরিচালক? আবদুল্লা ওয়াজদিই বা কে? কোন অধিকারে সে নিজেকে সরকারী কর্মী বলে? তার লজ্জা হওয়া উচিত। একদিন এই লজ্জাই তাকে ঠেলে ফেলে দেবে মন্ত্রকের অলিন্দে। আমি তখন তার গায়ে থুতু দিয়ে আনন্দ অনুভব করব।

বাহজাত মূর একদিন তাকে দপ্তরে ডেকে পাঠাল।

"আমি দুঃখিত বাইয়ুমি।"

ওথমান বিরক্তিভরে উত্তর দিল, "আমি আমার জীবনের ভালো কাজের পুরস্কারটা হাড়ে হাড়েই টের পাচ্ছি।"

"না, না শোনো। সে এক মন্ত্রীর আত্মীয়।"

"আমি চিরকালই অলস কর্মকর্তাদের হিংসা করতে শিখেছি।"

আমি তো দুঃখিত বটেই, আবার আমাদের প্রধান সচিবও বেশ দুঃখিত।" কয়েক মুহূর্তের নীরবতা ভেঙে বাহজাত মূর আবার বলতে লাগলেন, "মন খারাপ করো না। সর্বসম্মতভাবে ঠিক হয়েছে যে এখন যিনি পদে আছেন তিনি অবসর গ্রহণ করলেই তোমার পদন্নোতি হবে।"

কোনো লাভ নেই। কারণ পদন্নোতি নিজের লালিত আশার পরিপূর্ণতা ব্যতীত আর কিছুই দেয় না। নতুন পরিচালক এখন সবে চল্লিশ বছরের যুবক, অর্থাৎ, সব কিছু ঠিকঠাক চললে বড়জোর সে সহপরিচালক হিসেবে অবসর নেবে, বা ভাগ্য ভাল থাকলে বড়জোর প্রশাসনিক কর্তা হিসেবে...। তার জীবনের স্বপ্ন ধূলিসাৎ হয়ে গেছে তার অতীত মৃত এবং কবরস্থ আর পেছনে পড়ে থাকবে এক দৃষ্টিবিভ্রমকারী অন্ধকার। এর চেয়ে বরং তার বাবার মত ঠেলাগাড়ি চালানোই তার ভালো ছিল। হতাশা তার জীবনটাকে ছেয়ে দিল, তার মনে হল জীবনের লক্ষ্য পূরণের চেয়ে তার জীবনকারণ আরও সংক্ষিপ্ত হয়ে এসেছে।

এবার বিয়ের বাসনাটা তার মাথায় বেশ জেঁকে বসল। এরকম অভিজ্ঞতা তার আগে কখনও হয়নি। এবার কিন্তু সে আর কালক্ষেপ করতে চাইল। কারণ তা হল উদ্দেশ্য সাধনের প্রতিবন্ধকতা। যদিও প্রেম ও পরিণয়ের সেরা সময় সে পেছনে ফেলে এসেছে। সত্যিই সে কতই না অপেক্ষা করেছে একটা বৌ-এর মত বৌ-এর জন্য, একটা মধুর সম্পর্কের জন্য, একটু আন্তরিকতার জন্য, একটা সন্তান, একটা আরামপ্রদ ঘর, একটা শান্তির জায়গা একটা মানবিক সম্পর্ক একটু দয়ার পরশ, মধুর বচন যা তার যন্ত্রণা মুক্তি দেবে।...

মৃত্যুকে ঠেকিয়ে রাখবে, তার ক্ষয়ক্ষতিগুলো বাঁচাবে, এক নিখাদ বিশ্বাস, তাকে বাঁচাবে নির্বোধ বিশ্বাসগুলো থেকে। আর সেটা হবে ক্ষণভঙ্গুরতা, অভাব ও নিঃসঙ্গতার সঙ্গে একটা চুক্তি।

"নারীই জীবন, আর তার উপস্থিতিতেই মৃত্যু সত্যেব মাথায় মুকুট পরায়, নিজের সবরকম গাম্ভীর্য নিয়ে।"

ওম জনাবের কাছে সে আর যাবে না, আর ওম হুসনির কাছেও তার পাওয়ার মত কিছুই নেই। সে তো পঙ্গু। ঠিক এমনি সময়েই ইহশান ইব্রাহিম নামের একটি মেয়ে দপ্তরে যোগদান করল। যার প্রতি সে নির্দ্বিধায় অনুরাগ প্রকাশ করল। মেয়েটার দিক থেকে সাড়া পেলে সে আর এক মুহূর্তও দেরী করবে না। কারণ একাকীত্বের রাতগুলো তাকে বড় বেশি ভীত করে তুলছিল। আর বিয়ের ব্যাকুলতা তাকে ভেতর থেকে প্রবলভাবে নাড়া দিচ্ছিল। ঠিক যেন একটা ঘুমন্ত আগ্নেয়গিরি জেগে উঠতে চলেছে।

ইহ্শান কিন্তু তার অনুরাগের ইঙ্গিত ঠিকভাবে অনুধাবন করতে পারল না। সে সম্ভবত ভেবেছিল যে তার মত বয়স্ক একজন লোকের পক্ষে তাকে প্রেম নিবেদন করাটা বিসদৃশ ব্যাপার। কিন্তু সে করবেটাই বা কি? সৈয়দা বা ওনসিয়াকে সে যেমন ধৈর্য্যসহকারে প্রেম নিবেদন করেছিল এখন তো তা সম্ভব নয়। এই বয়সে এসে।

একদিন ইহ্শানা যখন কাজ নিয়ে তার দপ্তরে এল, সে তখন সুযোগ বুঝে বলল, "আমি যদি তোমায় একটা প্রশ্ন করি তুমি কিছু মনে করবে না তো?'

"অবশ্যই নয়।"

ওথমান ইতস্তত করে প্রশ্ন করল, "তুমি কি বাগদত্তা?" লজ্জায় তার মুখ লাল হয়ে গেল। এমনভাবে সে ওথমানের দিকে তাকালো যে তাকে অধস্তনকর্মীর দৃষ্টি বলে মনে হল না।

"হ্যাঁ।"

ওথমান হতাশ হলো।

"আমায় ক্ষমা করো, কিন্তু তোমার আঙুলে তো কোনো আংটি দেখি নি?"

"আমি...তার মানে...আমি প্রায় বাগদত্তা।"

প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া কাটিয়ে সে বলল, "তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করব যেটা শুধু তোমার আমার মধ্যে গোপন থাকবে?"

"বলুন।"

"একটা বৌ খুঁজে দিতে পারো আমায়?"

মেয়েটা তাব প্রাথমিক চমক কাটিয়ে অনুনয়ের সুরে বলল, "আমার বন্ধুরা তো প্রায় আমারই বয়সী, আমার আশঙ্কা, আপনার কেউই উপযুক্ত হবেন না।"

সুন্দর বলার ধরন, "আপনি তাদের মানানসই হবে না।"

"আমার বয়সী লোকেদের পক্ষে কি বিয়ে করা অসম্ভব?" সে চূড়ান্ত হতাশার দিকে এগিয়ে চলল।

"কেন নয়? সব বয়সেরই উপযুক্ত স্ত্রী পাওয়া যায়।"

"ধন্যবাদ! বিরক্ত করার জন্য ক্ষমা চাইছি।"

"আশা করি তোমার কাজে লাগতে পারব।"

মেয়েটা চলে যেতেই সে তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলো। সে ভাবল, মেয়েটা নিজে তাকে গ্রহণ করতে পারত বা তার কোন বান্ধবীর জন্যও বলতে পারত। কিন্তু নিজেকে তার বাতিল বর্জ্যপদার্থ মনে হতে লাগল। অনেকটা সরবরাহ দপ্তরের ফালতু জিনিসগুলোর মত। প্রতিবছর যেগুলো হিসেবের পরে ফালতু বলে বেচে দেওয়া হত। ঘটনাবশত তার বিয়ের ব্যাপারটাও এর চেয়ে বেশি কিছু নয়। যদি মহানির্দেশকের দপ্তর অধিকার করার লালিত স্বপ্ন ও আশা বাস্তবায়িত হয় তাও নয়। সে আর ছুটতে পারছে না, সময়ের গতি তাকে ক্রমশই পেছনে ফেলে দিচ্ছে। একেকটা দিন চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিয়ের চিন্তাটাও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। এমনকি তা ছাড়িয়ে যাচ্ছে পদন্নোতির আকাঙ্ক্ষাকেও। ইহশানও কিছু ঠিক করতে পারল না। পাগলের মত সে পথেঘাটে বাসেট্রামে যে কোনো মেয়ের প্রতি অনুরাগ প্রকাশ করতে লাগল। কিন্তু সফল না হয়ে শেষ পর্যন্ত সে হাল ছেড়ে দিল। নিজেকে বললো, "আমার জীবনটা বরবাদ হয়ে গেল।"

বিরক্তিসহকারে সে ভাবতে বসল কি এমন বাধা আছে যাতে তার পক্ষে কিছুতেই বিয়ে করা সম্ভব হচ্ছে না। যা কিছু ঘটেছিল সে তো অনেকদিন আগের ব্যাপার। তবে বয়সটা যে বিয়ের বিপক্ষে ছিল তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু সেটাই তো সব নয়। লোকজন

সম্ভবত তার সম্পর্কে খোঁজখবর করে ভেতরের কথা টেনে বের করেছে। ওফ্ কি লজ্জার কথা। সত্যিটা হচ্ছে সে একটা দরিদ্রতম বাড়ির ছেলে। ঈশ্বর জানেন যে তারা আরও কি কি সব বলেছে। কারণ তার মত এরকম দারুণ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন লোক সহজেই অন্যের হৃদয়ে হিংসার উদ্রেক ঘটাতে পারে। অনেকদিনই তার মনে হয়েছে যে জীবনে একজন প্রকৃত বন্ধুর খুব অভাব। আর সে যেন মানুষের সংকীর্ণতার অনেক ওপরে উঠে গেছে।

রাত্রি তাকে যথারীতি নিয়ে গেল কাদ্রিয়ার কাছে সেই ফাঁকা ঘরে।

"কি দারুণ," সে তিক্ততার স্বরে বলল, "সহ-পরিচালকের চাকরি আর সঙ্গে এই আধা-কাফ্রী রূপোজীবিনী।

"এই প্রথম তুমি দ্বিতীয় পাত্র পানীয় নিলে," সে হাসতে হাসতে বলল। "আজই পৃথিবীর শেষ দিন নয়তো?"

সত্যিই হয়তো সেটা পৃথিবীর শেষ দিন, কারণ তার মধ্যে অদ্ভুত এক অনুভূতি হলো।

"কাদ্রিয়া তুমি নিশ্চয়ই বোঝ যে আমার ওপর বিশ্বাস রাখা যায়, "সে অনেকটা উদ্দেশ্যহীনভাবে বলল।

ওফ্ ভগবান, কাদ্রিয়া তার রুক্ষ চুলে একটা লাল রুমাল বাঁধতে বাঁধতে বলল।

"আর আমি যদি পৃথিবীকে ঈশ্বরের সৃষ্টি বলে বিশ্বাস না কবি আমি যেন মনুষ্যেতর জীব হই।" কাদ্রিয়া তার দিকে বোকার মত তাকিয়ে থেকে বলল, "ওরা ঠিক করেছে আমাদের ভাত মারবে, জাহান্নমে যাক সব।"

ওথমান সে কথায় কান না দিয়ে বলে চললো, "আর ঈশ্বর ও তাঁর মহত্ত্ব..."

"ওরা আমাদের ঝেড়ে ফেলতে চাইছে," কাদ্রিয়া বলে উঠল।

"কি বললে?"

"তুমি শোনোনি, সবাই পতিতাবৃত্তি তুলে দেবার কথা ভাবছে?"

না, সে শোনেনি। খবরের কাগজের দৈনন্দিন ঘটনা আর স্মরণিকা ছাড়া কিছুই তার চোখে পড়ে না।

"সত্যি?" সে উদ্বিগ্ন স্বরে জিজ্ঞেস করল।

"ওরা তো সেরকমই বলছে।"

"অবিশ্বাস্য।"

"ওরা আমাদের কাজ খুঁজতে সাহায্য করবে বলেছে। হ্যাঁ, কাজই বটে। জাহান্নমে যাক। আমাদের কাছে আসার আগে কি আর সবকিছুর সংস্কার হয়ে গেছে?

"এটা হয়ত গুজব। জান তো দেশটা গুজবে ভরা।"

"আমি বলছি, সরকার থেকে আমাদের বলে গেছে।"

"কবে থেকে কার্যকরী হবে?" সে সত্যিই উদ্বিগ্ন স্বরে বলে উঠল।

"বছরের শেষাশেষিই।"

"তারা চুপ করে বসে রইল। আর ঘরে গলি গাড়ি ঘোড়ার আওয়াজ ছাড়া কোন আওয়াজই শোনা গেল না। ওথমান অনেক বিপর্যয়েরই কথা ভেবেছে কিন্তু এটা তার মাথায় খেলেনি।

"চারদিকে পতিতাপল্লী গজিয়ে উঠবে," সে ব্যঙ্গের স্বরে বলল।

"আর রোগ ছড়াবে।"

"হাজার হাজার নিরাপরাধ মেয়ে দুর্নীতিগ্রস্ত হবে।

"ওই হীন মূর্খরা, কোন কিছু করার না পেয়ে..."

"তুমি কি কাজ করবে?" ওথমানের বিস্মিত প্রশ্ন।

"যাই করি না কেন হাসপাতালে ধোপানীর কাজ আমি করতে পারব না।"

"তোমার ঠিকানাটা দেবে?"

"আমাদের ওপর নজরদারী করা হবে।"

"তুমি ভবিষ্যতের কথা ভাবছ না?" সে আর থাকতে না পেরে বলল।

"আমি বিয়ে করব।" তার দৃঢ় উত্তর। "আর কিছু করার নেই আমার।"

তার কথার ধারে ওথমান ধরাশায়ী হল। হাত বাড়াল আর এক পাত্র পানীয়ের দিকে।

"কাউকে ঠিক করেছ?"

"সে অসুবিধে হবে না।"

"কি করে?"

"আমার পাঁচ হাজার টাকা আছে," সে বেশ গর্বের সঙ্গে উত্তর দিল।" তার মধ্যে দেড় হাজার টাকায় একটা ভালো ঘর নেব, আর বাকি টাকাটা রেখে দেব। অনেকেই কি এরকম স্ত্রী চাইবে না?"

"নিশ্চয়ই, তুমি ঠিকই বলছ।"

"আমার জন্য ভাল পাত্র পেলে বলো," সে হাসতে হাসতে বলল।

"মাঝরাতে সে তোরণের নীচে দিয়ে চলতে চলতে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে এক মাতালের ওপর হুড়মুড় করে পড়ে গেল। সারা গা গুলিয়ে উঠছিল তার। একাকীত্ব, বিষণ্নতা ও একটা খালি খালি ভাব তাকে ঘিরে ধরল। যে নিজের কর্তব্য শেষ কবতে চাইল। কিছু না ভেবেই টলতে টলতে চলতে লাগল সেই গলির দিকেই। দেখল কাদ্রিয়া নেমে আসছে বাড়ি যাবে বলে। তাকে হাত দিয়ে থামিয়ে বলল, "কাদ্রিয়া আমি তোমার এক যোগ্য পাত্র পেয়েছি।" অন্ধকারে তার মুখ দেখা না গেলেও, প্রতিক্রিয়া বুঝতে তার অসুবিধে হল না।

"চলো, এক্ষুনি বিয়ে করি।"

৩২

ঠিক তার পরের দিনই বিয়েটা হল। সে যেমনটা আশা করেছিল মেয়েটা ঠিক ততটা চমকালো না। সে সত্যিই বিয়ে করছে কিনা সে ব্যাপারে নিশ্চিত হতে সে তাকে আপাদমস্তক গম্ভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করল। তারপর মাথা নেড়ে তার সম্মতি জানালো।

ওথমান মনে মনে ভাবল যে, কাদ্রিয়া হয়তো ভাবছে যে তার জমানো পাঁচ হাজার টাকার লোভেই সে ভণ্ড পরোপকারী সেজেছে।

"চলো, এক্ষুনি বিয়েটা সেরে আসি!" সে উদগ্রীব হয়ে বললো।

কাদ্রিয়া হাসতে হাসতে বললো, "আরে বাবা, সকালটা আগে হতে দাও। তারপর না হয় সেজেগুজে যাওয়া যাবে।

সে রাত্রিটা অল-সাহমাসিজরির একটা ছোট্ট ঘরেই কেটে গেল। সকালে সে বলল,

"একটা সাজানো গোছানো বাড়ি ঠিক কর, নাহলে বিয়ে করে উঠব কোথায়?"

কাদ্রিয়া দৃঢ়তা ও আত্মনির্ভরতার সঙ্গে বলল, "না, আগে বিয়ে তারপর থাকার ব্যাপার।"

ম্যারেজ রেজিস্টারকে বাড়িতেই ডেকে আনা হল। কিন্তু কাগুজে বিয়ের দুটো আইনী সাক্ষীর দরকার। খুঁজে পেতে যে দুজনকে পাওয়া গেল, তারা ছিল ওই পাড়ার দালাল। যারা নিয়মিত তার ঘরে খদ্দের ধরে নিয়ে আসত। সে পুরো ব্যাপারটাই চিত্রার্পিতের মত দেখতে লাগল। যদিও অনুষ্ঠানটা ছিল ততটাই যেটা না করলে নয়। কি হচ্ছে কি? একটা উদ্বেগজনক, আতঙ্কের অনুভূতি তাকে ক্রমশ গ্রাস করে নিচ্ছিল। সে প্রাণপণে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতে লাগল এই দুঃস্বপ্ন থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্য। আর এটাই বোধহয় বেপরোয়াভাবে তাকে জীবনকে নির্লিপ্তভাবে দেখতে শেখাল।

রেজিস্টারের কাছে লেখা তার নাম ও পেশা দেখে যুগপৎ মেয়েটা ও দালালরা চমকে উঠল, থুড়ি তার বিয়ের সাক্ষীরা। ওথমান মনে মনে ভাবল যে ওরাও কি আমায় অন্যদের মত পাগল ভাবছে। হঠাৎই তার চিন্তা ভাবনাগুলো তালগোল পাকিয়ে সব কিরকম উল্টাপাল্টা হয়ে গেল। একটা কাফ্রী পতিতা। একটা হোঁৎকা গরুর মত ঘুরে বেড়াচ্ছিল, অর্ধশতাব্দী ধরে এই অন্ধকার কুঠুরিতে পড়েছিল কামুকতা ও দারিদ্রকে সঙ্গী করে...। সুতরাং উন্মাদনায় সামিল হওয়ার পাগলামো মেটাতে সে সক্ষম হয়েছিল। অবশেষে সে কাদ্রিয়ার স্বামী হল। তার রতিক্রিয়ার সঙ্গিনী কাদ্রিয়া অবশেষে পেল তার স্ত্রী মর্যাদা। তার নিজের প্রতি সে এ কি করল?

নিজের প্রশ্নের উত্তর নিজেই দিয়ে বলল, "কেন, একটা নতুন অধ্যায়ের সূচনা হল আমার জীবনে।"

হামজা অল-সুয়েফির কাছে যাতায়াতের সময়ই তার রাওয়াদ-অল-ফরাজ-এর আবাসনগুলো বেশ মনে ধরেছিল। একটা বারান্দাওয়ালা তিনকামরার বাড়ি সে ভাড়া নিল। তার পরেই দুজন উঠে পড়ে লাগল সেটাকে সাজিয়ে তুলতে। মর্যাদা ও শালীনতার দোহাই দিয়ে ওথমান কাদ্রিয়াকে ওড়না ব্যবহারে বাধ্য করল। আসলে ওথমান চাইছিল ওড়নাটাকে মুখোশের মত ব্যবহার করে কাদ্রিয়ার অতীতটাকে ঢেকে দিতে। যাতে তার পুরোনো খদ্দেররা। তারা প্রতিটি ঘরকেই রুচিসম্মতভাবে সাজালো। সেই সঙ্গে নিয়ে এল একটা রেডিও ও নতুন নতুন পোশাক, আর ঘর-গেরস্থালীর টুকিটাকি। এতেই প্রায় হাজার দুয়েক টাকা খরচ হল। সে আগের কৃপণতা ভুলে বেশ ফূর্তিতেই থাকতে লাগল

আর দেদার পয়সা ওড়াতে লাগল। তার মনে হল একটা আকাঙ্ক্ষা যেন তাকে গ্রাস করেছে নিজেকে উপলব্ধি করার জন্য, যা থেকে সে নিজেকে এতদিন বঞ্চিত রেখেছিল।

বেশ একটা সংবেদনশীল পরিস্থিতিতে সে ওম হুসনিকে বিদায় জানাল। আর তাতে মহিলা যারপরনাই বিস্মিত হলেন। কেঁদে কেঁদে সে বলতে লাগল, "জন্মস্থান ছেড়ে যেয়ো না, তা ভাল হবে না।"

কিন্তু সে চলেই গেল, কোন অনুশোচনা ছাড়াই। কারণ কাদ্রিয়াকে ছাড়া তো এখানে থাকা যাবে না। আর সে ভাবত যে গলিটা অবক্ষয়ের প্রতীক, এক বিফল জীবন ও দুঃখের স্মৃতি। তার পাওয়া-না-পাওয়ার ব্যথা যন্ত্রণাগুলো সে ডুবিয়ে দিতে চাইছিল আপাতদৃষ্ট আনন্দের গহ্বরে। আর সে নিজেকে নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস করাতে চাইছিল যে একমাত্র কাদ্রিয়াকেই সে নিঃস্বার্থভাবে ভালোবেসেছে। আর এটাই তাদের আজীবন সম্পর্কের ভিত্তি। মেয়েটার দিক থেকে একজন গৃহবধূ হিসেবে যতটা করার সবটাই সে নিষ্ঠা সহকারে করছিল। আর ওই ধরনের পরিবেশ থেকে বেরিয়ে এসে এরকম কেতাদুরস্ত জীবনযাপন সে বেশ মানিয়েও নিয়েছিল। আর ওথমানও চাইত না যে তার পুরোনো পেশার বন্ধুরা তাকে দেখে ফেলুক, আর সেই কারণে প্রতিবেশিদের সঙ্গে মেলামেশাটাও সে একটা সীমার মধ্যে বেঁধে রেখেছিল। আর ব্যাপারটা নিয়ে কাদ্রিয়া প্রশ্ন করতে সে বলেছিল, "ওদের ব্যবহার আমার ভাল লাগে না।"

আসলে ব্যাপারটা ছিল অন্য। প্রতিবেশীর সঙ্গে কোন কারণে মনোমালিন্য হলেও উত্তেজিত কাদ্রিয়ার মুখ থেকে যদি কোন অশ্লীল ভাষা বেরিয়ে আসে তবে অবগুণ্ঠনের ঝুলি থেকে সত্যের বেড়ালটা বেরিয়ে পড়বে। তবে ওথমান কখনই অস্বীকার করত না যে মেয়েটা তাকে সুখী করার আপ্রাণ চেষ্টা চালাচ্ছে। যথাসম্ভব সে মানিয়েও নিচ্ছে এই নতুন পরিস্থিতিতে। আর যতদিন যাচ্ছিল সে তার নতুন জীবন সম্পর্কে আরও নির্ভরতা অর্জন করছিল। আর ক্রমশ তৃপ্ত হচ্ছিল তার উষ্ণসান্নিধ্যে। শৃঙ্খলা আর পরিচ্ছন্নতা চিরকালই তার সাধ্যের মধ্যে ছিল। এখন সে সমর্থ হয়েছে পরিচ্ছন্ন চেতনা নিয়ে আল্লাহ-র কাছে প্রার্থনা করতে। অনুভব করতে পারছে যে একটা (বলা ভাল দুটো) প্রাণকে সে নষ্ট হতে দেওয়ার থেকে উদ্ধার করছে। আর ক্রমশই সে আমার তুলনায় আরও বেশি ঈশ্বরমুখী হয়েছে।

ওথমান অল খাসির গোরস্তানে একখণ্ড জমি কিনল। বিশেষজ্ঞ ও স্থপতিদের সঙ্গে পরামর্শ করে প্রস্তুত হল একটা জমকালো সৌধ তৈরী করার। সে নিয়মিত যেত সেই সৌধের কাজের অগ্রগতি দেখতে। সঙ্গে নিয়ে যেত তার মন্ত্রকের এক স্থপতিকে. যে এই সৌধের পরিকল্পনা করেছিল। স্থপতি তাকে একদিন জিজ্ঞেস করল, "আচ্ছা আপনাদের কোন পারিবারিক কোনো পুরোনো সৌধ নেই?"

ওথমান বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত না হয়ে উত্তর দিল, "অনেকদিন আগের একটা আছে বটে। পূর্বসুরীদের ভীড়ে সেখানে পা রাখার জায়গা নেই। নতুন একটা না করা ভিন্ন গত্যন্তর নেই।"

"এটা কিন্তু একটা দারুণ করে তৈরী করতে হবে। এটা যেন অতুলনীয় হয়", স্থপতি উত্তর দিল। "তবে আধুনিক স্থাপত্য শিল্প অনুসারেই হবে এটা।

"তবে আমার মতে বসবাসের ব্যাপারে অন্যের বাড়ি ভাড়া নিয়েও থাকা যায়। কিন্তু একটা পারিবারিক স্মৃতিসৌধ না থাকাটা .....বেশ অমর্যাদাকর।

স্থপতি হাসতে হাসতে বলল, "ভারতবর্ষে হিন্দুদের দাহ করা হয়।"

"কি ভয়ঙ্কর" ওথমান ঘৃণা মিশ্রিত স্বরে বলল। স্থপতি আবার হাসতে হাসতে বলল, "আমার মতে কবর দেওয়ার তুলনায় শবদাহ অনেক সম্মানজনক। ভেবে দেখেছেন, কখনো মৃতদেহ কিভাবে পচে?"

'না, এমনকি আমি ও ব্যাপারে জানতেও চাই না।'

ওথমান রাগত স্বরে বলল। তারপর একটু ভেবে বলল "আচ্ছা একটা শৌচাগার করলে কেমন হয়?"

"বহিরাগত আর ভবঘুরেরা আসবে আর নোংরা করবে।"

"আচ্ছা কিছু গাছপালা লাগালে তো হয়।

"ওটা কোন সমস্যা হবে না। বাইরে থেকে জল দিলেই চলবে।"

সৌধের কাজ পুরোপুরি শেষ হয়ে যাওয়ার পর সবকিছু মিলিয়ে নিয়ে সে বাকী টাকাটা পরিশোধ করে দিল। এক অনাবিল আনন্দে চারদিক ঘুরেফিরে দেখতে লাগল। সামনের খোলা দরজাটা দিয়ে সে দেখতে পাচ্ছিল ঝকঝকে সিঁড়ি গুলো নেমে গেছে কবরের দিকে। সে একটু ঝুঁকে তাকাল রৌদ্র ঝলমলে সৌধের মেঝেটার দিকে। ঝা চকচকে মেঝেটা যেন রৌদ্রের আলোয় স্নান করছে। সে অনুভব করল এটাই যেন তার চিরন্তন গৃহ, সব যেন তারই জন্য তৈরী। তার হাড়গুলো তার মা বাবার মত অন্য শবের ভীড়ে হারিয়ে যাবে না। তার অন্তরের গভীর থেকে নির্গত হল এক আশ্চর্য কোমল স্বর। যেন প্রেমিকের মত ফিসফিসিয়ে তাকে বলল, এস শুয়ে পড় ওই উজ্জ্বল মেঝেতে, এক আরামের স্বাদ নিতে, যার ভাগীদার সে জীবনে কখনও হয়নি। সে উপভোগ করল এক শান্তি যা সে কখনও পায়নি। এই প্রথম তার ঝঞ্ঝা বিক্ষুব্ধ জীবনে সে আবেগ তাড়িত হল। মূহর্তের জন্য তার ইচ্ছে হল এই অদ্ভুত নির্দেশ পালন করতে। ওই জগতের আনন্দ ও আরামের মধ্যে বিলীন হতে। সমাধিক্ষেত্র ত্যাগ করে শহরে আসা পর্যন্ত এই ঘোরেই সে আচ্ছন্ন রইল। সে পাগল হয়ে উঠেছিল তার পিতামাতার দেহাবশেষ নতুন সৌধে স্থানান্তরিত করার জন্য। তাতে সেটা আরো বেশি করে নিজের বাড়ি বলে মনে হবে। কিন্তু সে অনেকদিন আগে শুনেছিল শবদেহ নাকি সরানো সম্ভব নয়। কারণ নিঃস্বদের সমাধিক্ষেত্র ও ভীড়ে ঠাসা, সেখানে দেহ আলাদা করাই দুষ্কর।

"সন্দেহ নেই যে আমরা আগের থেকে অনেক ভালো আছি।" সে এই বলে নিজের মনকে বোঝাল। তবে তার মানে এই নয় যে সে ঈশ্বরের চিরন্তন পৃথিবীকে অস্বীকার করেছে, যদিও এ ব্যাপারে তার মনের ইচ্ছে তলানিতে ঠেকছিল।

৩৩

দিনগুলো যেতে দাও।

আর যাই ঘটুক না কেন সে এখন পুরোদস্তুর সংসারী লোক ও এক সৌধের মালিক। সে এখন বেশ কিছু নতুন খাবারের নাম জেনেছে। আগে জানত চাল লেন্টিল, বীণ ইত্যাদি। এখন জেনেছে যে টাকাগুলোকে মমির মত ডাকঘরে ফেলে না রেখে অন্য কিছু করা।

তার দিনগুলো ক্রমশই একঘেয়ে ক্লান্তিকর হয়ে যাচ্ছিল, আর সেই সঙ্গে কিছুটা আশাহতও বা।

অপ্রত্যাশিতভাবে কিছু ঘটনা তার ভাগ্য ও ভবিষ্যত পাল্টে গেল। পৃথিবীটা যেন নতুন করে প্রতিভাত হল তার চোখের সামনে। একদিন সকালে মন্ত্রকের সবাই শুনলো যে মহানুভব বাহজাত মূরকে স্বরাষ্ট্র সচিবের পদে উন্নীত করা হয়েছে। আর তাতেই বহুদিন বাদে এই প্রথমবার মহানির্দেশকের পদটা শূন্য হবে। আর এই দু সপ্তাহ ধরেই অনেকের নাড়ীর গতি বেড়ে গিয়েছিল। নতুন মহানির্দেশকের নাম জানতে না পারায়। অবশেষে সিদ্ধান্ত হল আবদুল্লাহ ওয়াজাদ ওই পদে অসীন হবেন। তার হৃদয়ে দীর্ঘদিনের সুপ্ত আশা আবার উত্তেজনায় জেগে উঠল।

"আমিই একমাত্র যোগ্য প্রতিনিধি," ওথমান মনে মনে বলল। পদোন্নাতির প্রথম সারিতেই আমি। ওরা কি করবে ওখানে গিয়ে?"

ঘটনাবিহীন কয়েকটা সপ্তাহ পেরিয়ে গেল। ওথমান তার বিষয়টা নিয়ে নতুন মহানির্দেশক বা স্বরাষ্ট্র সচিব পর্যন্ত কারুর কাছে দরবার করতেই বাকি রাখলো না।

একদিন সহকর্মীদের আলোচনায় সে শুনতে পেল যে একজন বলছে প্রশাসনিক কর্তার পদটা খুব সংবেদনশীল। সে তক্ষুণি খোঁজ নিল সেই বিষয়ে।

"এ পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে আসলে অভিজ্ঞতার বা দক্ষতার চেয়েও বেশি স্থান দেওয়া হয় সামাজিক মর্যাদাকে" লোকটি বলল। ওথমান বিরক্তভাবে বলল, "হ্যাঁ, মহানির্দেশক বা স্বরাষ্ট্র সচিবের নিয়োগের ক্ষেত্রে এমনটা করা হতে পারে। এটা তো সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত। সে তো সেই তখন থেকে যখন এই পদের জন্য বৃটিশ অফিসারদের নিয়োগ বন্ধ হল।

তার ক্ষোভ আর দীর্ঘমেয়াদী হল না, কারণ সেই মাসেই তার পদোন্নতির বিজ্ঞপ্তি জারী হল। পরবর্তীকালে সে দিনটা হয়ত মনে করলেই প্রচণ্ড উত্তেজিত হয়ে পড়ত। আর নিজের মনে বলত, "একমুহূর্তেই এই অঘটনটা ঘটল।" আবও বলত, "প্রবীণতার বিচারে মহানির্দেশকের পরেই আমি।"

কিন্তু কিভাবে ঘটল ঘটনাটা? ইতিমধ্যেই সে বিশ্বাস করতে শুরু করেছে যে এবার তাকে অবসর নিতে হবে। আর তা কেউ তাকে টপকে যাওয়ার আগেই। কিন্তু সংসদে একটা পরিবর্তন হল, যার ফলে স্বরাষ্ট্রসচিব মন্ত্রী হলেন আর তার ফলেই তার মনে আবার একটা খুশির বাতাবরণ তৈরী হল। বাহজাত মূর, স্বরাষ্ট্রসচিব, তাকে ডেকে বললেন,

"অনেক প্রতিবাদ সত্ত্বেও কিন্তু আমি তোমাকেই মনোনীত করলাম।" ওথমান তাঁকে আন্তরিক অভিবাদন জানাল। আর দুঃখিত হয়ে প্রশ্ন করল, "প্রতিবাদ কিসের?"

"তুমি তো দীর্ঘদিন সরকারী চাকরি করেছ, প্রতিবাদের কারণটা অনুধাবন করতে পারছনা।"

যাই হোক, সে তার স্বাভাবিক চরিত্র বজায় রেখে আগের মত কাজ করতে আরম্ভ করল। আর সে ঈশ্বরের কাছে নিয়মিত প্রার্থনা করত যে তার পরিচালনায এই দপ্তরের কাজ কর্ম যেন এক অবিস্মরণীয় কীর্তি স্থাপন করতে পারে। আর তাই সে প্রত্যেক কর্মীকে ব্যক্তিগতভাবে বোঝাচ্ছিল, সরকারী পদ খুব সম্মানের ব্যাপার আর মানুষের প্রতি কর্তব্য, পৃথিবীর প্রতি শ্রদ্ধা এক সচেতন রীতি।

প্রথমদিন থেকেই সে ঠিক করেছিল যে সে আবদুল্লাহ্ ওয়াজদিকে সম্পূর্ণভাবে সহযোগিতা করবে। কারণ এটা ছিল একটা সরকারী রীতি আর দপ্তরেব প্রতি কর্তব্যে তার কোনও ত্রুটি দেখা যায় নি। সে আপ্রাণ চেষ্টা করছিল নিজের অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে মহানির্দেশকের অদক্ষতাকে চাপা দিতে। এককালে স্বরাষ্ট্র সচিবকে সে যেমন ব্যক্তিগত সাহায্য করত তাঁকেও সে ওই একই প্রস্তাব দিল। যদিও সে জানত যে তার আজকের কাজেব ফল আগামীদিন পাবে।

সে হয়ত মনে মনে বলল, "যদিও ওয়াজদি এখনও যুবক, কিন্তু অঘটনেব সময় প্রায় এসে গেছে।"

কিন্তু শুধু অঘটনের আশায় সে বিষয়টা নিয়ে নাড়াচাড়া করেনি। সে দেখল ওয়াজিদ বেশ সংকীর্ণ স্বার্থান্বেষী ও পরশ্রীকাতর। আর তার চ্যালাগুলোও জুটেছে ঠিক তারই মত। খাবার দেখলেই হল। একসঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়বে সবাই। ওথমান খেয়াল করল যে তাব পান ভোজনের গল্পের রস ওয়াজদি বেশ আগ্রহসহকারেই গ্রহণ করছে।

আর এই রোগ যার মধ্যে ঢুকেছে তার আর মুক্তি নেই", সে ভাবল।

তাহলে কি এটাই একমাত্র সঠিক পথ, তাই নয় কি? যে তার সীমিত ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও সে ছিল আল্লাহ্‌র একনিষ্ঠ সেবক। সে নবীর নাতি অল হুসায়েনের ভক্ত, আল্লাহ্‌র দোয়া থেকেও বঞ্চিত হবে না কোনদিন। সেই চূড়ান্ত দিনে রায় প্রদানের সময় মানুষ তার সযত্নে লালিত আশা-আকাঙ্ক্ষাগুলোর জন্য আবেদন করার বেশি আর কিই বা করতে পারে (জীবনের শেষ মুহূর্তে এসে মানুষ তার আরাধ্য দেবতাকে বলে) কিইবা দেখাতে পারে সেই লক্ষ্যগুলো ছাড়া যা আশীর্বাদের মত ঝরে পড়েছে তার ওপর তার দৃঢ় প্রগতি ছাড়া, যা দেশ ও মানুষের জন্য নিবেদিত? রাষ্ট্র হল মর্ত্যের মসজিদ, আর আমাদের ইহকাল ও পরকালেব কি অবস্থা হবে তার সবকিছুই বর্তমান কাজেব ফলাফলের ওপর নির্ভরশীল।

এদিকে, তার বিবাহিত জীবনের সুখশান্তি কিন্তু দীর্ঘমেয়াদী হল না। সে নিজেকে যতই ঠকাক না কেন, আর ভালো ফলের আশায় বসে থাকুক না কেন, অসুবিধেগুলো

তার পিছু ছাড়ল না। সে কাদ্রিয়াকে অনুনয় করে বলল, 'কাদ্রিয়া এত মদ খাওয়া ভাল নয়।" মেয়েটা হতভম্ব হয়ে তার দিকে তাকাল।

"হ্যাঁ, জানি, আর তাইতো করি।"

"এখনও অনেক সময় আছে এগুলো ছাড় "; সে আশান্বিত হয়ে বলল।

"ও কিছু হবে না।"

"হ্যাঁ করতে হবে," সে একই সুরে বলল," কারণ আমি চাই তুমি ঈশ্বরের কাছে উপবাস ও প্রার্থনা কর। আমাদের ঈশ্বরের আশীর্বাদ প্রয়োজন।

সে রাগত স্বরে বলল, "আমি ঈশ্বরে বিশ্বাসী। আর জানি তিনি দয়ালু ও করুণাময়ী।"

"তুমি এক সম্ভ্রান্ত নারী, আর কোন সম্ভ্রান্ত মহিলা রোজ রাতে মদ গেলে না।"

"তাহলে তারা কখন মদ্যপান করে?"

"তারা মোটেই করে না।"

অবজ্ঞার হাসি হেসে সে তাকাল তার দিকে। একটা ক্রোধের ছায়া ফুটে উঠল তার চোখে, বিরক্তিভরে বলল, "সব ফালতু।"

"কি বলতে চাও কি?"

"আমাদের তো সন্তান লাভের আশা নেই। বড়ই দেরী হয়ে গেছে।" সন্তান হীনতার দুঃখ সে জানত। তা সত্বেও বলল, "আমরা চেষ্টা করলে এখনও কিন্তু আনন্দে বাঁচতে পারি।

মেয়েটা নেশা ছাড়ার চেষ্টা খানিকটা করেছিল কিন্তু তা আবার আগের মতই চলতে লাগল। ফলে ওথমান আরও বেশি করে অফিসের কাজে জড়িয়ে পড়ল আর কাদ্রিয়াকে তার পক্ষে সঙ্গ দেওয়া সম্ভব হতো না। আব তার ভয়ঙ্কর একাকীত্বই তাকে আরও বেশি করে নেশার কবলে ঠেলে দিল। একদিন ওথমান তাকে আফিম খেতে দেখে শিউরে উঠল।

'না', ওথমান চীৎকার করে উঠল।

"আহ্ ছাড়।" মেয়েটাও চেঁচিয়ে উঠল।

"তুমি...কবে থেকে," সে উদ্বিগ্নভাবে বলল।

"কেন, সেই নোয়ার বন্যার সময় থেকে।"

"কিন্তু..."

"বন্ধ কর। এটা মৃত্যুর চেয়েও ভয়ঙ্কর।"

"কিন্তু মৃত্যু আর আফিম দুটোই সমান।"

'আমি পরোয়া করি না," সে মরীয়া হয়ে বলল।

ভয় তাকে গ্রাস করল। সে নিজের প্রতি এ কি করল? সে সুখের মায়াবী বিভ্রমের পেছনে ছুটতে গিয়ে, সুখকে বিভ্রমে পর্যবসিত করেছে। এখন তাকে তার চরম মূল্য দিতে হবে। আর বিবাহ বিচ্ছেদের চিন্তাটাও অর্থহীন। এখন তাকে ভয়ঙ্কর হিংস্র বিতর্কের সম্মুখীন হতে হবে।

"ওটা তুমি পেলে কোথায়?" সে জিজ্ঞেস করল কিন্তু কোন উত্তর এলো না কাদ্রিয়ার কাছ থেকে। "তাহলে আমার সন্দেহটাই ঠিক, তুমি আগের জগতের সঙ্গে যোগাযোগটা এখনও রেখে চলছ। তুমি জান ওগুলো কত ভয়ানক?"

"বাজে বকবক্ না করে চুপ করো।"

"কাদ্রিয়া", আর একবার অন্তত ভাবো। যদি তুমি তোমার জীবনযাত্রাটা না পাল্টাও তাহলে কিন্তু আমরা শেষ হয়ে যাবো।"

তার সম্মান ও ভবিষ্যৎ রক্ষা করতে সে ব্যাপারটা সামলে নিল। আর প্রায় যুদ্ধ করে তাকে ভর্তি করল হিলওয়ানের একটা পুনর্বাসন কেন্দ্রে। সেখানে কাদ্রিয়া প্রায় দুমাস ধরে চিকিৎসার পর সুস্থ হল।

ওথমান আশা করেছিল যে কাদ্রিয়া এক নতুন নারী হিসেবে তাব কাছে আসবে। মাদকের বদলে খাদ্যই এখন তার জীবনে প্রধান সান্ত্বনা হয়ে দাঁড়াল। আর অত্যধিক খাওয়ার ফলে তার চেহারাটা কুমড়োপটাশের মত হয়ে দাঁড়াল। মানুষের কাছে সে হাসির বদলে করুণার খোরাক হয়ে উঠল। ওথমানের মনে সে সম্পর্কে চিন্তার অন্ত ছিল না। হয় তার চিন্তা কিংবা পদোন্নতির ভাবনা তাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। সে অনুশোচনা করে বলত "আমি আজ এমন একটা জিনিস হারিয়েছি যা ওই রাত্রিগুলোকে তৈরী করেছিল পশুসুলভ আচরণের উপযোগী করে। বাকি আর কি আছে এখন? এক বেআব্রুতা, অবিশ্বাস, অজ্ঞান ও বিস্বাদে ভরা জীবন।"

সে তার রাজনীতি সচেতন সহকর্মীদের মত নিজেকে এই বলে সান্ত্বনা দিল যে সবাই তাদের বউদেরই দোষী সাব্যস্ত করে সামাজিক অবিচার ও শ্রেণী বৈষম্যের সুযোগে। তার মনে পড়ল নিজের জীবনের ঘটনাগুলোও। কাদ্রিয়ার মত সেও কি দারিদ্র্য অসহায়তা ও বঞ্চনার শিকার হয়ে বেড়ে ওঠে নি? হ্যাঁ, কিন্তু এক সঠিক সময়ে সে তার রুক্ষ হৃদয়ে সঠিক মাধুর্য্য উপলব্ধি করেছিল। আর ঠিক এভাবেই সে সন্ধান পেল এক শাশ্বত জ্ঞানের, যেখানে ছিল এক মহান যাত্রা পথ সেখানে মনুষ্যরূপে সে চলতে গিয়ে ক্ষত বিক্ষত হয়েছে। আর সে ছিল সর্বশক্তিমান ঈশ্বরেরই সৃষ্টি। আর সেই কারণেই সে মেয়েটাকে ক্ষমা করতে পারে নি—আর নিজেকে নিজে প্রশ্ন করল, "আমি নিজের জন্য কি করেছি?"

প্রকৃত ভালোবাসা ছাড়া বিবাহিত জীবনে আছেটা কি? একটা আধ্যাত্মিক বন্ধনে, পরবর্তী প্রজন্মের কাছে প্রতিশ্রুতি, নাকি শুধু মানবিক সহযোগিতা তারপর সে নিজেকে সতর্ক সম্ভাষণ করল।

"স্বাভাবিক ভাবে নাও। দুঃখগুলোকে কখনও বেশি প্রাধান্য দিও না। তুমি যতটা ভাবছ ততটা সবল তুমি নও। একটা হালকা হাওয়ার মত পেলব, কোমল পরিবর্তন আসবে। কিন্তু তা হবে শেয়ালের মত ধূর্ত। এটা বয়সের সঙ্গে তাল মিলিয়ে হবে।..." একটু ভেবে আবার বলল,

"এটাই হল সময় প্রতিটা প্রাপ্তিকে ধন্যবাদ দেওয়ার আর সময়ই দায়ী প্রতিটি ক্ষতির জন্য...এবং ঈশ্বরকে অবমাননার জন্য।

৩৪

স্বাভাবিক ভাবেই সে তার নতুন পদোন্নতির কথাটা পুরোপুরি বিস্মৃত হল। আনন্দ হারিয়ে গিয়ে তৈরী হল এক ভয়ের বাতাবরণ। পরিচালন বিভাগের অধিকর্তা হিসেবে তার কাজ এক গতে বাঁধা দৈনন্দিন কর্মসূচীকে পরিণত হয়েছিল। আর যেহেতু সে জীবন সায়াহ্নে উপস্থিত হয়েছিল তাই সে সব কিছু দ্রুত শেষ করতে চাইছিল। তা না হলে চাকরী জীবনের অন্তিম পর্বে এসে তাকে হয়ত ভিক্ষুকের মত দাঁড়াতে হবে ওই নীল ঘরটার সামনে। সত্যাই, উচ্চাকাঙ্ক্ষা বড় নিষ্ঠুর। আর বিয়েটাও তার কল্পনার সঙ্গে নিতান্ত বেমানান।

"আল্লাহ্ আমি চেষ্টা করছি তাকে পথ দেখাতে। তুমি দয়া করে আমায় শক্তি দাও।"

কিন্তু তার প্রচেষ্টা বৃথাই গেল। বস্তুতঃ তা কাদ্রিয়ার কাছে নিয়ে এল এক অকল্পনীয় দুর্দশা। অতীত ও তার কাছে দুঃসহ ছিল কিন্তু সে তা কখনও উপলব্ধি করেনি। আর মদ ও আফিম তাকে দিয়েছিল এক সাময়িক শান্তি। কিন্তু আজ সে মুখোমুখি হল এক চরম শূন্যতায় এক ভয়ঙ্কর আত্মোপলব্ধির। তার চোখ আতঙ্কে বিস্ফারিত হয়ে উঠল। আর তাকে সান্ত্বনা দেওয়ারও কিছু ছিল না। না ভালোবাসা, না সন্তান।

ওথমান মনে মনে বলল, একটা রূপোজীবিনী হিসাবে সে ছিল আমার সান্ত্বনা ও শান্তি। কিন্তু এই আরামদায়ক বাড়িটা আমারই জন্য নরক হয়ে উঠেছে।"

"যদি আমরা প্রত্যেকেই নিজের রাস্তায় চলি, একটা অঘটন হয়ত আমাকে সুখ এনে দেবে। কিন্তু কোথায় আমার সেই পুরাতন নিঃসঙ্গতা? কোথায়?"

একদিন সন্ধ্যায় সে বাড়ি ফিরতেই কাদ্রিয়ার মুখ ঝামটা ও রক্তচক্ষু তাকে অভ্যর্থনা জানাল।

ওথমান আতঙ্কে চেঁচিয়ে উঠল, "আবার নেশা করেছ তুমি?" সে অবসাদের ঢঙে মাথা নাড়ল।

"হ্যাঁ। ভাগ্যিস।"

"তাহলে আফিমও খাবে," ওথমানের ভয়ার্ত কণ্ঠস্বর।

"হতেই, পারে," সে ব্যঙ্গের ঢঙে উত্তর দিল।

"তাহলে আমরা কি করব?" ওথমান চড়া গলায় জিজ্ঞেস করল।

কাদ্রিয়া ঠাণ্ডা স্বরে বলল, "ঠিকই আছে। জান গতকাল রাত্রে আমি স্বপ্ন দেখলাম, যেন মা আমার কাছে এসেছেন।"

"আমার আর কিচ্ছু করার নেই।"

"আমি তো সেটাই চাই।"

মেয়েটা ওথমানের সামনেই যেন আস্তে আস্তে একটা বিভ্রমের জগতে তলিয়ে গেল। এক লক্ষ্যহীন লক্ষ্যের সন্ধানে। এভাবে সে কিছুটা ভারমুক্ত হল যে এর ফলে সে তার হারানো নিঃসঙ্গতা আবার ফিরে পাবে। আর ক্ষতবিক্ষত বিবেকে সে ওই মৃত্যু

পথযাত্রীকে অতল গহ্বরে তলিয়ে যেতে দেবে। আল্লাহকে উদ্দেশ্য করে বলল, "আমার এ ধরণের ভাবনাচিন্তাব জন্য আমায় ক্ষমা করো। ইয়া আল্লা, ওরা জীবনেরই অঙ্গ, আর তাই এত নিষ্ঠুর।"

সে যখন তার চিন্তায় জ্বলে পুড়ে মরছিল, সেই সময় রাদিয়া আবদাল খালিক তার ব্যক্তিগত সচিব নিযুক্ত হল। যদিও সচিব পছন্দের ভারটা তার ওপরেই ছেড়ে দিয়েছিলেন ব্যক্তিগত বিভাগের প্রধান।

তিনি এও বলেছিলেন, "সচিব নির্বাচন করাটা তোমার ব্যক্তিগত অধিকারের মধ্যে পড়ে, তোমার কোন বিশ্বস্ত আত্মীয়কেও তুমি এপদে নিয়োগ করতে পার।

হায়রে, লোকটা কি সত্যিই জানে না যে সে কোন জগত থেকে এসেছে? তাব দীর্ঘ কর্মজীবনে সে শ্রমিকদের অনেক হাঁড়ির খবরই রাখত। তা তারা যতই গভীব জলের মাছ হোক না কেন। এটা নিশ্চিত যে তার পরিবারের গাড়োয়ানি ঐতিহ্যটা কারুর কাছে আর অজানা নেই।

"আর পছন্দের দায়িত্বটা আমি আপনাকেই দিলাম।"

"জনাব, আপনি সত্যিই সততার প্রতিমূর্তী।" বেশ ঘনিষ্ঠ রসিকতার ঢঙে বলল।

তার পরদিন সকালে এক তরুণী তার সামনে এসে নিজের পরিচয় দিয়ে বলল, "আমি রাদিয়া আপনার নতুন সচিব। আপনি আমার নিযুক্তিপত্র গ্রহণ করলে আমি বাধিত হব।"

ওথমান বেশ গর্বের সঙ্গে বলল, "কেমন আছ? তা তুমি কোন বিভাগ থেকে বদলী হয়ে এলে?"

"ব্যক্তিগত বিভাগ থেকে।"

"বাহ্, কি নিয়ে পড়েছ?"

"ইতিহাসে স্নাতক।"

সে প্রায় তার বয়স জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিল, কিন্তু নিজেকে সামলে নিল। কত আর হবে, বড়জোর পঁচিশ। তার চেহারাটা বেশ নজর কাড়া, আর পিঠে ছড়িয়ে আছে একঢাল কালো চুল। আর তার বাদামী রঙের মুখটা যেন তাব সৌন্দর্যকে আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। তার চোখদুটো খুব ছোট কিন্তু বুদ্ধিদীপ্ত, আকর্ষণীয় ভাবে উজ্জ্বল। আর তার চওড়া ঠোঁট জোড়া তার মুখটাকে আরও আকর্ষণীয় কবে তুলেছে। ওথমান এরকম সচিব পেয়ে তার বিভাগীয় প্রধানকে মনে মনে ধন্যবাদ দিল।

"ওহ্ এই নরক থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্য কত চেষ্টাই যে আমি করেছি।"

প্রথম থেকেই সে মেয়েটিকে রক্ষা করতে উদ্যত হল। কিন্তু যত দিন যেতে লাগল তা ক্রমশ অনুরাগে রূপান্তরিত হল। বিশেযতঃ ওথমান যখন জানতে পারল যে মেয়েটা অনাথ আর এক দজ্জাল মাসীর কাছে মানুষ হয়েছে। তার অভ্যন্তরীণ আসা আকাঙ্ক্ষা তো তার কাছে গোপন ছিলনা কিন্তু সে কোন স্থির সিদ্ধান্ত নিতে পারছিল না। এমন কি ভুল করার সিদ্ধান্তও নয়।

"তার সঙ্গে প্রতিদিন সকালে দেখা হওয়াটাই যথেষ্ট নয় কি, সে ভাবল।" মেয়েটা তার নিষ্পাপ শিশুসুলভ চাউনি দিয়েই বেঁধে ফেলল ওথমানকে। তার নম্রতা ও সুন্দর ব্যবহার ওথমানকে কেমন যেন বিবশ করে দিল। যেহেতু তার অধিকর্তা ছিলেন তার পিতার বয়সী সে কারণে কখনই তার কোন আচরণ তার শালীনতার সীমা লঙ্ঘন করেনি। কিন্তু সে হঠাৎ করে তার সম্বন্ধেই বা কেন বেশি ভাবছে? তবে কি তার উপস্থিতি তাকে আচ্ছন্ন করে তুলছে? একটা সময়ে যারা জীবনকে গুরুত্ব দেয় বা যারা তাকে নিয়ে মজা করে মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়।

"আল্লাহ্ দয়া কর," সে প্রার্থনা করল। সে মেয়েটার কাজকর্ম বেশ আগ্রহের সঙ্গে দেখতে দেখতে প্রশ্ন করল, "দপ্তরের কাজ ভাল লাগছে তো?" চাপ নেই তো?"

"না না, আমি কাজ ভালোবাসি" উত্তর এল।

"আমিও প্রথম দিন থেকে তাই করে যাচ্ছি। আমি তোমায় বলছি, কঠোর পরিশ্রম কোনদিন বিফলে যায় না।"

"কিন্তু, ওরা যে বলে..."

"জানি," ওথমান অধৈর্য্য হয়ে বলল, "কিন্তু আমি একে অস্বীকার করি না। পক্ষপাতীত্ব, স্বজন পোষণ, দলাদলি সবই ক্ষমতাসীনদের সুবিধার্থে হয়। কিন্তু দক্ষতাকে কখনই অস্বীকার করা যায় না। এমনকি উচ্চপদে আসীন আমলারাও যোগ্য ব্যক্তিকে খুঁজে নেয় তাদের অযোগ্যতা ঢাকা দেওয়ার জন্য।" সে হাসল, তার সৌন্দর্য অভিভূত করল তাকে, তারপর বলে চলল, "আমি সর্বশক্তিমান আল্লাহ্-র প্রতি বিশ্বাস রেখে লক্ষকে একাই এগিয়ে নিয়ে যেতে চাই।"

"আমি সর্বত্রই তাই শুনি।"

তাই নাকি? আর কিইবা শুনবে? ওই বিষয়টা যা ঘটুক ওম জনাবের ফিরে আসা ঠেকাবে? কিন্তু তা এমন কিছু না।

"তোমার কাজে যে আমি খুশি তা আমার জানানো উচিত", সে বলল।

"সবই আপনার উৎসাহের জন্য," মেয়েটা হেসে বলল।

এরকম বিশুদ্ধ পরিবেশ ছিল তুলনাহীন। এক পবিত্রতা যার গর্ভে নিহিত ছিল প্রতিজ্ঞা ও আনন্দ। ঠিক এখান থেকেই প্রেমিক প্রেমিকারা চলা শুরু করে। পরিণতি পায় বিবাহ ও প্রকৃত বন্ধুত্বে। এভাবেই বিভ্রম দূরে সরে দাঁড়ায়, এনে দেয় অপর্যাপ্ত সুখ। সময়টা হয়ত ভুল হতে পারে। তা তো নিশ্চিত হয় সুখের অস্তিত্ব। রাঁস্তাটা কিন্তু মসৃণ নয়। স্থান কালের পরিবর্তনে পরিবর্তিত হয় মানুষের ভাগ্যও। কিন্তু অতীতের ভুলভ্রান্তিগুলো ভোলা? অসম্ভব প্রায়। সৈয়দা আসিলা ও ওনসিয়া।

দিন যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে তার হৃদয়কে সাবধান করল। সে রাদিয়াকে প্রচণ্ড ভয় পেলেও ভালোবাসতেও শুরু করল। আর অন্যান্য বারের মত তার কাছে আত্মসর্পণও করল আর অপেক্ষা করতে লাগল জীবন তাকে নতুন কি দেয় তা দেখার আশায়।

৩৫

দিন যত যেতে লাগল, দপ্তরের কাজের চাপ ও বাড়ির নরক যন্ত্রণা তাকে অস্থির করে তুলল। তার মনে হতে লাগল পৃথিবী যেন এক জায়গায় থমকে গেছে, আর আবদুল্লাই ওয়াজাদও তার পদে যেন অনড় হয়ে রয়েছে বিখ্যাত পিরামিডের মত।

"সেখানে আশার লেশমাত্র নেই," সে ভাবল। এখন অঘটনই বা কি করে ঘটবে? তার মাথায় কালো চুল এখন কষ্ট করে খুজতে হয়, চশমা ছাড়া সে এখন চলচ্ছক্তিবহিত প্রায়, হজমীচূর্ণ ছাড়া খাবার হজম হয় না। দীর্ঘদিন ঘাড় ঝুঁকিয়ে টেবিলে বসে কাজ করার ফলে মেরুদণ্ডও তার চেহারা পাল্টেছে।

'আল্লাহ কে শুকর, যে এখনও আমি শয্যাশায়ী হইনি। এই কথা বলে সে দীর্ঘক্ষণ আয়নায় তার অবয়ব পর্যবেক্ষণ করতে লাগল। যদিও এটা তার সম্পূর্ণ স্বভাবের পরিপন্থী আর বলে উঠল,

"সব কিছু আগের মতই আছে দেখছি।"

সেই সময় সে একটা সরকারী নিয়ম সংক্রান্ত বিধি ব্যবস্থার বিষয়ে একটা সহজবোধ্য বই লিখে ফেলল। তা আবার তার আধিকারিকদের মধ্যে বেশ আলোড়নও তুলল। তার বয়সবৃদ্ধি সত্ত্বেও তার দপ্তর ও অনুবাদের কাজ বেশ ভালভাবেই চলছিল। এটা একদিকে তার মনের খোরাক যোগাত অন্যদিকে তার বিবাহিত জীবনের দায় থেকে তাকে উদ্ধার করত। আর এটাই ছিল তার আবেগ উত্তেজনা প্রকাশের মাধ্যম।

"অস্বীকার করার কিছু নেই যে, তার সঙ্গে যে সময়টা আমি চিঠিপত্র দেখে কাটাই সেটাই আমার সবচেয়ে সুখের সময়।"

টুকরো টাকরা হাসি ও শুভেচ্ছা বিনিময়, কাজের ব্যাপারে টুকিটাকি মন্তব্য, সবকিছুর মধ্যেই ছিল ঘনিষ্ঠ হওয়ার একটা ছদ্ম ছুতো। আব তার চুলেব ধরণ, জুতো ও ব্লাউজ সম্বন্ধে টুকিটাকি মন্তব্যগুলোও ছিল বেশ ইঙ্গিত পূর্ণ। একদিন সে মেয়েটার চুল বাধার ধরনের প্রশংসা করতে সে বলল, 'ভাবছি এটা ছেঁটে ফেলব।'

ওথমান হাঁ হাঁ করে উঠল।

মেয়েটার কাছে এই আচরণটা ঠিক কর্তাব্যক্তিসুলভ মনে হল না।

"কিন্তু..."

"থাক না যেমন আছে," ওথমান বাধা দিল।

"কিন্তু আধুনিকারা...।"

"আধুনিকারা কি করে তাতে আমার কিছু যায় আসে না। এটাই ভাল লাগছে।"

মেয়েটার মুখের রক্তিম আভা যেন ভোরের সূর্যকেও হার মানাল। ওথমান তার মুখে অখুশির কোন চিহ্ন দেখতে পেল না। সেই মুহূর্তেই ওথমান পুলকিতচিত্তে ফিরে গেল তার অতীত দিনে, আর প্রয়োগ করল মেয়েদের মন জয় করার চিরাচরিত ব্রহ্মাস্ত্র।

এক সকালে সে তাকে এক দারুণ সুন্দর বাক্স উপহার দিল। রাদিয়া চমকে উঠে প্রশ্ন করল 'এটা কি?'

"কোন একটা অনুষ্ঠানের স্মরণিকা।"

"কিন্তু...আপনি জানলেন কি করে?"

"সালে ন মুবারক।"

"সত্যিই তাই।"

"কিন্তু...আপনি না...এটা আবার কি দরকার ছিল..."

"তোমার নীরবতাই আমার কাছে অনেক অর্থবহ।"

"আমি সত্যিই কৃতজ্ঞ।"

"আমিও সত্যিই খুশি।"

সে হাসল, তারপর শক্তি সঞ্চয় করে নিজের আবেগের কাছে নিজেকে সমর্পণ করল। আগুপিছু না ভেবে মরীয়া হয়ে বলে উঠল, "কি করব? আমি যে তোমার মহব্বতে পাগল।"

মেয়েটা তার দৃষ্টি নামিয়ে নিল। ছেলেটার স্বীকারোক্তি সে সম্পূর্ণ ভাবে গ্রহণ করল আর খুশি মনে আত্মসমর্পণ করল ঘটনার গতির দিকে।

"এটাই কিন্তু আমার শেষ কথা, কি করব বল?" ওথমান বলে চলল।

তার মুখটা আরও বাদামী হয়ে উঠল, কিন্তু নিজেকে অবলম্বনহীনের মত ভাসিয়ে দিল গড্ডালিকা প্রবাহে।

বেশ কিছুক্ষণ স্তব্ধভাবে থেকে ওথমান বলল, "তুমি যতটা ভাবছ ততটা তরুণ কিন্তু আমি নই। তার চেয়েও বড় কথা আমি বিবাহিত। কি চাইছিল সে? হয়ত সে চাইছিল না ব্যর্থতা বা মৃত্যুর মুখোমুখি হতে। একেবারে নিঃসঙ্গ অবস্থায় ভালোবাসা ও সন্তানসান্নিধ্য ছাড়া।

ওথমান ব্যাকুলভাবে বলল, "কি করব বল? আমি যে তোমার মহব্বতে পাগল।"

আচমকা একটা নীরবতা বিরাজ করতে লাগল। কোন বাধাই বাধা রইল না, ওথমান হাসতে হাসতে জিজ্ঞেস করল, "তুমি কি কিছুই বলবে না?" সে হেসে বিড়বিড় করে কি বলল বোঝা গেল না।

"হয়ত বা তুমি ভাবছ আমি স্বার্থপর?"

"না, ভাবছি না," রাদিয়া ফিসফিস করে বলল।

"বা পাগল, বদ্ধ উন্মাদ?"

সে মিষ্টি হেসে উত্তর দিল, "নিজের প্রতি অবিচার করো না।"

"তুমি যা বলছ তা ঠিকই কিন্তু কি করব বলো?" তৃতীয়বারের জন্য নীরবতা নেমে এল।

"আমি জানতে চাই তুমি সত্যিই কি ভাবছ?" সে বলল।

"বেশ জটিল অবস্থা না বলা ভাল বিহ্বল করার মত," সে গম্ভীর ভাবে বলল। "আমি নিষ্ঠুর অমানবিক হতে চাই না।"

"তুমি কি আমার স্ত্রীর প্রতি ইঙ্গিত করছ?"

"ও ব্যাপারটা তোমার নিশ্চয়ই ভাবা উচিত।"

"দায়িত্বটা যখন আমার তখন ব্যাপারটা আমাব ওপরেই ছেড়ে দাও।"

"সেটাই স্বাভাবিক।"

"আর কি ভাবছ বল।"

মেয়েটা ততক্ষণে তার আবেগকে নিয়ন্ত্রণ কবে ফেলেছে, বলল, "কেন আমার বক্তব্য কি বোঝাতে পারিনি?"

"তোমায় কি বলব...এটা শুনে আমি এতখুশি মনে হচ্ছে যেন তোমার প্রতি আমাব ভালবাসায় তোমার সায় আছে।"

"হতে পারে", সে দ্বিধাহীনভাবে বলল। ওথমান আনন্দে মাতাল হয়ে গেল।

রাজকীয় ত্যাগেব সুরে বলল, "এখন কি ঘটছে তা নিয়ে আমার মাথাব্যথা নেই।" তার পর সহমর্মীতার সুরে বলল, "সুখ কাকে বলে তা আমি জানি না।"

"সত্যিই তাই?"

"আমার জীবনটা কষ্টের আর বিবাহ, সেটা তো হতাশার সমতুল্য।"

"কই আপনি তো কিছু বলেন নি?"

"কিরকম?"

আপনি তো চিরকালই আমার কাছে প্রাজ্ঞ বিজ্ঞ ব্যক্তির মত, আর আমার ধারণা এই ধরনের লোকেরা বেশ সুখীই হয়।"

"সত্যই কি ধারণা।"

"আমি না জেনে যদি তোমায় দুঃখ দিয়ে থাকি তাহলে আমি দুঃখিত।"

"কিন্তু তোমার ভালোবাসা আমায় সুখী করেছে।" তার মনে হল যে সে জীবনের সেবা পুরস্কার পেয়েছে। যা প্রায় আল্লাহকে পাওয়াবই সামিল। ভালোবাসার শক্তি কি মহান।

রাদিয়া একদিন ওথমানকে তার অল সৈয়দা জনাবের বাড়িতে নিয়ে গেল। পরিচয় করিয়ে দিল বৃদ্ধা খাণ্ডারণী মাসীর সঙ্গে। প্রথম থেকেই ওথমানের কাছে ব্যাপারটা জলের মত পরিষ্কার ছিল যে মহিলা এ বিয়েতে রাজী নন। এবং হলোও তাই। তিনি বিভিন্ন আলোচনার মাধ্যমে মনোভাব পরিষ্কার বুঝিয়ে দিলেন। প্রথমেই বলল, "তোমাব স্ত্রীকে পরিত্যাগ করতে হবে।"

ওথমান ওই দাবীটা প্রত্যাখ্যান করল, কারণ তার স্ত্রী ছিল অসুস্থ।

মাসী চীৎকার করে বলল, "তুমি একে বুড়ো তায় অকম্মার ধাড়ি।"

রাদিয়া ছুটে গেল ওথমানের পক্ষে সওয়াল কবতে।

মাসির কথায় রাগ করো না, সে বলল। মাসি আবার জিজ্ঞস করল তাহলে করবে টা কি?"

"যতদিন পারা যায় বিয়েটা গোপন রাখাই ভাল।"

বাহ্! দারুণ গল্প। মাসী কাঁদতে কাঁদতে বলল। "আর তুমি...তোমার কি বক্তব্য?" রাদিয়াকে জিজ্ঞেস করল বুড়ি।

"হ্যাঁ ব্যাপারটাতে আমিও খুশি নই, কিন্তু ফেলে রাখতে চাই না আর। তাই মেনে নিচ্ছি।"

"যা খুশি কর।" মাসী চেঁচিয়ে উঠল। কিন্তু পুরো ব্যাপারটাই আমার কাছে বাজে ও পঙ্কিল ঠেকছে।

'মাসি! রাদিয়া। ভেঙে পড়ল।

মাসি ঝাঁঝের সঙ্গে ওথমানকে প্রশ্ন করল, "তুমি কি আমাদের দারিদ্র্য, সহায়হীনতা ও নিরাপত্তাহীনতার সুযোগ নিচ্ছে না?"

"এই দারিদ্র্য ও একাকীত্বের অভিজ্ঞতা অনেকের চেয়ে আমার অনেক বেশি," ওথমানের পাল্টা জবাব। আর এতেই সে প্রথম অনুভব করল তার আবেগের বিস্ফোরণ।

মাসী বলল, "যা ভাল বোঝ কর।"

রাদিয়া বেশ বেপরোয়া ভাব বলল, "আমরা তো ঠিকই করেছি একসঙ্গে থাকব।"

"আমি আর কি করতে পারি? যা করার আল্লাই করবেন।"

মাসখানেক বাদে কাকীর বাড়িতেই বিয়েটা হল। ঘর গৃহস্থালীর সব জিনিসপত্র আনা হল তাদের নতুন সংসারের জন্য। ওথমান ভাবল, জীবনটা হল একটা ধারাবাহিক স্বপ্ন ও দুঃস্বপ্নের সমাহার। আর তার ক্ষেত্রে শেষের স্বপ্নটাই সুখের। সে প্রায় মধ্যরাত পর্যন্ত রাদিয়ার সঙ্গসুখ উপভোগ করার পর ফিরে যেত রাওয়াদ-অল-ফরাজ-এ তার নিজের বাড়িতে, যা তার কাছে ছিল দোজখের মত। কারণ সেখানে নিজের জগতে নিজে হারিয়ে বসেছিল কাদ্রিয়া। কখনও জানতেও চায় না ওথমান কোথায় ছিল বা কি করছিল। যেন পার্থিব কোন কিছুর প্রতিই তার কোন মোহ নেই। যতদিন পর্যন্ত লোককে জানাচ্ছে যে সে দ্বিতীয় দার পরিগ্রহ করেছে ততদিন অবধি পিতৃত্বের চিন্তা সে দূরে সরিয়ে রাখল, যাতে তার নতুন বউ দপ্তরে তার সহকর্মীদের কাছে অপ্রস্তুত না হয়।

চূড়ান্ত আনন্দে সে তার বয়স ভুলে গেল। এমনকি মহানির্দেশকের পদের প্রতি তার যে আকাঙ্ক্ষা ছিল সেটাও তলিয়ে গেল। এমনকি ভুলে গেল কাদ্রিয়াকেও। নিজেকে সে বলল জীবনটা একটা রঙ্গমঞ্চের মত যাতে আল্লাহ-র ইচ্ছার মাধুর্যগুলো উপস্থাপিত হয়।

৩৬

জীবনে এই প্রথম ওথমানকে একটা মানানসই সুন্দর পোশাকে দেখা গেল। বিলাতি পশমের তৈরী ধূসর জামাপ্যান্ট, বিলাতী জুতোতে সজ্জিত। সবই রাদিয়ার কেনা, এমনকি

গলাবন্ধটাও। এই প্রথম সে নিয়মিত দাড়ি কামিয়ে ওডিকোলন মাখা শুরু করল। তবে লজ্জা লাগছিল বলে চুলে কলপটা আর লাগাল না। স্বাস্থ্যের উপযোগী ওষুধ খেতে শুরু করল, নজর দিল পরিচ্ছন্নতার দিকে যা আগে কখনও তার ধাতে ছিল না। রাদিয়াকে বলল, "জানেমন, তোমার সঙ্গে আমি এক নতুন জীবন শুরু করলাম। বাস্তবিকই সে তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে আবেগ ভরে বলল, "আমায় একটা সন্তান দেবে? বেশ কিছুক্ষণ পবে আবার বলত শুরু করল, "জানি না সুদিন কবে আসবে। কিন্তু আমি একটা প্রাচীন পরিবার থেকে এসেছি। আল্লাহ্ আমাদের দীর্ঘায়ু দান করুন।"

রাদিয়া তাকে চুম্বন করে বলল, "আমার মন বলছে যে আমাদের ভবিষ্যৎ সুখের হবে।"

"একটা বিশ্বাসীর হৃদয়ই হল তার পরিদর্শক। বহুমুখী পাপের তরঙ্গ প্রতিরোধ করার মত আস্থা আমি অর্জন করেছি। শ্রদ্ধার সঙ্গে রাষ্ট্রের সেবা করেছি। আমার সেই আত্মত্যাগ আজ অনেকের কাছেই উত্তরণের অনুপ্রেরণা। হয়ত এ ব্যাপারগুলো যখন ঘটবে তখন আমি চলে যাব সব চাওয়া পাওয়ার উর্দ্ধে।

এদিকে কাদ্রিয়ার জীবন ক্রমশ পরিণতির দিকে এগোচ্ছিল। আর ওথমান ক্রমশ তার দায়িত্ব থেকে নিষ্কৃতি পাচ্ছিল। যদিও তার যথেষ্ট সহানুভূতি ছিল কাদ্রিয়ার প্রতি। আর তাই সে ভয় পাচ্ছিল তাকে তার সতীনের কথা জানাতে।

এত কিছুর মাঝেও সে কিন্তু ভোলেনি যে তার চাকুরী জীবন প্রায় শেষ সীমায় উপনীত হয়েছে। কিন্তু তার জীবনের সবচেয়ে মূল্যবান স্বপ্ন সফল হওয়ার কোন আশাই সে দেখছে না। দিন দ্রুত চলে যাচ্ছিল, আর কিছু কিছু আশাতীত ঘটনা ঘটছিল। একদিন আবদুল্লাহ ওয়াজদিকে দেখা গেল বিদেশ দপ্তরের সচিব হিসেবে। ওথমানের সামনে তখন মহানির্দেশকের শূন্য পদ। সে চোখ বন্ধ করে হৃৎস্পন্দন অনুভব করার চেষ্টা করল। ওই পদের আশাই তার জীবনের সমস্ত কিছু অন্য সব কিছু আর স্ত্রী, আশা, বিয়ে সবকিছুই এক লহমায় শূন্যে মিলিয়ে গেল। তার অবদমিত উচ্চাশায় বিস্ফোরণ ঘটল। সে সেই গতিকে সালাম জানাল। রাদিয়া বলল, "প্রত্যেকে তোমাকেই একমাত্র প্রার্থী হিসেবে বলছে।"

"আল্লাহ্, আমাদের আশা পূর্ণ করুন।" সে পবিত্র প্রার্থনার ভঙ্গীতে বলল। "জীবনটা কি দারুণ নয়? এটা এক মুহূর্তেই সব দুঃখকে সরিয়ে দিল যেটা সমুদ্র কখনও পারত না। জীবন হল অনেকটা মায়ের মত, যদিও কখনও কখনও কঠিনভাবে আমাদের শিক্ষা দেয়।"

দেরী না করে ওথমান পররাষ্ট্র মন্ত্রকে গেল আবদুল্লাহ ওয়াজদিকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করতে। ওয়াজিদ তাকে স্বাগত জানিয়ে বলল, "জনাব বাইয়ুমি আমার বলার কথা হল এই যে, আমি আন্তরিক ভাবে কৃতজ্ঞ কারণ প্রথমতঃ আমাকে সচিব হিসেবে নিযুক্ত করেছে দ্বিতীয়তঃ আমাকে মন্ত্রকে ফিরিয়ে দিয়েছে।"

আনন্দে মাতোয়ারা হয়ে ওথমান দপ্তর ছেড়ে বেরিয়ে গেল। তার আশঙ্কা হচ্ছিল তাকে একজন কার্যনির্বাহী মহানির্দেশক হিসেবে নিয়োগ করা হবে না কি পদোন্নতি না হওয়া পর্যন্ত স্বস্থানেই থাকতে হবে। প্রতিদিনের অপেক্ষাটা ছিল এক যন্ত্রণার মত। জ্ঞানত সে জানত যে তার সম্বন্ধে মন্ত্রীর ধারণাটা ভালই, আর সেই কারণেই সে বিভাগীয় সচিবের অনুগ্রহধন্য। শেষ পর্যন্ত সে আর থাকতে না পেরে বাহজাত মূরের সঙ্গে দেখা করতে গেল।

'আমি তোমার চিন্তাটা বুঝতে পারছি।'

ওথমান বোকার মত হেসে চুপ করে রইল।

তুমি কিন্তু বুঝছ না।"

"আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ আমি আপনাকে দিয়েছি।" ওথমান যন্ত্রণার স্বরে বলল।

"একটু ধৈর্য্য ধর," সচিব হেসে বললেন। "আমার দৃঢ় বিশ্বাস শেষ পর্যন্ত তোমায় সুখবর দিতে পারব।"

ওথমান কৃতজ্ঞচিত্তে বেরিয়ে এলেও ভাবনাচ্ছন্ন হয়ে রইল। কেন তাকে ধৈর্য্য ধরতে বললেন? যদিও লক্ষণগুলো ভালই কিন্তু সবকিছু ঠিকঠাক চলবে তো? অপেক্ষার যন্ত্রণায় সে পাগল হয়ে যাচ্ছিল। এক সপ্তাহ বাদে রাষ্ট্রের সচিব তাকে ডেকে পাঠাল। তার চোখের শীতল দৃষ্টি দেখে তার হৃদপিণ্ডটা লাফিয়ে উঠল।

"তোমার পদোন্নতিতে দেরী দেখে নিশ্চয়ই অবাক হচ্ছ।"

'হ্যাঁ মহানুভব।'

"তোমার ব্যাপারে আমার মতামত তো তুমি জানই, মন্ত্রীও সহমত পোষণ করেছেন।"

"আমি সত্যিই কৃতজ্ঞ।"

তারা নির্বাক হয়ে নিষ্পলক দৃষ্টিতে একে অপরকে দেখতে লাগল।

'কি বুঝছ?' বাহজাত মূর জিজ্ঞেস করলেন। ওথমান ফিসফিসিয়ে উত্তর দিল, ওপরতলা থেকে নিশ্চয়ই প্রতিবাদ আসবে।"

"হ্যাঁ, তা বেশ একটা লড়াই চলছে।

'তাহলে শেষ পর্যন্ত কি হবে?"

আমার মনে হয় না মন্ত্রী ব্যাপারটা পাত্তা দেবেন।

"কতটা আশাপ্রদ বলে আপনার মনে হচ্ছে?"

"প্রভূত! আল্লাহ্-র ওপর বিশ্বাস রাখো।"

আল্লাহ্-র প্রতি তার বিশ্বাস অসীম, কিন্তু শয়তানরাও তো লড়াই চালাচ্ছে। ওথমানও প্রচেষ্টা চালাচ্ছে কণ্টকাকীর্ণ পথটা পেরুতে।

"সুযোগ খুবই অল্প." ওথমান দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল।

"দুঃখিত হয়ো না," রাদিয়া বলল। পদোন্নতিটাই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হতে পারে না।"

কিন্তু দুঃখ তার অন্তরের গভীরে বাসা বেঁধেছিল। তার সারাজীবনের স্বপ্ন যেন ছাই হয়ে গেল। রাদিয়া ঠিক করল যে সপ্তাহান্তে একটা দিন তারা অল কানাতির বাগিচায় ঘুরতে যাবে। ওথমান তাকে স্বাগত জানাল আর গেল সেখানে। সেই তার জীবনে একমাত্র সুখের বস্তু ছিল।

"মানুষ তার দুঃখ চিরদিনই প্রকৃতির কোলে বিসর্জন দিয়েছে, রাদিয়া বলল।

সে ঘাসে বসে পড়ে, গা এলিয়ে দিল। ওথমান মেয়েটাকে প্রগাঢ় ভালোবাসার সঙ্গে দেখল। আন্তরিক ভাবে অনুভব করল প্রকৃতিতে তার মিশে যাওয়াকে। আসলে সে অবাক হয়ে দেখছিল, কোন কিছুই তার অতীতের সঙ্গে মিলছিল। কারণ সে নিজের মধ্যেই ডুবে ছিল। যে জগতটা ছিল তার ভাবে পরিপূর্ণ যা ঘেরা থাকত বোধ বা উপলব্ধি দিয়ে। যে জগতে আল্লাহ্ ও তাঁর মহিমা ভালো ও মন্দের দ্বন্দ্বই বিরাজমান। সারাজীবন ধরে এটাই সে দেখে এসেছে।

"তুমি নিশ্চয়ই প্রকৃতি প্রেমী।"

"না আমি তোমার...।"

আমাদের চারদিকে দম্পতিদের দেখ।'

"সত্যি...কতজন"।

মেয়েটা নিজের হাতে তার হাতে রেখে বলল, "চল আমাদের দুশ্চিন্তাগুলো ভুলে যাই, এটা এত ভালো জায়গা।"

"হ্যাঁ চল..."

"কিন্তু সত্যিই তুমি কত দুঃখী।"

ওথমান দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল।

"দেখ, তুমি তোমার দপ্তরে একজন উচ্চপদস্থ আধিকারিক। অনেকে তো এর চেয়েও কমে খুশি থাকে।" ওথমান প্রায় বলেই বসছিল বিশ্বাস ছোটখাট সুখদুঃখের উর্দ্ধে।

আমি অন্যদের মত নই, আর আমার ন্যায্য পাওনা আটকানোর চেষ্টা খুব ঘৃণ্য ব্যাপার হবে সরকারের পক্ষে।"

"তুমি কি খুব বেশি মূল্য দিচ্ছনা?"

"প্রতিটি সরকারী পদই হল ব্যবস্থার অঙ্গ। আর সরকার হল আল্লায় পয়গম্বরের পার্থিব রূপ।

মেয়েটা অবাক হয়ে তাকাল তার দিকে। ওথমান বুঝল যে তার এই বোধটা মেয়েটার কাছে বিশ্বাসযোগ্য নয়।

'বেশ নতুন ধারণা,' সে বলল। কিন্তু আমি শুনেছি আল্লাহ-র আত্মা থেকেই মানুষের জন্ম। ওথমান দুঃখের হাসি হাসল।

"রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব নিয়ে আমার মতে আলোচনা করো না।

"ওটাই তো প্রকৃত জীবন।"

'যতসব ফালতু।'

'কিন্তু সারা বিশ্ব," ওথমান বাধা দিল,

"হৃদয়ের অভ্যন্তরে অবস্থিত।" তার হৃদয় ব্যথিত হল এই ভেবে যে, যে হয়ত তাকে পাগল বা মূর্খ ভাবছে। তাই ভেবে বলল, "ঝগড়া না করাই ভাল।"

রাদিয়া মিষ্টি হেসে সায় দিল।

"এটাই সময়, একটা নতুন আশায় আশ্রয় খোঁজার", ওথমান বলল।" আমাদের বিয়েটা লোককে জানানোর।"

আরক্ত মুখে রাদিয়া বলল, "সব সমস্যা মিটেছে কি?"

"সুখের জন্য সাহসের সঙ্গে জীবনের মুখোমুখি হতে হবে।"

"কথাগুলো শুনতে দারুণ", 'আমি তোমার সতীনকে বলতে চললাম, ওথমানের মুখ ভাস্বর হয়ে উঠল। এক গোপন শক্তি আমায় আহ্বান জানাল নতুন জীবন শুরু করার।

৩৭

ওথমান রাদিয়ার মাসীর কাছে আবার তার মনোবাসনা ব্যক্ত করল।

"এই প্রথম তুমি একজন দায়িত্বজ্ঞান সম্পন্ন লোকের মত আচরণ করলে," বৃদ্ধা মহিলা নিঃশ্বাস ফেলে বললেন। রাদিয়া। ওথমান দুজনেই হেসে উঠল।

"মাসী, তুমি ছাড়া আমাদের জীবন মূল্য হীন," ওথমান বলল। বৃদ্ধাও হেসে তাঁর সম্মতি জানালন।

"আজ আমরা দুজনেই অল-কানাতির বাগিচায় ঘুরে বেড়িয়ে দিন কাটিয়েছি, ও এবার যাই ওথমান জানাল। "তুমি কি আজ রাত্রেই তোমার স্ত্রীকে বলবে?" বৃদ্ধার উৎসুক প্রশ্ন।

"শুভস্য শীঘ্রম," বলে সে উঠে পড়ল। কিন্তু এক পা এগিয়েই তাকে দাঁড়িয়ে পড়তে হল। তার অভিব্যক্তিও সঙ্গে সঙ্গে বদলে গেল।

"কি হল," রাদিয়া উদ্বিগ্ন ভাবে জিজ্ঞেস করল। ওথমান কিছু না বলে বুকের দিকে আঙুল দিয়ে দেখল।

"বসো, বসো! কি কষ্ট হচ্ছে? ক্লান্ত লাগছে কি?"

'ভীষণ যন্ত্রণা হচ্ছে!' সে বুকে হাত দিয়ে বলল। রাদিয়া তড়িৎ গতিতে এগিয়ে গেল তাকে সাহায্য করতে কিন্তু তার আগেই সে ধপ্ করে চেয়ারে বসে পড়ে অজ্ঞান হয়ে গেল।

যখন তার জ্ঞান ফিরল দেখল যে সে বিছানায় শুয়ে আছে। জুতো আর টাই ছাড়া বাকি সব পোষাকই ঠিকঠাক আছে। ঘরে দেখল এক নতুন ব্যক্তিকে। নিজের দুর্বলতা সত্ত্বেও সে বুঝতে পারল যে তিনি একজন ডাক্তার।

রাদিয়া দাঁড়িয়েছিল পাশেই বিষণ্ণ, বিবর্ণ মুখে। তার মাসীকেও বেশ হতাশই দেখাচ্ছিল।

"কেমন বোধ করছেন?" ডক্তার তার দিকে তাকিয়ে বললেন।

"কি হয়েছে আমার?" বিমূঢ় ওথমান পাল্টা প্রশ্ন করল।

"এমন কিছু গুরুতর নয়।"

"আপনাকে কিন্তু বেশ কিছুদিন বিশ্রাম নিতে হবে।"

"আমি ঠিকই আছি," অস্বস্তি অনুভব করল ওথমান। "বোধহয় উঠতে পারব।"

"তাই যদি হয় তাঁহলে আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি যে আপনার অবস্থা খুবই সঙ্কটজনক। ডাক্তারী পরিভাষায় যদি খুব বেশি ভয়ের কিছু নেই। কিন্তু আপনি বাড়াবাড়ি করলে কিন্তু সে অবস্থায় খুব সহজেই পৌঁছবেন। একমাস আপনার সম্পূর্ণ বিশ্রামের প্রয়োজন।" ডাক্তার দৃঢ়ভাবে বললেন।

"এ-ক-মা-স!' ওথমান অবাক।

"হ্যাঁ, তার সঙ্গে আপনাকে নিয়মিত চিকিৎসা করাতে হবে আর আমার নির্দেশমত খাওয়া দাওয়া করতে হবে। এখানে যুক্তি-তর্কের কিছু নেই। আমি কাল আবার আসবো," যন্ত্রপাতিগুলো ব্যাগে ভরে আবার বললেন, "সবকিছু যেন মনে থাকে।"

ডাক্তার চলে গেলেন কিন্তু ওথমান একরাশ হতাশা আর রাগ নিয়ে তাকিয়ে রইল। রাদিয়া উৎসাহ দেওয়ার ভঙ্গীতে তার কাছে এগিয়ে এল।

"একটু ধৈর্য্য ধর সব ঠিক হয়ে যাবে," উদ্বেগের চিহ্ন তার মুখে স্পষ্টই দেখা যাচ্ছিল। সে ওথমানের কপালে তার আঙুল ছোঁয়াল।

"চিন্তা করো না। সব ঠিক হয়ে যাবে।

"কিন্তু এত কাজ..."

"মন্ত্রকের পরিস্থিতি আমি সামাল দিতে পাবব।"

"কি করে?"

"সত্য তো প্রকাশ পাবেই একদিন না একদিন। তাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই।"

"কি যে করি।"

"তোমার স্ত্রী ও জানবে নিশ্চয়।"

"সেটাই তো আসল সমস্যা।"

"আমাদের তো সত্যের মুখোমুখি হতেই হবে।" "বিশ্রাম নাও তো।" রাদিয়ার মাসী বাধা দিলেন। রাদিয়া ঠিকই বলেছিল, হাল ছেড়ে দিলে চলবে না। তার বেঁচে থাকার আশা বিষণ্নতা ও আত্মসমর্পণের ইচ্ছেকে ত্যাগ করেছিল। শেষে পুরোটাই একটা প্রহসনে পরিণত হল।

সে চোখ বন্ধ করে চিন্তামুক্ত হওয়ার চেষ্টা করল, যেন ওগুলো তার কাছে কোন ব্যাপারই নয়। যদিও সব কিছুর কেন্দ্রে ছিল সে নিজেই। খুব শীঘ্রই তার দপ্তরের সহকর্মীরা তাকে দেখতে এল। কিন্তু তার সঙ্গে দেখা করার ডাক্তারী নির্দেশ না থাকায়

শুভেচ্ছাবার্তার তোড়ে ভেসে গেল সে। সেগুলো পড়তে পড়তে হঠাৎ তার সামান বাসয়ুনি ও হামজা-অল-সুয়োফি-র কথা মনে পড়ল। বেশ অস্বস্তিই বোধ করলো সে। ভাবতে লাগল তাঁরা কেমন আছেন বা আদৌ বেঁচে আছেন কিনা? তারপরেই তার মনে হল তার দপ্তরের নতুন কর্মীদের কথা। তারা হয়ত তাকে চেনেই না বা চেনার সুযোগই পায়নি। তার মাথার ওপর আকাশে মেঘ জমা হল আবার সরেও গেল। ঠিক তখনই সে বুঝতে পারল সূর্যাবর্তের তাৎপর্য।

কিছুক্ষণের জন্য চোখ বন্ধ করে যখন সে আবার চোখ খুলল, কাদ্রিয়াকে দেখতে পেল তার পাশেই, বিছানায় বসে। সে একদৃষ্টে তাকিয়েছিল ওথমানের দিকে। তার চোখের দৃষ্টিও অদ্ভুত হতভম্ব কিন্তু মোলায়েম, গাঢ় অথচ নির্লিপ্ত। ঠিক যেন হালকা মেঘের ওড়নায় ঢাকা চাঁদ। ওথমান নিশ্চিত হল যে কাদ্রিয়ার এই জগতের মেয়াদ বেশিদিন নেই, আর তাতে ভয় পাবারও কিছু নয়। কিন্তু তার আচরণও দারুণ পেলব মনে হচ্ছিল ওথমানের। সে শান্তস্বরে বলল, "এখন কেমন লাগছে?"

সে বিভ্রান্ত ভাবে হেসে বিড়বিড় করে বলল, "দারুণ, ধন্যবাদ।"

"ওরা বলল তোমার 'নিজের' বাড়িতে ফিরে যাওয়াটা তোমার পক্ষে বিপদজনক হতে পারে, আমি তোমার দেখা শোনা করতে চাই," সে অজানাকে আহ্বানকরার ভঙ্গীতে বলল।

"ধন্যবাদ কাদ্রিয়া, তুমি যে আমার কাছে কি...।

"আল্লাহ যতদিন না তোমায় সুস্থ করছেন ততদিন তুমি বিশ্রাম নেবে।" অভূতপূর্ব গাম্ভীর্যে কাদ্রিয়া বলে উঠল। "তোমায় আমি দায়ী করি না; আমি বুঝতে পারছো যে তুমি সন্তান চাও, ঠিকই করেছ। আল্লাহ তোমার ইচ্ছা খোয়াইস পূর্ণ করুন।"

"কাদ্রিয়া তুমি এত ভাল আর দয়ালু..."

কাদ্রিয়া হঠাৎ নীরবতায় ডুবে গেল তারপর যেন পাড়ি দিল এক স্বর্গীয় সুবাসের জগতে। সত্যের উন্মোচনে স্বস্তি বোধ করল ওথমান। যেন তার জটিল ও বিস্ফোরক মুহূর্তগুলো উন্মোচিত হয়ে গেছে। সে বুঝতে পারল তার অসুস্থতার প্রকৃত কারণ। আর কি তার মনে পদোন্নতির আশা আছে? না আশা আছে পিতৃত্ব লাভে।

"আমি তো আগে থেকে কিছুই বুঝতে পারিনি," সে রাদিয়াকে বলল।

"ডাক্তার তো আশ্চর্য হন নি।"

"এটা আমায় চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল অসচেতন হওয়ার অর্থ কি?"

"এটা সাময়িক ব্যাপার।"

'আমি সত্যিই তোমার জন্য দুঃখিত।"

"আমি? আমি সত্যিই তোমার ভালোমন্দের কথা ভাবি সারাক্ষণ। পৃথিবীতে কার কখন কি হয় কি বলা যায়?" খুব নরম ভাবে তাব দিকে তাকিয়ে দেখল ওথমান।

রাদিয়া চোখের জল লুকোনোর জন্য মুখ নীচু করল।

"আমি তোমার কাছে কৃতজ্ঞ," ওথমান বলল, "তুমি আমাদের জীবনে একমাত্র আলোকবর্তিকা।" এর না আছে কোন যুক্তি না কোন প্রকৃত অস্তিত্ব।'

"জীবনের ভালো দিকগুলোর দিকে তাকাও না, অন্ততঃ আমাদের স্বার্থে।

ওথমান নিঃশ্বাস ফেলে জিজ্ঞেস করল, "কাদ্রিয়া কি নিশ্চিন্তে বাড়ি গেছে?"

"হ্যাঁ।"

"আমি তার গলার স্বর শুনতে পেলাম মনে হল। কি হয়েছিল বলো তো।"

"কিছুই নয়। সে এক হতভাগিনী।"

"হ্যাঁ। মানুষ নিঃশ্বাস ফেলার দ্রুততায় অনেক ভুল করে বসে।"

"তোমার পুরোপুরি বিশ্রাম নেওয়া প্রয়োজন।"

ওথমান খুব নরমভাবে তার দিকে তাকালো "আমরা কি আমাদের একটা আশা বুঝতে পারব?"

"হ্যাঁ আল্লাহ্ যদি দোয়া করেন।"

ওথমান বিষণ্নমুখে বলল, "বিপর্যস্ত অবস্থায় পদোন্নতি হওয়ার কথাও আমি পেছনে ফেলে এসেছি—আমার একটাই স্বপ্ন—সন্তান।"

"আমাদেরও একটা হবে।"

"ধন্যবাদ সোনা।"

"স্বাভাবিকভাবে নাও না, সব ঠিক হয়ে যাবে।"

"কিভাবে চিরকালের স্বপ্ন হারিয়ে যায় বলো তো? হয়ত পৃথিবীর ধ্বংস এক দিন হবেই..."

"দার্শনিক তত্ত্বগুলো কি এখনই বলতে হবে?"

"আচ্ছা থাক।"

"ঘুমনোর আগে কি তোমার কিছু দরকার?"

"হ্যাঁ, বেঁচে থাকার গোপন রহস্যটা জানা" সে হাসতে হাসতে বলল।

৩৮

শেষ পর্যন্ত দর্শনার্থীরা তার কাছাকাছি আসতে সম্ভবপর হল। প্রায় সবাই এল তাকে দেখতে। তার সহকর্মী অধবস্তনকর্মীদের একটা বড় অংশ এমন কি কুলি ও পাত্রবাহকেরাও। তার শোবার ঘরে একটা ছোটখাট ভীড়ও জমে গেল। সবাই তার দ্রুত আরোগ্য প্রার্থনা করছিল। তারপর আলোচনা চলতে লাগল স্বাস্থ্য ও অসুস্থতা সম্পর্কে এছাড়াও ছিল খুব দ্রুত সেরে ওঠার আশ্চর্য কাহিনী ও আল্লাহ্-র করুণার কথা। তবে মন্ত্রক সংক্রান্ত খবরাখবর, চিকিৎসকদের দক্ষতা মন্ত্রী ও তাঁর সচিবের পাঠানো শুভেচ্ছা বার্তায় আগ্রহ কম ছিল না।

"সহ-সচিব নিজে এলেন না কেন?"

"তিনি কাজে আকণ্ঠ ডুবে আছেন। অবশ্য সেটা কোন কারণ নয়।"

"তাতে কি হয়েছে?"

পরক্ষণেই আলোচনার বিষয় পাল্টে হল জনগণ সম্পর্কিত ঘটনাবলী, সাম্প্রতিকতম বেতার অনুষ্ঠান, দ্রব্যমূল্য, দুই প্রজন্মের দূরত্ব ইত্যাদি।

কিছু কিছু ক্ষেত্রে ওথমানও অংশগ্রহণ করেছিল, কিন্তু অধিকাংশ সময়েই সে ছিল শ্রোতার ভূমিকায় হঠাৎ আরম্ভ হল রাজনীতির আলোচনা। আবার শুরু হল সংঘর্ষের কথা, শ্লোগান ও আরও অনেক কিছু। তার কানে এসে ক্রমাগত বাজতে লাগল স্বাধীনতা, গণতন্ত্র, জনগণ, শ্রমিক কর্মচারী, বৈপ্লবিক চিন্তাধারা ও আগামীদিনের রাজনৈতিক পালাবদলের নিশ্চিত আভাস। তার মনে হল প্রতিটি মানুষই যেন নিজের নিজের উচ্চাশার নীচে চাপা পড়ে ছটফট করছে। এটাই কি যথেষ্ট নয়? অথচ তারা বিশ্বাস করে বিপ্লবের স্বপ্নকে। কিন্তু বিপ্লব কি তাকে সুস্থ করে তুলতে পারবে? এনে দিতে পারবে একটা সন্তান? কিন্তু সে তাঁর আশাকে সযত্নে লালন করতে লাগল। তারা যেন এক ঝাঁক ভেড়া বিষণ্ন বিধুর অঞ্চলে ইতস্ততঃ চরে বেড়াচ্ছে। আর আশাগুলোকে ঝুলিয়ে রেখেছে স্বপ্নের ওপর। তাদের বিশ্বাসের ভিত্তিও দুর্বল আর এরা জানেই না নিঃসঙ্গতাও একধরনের উপাসনা।

তাড়াতাড়ি সেরে ওঠার সান্ত্বনা তাকে হঠাৎ উষ্ণ অভ্যর্থনা জানাল। নিজের বাড়িতে নিজের মধ্যে ডুবে থাকা একটা দারুণ সুযোগ সন্দেহ নেই। তাই সে বিছানার ধারে সরে এসে ধীরে ধীরে মাটিতে পা নামালো।

"আল্লাহর ওপর আমার বিশ্বাস আছে...।" সে উঠে দাঁড়িয়ে বিছানায় হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল যতক্ষণ না নিজের শক্তি ফিরে পায়। তারপর বাচ্চাদের মত টলমল করে হাঁটতে লাগল। তার পা তাকে কোন সাহায্যই করল না। আস্তে আস্তে দরজা পর্যন্ত হেঁটে গেল সে, তারপর দরজা খুলে বসার ঘবেব উদ্দেশ্যে পা বাড়ালো। ইচ্ছে ছিল রাদিয়া ও তার মাসীকে হঠাৎ চমকে দেবে। কিন্তু ঘরে ঢোকার মুখেই তীব্র বাদানুবাদ কানে এল তার;

"কে কে?" চীৎকার করে জিজ্ঞেস করল রাদিয়া। তার মাসী অসম্ভব নীচু গলায় বলল "সব ঝামেলাই তুমি ডেকে এনেছ, আমি অনেক আগেই তোমাকে সাবধান করেছিলাম।"

"এখন আর বলে কি হবে?"

"দেখছ তো তোমার লোভ আর অসতর্কতা তোমাকে কোথায় টেনে এনেছে?"

"যত পার চেঁচাও আর ও শুনতে পাক।"

তারা চুপ করে গেল।

কিংকর্তব্যবিমূঢ়ের মত সে নিজের বিছানায় ফিরে গেল। কি নিয়ে ঝগড়া করছিল ওরা? কি এনেছে রাদিয়া? কিসের লোভ? অসতর্কতাই বা কিসের?

চোখ বন্ধ করে ঠোঁট কামড়ে ধরল ওথমান।

"হায় আল্লাহ। এর মানে কি? সব কি সত্যি? হবে নাই-বা কেন? খেলাটা সে

নিজেই খেলতে চেয়েছিল কিন্তু দুর্ভাগ্য তাকে তাড়া করছে। মানসিক বিপর্যয়ে সে একেবারে ভেঙ্গে পড়ল।

"কি বোকামিই না করেছি।"

আবার অসুস্থ হল সে। যমে মানুষে টানাটানি চলল। কিন্তু সে নিশ্চিতভাবেই জীবনকে আঁকড়ে ধরে রইল। বিশ্বাস করল না যে একটা পবাজিত যুদ্ধে সে অবতীর্ণ হচ্ছে।

"আল্লাহ্-র ইচ্ছাই পূর্ণ হবে।"

যদিও সবাই বলতে লাগল যে সে সঙ্কট পার হয়ে এসেছে কিন্তু মনে মনে বুঝল যে তাকে অনন্তকাল বিছানায় শুয়েই কাটাতে হবে। কিন্তু তার গোপন আশা কোথাও সে প্রকাশ করল না। রাদিয়া এলে সে চোখ বুঝেই শুয়ে থাকত। কোন রাগ বা দ্বেষ তার প্রতি ওথমানের ছিল না।

"ওকে তো নিজের চেয়ে বেশি ঘৃণা করার অধিকার আমার নেই," ভাবল ওথমান।

"ভাবতে দ্বিধা নেই একদিন আমাদের একটা সন্তান হলে আমি বুঝবো যে জীবনটা ভালো মন্দের সংমিশ্রণে তৈরী। কিন্তু কি মূর্খই না ছিলাম আমি। আর কি রকম ভাবে শেষজীবনে এসে পৌঁছলাম।" তার রাগ হল না কিন্তু আল্লাহ্-র পবিত্র পথেব ওপব বিশ্বাসের ভিত টলে গেল।

একদিন উত্তেজনায় হাঁপাতে হাঁপাতে রাদিয়া তার ঘরে এল।

"স্বরাষ্ট্র সচিব তোমায় দেখতে এসেছেন, স্বভাবসিদ্ধ গাম্ভীর্য নিয়ে এলেন বাহজাত মূর। পাশে বসে তার করমর্দন করলেন, "তোমাকে দারুণ লাগছে।"

ওথমান আপ্লুত হয়ে গেল, "মহানুভব, এ যে এক বিরাট সম্মান।"

"তুমি তার যোগ্য। ভালো কাজ তো অবিস্মরণীয়।"

তার চোখ জলে ভরে এল।

"তোমার অনুপস্থিতি আমাদের অপূরণীয় ক্ষতি করে দিল।"

"আপনি মহান বলেই একথা বললেন।"

"তুমি খুব শিগগীরই ভালো হয়ে ফিরে আসবে, একটা ভালো খবর আছে তোমার জন্য," মানুষটির স্মিত মুখের দিকে তাকিয়ে ওথমান বিহ্বল হয়ে পড়ল।

"তোমাকে মহানুভবের পদে উন্নীত করা হয়েছে।" তখনও ওথমানের বিহ্বলতা কাটেনি।

"সততা ও ন্যায়ের জয় হয়েছে।"

"আমার সবকিছুই আপনার দয়ার ওপর নির্ভরশীল", অস্ফুটে বলল ওথমান।

"মহামান্য মন্ত্রীমহোদয় তোমাকে তার আরোগ্য কামনা পৌঁছে দিতে বলেছেন।"

"আমি তার কাছে কৃতজ্ঞ।"

লোকটা যেন তাকে সপ্তম বেহেস্তে পৌঁছে দিল। ঠিক অজানার বার্তাবাহকের মত। রাদিয়া ও তার মাসীব শুভেচ্ছা সে নির্মীলিত নয়নে শুনলো কিন্তু মহাশূন্যের প্রতি তার আস্থা ফিরল না।

"আমি কত সুখী," সে রাদিয়াকে বলতে শুনলো। সে শান্তভাবে এই সাফল্য গ্রহণ

করল। এখন সে মহানুভব, ওই নীল ঘরের অধিকর্তা, পরিচালন ও আইন বিভাগের মহানির্দেশক, তার নির্দেশের খসড়া, দক্ষ পরিচালন দপ্তর, জনমতের নিখুঁত পরিচালন, সত্য ও ন্যায়ের লক্ষ্যের ওপর স্থাপিত।

"হে-আল্লাহ, আমার জীবনের পেয়ালা সে দিন পরিপূর্ণ হবে যখন আমি তোমার নির্দেশ পালন করতে পারব।"

কিন্তু ডাক্তারী নির্দেশ ছিল অন্যরকম,

"আমার দেখার দরকার আপনার স্বাস্থ্য, চাকরী নয়।" ডাক্তার বড়ই কড়া। তাঁর নির্ণয় ঠিক হলে পদোন্নতির আশা ভরসা সেখানেই ইতি।

"প্রকৃত বিশ্বাসীকে স্বাস্থ্য কখনই সুখী করতে পারে না।" ওথমান বলল।

"এরকম কথা আমি কখনও শুনিনি।

"আমার অসুস্থতার জন্য সব ছুটি শেষ হয়ে গেলে তো আমাকে অবসর নিতে বাধ্য করা হবে।"

"এখানে আমার কিছু করার নেই।"

হতাশ হল ওথমান, ভাবল, "হয়ত ওরা দয়া করে আমাকে ওপরের পদে বসাবে আর ভাববে আমি কাজ করতে পারব না।" রাদিয়াকে ডেকে বলল, "আমি তোমাকে আর বিরক্ত করতে চাইনা।' রাদিয়া স্তম্ভিত, "তার মানে?"

"অসুস্থের সেবা করে যাওয়া ভয়ঙ্কর।"

রাদিয়া প্রতিবাদ করলেও সে তার সিদ্ধান্ত থেকে সরে এল না। ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলে হাসপাতালে একটা ঘর ভাড়া করল। দর্শনার্থীরা ছাড়া আর কারুর সেখানে যাওয়ার অনুমতি ছিল না।

দিন যেতে লাগল। বাইরের জগত থেকে ওথমান সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল। কাদ্রিয়ার অবস্থাও ক্রমশ খারাপের দিকে যাচ্ছিল। আসা বন্ধ করল সে। ওথমান ভাগ্যের হাতে নিজেকে সমর্পণ করল। অতীত বর্তমান, ভবিষ্যত কিছুতেই কিছু এসে যেত না তার। রাদিয়ার দেখতে আসাটা তার অসহ্য লাগলেও সহ্য করত সে। হয়ত একদিন ভালো হতে পারে। তার অভিযোগ, জীবনের পবিত্রও নিষ্ঠুর দিক ও অসম্ভব আকাঙ্ক্ষার প্রতি বিশ্বাস অটল রইল। আর নিজেকে বোঝাত হতাশা বা ব্যর্থতা মানুষের আত্মবিশ্বাস জাগিয়ে তোলে। অসুস্থতা বা মৃত্যু সেখানে পৌঁছতে পারে না। মানুষের নিশ্চিত বিশ্বাসই চলার পথে শক্তি জোগায়।

ফাঁকা কথা ও উৎসাহকে সে ঘৃণা করতে লাগল। নতুন পদে যোগ দেওয়া ছিল একটা স্বপ্নের মত, যেমন ছিল সন্তানের আশা। তবে কে জানে কি হয়?

তার সবচেয়ে খারাপ লাগত যখন তাকে আমল না দিয়ে সব কাজ হয়ে চলত নিয়োগ, পদোন্নতি, অবসর, প্রেম, বিবাহ, বিচ্ছেদ, রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব ও শ্লোগান,—দিন রাত।

নীচে হকারদের চীৎকার মনে করাতো যে শীত আসছে।

হয়ত একটা সূর্যস্নাত নতুন সৌধ তাকে ওইরকম আনন্দ দেবে।

ভাষান্তর : বিদিশা ভট্টাচার্য